বাংলাদেশের যাত্রা : বিবর্তনের রূপরেখা

গবেষক

মার্জিয়া আক্তার,

রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ : ০৬/২০১১-২০১২

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক

ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুন ২০১৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মার্জিয়া আক্তার, পিতা – রাশিদুল হক, গ্রাম ও ডাকঘর : ঘাটিয়ারা, থানা ও জেলা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কর্তৃক 'বাংলাদেশের যাত্রা : বিবর্তনের রূপরেখা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত মৌলিক গবেষণাকর্ম। তার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ : ০৬/২০১১-২০১২। এ অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি অর্জনের অথবা কোনো পত্রিকায় মুদ্রণের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

(ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ও
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতাপত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষের খণ্ডকালীন পিএইচ.ডি প্রোগ্রামে *বাংলাদেশের যাত্রা : বিবর্তনের রূপরেখা* শীর্ষক শিরোনামে আমি নিবন্ধনপ্রাপ্ত হই। অভিসন্দর্ভটি রচনার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ-এর সস্নেহ উপদেশ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। অভিসন্দর্ভের কাঠামো পরিকল্পনা ও দুরূহ প্রসঙ্গসমূহের মীমাংসায় তাঁর নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও প্রাজ্ঞ পরামর্শে আমি উপকৃত হয়েছি। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিসীম।

গবেষণা পর্বে পশ্চিমবঙ্গের যাত্রা গবেষক ড. প্রভাত কুমার দাস আমাকে পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমিতে নিয়ে যান এবং সেখানকার গুণী যাত্রাশিল্পীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি চিৎপুর যাত্রাপাড়া ও যাত্রা পরিবেশনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে আমার ধারণাকে পূর্ণতা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। যাত্রা বিষয়ে তাঁর লেখা দুটি গ্রন্থ : *যাত্রার সঙ্গে বেড়ে ওঠা*, *যাত্রা-থিয়েটার ও অভিযাত্রা* ; দুটি সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ: *বাংলা যাত্রাপালার গান*, *বিষয় : যাত্রা থিয়েটার অমরনাথ পাঠক* এবং তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ *যাত্রা আকাদেমি* পত্রিকা ও *বহুরূপী* পত্রিকার যাত্রা বিষয়ক সংখ্যা –– এই উপকরণগুলো যাত্রা বিষয়ে আমার জ্ঞানকে ব্যাপক সমৃদ্ধ করেছে। এ সুযোগে তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। ড. দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপচারিতায় বাংলা যাত্রার বিবর্তনের নানান বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জন করি। বিশেষত তাঁর *নির্বাচিত বাংলা যাত্রার* ৪টি খণ্ড এই গবেষণায় প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

অধ্যাপক ড. পবিত্র সরকারের সঙ্গে বাংলা যাত্রার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলাপ করি। তাঁর প্রাজ্ঞ পরামর্শ আমাকে এই গবেষণাকর্মে অগ্রসর হতে প্রেরণা জুগিয়েছে। আমার শিক্ষক অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান গবেষণা কর্মের শুরুতে তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহের সুচিন্তিত পরামর্শ দেন। তাঁর পরিচয় সূত্রেই কলকাতার বাংলা যাত্রার গবেষক ড. দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে তাঁর বিশাল সংগ্রহ শালায় প্রবেশাধিকার দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. বেগম আকতার কামাল বিভাগে অনুষ্ঠিত আমার দুটি সেমিনার-পর্বে সভাপতিত্ব করেন। এ দুটি সেমিনারে উপস্থিত থেকে বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলী অভিসন্দর্ভের বিষয় ও আঙ্গিকের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন। তাঁদের সবাইকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানাই। নাট্যকলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ জামিল অহমেদ এর সঙ্গে আলাপে যাত্রাশিল্পের পরিবেশনা তথা মঞ্চ-

Dhaka University Institutional Repository

আকৃতি সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। বাংলাদেশের যাত্রা গবেষক মঈনউদ্দীন আহমদ, ড. তপন বাগচীর গ্রন্থ ও পরামর্শ থেকে উপকৃত হয়েছি। প্রবীণ যাত্রাশিল্পী মিলনকান্তি দের সঙ্গে আলাপ চারিতায় বাংলাদেশের যাত্রা পরিবেশনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্পর্কে জানতে পারি। ২০১৫ সালে Monash University থেকে *The survival of Jatra* শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য Dr. Md. Alamgir Hossain পিএইচ.ডি অর্জন করেন। মিলন কান্তি দের সহযোগিতায় অপ্রকাশিত এই অভিসন্দর্ভটি দেখে সমৃদ্ধ হয়েছি। এছাড়া সৈকত আসগর (১৯৫৪-২০০০) সম্পাদিত যাত্রাবিষয়ক দুটি গ্রন্থ এবং সুশান্ত সরকার সম্পাদিত যাত্রা সম্পর্কিত সংকলনটি এই গবেষণার সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ যাত্রা পালাকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এম এ মজিদ, বাংলা একাডেমির সাইমন জাকারিয়া; যাত্রাভিনেত্রী জ্যোৎস্না বিশ্বাস ও কৃষ্ণা চক্রবর্তী; যাত্রাভিনেতা ভিক্টর দানিয়েল, তাপস সরকার, হাবিব সারোয়ার, গৌরাঙ্গ আদিত্যের সঙ্গে আলাপে নানানভবে সমৃদ্ধ হয়েছি। বিশিষ্ট নাট্যজন রামেন্দু মজুমদার, মামুনুর রশীদ, আতাউর রহমান, লিয়াকত আলী লাকী, গাজী রাকায়েতসহ অনেকেই বিভিন্ন সময় নানা তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন।

এ অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশের যাত্রাশিল্পের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য এদেশের পূর্ববর্তী যাত্রা গবেষকদের করা ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য আহরণ ও সন্নিবেশনের চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের যাত্রা দলগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভের চেষ্টা করা হয়েছে। এই সঙ্গে মাঠ পর্যায়ে যাত্রা সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের সঙ্গে আলোচনা করে দলগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও পরিবেশনার তথ্য উদ্ধার করা হয়েছে।

গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্যে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, বিশ্বসাহিত্যকেন্দ্র গ্রন্থাগার, শিল্পকলা একাডেমী গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, কবি সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের মুহম্মদ আবদুল হাই স্মৃতি পাঠকক্ষ, নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং কলকাতার রবীন্দ্রভারতী গ্রন্থাগার, আলীপুর জাতীয় গ্রন্থাগার, নাট্যশৌধ সংস্থানের গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এ সকল গ্রন্থাগারের কর্মকর্তাবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতার কথা কখনোই বিস্মৃত হবার নয়। বিশেষ করে ঢাকার বাংলা একাডেমির প্রধান গ্রন্থাগারিক মোবারক হোসেন নানান বিষয়ে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন।

আমার বাবা প্রয়াত রাশিদুল হক ছিলেন এই অভিসন্দর্ভের প্রেরণা। তিনি কাজটির আরম্ভ দেখে গেলেও শেষটা দেখে যেতে পারেননি। জীবনসঙ্গী আবু বকার সিদ্দিক বাবুল ও কন্যা হুমায়রা সিদ্দিকের নিরন্তর উৎসাহ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। গবেষণার সময় পারিবারিক অনেক কাজের দায়িত্ব থেকে তারা আমাকে মুক্তি দিয়েছে। অভিসন্দর্ভের খসড়ার প্রতিটি পৃষ্ঠার প্রথম পাঠক কখনো আমার সহোদরা কিণ্ডীয়া আক্তার, কখনোবা সায়মা

Dhaka University Institutional Repository

আক্তার। তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নয়। অভিসন্দর্ভ রচনার নানা পর্যায়ে শ্রমক্লান্ত মুহূর্তে শিশুপুত্র নিসর্গের মুখশ্রী আমাকে উজ্জীবিত করেছে। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে আরও যাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি, তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মার্জিয়া আক্তার,
সহযোগী অধ্যাপক,
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়,
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

অবতরণিকা ৮
প্রথম অধ্যায় : প্রাক-কথন : বাংলা যাত্রা ১৩
১.১ ভূমিকা ১৩
১.২ 'যাত্রা' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও প্রচলন : অর্থের বিস্তার ১৩
১.৩ 'যাত্রা'র সংজ্ঞা ১৬
১.৪ যাত্রাপালা : পরিবেশনা আঙ্গিক ও উপস্থাপনা পদ্ধতি ১৮
১.৫ যাত্রার উদ্ভব সম্পর্কে বিভিন্ন মত ২৫
১.৬ পর্যালোচনা ৪৪
দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলা যাত্রার উন্মেষপর্ব : আঠারো ও উনিশ শতকের বাংলা যাত্রা (১৭০১-১৯০০) ৪৬
২.১ অবতরণিকা ৪৬
২.২ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা যাত্রা ৪৭
২.৩ পৌরাণিক বা ধর্মীয় বা ভক্তিমূলক পালা ৫০
২.৪ উনিশ শতকের বাংলা যাত্রা ৫৫
২.৫ নূতন যাত্রা ৬৫
২.৬ বিভিন্ন যাত্রাকার ৮১
২.৭ পর্যালোচনা ৯৪
তৃতীয় অধ্যায় : বাংলা যাত্রার বিকাশ : বিশ শতকের প্রথমার্ধ (১৯০১-১৯৪৭) ৯৭
৩.১ স্বাদেশিক চেতনা ৯৭
৩.২ জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিক যাত্রা ১০১
৩.৩ ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পালা ১১৬
৩.৪ কাল্পনিক পালা ১৩৪
৩.৫ ব্রজেন্দ্রকুমার দে (১৯০৭-১৯৭৬) ১৩৫
৩.৬ পর্যালোচনা ১৪৬
চতুর্থ অধ্যায় : দেশবিভাগ : যাত্রায় পূর্ব-বাংলার পথচলা (১৯৪৭-১৯৭০) ১৫১
৪.১ ভূমিকা ১৫১
৪.২ পূর্ব বাংলার যাত্রা : উত্তরাধিকার ১৫১
৪.৩ উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৩) ১৫৩
৪.৪ সামাজিক পালা ১৬০
৪.৫ জীবনীভিত্তিক পালা ১৬৪
৪.৬ লোককাহিনিভিত্তিক পালা ১৬৭
৪.৭ পূর্ব-বাংলার যাত্রাদলের ইতিহাস ১৭৬
৪.৮ পূর্ব বাংলায় যাত্রার মঞ্চায়ন ১৮২
৪.৯ পূর্ব-বাংলার যাত্রাশিল্পী ১৮৫
৪.১০ পর্যালোচনা ১৮৯
৫ম অধ্যায় : স্বাধীন স্বদেশ : বাংলাদেশের যাত্রার রূপ-রূপান্তর (১৯৭১-২০১৭) ১৯২
৫.১ ভূমিকা ১৯২
৫.২ আর্থ সামাজিক পটভূমি ১৯২
৫.৩ বাংলাদেশের যাত্রাদলের ইতিহাস ১৯৯
৫.৪ বাংলাদেশে যাত্রাশিল্পের পরিবেশনা ২০৬
৫.৫ বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক যাত্রাপালা ২০৮
৫.৬ বাংলাদেশের যাত্রাদল ২১২
৫.৮ বাংলাদেশের যাত্রাপালাকারদের পরিচয় ২১৮

Dhaka University Institutional Repository

৫.৯ বাংলাদেশে যাত্রার নানা প্রতিবন্ধকতা.....২২৪
৫.১০ সেন্সর কমিটির আলোকে বাংলাদেশের যাত্রাপালা..... ২৩৪
৫.১১ বাংলাদেশের যাত্রাশিল্পী ২৪১
৫.১২ বিবেকের রূপান্তর ২৪৪
৫.১৩ বাংলাদেশে যাত্রার উন্নয়নে গৃহীত কিছু পদক্ষেপ ২৪৫
৫.১৪ পর্যবেক্ষণ.....২৪৬
উপসংহার.....২৪৯
গ্রন্থপঞ্জি ২৫৮
পরিশিষ্ট ২৮৩

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

যাত্রা আবহমান বাঙালি ঐতিহ্যের অংশ। প্রাথমিকভাবে 'যাত্রা'র অর্থ প্রস্থান বা গমন হলেও, পরবর্তীকালে এর অর্থ হয়ে দাঁড়ায় ধর্মীয় উৎসব বা যুদ্ধকালীন শোভাযাত্রা; বলা যেতে পারে ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠান সংঘবদ্ধ যাত্রা থেকেই যাত্রা আঙ্গিকের জন্ম। রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, দোলনযাত্রা, দোলযাত্রা, রাস যাত্রা, চন্দন যাত্রা প্রভৃতিতে লোকউৎসবের অংশ হিসেবে 'যাত্রা' অভিধাটি ব্যবহৃত হয়েছে। ধারণা করা যায় এ সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষ ও ভক্তদের যে মিছিল হয় –– সেখানে নাচ-গান-অভিনয়ের মাধ্যমে দেবতার লীলাকীর্তন বর্ণিত ও অভিনীত হয়। সম্ভবত, ধর্মীয় ও যৌথ সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের অনুষঙ্গে বিশ্বজগৎ, প্রকৃতি এবং মানবজীবনের নিরন্তর প্রবাহ এভাবেই যাত্রায় পরিবেশিত হয়। অনুমান করা যেতে পারে, নাচ-গানের কাঠামোটি, দেবদেবীর জয়স্তুতিকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখে। তবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে জনসংযোগের সামর্থই যাত্রার পরবর্তী রূপান্তর ও পরিবর্তনকে সম্ভব করে। যাত্রা কেবল বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অর্থাৎ গ্রামের সাধারণ মানুষের বিনোদনেই নিজেকে অবসিত করেনি –– আধুনিকতাকে স্বীকার করে তার মাঝে প্রতিযোগিতা করে ও নৈতিক মানদণ্ড তৈরি তথা সমাজ সংগঠনের দায় এবং দায়িত্ব পালন করেছে। মননশীলতার পাশাপাশি আধুনিক বাচিক ও আঙ্গিক অভিনয়ের কলাকৃতিকে যাত্রা মেনে নিয়েছে। পৌরাণিক কাহিনির স্থানে সামাজিক কাহিনি এসেছে, ঐতিহাসিক যাত্রাপালা সাধারণ জীবনে সমাজ, শিক্ষা, ঐক্য, ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। সর্বস্তরের গণমানুষ যাত্রা গানকে আপন ঐতিহ্য হিসেবে ধারণ করেছে।

যাত্রাগান হচ্ছে অভিনয় নৃত্যগীতাদি সমন্বিত গ্রামীণ বিনোদন মাধ্যম। বাংলাদেশে প্রচলিত ময়নামতির গান, গোপীচন্দ্রের গান, মনসার গান. নাটগীত, ঝুমুর, কীর্তন, পাঁচালি, ঢপকীর্তনের সঙ্গে তুলনায় যাত্রাগান বিশিষ্ট ছিল। দর্শক শ্রোতা সাধারণের সাংস্কৃতিক চর্চার উপায় হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে তা মননশীলতা সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে বাংলা সংস্কৃতির অঙ্গরূপে চর্চিত, লালিত এবং প্রচলিত আছে। লৌকিক জীবন চেতনার প্রকাশ ঘটাতে এবং তার সাথে লোকজীবনের নানাবিধ সাংস্কৃতিক বোধকে সম্মিলিত করে এই যাত্রা নামক অভিনেয় শিল্পটি গড়ে উঠেছে। ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস, পুরাণ নানাবিধ সাংস্কৃতিক দিক এর সাথে যুক্ত রয়েছে। এ অর্থে যাত্রাও দেশের লোকজ সংস্কৃতির অন্যান্য শাখা বা ধারার সাথে একটি শক্তিশালী তথা উন্নত ধারা বা শাখা হিসেবে শিল্পীত রূপ লাভ করেছে।

বাংলা যাত্রার উদ্ভবকাল বিষয়ে গবেষকদের মতান্তর থাকলেও যাত্রার উদ্ভবের উৎস হিসেবে প্রধানত দুটি মত পাওয়া যায়। একদল মনে করেন যাত্রা দেবদেবী মহিমা কীর্তন-জাত। এর বিপরীতে অন্যদল বিভিন্ন পুরাণ,

Dhaka University Institutional Repository

ভাগবত এর কথকতার পাঁচালী গান থেকে যাত্রাগানের উদ্ভব হয় বলে মনে করেন। উভয় মতের মধ্যেই গ্রামীণ শ্রোতার আসরের উপস্থিতিতে এই পরিবেশনার অস্তিত্ব নিহিত আছে। লোকায়ত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এ অভিনয় আঙ্গিকটিতে উভয় ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্যই বিকশিত হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে যাত্রার উদ্ভব সম্পর্কে এ সমস্ত অনুমান সৃষ্টি হয়। যাত্রার আঙ্গিকে যেমন দেবলীলাবন্দনা, তেমনি পাঁচালির কলেবরে কাহিনি বয়ানের চিত্রও বিদ্যমান। কেবল দেবতার অনুগমনেই নিবদ্ধ না থেকে উন্নততর শ্রেণির অভিনয় হয়ে উঠল যাত্রাপালা। দেবপূজার অঙ্গন পেরিয়ে অন্য সামাজিক অনুষ্ঠানে যাত্রাপালা স্থান পায়। যাকে বলা যায় যাত্রার সাধারণ প্রমোদকলায় রূপান্তর -- সেই নব কলেবরের যাত্রার বিবর্তনই আমাদের অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু।

বাংলার যাত্রাগানগুলোর উদ্ধরণ ও তার মাধ্যমে যাত্রার রূপান্তর-প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে এ অভিসন্দর্ভ লিখিত। বাংলা যাত্রায় কখনো স্থান পেয়েছে পৌরাণিক ও ভক্তিমূলকপালা; কখনো বা রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, আবার কখনো কাল্পনিক ও সামাজিক বিষয়ানুষঙ্গের অনুগামী হিসেবে তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। আবার কখনো কখনো জীবনীকেন্দ্রিক ও লোককাহিনিভিত্তিক পালা যাত্রায় প্রাণ পেয়েছে। প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মের মূল বিষয় হলো পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের যাত্রার নিবিড় পাঠের মাধ্যমে তার উৎস ও স্বরূপ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। সেই সঙ্গে যাত্রার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের পরিবর্তনের ধারাকে অনুসরণ করা। এই লক্ষ্যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের যাত্রার কালানুক্রমিক বিবর্তনের রূপরেখা সন্ধান করা হয়েছে। পাঁচটি অধ্যায়ে এই অভিসন্দর্ভটি বিভাজিত। এর অধ্যায় বিভাজন নিচে তুলে ধরা হলো:

১. অবতরণিকা
২. প্রথম অধ্যায় – প্রাক্ কথন : বাংলা যাত্রা
৩. দ্বিতীয় অধ্যায় – বাংলা যাত্রার উন্মেষপর্ব : উনিশ শতকের বাংলা যাত্রা (১৭০০-১৯০০)
৪. তৃতীয় অধ্যায় – বাংলা যাত্রার বিকাশ : বিশ শতকের বাংলা যাত্রা (১৯০১-১৯৪৭)
৫. চতুর্থ অধ্যায় – দেশবিভাগ : যাত্রায় পূর্ব-বাংলার পথচলা (১৯৪৭-১৯৭০)
৬. পঞ্চম অধ্যায় – স্বাধীন স্বদেশ : বাংলাদেশের যাত্রার রূপ-রূপান্তর (১৯৭১-২০১৭)
৭. উপসংহার

প্রথম অধ্যায়ে ঐতিহ্যবাহী শিল্পমাধ্যম হিসেবে যাত্রার উদ্ভবসহ বাংলা যাত্রার প্রাক-ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এ বিষয়ে গবেষকদের মতসমূহ বিচারসহ নিজস্ব বক্তব্যও উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলা যাত্রার উন্মেষকালের অবস্থাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পৌরাণিক, ধর্মীয় বা ভক্তিমূলক যাত্রার পাশাপাশি বিদ্যাসুন্দর ও সখের যাত্রার প্রচলন এ অধ্যায়ের উপজীব্য। ধর্মীয় আঙ্গিক থেকে যাত্রা ইহলৌকিকতামণ্ডিত হয়ে ওঠার সুবাদে

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামীণ বিনোদন মাধ্যমটির নবরূপ গ্রহণের আলোচনা এই পর্বে স্থান পেয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা যাত্রায় জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শ প্রচার ও প্রসারের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। স্বাদেশিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও কাল্পনিক পালা এ অধ্যায়ে বিবেচিত হয়েছে। জনপ্রিয়তা ও শিল্পের মান –– এই উভয় বিচারে বাংলা যাত্রার বিকাশের ইতিহাসে শিখরস্পর্শী এ পর্বটি। চতুর্থ অধ্যায়ে দেশভাগ-উত্তর পূর্ব-বাংলার যাত্রার পথচলাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সামাজিক, জীবনীমূলক ও লোককাহিনিভিত্তিক পালার সমারোহ এ পর্বে লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চম অধ্যায়ে ১৯৭১ পরবর্তী বাংলাদেশের যাত্রার বৈশিষ্ট্য ও রূপ-রূপান্তর বিবেচনায় এসেছে। মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকেন্দ্রিক পালা, পরিবেশ বিষয়ক যাত্রাপালা ও শিক্ষামূলক যাত্রাপালা এ সময়ের যাত্রার উল্লেখযোগ্য অর্জন। পাশাপাশি বাংলা যাত্রার অবক্ষয়ের নানান চিত্র, সেন্সর ও নিষেধাজ্ঞার জটিলতা এ পর্বের যাত্রার বিকাশে পরিপন্থী হয়। উপসংহারে বাংলা যাত্রার বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকেই ধর্মাদর্শ ও ন্যায়নীতি বোধ সম্পর্কে প্রাধান্য দিয়ে যাত্রা পরিবেশিত হয়েছে। এছাড়া যুদ্ধকাহিনির বিশেষ আকর্ষণ যাত্রাপালাগুলিতে ছিল। ফলে পালাকারগণ *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *মনসামঙ্গল*, *চণ্ডীমঙ্গল*, *ধর্মমঙ্গল* প্রভৃতি ভক্তিমূলক ও যুদ্ধাত্মক ঘটনাবলি যাত্রার কাহিনি হিসেবে গ্রহণ করতেন। এ সমস্ত পৌরাণিক পালায় জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিমূলক দার্শনিক সমস্যা, ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের অত্যাচার, অস্পৃশ্যতা-বর্জন, ধনী-দরিদ্রের দ্বন্দ্ব এবং প্রচ্ছন্নভাবে স্বদেশ চেতনাও স্থান পেত। এক সময় আসরে *চৈতন্যযাত্রা*ও প্রসার লাভ করে যদিও এ যাত্রার মূলভাব ছিল প্রেম ও ভক্তি। পরবর্তী সময়ে আবার ভারতচন্দ্রের প্রেমকাহিনি অবলম্বনে নৃত্যগীত প্রধান *বিদ্যাসুন্দর* পালা জনপ্রিয়তা অর্জন করে। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় এর *পদ্মিনী* নাটক থেকে যাত্রায় ঐতিহাসিক পালা প্রচলিত হয়। এ শ্রেণির লোকনাট্যে সতীত্ব, প্রেম বীরত্ব, শরণাগতকে আশ্রয় দান এর পাশাপাশি সমসাময়িক আন্দোলন, হিন্দু-মুসলমানের মিলন ও দেশপ্রেম স্থান পেয়েছে। *পঞ্চনদ*, *দাক্ষিণাত্য*, *ভাস্কর পণ্ডিত* প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য পালা। স্বাদেশিকতার প্রতিষ্ঠা বিশ শতকের যাত্রায় প্রাণ সঞ্চার করে। মুকুন্দদাসের পালাগুলিতে স্বদেশি ভাবের উন্মাদনা জাগে। এর পরিণতিতে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। তাঁর পালাগুলিতে স্বাদেশিক চিন্তা প্রধান্য পেলেও কৃষি-শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক-শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, পল্লী-উন্নয়ন, হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্য, অস্পৃশ্যতা বর্জন, দেশি শিল্পের উন্নয়ন প্রভৃতির আলোকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যারও আর্বিভাব দেখা যায়। *মাতৃপূজা, সমাজ, পল্লীসেবা* প্রভৃতি পালা তার সাক্ষ্য বহন করে। এ সময় বিনোদনের পাশাপাশি সামাজিক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও যাত্রা জনপ্রিয় হয়। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে দেশভাগ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক সংকটের মত বিষয়ও জাতীয়তাবোধের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লেষণে ও বিবেচনায় যাত্রার পরিসরে ঠাঁই করে নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জীবনবোধের মূল্যায়নে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তাই অলৌকিক পরিবেশ ও পুরাণ কাহিনির আকর্ষণ হ্রাস পায়। ইতিহাস-চেতনা ও বাস্তববোধ সম্পন্ন কাহিনি অধিক জনপ্রিয় হতে থাকে। ফলে পৌরাণিক-ভক্তিমূলক পালার স্থলে জায়গা করে নেয় সামাজিক, জীবনীমূলক ও লোককাহিনিভিত্তিক যাত্রা। *সোনাইদীঘি*, *সম্রাট জাহানদার*, *সিরাজদ্দৌলা*, *রাণী দূর্গাবতী*, *কবরের কান্না*, *দিগ্বিজয়ী*, *তাজমহল* প্রভৃতি পালা জনমনে আলোড়ন তোলে। কল্পনার আধিক্য সমন্বিত বাস্তব সমস্যা প্রতিফলিত কিছু যাত্রা কাল্পনিক পালা নামে খ্যাত হয়। *যাত্রা হল শুরু*, *মাটির প্রদীপ*, *কে কাঁদে* প্রভৃতি এ ধরনের পালা। বাঙালির নিজস্ব, লোক-আঙ্গিককে ধারণ করে যাত্রার পথচলায় একসময় সংস্পর্শ পায় ইউরোপীয় নাট্যকাঠামোর। উপনিবেশ উপজাত নানান আধুনিকতাকে ধারণ করে যাত্রা পূর্ব-বাংলায় তথা বর্তমান বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করে। সাতচল্লিশ-উত্তর সময়ে পরিবর্তনের গতিশীল ধারায় রাজনৈতিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক সত্যের নানাবিধ পরিবর্তনকে ধারণ করে যাত্রা বিকশিত হয়। ১৯৭১ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের যাত্রায় ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটে। সদ্য স্বাধীন দেশে শিল্প সাহিত্যে যেমন সৃষ্টির প্রাচুর্য ঘটে, তেমন যাত্রাও তার বাইরে থাকে নি। স্বাধীনতার পূর্বে যেখানে মাত্র ২২টি দল ছিল, মুক্তিযুদ্ধের পরে সেখানে যাত্রা দল হয় ২১০টি। বাংলাদেশের যাত্রাপালা নির্বাচনের ক্ষেত্রে জীবনীভিত্তিক পালার জোয়ার দেখা যায়। এ পর্বের পালায় শেখ মুজিবর রহমান, কাজী নজরুল ইসলাম, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, লেলিন, হিটলার প্রভৃতি ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে যাত্রা পরিবেশিত হয়। এসব ব্যক্তিবর্গের জীবন নবগঠিত দেশের সামনে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপিত হয়।

সময়ের পরিবর্তনে জীবনধারণে আধুনিকতার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ের পাশাপাশি যাত্রার আঙ্গিকেও পরিবর্তন ঘটেছে। খোলা মাঠে যাত্রার রীতি অনুসারে পাকা মঞ্চ না হলেও চৌকি পাতা থাকে যা দর্শকরা ঘিরে থাকে। যাত্রার আসর জমাতে প্রদর্শনী শুরুর ঘণ্টা দুয়েক আগে বাদকদল বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে দর্শক জড়ো করেন। যাত্রা এখন মঞ্চে উন্নীত হয়েছে। তার আসর বর্তমানে লুপ্ত প্রায়। যাত্রার অভিনেতা ও দর্শকদের মধ্যে যে নৈকট্য ছিল আজ আর তা নেই। এখন আর বিভিন্ন দিকে ঘুরে ঘুরে অভিনয় করা হয় না, একদিকে তাকিয়ে অভিনয় করলেই চলে। মঞ্চে অভিনয়ের ফলে অভিনেতারা আগমন নির্গমনের কৌশলের দিকেই বেশি সচেতন হয়ে উঠেছেন। খোলা আসরে আগে ডেলাইট, পেট্রোম্যাক্স অথবা হ্যাজাকের আলোতে অভিনয় করতে হত। সেজন্য আগে যাত্রার অভিনেতা বাচিক অভিনয়ের দিকেই বেশি জোর দিতেন। কণ্ঠস্বরের উচ্চতা ও গাম্ভীর্যই তার প্রধান সম্পদ ছিল। কিন্তু এখন অনেক অভিনেতা মঞ্চে স্পটলাইটের সুযোগ নিতে চান। সেজন্য কণ্ঠস্বরের চর্চা না করে সূক্ষ্ম ভাবের অভিব্যক্তির দিকে তাঁরা অনেক বেশি নজর দিতে চান। গলা চেপে অভিনয়ের ফলে এমন হয়েছে যে, খোলা জায়গার অভিনয়ে অনেক অভিনেতাই এখন অক্ষম। আলোক সম্পাতের অসহনীয় উপদ্রব যাত্রাভিনয়কে অনেক

Dhaka University Institutional Repository

স্থলেই অত্যন্ত বিসদৃশ ও বিরক্তিকর করে ফেলে। অনেক জায়গায় আবার শাদা পর্দায় নানা রকম আলো ফেলে ম্যাজিক দেখাবার চেষ্টায় যাত্রাওয়ালারা থিয়েটারী প্রয়োগকেও হার মানিয়ে চলেছেন। যে সঙ্গীত ছিল যাত্রার প্রধান সম্পদ, তা এখন যেন রীতিরক্ষার জন্যই রাখা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঙ্গীতের কোনো উপযুক্ত শিক্ষা ও অনুশীলন হয় না, তাই সঙ্গীত যখন শুরু হয় তখন তা পীড়াদায়কই হয়ে পড়ে। বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারেও প্রথা পালনের ছাপ স্পষ্ট। অনেক ক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্রীদের মঞ্চ থেকে নেপথ্যে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাদের কাজ শুধু জায়গায় জায়গায় নেপথ্য সঙ্গীতের কাজ চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু বাদ্যযন্ত্রী আগে অভিনেতার মতই যাত্রাভিনয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। আজ তাঁকে আর অভিনয়ের কোনো প্রয়োজনেই ডাকা হয় না। এভাবেই যাত্রার আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে ব্যাপক বদল ঘটেছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
প্রাক-কথন : বাংলা যাত্রা

১.১ ভূমিকা

'যাত্রা' বাংলাদেশের নৃত্যগীতসমৃদ্ধ অভিনয়নির্ভর ঐতিহ্যবাহী শিল্পরীতি। এদেশের অতি প্রাচীন লোকজ জীবনের সাংস্কৃতিক চেতনাবোধ থেকে এ শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ। আবহমান কাল থেকে যাত্রা নাট্যানুগ রূপকল্প হিসেবে চলে এসেছে। ভারতীয় প্রাচীন নাট্য ঐতিহ্যের ধারাসমূহের মধ্যে 'যাত্রা' অন্যতম। বৃহৎবঙ্গে সময়ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'যাত্রার' প্রচলনে ও বিকাশে পরিবর্তন ঘটে। যুগের চাহিদার পূরণে যাত্রা বারেবারেই নব কলেবর ধারণ করে। কালের ধারাস্রোতে টিকে থাকা এ শিল্প বর্তমানকালেও জনমানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। যাত্রা শিল্পের অতীত ও বর্তমানের পারস্পরিক ধারা, স্বরূপ এবং চরিত্র অবশ্যই বিশ্লেষণাত্মক বিবেচনায় বিচার্য। আবহমানকাল থেকেই বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে যাত্রাপালার প্রচলন লক্ষণীয়। বিভিন্ন উপলক্ষ্য অনুসারে এর আকার ও বিষয়বস্তুর ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়। নানা দেবতার উপাসকদের ভক্তির নিবেদন থেকে উদ্ভূত এই নমনীয় শিল্প আঙ্গিকটি দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে এই দীর্ঘ যাত্রাপথে এর রূপের ও বিষয়ের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে।

১.২ 'যাত্রা' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও প্রচলন : অর্থের বিস্তার

প্রাচীন বাঙালি সমাজে শুভ কাজে যাওয়াকেই 'যাত্রা' বলা হতো এবং যাত্রার পূর্বে নানারকম আচারমূলক কৃত্য পালন করা হতো। যাত্রাকালে মঙ্গলকর জলপূর্ণ ঘট স্থাপন করার রীতি প্রচলিত ছিল, যাকে 'যাত্রা ঘট' বলা হতো। আবার যাত্রাপথ ধরে শোভাযাত্রাও প্রচলিত ছিল। কোথাও যাবার সময় অশুভ প্রভাব দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আদিম জাদুবিশ্বাস-সম্বলিত সংগীত-নৃত্য ও অভিনয়ের মাধ্যমে নানাবিধ অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করা হতো। সময়ের পরিক্রমায় যাত্রার আচার সংশ্লিষ্ট গমনের রীতিটি বিলুপ্ত হয়ে অভিনয়কলার রূপ পরিগ্রহ করে। এই প্রাচীন ও ঐতিহ্যময় অভিনয় সম্পর্কে জানা যায় সূর্যদেবতার কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে অভিগমনকে কেন্দ্র করে কৃষিনির্ভর সমাজ এমন সমস্ত উৎসব পালন করে যা তাদের সু-শস্যের সহায়ক হতে পারে। সূর্যের অয়ন-গতির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তার প্রধান প্রধান গতি সঞ্চারের কাছাকাছি সময়ে এমন কয়েকটি উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে যার সঙ্গে 'যাত্রা' শব্দটি সংযুক্ত আছে। যেমন : 'স্নানযাত্রা', 'রথযাত্রা', 'হিন্দোল' বা 'ঝুলনযাত্রা', 'রাসযাত্রা', দোলযাত্রা'।

যাত্রার ইতিহাস সন্ধানের প্রয়োজনে প্রথমে 'যাত্রা' শব্দটির ব্যুৎপত্তিসহ উদ্ভবের ইতিহাস নির্ণয় করা যেতে পারে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই 'যাত্রা' শব্দটির প্রচলন রয়েছে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৭-১৯৫৭) জানিয়েছেন,

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃত 'যা' ধাতু থেকে যাত্রা শব্দটির উৎপত্তি – যার উৎসগত অর্থ প্রস্থান, গমন বা প্রয়াণ।[১] জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস (১৮৭২-১৯৩১) লিখেছেন, যাত্রা হচ্ছে দেবতার উৎসব বিশেষ, পটহীন নাট্যাভিনয়, গীতাভিনয়;।[২] পি. আচার্যের (জন্ম ১৯৩১) মতে 'দৃশ্যপটহীন মঞ্চে অভিনয় হচ্ছে যাত্রা'।[৩] কাজী আবদুল ওদুদও (১৮৯৪-১৯৭০) যাত্রাকে 'দৃশ্যপটহীন নাটক অভিনয়' হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।[৪] সুকুমার সেনের (১৯০১-১৯৯২) মতে, যাত্রা হচ্ছে অভিনয় (উৎসবে) < সং যাত্রা; তৎ (কৃষ্ণদাস, চূড়ামণিদাস)।[৫] লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৮৪) মনে করেন 'যাত্রা' শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা থেকে আগত। তিনি দ্রাবিড় ভাষাভাষির মধ্যে ধর্মোৎসব অর্থে 'যাত্রা' শব্দটির ব্যাপক প্রচলন লক্ষ করেছেন।[৬] উৎপত্তিসূত্রে যাই হোক 'যাত্রা' কথাটির প্রয়োগ স্পষ্টত দুই ধরনের – বিহার, ভ্রমণ, চলাচল একদিকে আর অন্যদিকে বিশিষ্ট পরিবেশনা বা অভিনয়।

উৎসব অর্থে 'যাত্রা' শব্দের ব্যবহার করেছেন আলংকারিক অভিনবগুপ্ত (৯৫০-১০২০)।[৭] গুণ্ডিচাদি দ্বাদশ যাত্রার প্রসঙ্গ *স্কন্দপুরাণের* উৎকল খণ্ডে উচ্চারিত হয়।[৮] সংস্কৃত পণ্ডিত বিশ্বনাথ কবিরাজ (১৩৭৮-১৪৩৪) তাঁর *সাহিত্যদর্পণে* নায়িকার স্বরূপ ব্যাখ্যায় মহোৎসব অর্থে যাত্রা শব্দটি ব্যবহার করেন।[৯] এ ছাড়াও যোগাবশিষ্ঠের *রামায়ণে* [১০]এবং বাৎসায়ন *কামসূত্রে*-র যশোধর লিখিত জয়মঙ্গলা টীকাতেও যাত্রা শব্দটি উৎসব অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১১] খ্রিস্টীয় ৫৭০ অব্দের কিছু পূর্বে রচিত বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রে'র গল্পেও যাত্রা কথাটির সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে।[১২]

---

[১] হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, সাহিত্য অকাদেমি, দ্বিতীয় খণ্ড।। প-হ, অষ্টম মুদ্রণ : ২০১১, পৃ. ১৮৫৯

[২] জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*, দ্বিতীয় খণ্ড, পুর্নমুদ্রণ-১৯৭৯, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ১৮১৫

[৩] পি. আচার্য, *শব্দসন্ধান শব্দাভিধান*, বিকাশ গ্রন্থ ভবন, কলকাতা, প্র. ১৯৯২, ব্যবহৃত সং ১৯৯৬, পৃ. ১৩৭

[৪] কাজী আবদুল ওদুদ, *ব্যবহারিক শব্দকোষ*, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, প্রকাশসাল উল্লেখ নেই, পৃ. ৮৩৮

[৫]সুকুমার সেন, *ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধার্থ বাংলা-কোষ*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৩, পৃ. ৩৭৭

[৬] আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, মুখার্জী এন্ড কোং, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ জুন ২০০৯, পৃ. ৪৮

[৭] ভবভূতির উত্তররামচরিত ও মালতী মাধবের প্রস্তাবনায়, আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোকের লোচন টীকায়

[৮] 'দ্বাদশৈতা মহাযাত্রা গুণ্ডিচাদ্যাস্ত্ত পাবানা ঃ' উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ. ১১

[৯] 'যাত্রাদি নিরতাহন্যোঢ়া কুলটা গলিতত্রপা' – অর্থাৎ যাত্রাদি মহোৎসবে নৃত্য-গীত-আসক্তা কুলটা নারীই পরকীয়া পরিণীতা নায়িকা। উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ওসম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ. ১১

[১০] 'অত্রোৎসব মৃতক এষ তথেহ যাত্রা' উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ. ১১

[১১] শ্রদ্ধাঞ্চ জনয়ন যাত্রামপি তদ্দর্শনেন গোষ্ঠীশ্চ প্রবর্তয়েৎ উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ. ১১

[১২] 'ভগবতো গরুড়স্য যাত্রা প্রসঙ্গেন চলিত:।' এখানে প্রসঙ্গ অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে কথাটি লক্ষ্য করতে হবে। উল্লিখিত যাত্রা সম্ভবত গরুড়ধ্বজ নিয়ে মিছিলের মত ছিল- *বিচিত্র সাহিত্য* (১ম খণ্ড), ড. সুকুমার সেন, পৃ. ১২

অশোকের অষ্টম গিরি-অনুশাসনে লিখিত আছে যে, তিনি তাঁর রাজত্বকালের দশম বর্ষে ধর্মযাত্রা করে বুদ্ধগয়ায় যান।[১৩] যাত্রা অভিধাটির এই অর্থে প্রয়োগ প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেন : 'যাত্রার এই দুটি রূপ এখনকার দিন পর্যন্তও চলে এসেছে, মেলা অর্থে 'জাত' কথাটিতে রয়েছে বিহার যাত্রার অর্থ, আর নাটপালার গীত-অভিনয়ে তৎসম শব্দটিতে রয়ে গেছে ধর্মযাত্রার ইঙ্গিত।[১৪] এই উভয় অর্থে যাত্রার প্রচলন অন্য গবেষকদের নিকটও অলক্ষিত থাকেনি। গবেষক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের (১৮৭৯-১৯৪০) অনুসন্ধানে জানা যায় :

> প্রাচীনকালে যাত্রার অর্থ দেবতাবিশেষের লীলা বা চরিত্রের অংশবিশেষ সাধারণের হৃদয়ে জাগরুক রাখিবার কোনও উৎসব। গ্রিক মেগাস্থেনেসের বিবরণে আছে, আজকালকার যাত্রাভিনয়ের মতো যাত্রার গান পাটলীপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের সভায় হইত। ভরত-নাট্যশাস্ত্রেও যাত্রার উল্লেখ আছে। ভবভূতির মালতী-মাধবে ভগবান কালপ্রিয়নাথের যাত্রাভিনয়ের কথা আছে। এই যাত্রা উৎসবার্থে এবং পারিভাষিক উভয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উৎসব হিসেবে মহাভারতে ঘোষ-যাত্রার কথা আছে। হরিবংশে বন-যাত্রার কথা আছে। বন-যাত্রা বনভোজন। ইহাতে নৃত্যগীতের ব্যবস্থার কথা আছে। তাহার সঙ্গে এক রকম অভিনয়ের কথা আছে। মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থেও অভিনেতা ও অভিনেত্রীর উল্লেখ আছে। ধর্ম-সম্বন্ধীয় ও পৌরাণিক বিষয় লইয়াই যাত্রা অভিনয় হইত। শিবযাত্রা সকলের চেয়ে পুরাতন। তারপর রামযাত্রার প্রবর্তন হয়। হিন্দুরাজত্বের সময় হইতেই রামযাত্রার প্রচলন দেখা যায়। রামযাত্রার অনেক পরেই কৃষ্ণযাত্রার উদ্ভব। ভাগবতে লীলাভিনয়ের কথা আছে।[১৫]

সুকুমার সেন মনে করেন, দেবতার শোভাযাত্রা থেকেই আধুনিক 'যাত্রা' কথাটি এসেছে এবং দেবোৎসব-যাত্রা উপলক্ষ্যে সেকালে নাটগীত ও নাটক অভিনয় হইত।[১৬] বলবন্ত গার্গীর (১৯১৬-২০০৩) বক্তব্যও প্রায় সমধর্মী :

> '… devotes went ringing and dancing in processions. This singing with dramatic elements gradually come to be known as 'Jatra' which means to go in procession.[17]

মন্মথমোহন বসু (১৮৭০-১৯৫৯) 'যাত্রা'র সঙ্গে দেবদেবীর শোভাযাত্রার বিষয়টিকে সম্পর্কিত করেন। তিনি বিশেষভাবে এর উৎসে সূর্য ও চন্দ্রের 'যাত্রা' বা গতি এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষ তিথির সংঘটনকে গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে, সূর্যের যাত্রা উপলক্ষ্য করে এ সকল উৎসব হত এবং এদের প্রধান অঙ্গ নাট্যাভিনয় ছিল বলে নাট্যাভিনয়ের নাম 'যাত্রা' হয়।[১৮]

---

[১৩] অতিবাতং অন্তরং রাজানো বিহার যাতাংঞ য়াসু এত মগব্যা অঞ্ঞানিচ এতারিসানি অভীরামকানি অহুংসুখো দেবানং প্রিয়ো প্রিয়দসি রাজা দসবাসাভিসিতো সংতো অয়ায় সংবোধিং তেনেসা ধম্মমাতা। *বিচিত্র সাহিত্য* (১ম খণ্ড), ড. সুকুমার সেন, পৃ. ১২

[১৪] *বিচিত্র সাহিত্য* (১ম খণ্ড) ড. সুকুমার সেন

[১৫] অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, যাত্রা, *বাঙলার প্রথম*, সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ ১৯৮০,কলকাতা, পৃ. ১১৫

[১৬] *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, পৃ.

[১৭] Balwant Gargi, *Folk Theatre of India*, 1991, Rupa & Co, Calcutta, p.14

[১৮] মন্মথমোহন বসু, *বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, দ্বি-সং, ১৯৫৯, পৃ. ৩৬-৪২

নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় (১৮৫২-১৯১০) সুইজরল্যান্ডের জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাংলা যাত্রা বিষয়ে প্রথম গবেষণা করেন। 'যাত্রা' শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন:

> The word Yatra is derived from the root ya-to go. Yatra therefore means, in the first place, a going, a departing ; e.g., usha-yatra, leaving home at the earliest dawn ; maha-yatra, the great departure-i.e., death-hence a pilgrimage, e.g., Gaya-yatra, Prayaga-yatra,etc.
>
> Secondly, yatra means a march, processions , e.g.,Dola-yatra, janmashtami-yatra, and Rasa-yatra-religious processions in connection with the history of the popular god, Krishna, which take place three times every year, in spring (Basanta), rainy season (Barsha) and autumn (Sharat).
>
> Thirdly, Yatra means a species of popular dramatic representations, originally represented perhaps only in connection with the three religious processions named above, but gradually taking a more general meaning and a greater sphere of action.[19]

তাঁর মতে, 'যাত্রা' শব্দটির তিন ধরনের অর্থ হতে পারে: প্রথমত 'to go' বা যাওয়া অর্থে; দ্বিতীয়ত 'march procession' বা শোভাযাত্রা অর্থে; তৃতীয়ত, এক ধরনের জনপ্রিয় নাট্য-প্রদর্শনী। প্রস্থান অর্থে যাত্রা নয়, দোল-জন্মাষ্টমী-রাস শোভাযাত্রাই জনপ্রিয় নাটকীয় উপস্থাপন হিসেবে যাত্রায় রূপলাভ করে। নিশিকান্ত যে তৃতীয় অর্থে যাত্রাকে নির্দেশ করেছেন – তা বিবর্তিত হয়ে বর্তমান সময়েও প্রবহমান।

১.৩ 'যাত্রা'র সংজ্ঞা

ভারতবর্ষীয় নাটকের ইতিহাস অন্বেষণ করলে দেখা যায় আদিকাল থেকে সংস্কৃত নাটকের ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্যের পাশাপাশি ভারতীয় লোকনাট্যের ধারাটি বহমান। ভরত *নাট্যশাস্ত্রে* সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত একটি লোকপ্রিয় নাট্যরূপের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সংস্কৃত নাটক বিলুপ্ত হয়ে যাবার পরে ভারতীয় নাটক মূলত লোকনাট্যের প্রাণময় প্রবাহের মধ্যেই বেঁচে ছিল।[২০] যাত্রা সম্ভবত লোকনাট্যের প্রধান শাখাগুলির মধ্যে প্রাচীন। সওগাত-সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (১৮৮৮-১৯৯৪) যাত্রাকে 'বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনের আদিরূপ হিসেবে' উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, যাত্রাগান পল্লির মানুষকে যতটা আকৃষ্ট করে অন্য কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ততটা করে না। যাত্রায় উন্নত পরিবেশনা হলে শিক্ষিত শহরবাসীকেও আকৃষ্ট করা সম্ভব বলে তাঁর বিশ্বাস।[২১] নাট্যচার্য শিশিরকুমারের (১৮৮৯-১৯৫৯) মতে, 'যাত্রাই বাংলার খাঁটি নাট্য, একবারে বাঙালীর নিজস্ব। আমাদের জাতীয় নাট্য বলে যদি কিছু থাকে সেটা হচ্ছে যাত্রা।'[২২] কবি খান মুহম্মদ মঈনউদ্দীন (১৯০১-১৯৮১) মনে করেন,

---

[১৯] Nishikanta Chattpopadhyay, *The Yatras or The Popular Dramas of Bengal,* London : Trubner & Co.,1882. উদ্ধৃত. সৈকত আসগর(সম্পাদিত), *বাংলার লোকসংস্কৃতি : যাত্রাশিল্প*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্র.প্র. এপ্রিল ২০০২, পৃ. ৫৮৭

[২০] Berreiedale keith, London, Oxford University press, 1924 rpt 1970, page 40

[২১] মুজিবর রহমান খান (সম্পাদিত), *জাতীয় যাত্রা উৎসব ১৯৭৯-৮০ স্মরণিকা*, নাট্যকলা বিভাগ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৯, পৃ. ২৭

[২২] উদ্ধৃত.প্রভাত কুমার দাস, *যাত্রার সঙ্গে বেড়ে ওঠা*, কারিগর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানু ২০১৪,পৃ.

'যাত্রাগান বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য। এই পুরাতনকে ভিত্তি করেই নতুনের জয়যাত্রা।'[২৩] ইতিহাসবিদ সৈয়দ মুর্তজা আলী (১৯০২-১৯৮১) উপলব্ধি করেছেন যে, যাত্রার সরল আঙ্গিক ও প্রবল আবেগ জনমনকে সহজেই অভিভূত করে। এছাড়া যাত্রার মাধ্যমে শহর ও গ্রামীণ মানুষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।[২৪]

লোকসাহিত্য গবেষক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের (১৯০৪-১৯৮৭) প্রত্যাশা, বাংলাদেশের পয়ষট্টি হাজার গ্রামে যাত্রা অভিনয়ের জয়গান ছড়িয়ে পড়ুক। যাত্রায় যে সৃষ্টিধর্মিতা আছে, তার মাধ্যমে গ্রামের সকল মানুষকে তিনি উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন। শিক্ষাবিদ ডক্টর এনামুল হক (১৯০৬-১৯৮২) 'যাত্রাকে আমাদের জাতীয় জীবনের একটা সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি' হিসেবে তুলে ধরেছেন। 'বাংলার সুপ্রাচীন সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত হোক, নিরানন্দ বাঙালির মনে আনন্দ' ফিরে আসুক – এটাই তাঁর অভিপ্রায়। নাট্যকার নুরুল মোমেন (১৯০৬-১৯৮৯) সিনেমা ও নাটক থেকে যাত্রার আলাদা বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন –

> সিনেমায় যেটা আমরা পাই, সেটা জোড়াতালি দেয়া জীবন। নাটকে যতটা পাই, তার বেশ খানিকটা নিয়ন্ত্রণ হয় পর্দার আড়াল থেকে। কিন্তু যাত্রার বেলায় দর্শক হিসেবে আমরা যতটুকু পাই সেটা নির্জলা ও সামগ্রিক। তাতে কোনও আড়াল নাই। শিল্পীগণ নিজগুণে যতটা রক্তমাংসের চরিত্র হতে পারেন ততটাই হন। যাত্রার এই পথই হলো জয়যাত্রার পথ, অন্য পথে যাত্রা নাস্তি।[২৫]

মঈনউদ্দীন আহম্মদ, 'যাত্রা সাহিত্যের মূল্যায়ন' প্রবন্ধে যাত্রার সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে :

> যখন কোনো বিষয়বস্তু লৌকিক ঐতিহ্য মণ্ডিত হয়ে বিশেষ ঢংঙে আসর প্রথার মাধ্যমে অভিনীত হয়। তখন সে শিল্পকলাকে যাত্রা বলে অভিহিত করতে পারি। যাত্রার দেহ-আত্মার সংগে বাংলার গণমানুষের নাড়ীর যোগ। গ্রাম বাংলার মানুষ একে গ্রহণ করেছে আনন্দের ও স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে। এখন শহরের অধিবাসীরাও যাত্রাকে সাদরে সংবর্ধনা জানিয়েছে। তাই যাত্রাকে যদি যুগের পটভূমিতে নতুনভাবে বিন্যস্ত করা যায় তাহলে যাত্রা হয়ে উঠবে আনন্দ বিনোদনের উন্নত ও উপভোগ্য শিল্পকলা, শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম, প্রয়োজনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটের ক্ষেত্রে আন্দোলনের হাতিয়ার এবং পালন করতে পারে যুগ মানস সৃষ্টির গৌরবদীপ্ত ভূমিকা।[২৬]

যাত্রা গবেষক প্রভাতকুমার দাস (জ.১৯৪৫) যাত্রার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বলেছেন :

> উচ্চগ্রামে বাচিক অভিনয়, ...একটু সুরেলা কাব্যিকতার সাবলীল রীতির মধ্যেই জাগ্রত থাকত তার প্রাণ। উন্মুক্ত আকাশের নীচে, শামিয়ানা ঢাকা চর্তুদিকে খোলা গ্রামীণ আসর, অভিনেতা আর দর্শক, পরস্পর নিকটতর আলোকিত সমন্বয়ের মধ্যে হয়ে উঠত প্রাণবন্ত। আসলে যাত্রার অপেরাধর্মিতার সে মূল বৈশিষ্ট্য, নাচ গান বাজনা সুর, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা

---

[২৩] মুজিবর রহমান খান (সম্পাদিত), *জাতীয় যাত্রা উৎসব ১৯৭৯-৮০ স্মরণিকা*, নাট্যকলা বিভাগ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৯, পৃ.২৩

[২৪] মুজিবর রহমান খান (সম্পাদিত), *জাতীয় যাত্রা উৎসব ১৯৭৯-৮০ স্মরণিকা*, নাট্যকলা বিভাগ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৯, পৃ. ২৩

[২৫] মুজিবর রহমান খান (সম্পাদিত), *জাতীয় যাত্রা উৎসব ১৯৭৯-৮০ স্মরণিকা*, নাট্যকলা বিভাগ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৯, পৃ. ২৪

[২৬] শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

> সহজ আনন্দের নিবিড় আত্মিকতা। পুরাণপ্রেমিক মানুষের আবেগ গভীর মনে নাড়া দেওয়ার যথেষ্ট শক্তি ছিল এই লোককলার। সারল্য-নন্দিত গীতিবাহুল্যের মধ্যে নাটুকেপনার অস্তিত্ব ছিল কম। তুলনায়, লোকশিক্ষাকে বাহন করে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে পুরাণের কাব্যগাথাকে জনপ্রমোদের উপকরণ হিসেবে শুধুমাত্র তুলে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল সম্প্রদায়ের, অভিনেতার।[২৭]

১.৪ যাত্রাপালা : পরিবেশনা আঙ্গিক ও উপস্থাপনা পদ্ধতি

যাত্রা বাঙালির অতি প্রাচীন এক অভিনয় রীতি। দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তনকে অবলম্বন করেই যাত্রার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। প্রাচীনকালে কোন পূজা-পার্বণে মন্দির থেকে দেবমূর্তিকে নিয়ে নৃত্যগীত সহকারে শোভাযাত্রা করে গ্রাম বা নগর প্রদক্ষিণ করা হয়। এই প্রদক্ষিণ শেষে মন্দিরে ফিরে এসে শোভাযাত্রীরা দেবতাকে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে দেবতার সম্মুখে তাঁর মহিমাসূচক পালাগান বা যাত্রাগান গাইতো। বৃত্তাকার এই অনুষ্ঠান পরিবেশনার স্থানটিকে বলা হয় নাটমণ্ডপ। ভরতের *নাট্যশাস্ত্রে* প্রাচীন বাংলার বৃত্তাকার নাটমণ্ডপের উল্লেখ আছে। বৃত্তাকার উপস্থাপনা বলতে বোঝায়, নাটমণ্ডপে যে যাত্রাগান অনুষ্ঠিত হয় তার চারপাশে থাকে দর্শক ও মধ্যস্থলে অনুষ্ঠান। নাটমণ্ডপটি বৃত্তাকার বা চতুষ্কোণাকার বা যে কোনো আকৃতির হতে পারে। উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত যাত্রাভিনয় বা পালাগান দেবতাকে অবলম্বন করেই পরিবেশিত হতো বলে প্রধানত মন্দিরের নাটমণ্ডপে অনুষ্ঠিত হতো। বহু মন্দিরের উঁচু নাটমণ্ডপ ছিল ও রয়েছে। যেসব মন্দিরে উঁচু নাটমণ্ডপ নেই সেখানে স্বাভাবিকভাবেই অনুষ্ঠান সমতল ভূমিতেই অভিনীত হতো। মন্দির ছাড়া অন্যত্র, যেমন কোন জমিদারগৃহে যাত্রাভিনয় হলে তা উঁচুমঞ্চ বা সমতল ভূমি যেকোনোভাবে সেখানকার ব্যবস্থা ও সুবিধা অনুসারে হতো। মূল অভিনয়-স্থানের চারপাশে দর্শকদের বসার জায়গা থাকতো। আবার কখনো কখনো উঁচু প্ল্যাটফর্মে মূল অভিনয়-স্থান বা রঙ্গভূমি, যার দু'পাশে কিছুটা নিচু অপ্রশস্ত আরো দুটি প্ল্যাটফর্ম থাকে, যেখানে বাদ্যযন্ত্রী ও প্রম্পটারের বসার স্থান থাকে। প্রাচীনকালে মূল যাত্রা শুরুর আগে যে অনুষ্ঠিত হতো বন্দনা বা নান্দী । নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন :

> প্রথমে নান্দী বা মঙ্গলগীতি (অর্থাৎ বন্দনা) অনুষ্ঠিত হতো। এটি গোস্বামী বা অধিকারীর নেতৃত্বে সমগ্র কুশীলব কর্তৃক গীত হতো। নান্দীর পরে অধিকারীর প্রস্তাবনা (অর্থাৎ নাটকের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা, কোনো সময় কেবল অনুষ্ঠিতব্য যাত্রার নাম, কোনো সময় অতিরিক্ত আরো কিছু বক্তব্য) অতঃপর মূল যাত্রা বা বস্তু।[২৮]

প্রাচীন যাত্রায় খোল, করতাল, বাঁশি, ঢোল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতো। উনিশ শতক থেকে ইংরেজদের প্রভাবে যাত্রায় পাশ্চাত্য যন্ত্রাদির সমাবেশ ঘটতে থাকে। যেমন : হারমোনিয়াম, বেহালা, ক্লারিওনেট প্রভৃতি।

---

[২৭] প্রভাত কুমার দাস, *যাত্রার সঙ্গে বেড়ে ওঠা*, কারিগর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানু-২০১৪, পৃ.১৭

[২৮] সৈকত আসগর (সম্পাদিত), *বাংলার লোকসংস্কৃতি : যাত্রাশিল্প*, উদ্ধৃত. জিয়া হায়দার, যাত্রার উপস্থাপনা পদ্ধতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, এপ্রিল ২০০২, পৃ. ২৩৫-৩৬

নৃত্য-গীত ও অভিনয় এই তিনকলার সমন্বয়ে বৈষ্ণব ভক্তরা যাত্রাগানের নানা পরিবেশনা করে থাকেন। কৃষ্ণ-জীবনের নানা পর্বের পরিবেশনায় (দোল-যাত্রা, জন্মাষ্টমী যাত্রা, কালীয়দমন যাত্রা, রাস-যাত্রা, দিব্যোন্মাদ যাত্রা, বিচিত্রবিলাস-যাত্রা) এই লোকআঙ্গিক বাংলার মানুষের চেতনা ও সংস্কৃতিতে গভীর শিকড় বিস্তার করে। বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত এই মাধ্যমটি বাংলাদেশে বৈষ্ণব যুগের অবসানের পরেও বাঙালির সাংস্কৃতিক এবং লৌকিক জীবনের অংশ হিসেবে টিকে রয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাত্রাপালার গানগুলিতে কথ্য সংলাপ ও অভিনয়ে কিছু অংশের পরিবর্তন দেখা যায়, যদিও গানের কাঠামো বা কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাহিনি অক্ষুণ্ন থাকে। কৃষ্ণযাত্রা ছাড়াও অন্যান্য দেবদেবীর মাহাত্ম্য কথাও চণ্ডীযাত্রা, রামযাত্রা ও মনসার ভাসান যাত্রার মাধ্যমে পরিবেশিত হতো। এ শতাব্দীর শেষের দিকে যাত্রার বিষয় ও আঙ্গিকে নান্দনিক অবক্ষয় ঘটতে থাকে। ধারণা করা যায়, যুগসন্ধিক্ষণের সামূহিক অবক্ষয়ের ছায়াই এই লোকনাট্যের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে। ভারতচন্দ্রের *বিদ্যাসুন্দর* আখ্যানের বিভিন্ন পালার পরিবেশনায় যুগের অবক্ষয়ের চিত্র প্রতিফলিত। বাংলা যাত্রা-নাট্যের পরম্পরায় ষোড়শ এবং উনিশ এ দুটি শতক বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই যাত্রার ভাবরস ও পরিবেশনরীতিতে অনন্য হয়ে ওঠে এবং ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের বাহন হিসেবে যাত্রা যেমন জনজীবনে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে – তেমনি উনিশ শতকের শুরু থেকেই এর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। একই সময় এই লোকনাট্য ধারার আঙ্গিক ও বিষয়ে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। পবিত্র সরকার ষোল থেকে উনিশ অর্থাৎ এই তিনশ বছরে যাত্রার বিষয় ও আঙ্গিকের দিক থেকে যে চারিত্র্য লাভ করেছিল তাকেই পুরোনো যাত্রা এবং উনিশ শতকের পর থেকে রচনা ও পরিবেশনায় যে পরিবর্তিত রূপের সূচনা হলো তাকে 'নতুন যাত্রা' নামে অভিহিত করেছেন।[২৯] বিভিন্ন যুগে পরিবর্তনশীল ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রভাব সত্ত্বেও লোকনাট্যের এই শাখা পরিবর্তিত সামাজিকতায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে এবং নিজস্ব সত্তাটুকু বজায় রেখেছে। সংলাপ, ঘটনা ও চরিত্রের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এর নাট্যশরীর। প্রাচীন যাত্রায় গীতের অংশই প্রধান ছিল, গানের বাইরে সংলাপের অংশ ছিল সামান্য। আবার এ সমস্ত সংলাপের অধিকাংশ কোনো আসরের মধ্যে মুখে মুখে রচিত হত।

যাত্রার গঠনে গীতাংশ সংযোজনের কয়েকটি প্রচলিত রীতি রয়েছে। পালার শুরুতেই সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনার ধরনে, কাহিনির সারসংক্ষেপ গানের মাধ্যমে পরিবেশনা করা হয়; একে বলা হয় প্রস্তাবনাগীতি। অনেক সময় সংস্কৃত নান্দীপাঠের মতো দেববন্দনা পরিবেশিত হয়ে থাকে। এই দেববন্দনাগীতি 'আখড়াই বন্দী' নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে কখনো কখনো নাটকের মূল কাহিনিসূত্রের উপস্থাপনা হয়ে থাকে। সংলাপ যখন অভিনয়ের চরম

[২৯] *নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ*, যাত্রা প্রিয় পরম্পরা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্র.প্র.২০০৮, পৃ.৩৮৩

পর্যায়ে ওঠে তখন অভিনয় শিল্পীরা সংলাপ বলতে বলতেই গান গেয়ে ওঠে – এ ধরনের গান 'ভক্তি-গীতি' হিসেবে পরিচিত। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে অভিনেতার 'উক্তি-গীত' অনেক সময় জুড়ি নামক একদল গায়কদের দ্বারা পরিবেশিত হতো। গোষ্ঠীবদ্ধ কিছু চরিত্র যেমন ঋষিকুমারবৃন্দ, বৈষ্ণবগণ, সৈন্যদল, সখীরা এই গান পরিবেশন করতো। উনিশ শতকে মূল কাহিনির সঙ্গে সংযোগহীন যুগল নারী-পুরুষের 'যাত্রা-ডুয়েট' গান গাওয়ার প্রচলন হয়। এ সমস্ত গানে দুজন চরিত্র মালি-মালিনী, সাপুড়ে-সাপুড়েনী বা মেথর মেথরানী প্রভৃতি চরিত্র চটুল আদি-রসাত্মক নাচগান করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করে। এছাড়া পালায় কিছুদিন ধরে 'যাত্রা-ব্যালে' নামে মনোরঞ্জনাত্মক সমবেত নাচ-গান পরিবেশিত হয়। বিভিন্ন পালায় যারা নর্তকী, বাঈজী, বনদেবী বা নানান সজ্জায় সজ্জিত হয় তারাই নাটকের শুরুতে বা দৃশ্যান্তরে এই নাচ পরিবেশন করে।

উনিশ শতকে যে নতুন যাত্রার উদ্ভব হয় তার রচনা এবং প্রযোজনা শৈলীতে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। ধর্মকেন্দ্রিক ও দেবমাহাত্ম্য নির্ভর নাট্যবস্তু থেকে সরে এসে যাত্রা প্রধানত ধর্মনিরপেক্ষ নাট্য উপাদানকে অবলম্বন করে। পাশাপাশি সংলাপের অংশগুলি বেড়ে গিয়ে গীতাভিনয়ের অংশগুলি কমে যায়। কিরণময় রাহার পর্যবেক্ষণে জানা যায়:

> Whatever the occasions or the schools of religious practice which made use of it, *Jatra* had become very much part of the emotional life of the people. Inevitably it acquired a set of conventions and a style of its own. These conventions and the style endured even after its natural base of a feudal, rural society had become eroded in the nineteenth century. The themes changed to suit the needs of the altered social context but the conventions- the singing chorus (*juri*), the concert overture and the prologue, the rhetorical flourish, the operatic music, the high pitched emotional acting, the comic reliefs--remained.[30]

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় যাত্রায় প্রবেশ ঘটে বিবেক চরিত্রের। বিশ শতকে যাত্রার আধুনিক আঙ্গিকে 'বিবেকের গান' শুভবোধের নবতর মাত্রা সঞ্চার করে। কেন্দ্রীয় নাট্যঘটনা-বহির্ভূত সুস্থ নীতি ও আদর্শের ধারক 'বিবেক'। মূল কাহিনিসূত্রের মধ্যে বিবেকের গাওয়া গানের মাধ্যমেই মুখ্য চরিত্রের সমালোচনা, নৈতিক উপদেশ বা ভবিষ্যদ্বাণীর কথা শোনানো হয়। নাট্যকাহিনির নৈতিক মান বিবেকের গানের মাধ্যমেই রক্ষিত হয়। একইসময় যাত্রায় বিবেকের সমান্তরালে 'একানে বালক' এর চরিত্র গড়ে ওঠে। সমস্ত রকম সুকুমার বৃত্তি ও পবিত্রতার ধারক ছিল এই বালক চরিত্র। এই 'একানে বালকের গান'ও একসময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যাত্রাপালায়। গোটা উনিশ শতক জুড়ে যাত্রাপালায় গানের ব্যাপক আধিক্য ছিল। গানগুলির মধ্যে উচ্চাঙ্গের রাগিনী, খেয়াল, টপ্পা, আখড়াই, হাফ-আখড়াই ও কীর্তনের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। তখন মূল কাহিনিটি সঙ্গীতনির্ভর গদ্যসংলাপের সূত্রসংযোগে

[30] Kironmoy Raha, *Bengali Theatre*, National Book Trust, India, 1978, pg.5

'গীতাভিনয়' নামে অভিহিত হয়। এই সময় যাত্রায় ভাঁড়ামি, অশ্লীলতা, কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি, কালোয়া-ভুলুয়ার নাচ ইত্যাদি আদিরসের সংযোগে কলকাতার ধনবান স্বল্পশিক্ষিত বিলাসপ্রমত্ত বাবু সম্প্রদায়কে আনন্দিত করত।

যাত্রায় বেশভূষার চাকচিক্য ও আধিক্য লক্ষণীয়। চুমকি লাগান ঝকঝকে জামা, ব্লাউজ, নাগরা যাত্রার বেশভূষায় অধিক ব্যবহৃত হয়। এছাড়া রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, রানী, রাজকন্যা, রাজপুত্র প্রভৃতির চরিত্রানুগ পোশাকের প্রচলন যাত্রার আদি পর্ব থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত চোখে পড়ে। নাট্য নির্দেশক সৈয়দ জামিল আহমেদ যাত্রার বিভিন্ন চরিত্রে ব্যবহৃত পোশাক ও সাজসজ্জার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে:

> Yatra costumes follow certain accepted conventions. Performances based on social texts largely follow accepted conventions of contemporary social life. For example, all male characters from urban areas with educated background generally wear trousers, shirt and shoes. Higher they go up in the social and economic ladder, the greater is the tendency to wear suits, ties and sometimes even hats. The "evil'' characters have the tendency to sport dark sunglasses...those from rural areas usually wear *lungis* (if they are Muslims) and *dhotis* (if they are Hindus), with shirts, *Panjabis* or vests…All married female characters wear *saris*: the affluent, those of silk and the poor, those of cotton. Salwar and kamiz are usually worn by unmarried women of urban background and saris, by the same of rural background…The costume of the royalty and the courtiers of historical texts, known as 'royal dress', are generally very colourful, and decorative. Hindu kings usually wear silken *dhotis* and knee-long inner garment (*joda*), decorated waist bands, decorated breast pieces (*royal-buki*), crowns (*mukut*) and shoes. Ministers and other courtiers wear similar costume without the crown…Hindu queens usually wear saris, blouses and crowns. Muslim kings wear silken *salwar*, a knee-long full sleeved silken upper garment *(joda),*...Queens and princesses usually wear *ghagra*, full-sleeved and tight-fitting upper garment, a sleeve-less decorated jacket (*Bombai chadri*), necklaces, decorated caps and shoes. Sometimes they also wear fine *urnis* (modesty scarf) over their heads and chests…The gods and goddesses of the mythological texts are dressed similarly as the Hindu royalty.[৩১]

রূপসজ্জার (Make up) ক্ষেত্রেও যাত্রার নট-নটীদের অতিরঞ্জন স্পষ্ট। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত অভিনয়ে তিন প্রকার ভূমিকা গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন :

> অনুরূপ, বিরূপ ও রূপানুরূপ। চরিত্রের বয়স ও দৈহিক গঠন অনুযায়ী স্ত্রী ও পুরুষের ভূমিকায় যথাক্রমে নারী ও নরের স্বাভাবিক রূপসজ্জা গ্রহণকে অনুরূপ, এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে বিবেচনা না করিয়া ভূমিকা গ্রহণ করাকে বিরূপ এবং বয়স ও চেহারা অনুযায়ী নারীকে নর ও নরকে নারী সাজানোর রীতিকে রূপানুরূপ বলা হয়।[৩২]

সকল দেশের প্রাচীন নাট্যাভিনয়েই পুরুষ কর্তৃক রূপানুরূপ রীতি অবলম্বনের প্রচলন ছিল। যাত্রায় এ রীতির প্রচলন দীর্ঘদিনের। এ রীতির ফলে পুরুষদের স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে পুরো ও উজ্জ্বল মেক-আপের প্রয়োজন

---

[৩১] Syed Jamil Ahmed, *Achinpakhi Infinity Indigenous Theatre of Bangladesh,* University press Limited, 2000, pg 251

[৩২] উদ্ধৃত. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প্র.প্র. ১৯৭২

হত। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই যাত্রায় মেক-আপের আধিক্য লক্ষ করা যায়। আর সেই রূপানুরূপ চরিত্রে অভিনেতার সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য অন্য অভিনেতাদের প্রায় কাছাকাছি রূপসজ্জার প্রয়োজন হয়।

দেব-দেবীর ভক্তি মাহাত্ম্যের উৎসবের পরিবর্তে নির্দিষ্ট কিছু মানুষ যখন নিয়মিত চর্চায় যাত্রা দল সংগঠিত করে তখন স্বাভাবিকভাবেই তার আঙ্গিককে আঁটসাট ভাবে বাঁধতে হয়। নির্দিষ্ট অধিকারী বা অধিকর্তা, নির্দেশক, পালাকার এবং নট নটীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে যাত্রাদল যদিও স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মীয় কৃত্যের থেকে গোষ্ঠীবদ্ধতার উদ্ভব ঘটে। কর্মবিভাজনের মাধ্যমে বিশেষায়িত ভূমিকাও স্পষ্ট হতে থাকে। নিজ নিজ ভূমিকায় ক্রমোন্নতির চেষ্টাও চলে। যাত্রা হয়ে ওঠে যাত্রাশিল্পীর সৃষ্টি। এই পেশাগত সচেতনতা যাত্রাকে পার্থিব পরিবেশনা রীতির শিরোপা এনে দেয়। লোকশিক্ষা এবং লোকরঞ্জনের উপায় হিসেবে যাত্রাপালা রচিত হতে থাকে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক এমনকি রাজনৈতিক – সব ধরনের যাত্রাপালাতেই কোনো না কোনোভাবে নৈতিক ও আদর্শগত শিক্ষা দেবার রীতি প্রচলিত থাকে। প্রাচীন যাত্রায় সামান্য নাটকীয়তা ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে থিয়েটারের সংস্পর্শে এসে যাত্রা-পালার নাটকীয়তা ও চমক অতিনাটকীয়তায় পর্যবসিত হয়। লোকশিল্পের অন্যান্য আঙ্গিকের মতো যাত্রারও প্রধান ভিত্তি কল্পনাপ্রবণতা। বাস্তবের সরাসরি উপস্থাপনা যাত্রার উদ্দেশ্য নয়; বরং কল্পনার পরিমণ্ডলে বহুমাত্রিক ও বহুস্তর বাস্তবের পরিবেশনা এই নাট্য আঙ্গিকের শৈলীগত বৈশিষ্ট্য। যাত্রার প্রযোজনা এবং অভিনয়রীতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ পায় তাঁর 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে :

> আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐ জন্য ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে। কাব্যরস যেটা আসল জিনিস, সেইটেই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মতো চারি দিকে দর্শকদের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে।[৩৩]

যাত্রা পরিবেশনার প্রধান লক্ষণীয় বিষয় এর মঞ্চ-পরিকল্পনা যা একে পরিবেশনা রীতি ও উপভোগে বিশিষ্টতা এনে দেয়। উন্মুক্ত পরিসরে তিন দেয়ালের বেষ্টনী ছাড়াই, মঞ্চবিভ্রম তৈরি না করেই অভিনয় – যাত্রার অন্যতম মূল শর্ত। যাত্রার নাট্যাদর্শে লোক-কল্পনার এই বিশিষ্ট ভূমিকার কথা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আরও জানিয়েছেন:

> ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে জাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল; কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।[৩৪]

---

[৩৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রঙ্গমঞ্চ, *বিচিত্র প্রবন্ধ*, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, বিশ্বভারতী সংস্করণ ১৯৬৩, পৃ.৭৫-৭৬

[৩৪] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রঙ্গমঞ্চ, *বিচিত্র প্রবন্ধ*, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, বিশ্বভারতী সংস্করণ ১৯৬৩, পৃ.৭৬

প্রফুল্ল চন্দ্র গুহ ঠাকুরতা তাঁর বাংলা নাটকের উদ্ভব সংক্রান্ত গ্রন্থে যাত্রার মঞ্চসজ্জা প্রসঙ্গে প্রায় একই মত প্রদান করেছেন: `It is not produced upon a parmanent stage and it does not require any curtains or much scenery'.[৩৫] দৃশ্যপটহীন পর্দা তোলা বা ফেলা ছাড়াই সাধারণত যাত্রা জনবহুল এলাকা বা মন্দিরে পরিবেশিত হয়। অস্থায়ীভাবে নির্মিত পরিবেশনার মঞ্চটি (পরি-৪) কোথাও কোথাও বর্গাকার (এক পাশ ১৮ ফুট) ও ২.৫ ফুট উঁচু। আবার কিছু জায়গায় মঞ্চটি আয়তাকারও (২২/২০ অথবা ২০/১৮, পরি-৫) হয়। তবে কেন্দ্রীয় মঞ্চটি ১৬ থেকে ২২ ফুটের ভিতরই থাকে, যা পরিবেশনার স্থান ও দর্শকের সংখ্যা বিবেচনায় পরিবর্তিত হয়।[৩৬] মাথার ওপর থাকে সামিয়ানা আর চারিদিকে বসে দর্শকরা। সাজঘর থেকে অভিনয়-স্থল অবধি অভিনেতাদের প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য একটি লম্বা কাঠের পাটাতনযুক্ত থাকে। মূল মঞ্চের দুদিকে দুটো সরু পাটাতন থাকে বাদ্যযন্ত্রীদের বসার জন্য। মঞ্চের এই বিশেষ গঠনভঙ্গির জন্য অভিনেতা ও দর্শকদের মধ্যে সহজ যোগাযোগ সৃষ্টি হয়। পুরোনো যাত্রার অনেক পালাতেই কুশীলবেরা মঞ্চে এসে দর্শকদের কাছে সরাসরি নিজের পরিচয় দেয়। আবার কখনো কখনো যাত্রার অধিকারী সূত্রধরের মতো দর্শক ও কলাকুশলীদের মধ্যস্থ হয়ে কাহিনির ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন। যাত্রাপালার মঞ্চসজ্জা যেহেতু সামান্য ছিল ফলে ব্যাকগ্রাউন্ড দৃশ্যপটের কোনো ব্যাপার এতে নেই। নতুন যাত্রায় মাঝে মাঝে একটি চেয়ারকে মঞ্চবস্তু হিসেবে ব্যবহার করে রাজ-সিংহাসন কিংবা পথপ্রান্তের আসন কল্পনা করা হয়। আলোর ব্যবহারও যথেষ্ট ক্ষীণ; তাই প্রাচীন যাত্রা দিবালোকে অভিনীত হয়। পরে গ্রামীণ আসরে কেরোসিনের আলো, হ্যাজাক ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে থাকে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে আলোর প্রক্ষেপণেও নানান বৈচিত্র্য আসে। যদিও আলোক-সম্পাতের মাধ্যমে নাটকীয় পরিবেশ তৈরি করা যাত্রার মৌল চরিত্রের বিরোধী। যাত্রার সংলাপ প্রক্ষেপণেরও একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি আছে। স্বাভাবিক ও দৈনন্দিন কথা বলার ধরন থেকে তা সম্পূর্ণ আলাদা। যাত্রাভিনেতারা 'আঙ্গিক'[৩৭] অভিনয়ের মাধ্যমে নাটকীয় দেশ, কাল, পরিবেশ সৃষ্টি করেন। হাতের লাঠিটিকে দু-পায়ের ফাঁকে রেখে সহজেই যাত্রাভিনেতা বিশ্বাস করিয়ে দেন যে সেটা ঘোড়া। যাত্রার আঙ্গিকের মধ্যে দেশকালের গতিময়তা ও তারল্য অভিনেতার সাহায্যেই সৃষ্টি হয়। কল্পনায় শূন্য মঞ্চ কখনো পাহাড়-নদী, কখনো রাজপ্রাসাদ, কখনো তরঙ্গিত সমুদ্র দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।[৩৮] এতে দর্শকের উপভোগের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয় না।

---

[৩৫] P. Guha-Thakurta, *The Bengali Drama : Its Origin And Development*, kegan paul, Trench, Trubner & co. Ltd, London, 1930, p-20

[৩৬] Syed Jamil Ahmed, *Acinpakhi Infinity : Indigenious Theatre of Bangladesh*, University Press Limited, Bangladesh, First publised 2000, P.246

[৩৭] আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্বিক – অভিনয় এই চার প্রকার। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভাব প্রকাশের দ্বারা যে অভিনয়-কার্য নিষ্পন্ন হয়, তাকে আঙ্গিক অভিনয় বলে।

[৩৮] অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলার লোকনাট্য যাত্রা ও সাতটি রবীন্দ্র-নাটক*, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, প্র. প্র. ১৩৯৪, পৃ. ৫-৭

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন ঘটে, পূর্বের বৈশিষ্ট্যও বহুলাংশে লুপ্ত হয়। ধর্মীয় বা পৌরাণিক যাত্রার কাল উনিশ শতকেই প্রায় শেষ হয়ে যায়; যুক্ত হয় ঐতিহাসিক যাত্রা। বিশ শতকের গোড়া থেকে স্বদেশিযাত্রার সঙ্গী হয় ঐতিহাসিক যাত্রা। বর্তমানকালে রাজনৈতিক এমনকি জীবনীমূলক যাত্রাও ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বিষয়বস্তু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থাপনায়ও অনেক পরিবর্তন ঘটে। সমসাময়িককালে বাংলাদেশে যেসব পেশাদারি যাত্রা অনুষ্ঠিত হয় তার উপস্থাপনা রীতির পর্যায়ক্রমিক বিবরণ ওঠে আসে জিয়া হায়দারের বর্ণনায় :

(ক) মূল যাত্রা শুরুর আনুমানিক দু'ঘণ্টা আগে দলের একজন চাকর শ্রেণির ব্যক্তি পেটা ঘণ্টা বাজিয়ে কুশীলব ও যন্ত্রীদের সতর্ক করে নেয়।

(খ) সতর্ক ঘণ্টার পর বাদ্যযন্ত্রগুলো মঞ্চের নির্দিষ্ট স্থানে রেখে আসা হয়।

(গ) গ্রীনরুমে প্রার্থনা অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটি সাধারণত কীর্তন ঢংয়ের গানের সঙ্গে হয়ে থাকে। প্রার্থনা গীতির পর কুশীলবরা (মুসলমানরা ছাড়া) কোনো বিশেষ দেবতার –– বিষ্ণু, কৃষ্ণ, শিব বা দুর্গার পট প্রণাম করেন। (প্রথম সতর্ক ঘণ্টা থেকে প্রার্থনা অনুষ্ঠানটির সময়কাল একঘণ্টা।)

(ঘ) প্রার্থনা অনুষ্ঠানের পর একটিমাত্র ঘণ্টা বাজানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় 'ওপেনিং কনসার্ট'। ঢিমেলয় ও তালে বাজানো এই কনসার্টের সময়কাল পয়তাল্লিশ মিনিট। ওপেনিং কনসার্টেও পর প্রায় পনেরো মিনিট বিরতি।

(ঙ) বিরতি শেষে দুটি ঘণ্টা বেজে ওঠে। শুরু হয় দ্বিতীয় কনসার্ট; সময়কাল পনেরো থেকে কুঁড়ি মিনিট। এর লয় ও তাল অপেক্ষাকৃত দ্রুত।

(চ) দ্বিতীয় কনসার্ট শেষ হবার পরেই দেশ বন্দনা। এটি করে থাকে 'সখিদল'। (পূর্বেকার 'বন্দনা' পাকিস্তান-পরবর্তী সময়ে রূপ বদল করে হয় দেশ-বন্দনা। সমবেত গানও নাচের সমন্বয়ে এ দেশ বন্দনা পরিবেশিত হয়।)

(ছ) দেশ বন্দনার পরে বিচিত্রানুষ্ঠান। এতে থাকে প্রধানত নাচ ও গান যা কিনা বহুলাংশে অশ্লীল বলে অভিযুক্ত। বিচিত্রানুষ্ঠান প্রায় একঘণ্টাব্যাপী হয়ে থাকে।

(জ) তারপর তিনটি ঘণ্টা বেজে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় খুব দ্রুত লয় ও তাল-এ্যাপিয়ার কনসার্ট। তিন থেকে পাঁচ মিনিট স্থায়ী এই কনসার্ট শেষ হবার পূর্বেই অভিনেতা মঞ্চে প্রবেশ করে। কোনো সময় কনসার্ট চলাকালেই অভিনেতা তার সংলাপ শুরু করেন ও সংলাপ শুরু হলেই কনসার্ট থেমে যায়। আবার কোনো সময় কনসার্ট শেষ হবার মুহূর্তেই সংলাপ শুরু হয়।

(ঝ) যাত্রা (যাত্রাদলের লোকেরা বলেন যাত্রাবই) সাধারণত পাঁচ অঙ্কের হয়ে থাকে। প্রতি অঙ্কের শেষে প্রম্পটার (যিনি বিচিত্রানুষ্ঠান বা এ্যাপিয়ার কনসার্ট চলাকালে নীচু অপ্রশস্ত মঞ্চের একপাশে এসে বসেন) একটি ঘণ্টা

বাজান, অর্থাৎ একটি অঙ্কের শেষ। এরপরে ইন্টারল্যুড। এতে বিভিন্ন ধরনের গান ও নাচ কমিক ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত।

(ঞ) কোনো কোনো সময় শেষদৃশ্যের আগে অধিকারী বা কোনো অভিনেতা পরের রাত্রিতে অনুষ্ঠিতব্য যাত্রা বইয়ের নাম ঘোষণা করেন।[৩৯]

বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) বিশাল আয়তনের উপন্যাস *মঞ্জুরী অপেরা*[৪০] কিংবা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯৩৩-১৯৮৩) নাটক *সদাগরের নৌকা*[৪১] যাত্রাশিল্পীদের জীবন এবং পরিবেশনার অসামান্য দলিল হয়ে আছে।

১.৫ যাত্রার উদ্ভব সম্পর্কে বিভিন্ন মত

'যাত্রা' শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে গবেষকেরা ঐকমত্যে পৌঁছলেও যাত্রাগানের উদ্ভবস্থল ও কাল সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বসু, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য , অজিতকুমার ঘোষ প্রমুখ গবেষকগণ অতি প্রাচীন বা প্রাচীন কাল থেকে যাত্রার উদ্ভবের পক্ষে মত প্রদান করেছেন। অন্যদিকে ষোড়শ শতকে যাত্রার উন্মেষ হয়েছে এমন মতের পোষকতা যাঁরা করেন তাঁদের মধ্যে সুশীলকুমার দে, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সৈয়দ জামিল আহমেদ, কপিলা বাৎসায়ন, সুরেশচন্দ্র মৈত্র প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এর বাইরে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সেলিম আল দীন, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে আঠারো শতকের প্রথমপাদে, মাঝামাঝি এবং শেষার্ধে বাংলা যাত্রার উন্মেষ হয়েছে বলে মনে করেন। অপরদিকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং তপন বাগচী উনিশ শতকের প্রথমার্ধকে বাংলা যাত্রার সূচনাকাল হিসেবে চিহ্নিত করেন।

এই গবেষণায় যাত্রার উন্মেষের সময়কাল সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে উর্পযুক্ত গবেষকদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করার অবকাশ রয়েছে। আঠারো শতকের প্রথমপাদ থেকে অন্তত যাত্রার উন্মেষের সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিক প্রমাণ লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ বাংলার নবাবী আমলের সূচনালগ্ন থেকেই যাত্রা পরিবেশনার সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ নিরবচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যাচ্ছে।

১.৫.১ প্রাচীন যুগের পক্ষে মতামত

ধর্মীয় ভক্তি অনুরাগের কথকতা গায়ন থেকে যাত্রা যেদিন পার্থিব বিষয়ে বাংলা ভাষায় রচিত হয়ে অভিনীত হয় -- ধারণা করা হয় বাংলা যাত্রার শুরু তখন থেকেই ঘটে। যাত্রাগান অতি প্রাচীন শিল্পমাধ্যম যার উদ্ভব সম্পর্কে

---

[৩৯] সৈকত আসগর (সম্পাদিত), *বাংলার লোকসংস্কৃতি : যাত্রাশিল্প*, জিয়া হায়দার, যাত্রার উপস্থাপনা পদ্ধতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ২৩৯-২৪০

[৪০] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জুরী অপেরা ১ম খণ্ড, *তারাশঙ্কর রচনাবলী* ১৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ষষ্ঠ মুদ্রণ-১৪১৮, এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জুরী অপেরা শেষার্ধ, *তারাশঙ্কর রচনাবলী ১৪*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, অষ্টম মুদ্রণ-১৪১৮

[৪১] অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, *নাটক সমগ্র প্রথম খণ্ড*, সদাগরের নৌকা, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১১

নথিবদ্ধ ইতিহাস রচিত হয়নি; এমনকি ঐতিহাসিক প্রমাণও অপ্রতুল। তাই এর উৎস সম্পর্কে যৌক্তিক মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। প্রাচীনকাল ও অতিপ্রাচীনকালে যাত্রার উন্মেষ ঘটেছে বলে যারা দাবি করেন তারা বিভিন্ন দূরস্থিত পরোক্ষ প্রমাণের আলোকে অনুমান করেছেন। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য এর উৎস নির্দেশ করতে গিয়ে বৈদিক যুগের আচার অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেছেন।[৪২] *বাংলা বিশ্বকোষ* রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ বসুর (১৮৬৬-১৯৩৮) মতে প্রাচীন কালেই যাত্রার উদ্ভব হয়েছে:

> অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষের সকল স্থানেই প্রকাশ্য রঙ্গভূমে বেশভূষায় ভূষিত ও নানা সাজে সুসজ্জিত নরনারী লইয়া গীতবাদ্যাদি সহকারে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ অভিনয় করিবার রীতি প্রচলিত। পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত ভগবদতারের লীলা ও চরিত্র ব্যাখান করা এই অভিনয়ের উদ্দেশ্য। ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ সেই দেবচরিত্রের অলৌকিক ঘটনা পরম্পরা স্মরণ রাখিবার জন্য এক একটি উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। গীতবাদ্যাদি যোগে ঐ সকল লীলোৎসব-প্রসঙ্গে যে অভিনয়ক্রম প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহাই প্রকৃত যাত্রা বলিয়া অভিহিত।[৪৩]

নগেন্দ্রনাথ বসু 'লীলোৎসব' কেই যাত্রা হিসেবে চিহ্নিত করেন। *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা* গ্রন্থে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (১৭৯৯-১৮৫৯) লোকনাট্য বলতে বাংলা যাত্রাকে বুঝিয়েছেন। প্রাচীনকাল থেকেই যাত্রার উদ্ভব হয়েছে বলে তিনি ধারণা করেন। এ-ব্যাপারে তিনি সংস্কৃত নাটক এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত নাটকের তুলনামূলক আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে,

> যাত্রা অথবা উৎসব উপলক্ষে অভিনয়ের জন্য নাট্যরচনারীতিও প্রাচীনকাল হইতে ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত। কালপ্রিয়নাথের যাত্রা উপলক্ষে ভবভূতি উত্তররাম চরিত ও মালতীমাধব নাটকদ্বয় রচনা করেন। কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্র ও শ্রীহর্ষ রত্নাবলী নাটক বসন্তোৎসবে অভিনীত হইবার জন্য রচনা করেন। নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমূনির শাস্ত্রানুযায়ী জয়বিজয় কাহিনী অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন মহেন্দ্রবিজয়োৎসব। বাংলায়ও দেব-ধর্মোৎসবে অভিনয় করিবার জন্যই যাত্রানাট্য রচিত হইতে আরম্ভ করে – ইহা দ্বিধাহীনভাবে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে।[৪৪]

যাত্রার উদ্ভব সম্পর্কে নাট্য-ইতিহাসকার অজিতকুমার ঘোষের (জ.১৯১৯) বক্তব্য:

> আমাদের দেশের যাত্রার উদ্ভব হয়েছে দেবপূজা উপলক্ষে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাত্রা বা গমন থেকে। এই যাত্রার সময় গীত এবং নৃত্যের ভঙ্গিতে অঙ্গসঞ্চালন হ'ত। নৃত্যগীত সম্বলিত যাত্রার নাম তখন ছিল নাটগীত বা গীতনাট। ধর্মীয় শোভাযাত্রা গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়েও নৃত্যগীত এবং ভাব প্রকাশক অঙ্গভঙ্গির মধ্য দিয়ে দেবলীলার মহিমা ব্যক্ত করত। কালক্রমে নির্দিষ্ট স্থানে শ্রোতৃমণ্ডলীবেষ্টিত অভিনয়ই যাত্রাভিনয়ে পরিণতি লাভ করে। নৃত্যগীত ও অঙ্গভঙ্গি বিচ্ছিন্নভাবে

---

[৪২] গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১২৬

[৪৩] নগেন্দ্রনাথ বসু, *বাংলা বিশ্বকোষ*, পঞ্চদশ ভাগ, বি আর পাবলিশিং কর্পোরেশন, দিল্লী, ১৯৮৮, পৃ. ৬৯৭

[৪৪] গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১২৬

> অনুষ্ঠিত না হয়ে একটি কাহিনীর অন্তর্ভূক্ত হ'ল এবং তার মধ্যে কিছু হাস্যরসাত্মক সংলাপও যুক্ত হল। এইভাবে যাত্রানাটকের উৎপত্তি হল।[৪৫]

মূলত প্রাচীন লৌকিক দৈব বিশ্বাসের সাথে সাংস্কৃতিক চেতনার মিশ্রণে যে সুকুমার শিল্পধারা বিকশিত হয় তাই এ জনপ্রিয় নাট্যধারার মূল উৎস বলে তিনি মনে করেন। সনৎকুমার মিত্র (জ.১৯৩৩) যাত্রার উদ্ভব সম্পর্কে জানিয়েছেন :

> সূর্য দেবতার কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে অভিগমনকে কেন্দ্র করে কৃষি নির্ভর সুপ্রাচীন সমাজ নিশ্চয়ই এমন সমস্ত উৎসব পালন করতো, যা তাদের সু শষ্যের সহায়ক হতে পারে। সূর্যের অয়নগতির দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে যে, তার প্রধান প্রধান গতি সঞ্চার কাছাকাছি সময়ে এমন কয়েকটি উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে যার সাথে যাত্রা শব্দটি যুক্ত আছে। যেমন স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, হিন্দোল বা ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা। ... সূর্যের গতি পথের বিভিন্ন পর্যায়িক সঞ্চারই যাত্রা নামে পরিচিত। কৃষিনির্ভর প্রাচীনেরা সেই যাত্রা নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠান করতো। এবং এই প্রক্রিয়া, বিশ্বাস ও আচারের মধ্যেই আজকের যাত্রাভিনয়ের নষ্টকোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।[৪৬]

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার সুকুমার সেন যাত্রার উদ্ভবের কোনও নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করেননি, তবে যাত্রার পূর্বরূপ হিসেবে পাঁচালিকে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর বক্তব্য:

> পাঁচালি হইতেই যাত্রার উদ্ভব। যাত্রার সঙ্গে পাঁচালির পার্থক্য এইমাত্র ছিল যে পাঁচালিতেও মূল গায়েন বা পাত্র একটিমাত্র, যাত্রায় একাধিক, সাধারণত তিনটি।[৪৭]

এখন যাত্রায় তিনটি চরিত্রের স্থানে বিশ-বাইশটি চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। অর্থাৎ তিনি যে যাত্রার কথা বলেছেন তা মূলত নৃত্যগীতাভিনয়। রামলীলা বা কৃষ্ণলীলা পরিবেশনের জন্য এ ধরনের নৃত্যগীতাভিনয়ের আঙ্গিক প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে এ পরিবেশনা রামযাত্রা বা কৃষ্ণযাত্রা হিসেবে পরিগণিত হয়। প্রায় একই মত সমর্থন করে অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু (১৮৭০-১৯৫৯) বলেছেন, 'পাঁচালীগানের ক্রমিক পরিণতির ফলে যাত্রাগানের উৎপত্তি হইয়াছে।'[৪৮] গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ (জ.১৯৩৮) লিখেছেন:

> 'মালতী মাধব'-এ ভগবান কালপ্রিয় নাথের যাত্রাভিনয় বা যাত্রাগানের বিবরণ আছে। সম্রাট অশোক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তাঁর অষ্টম শিলালিপিতে উৎসব অর্থে যাত্রা ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, পূর্বকালের রাজারা 'বিহারযাত্রা' করতেন। সম্রাট অশোকের অভিষেকের দশম বর্ষে তাঁর 'ধর্মযাত্রা' যাত্রার উৎসস্থল হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।[৪৯]

---

[৪৫] অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, এপ্রিল-১৯৯৮, পৃ. ২

[৪৬] সনৎ কুমার মিত্র, যাত্রা : থিয়েট্রিক্যাল অপেরা (প্রবন্ধ), সাহিত্য ও সংস্কৃতি পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৩, পৃ. ২১৬, উদ্ধৃত. সুশান্ত সরকার ও নাজমুল আহসান (সম্পাদিত), *যাত্রা : উদ্ভব ও বিকাশ*, লোকনাট্য ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কেন্দ্র (লোসাউক), খুলনা, ১৯৯৪, পৃ. ১০৪

[৪৭] সুকুমার সেন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১১

[৪৮] মন্মথমোহন বসু, *বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, দ্বি-সং, ১৯৫৯, পৃ. ৪৮

[৪৯] গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ, *৩০০ বছরের যাত্রাশিল্পের ইতিহাস*, প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১৭

যাত্রার উন্মেষ সম্পর্কে প্রথম দিকের যাত্রা গবেষক নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে:

> ... বস্তুত এই ধরনের উৎসব ভারতবর্ষে যে বেশ সুপ্রাচীনকাল থেকেই পালিত হতো, তার বহু প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়। বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক দুই শিষ্য মৌদগল্যন ও উপতিষ্যের আত্মজীবনীতে দেখি তাঁরা প্রায়ই রাজগৃহের উৎসব উপলক্ষে মিলিত হতেন পরস্পরের সঙ্গে। বার্লফ, লাসেন প্রমুখ বিশিষ্ট প্রত্নবিদ বুদ্ধের মৃত্যুর তথা মহানির্বাণের যে সময় ধার্য করেছেন (৫৪৩ খ্রিস্টপূর্ব) তাতে করে মৌদগল্যন ও উপতিষ্যের এই ভাষ্য খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের বলে গণ্য করা যেতে পারে। আরো একধাপ এগিয়ে গেলে দেখি 'ললিতবিস্তার'-এ সিদ্ধার্থের নাট্য-অভিনয়-কুশলতার কথা বলা হয়েছে। এসব থেকে নিঃসংশয় হয়ে বোঝা যায় যে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকেই নিয়মিত কৃষ্ণযাত্রার অভিনয় হতো এবং ভারতের সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছেই তা জনপ্রিয় ছিল।[৫০]

প্রবোধবন্ধু অধিকারী তাঁর 'আটশো বছর যাত্রারথে' প্রবন্ধে জানিয়েছেন: 'জয়দেব ছিলেন খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের কবি। তাঁর অভিনয়-পদ্ধতিকে 'নাটগীত' ও 'যাত্রা-নাট' এই আখ্যাতেই ভূষিত করা হয়েছে।' এ প্রবন্ধে তিনি যাত্রাকে আটশ বছর আগের অর্থাৎ দ্বাদশ শতকের সৃষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন। বাংলার উত্তর-পূর্ব অঞ্চল অসমের শঙ্করদেবের 'অঙ্কীয়া নাটে' প্রথম অভিনয় অর্থে যাত্রা শব্দের প্রয়োগ দেখায়।[৫১] বিভিন্ন চৈতন্য জীবনীকাব্যগুলিতে চাঁদোয়া খাটিয়ে পরিবেশিত যাত্রার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তবে চৈতন্যদেবের আগেই সংস্কৃত নাটকের পাশাপাশি দেশীয় অভিনয় ধারার সমান্তরাল অস্তিত্বের কথা অনেক সমালোচকই জানিয়েছেন। আবার প্রাচীন ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের গবেষক A. B. Keith (১৮৭৯-১৯৪৪) জয়দেবের গীতগোবিন্দকে যাত্রারই একটি বিশিষ্ট রূপ হিসেবে ব্যখ্যা করেন। *The Sanskrit Drama in its Origin, Development, Theory and Practice* নামক গ্রন্থে তিনি জানিয়েছেন,

> The Dramas of the ritual, therefore, are in a sense somewhat out of the mainline of the development of the drama; the popular side has survived through the ages in rough way in the yatras well known in the literature of Bengal, while refined and sacerdotalished vedic drama passed away without direct descendent.[৫২]

তাঁর মতে, এই লোকনাট্যের ধারাটিই অধিক জনপ্রিয় ছিল যা আজও যাত্রার মধ্য দিয়ে বহমান। একাদশ শতকে রাধা-কৃষ্ণ লীলার উদ্ভব বাঙালির চিন্তনে এক যুগান্তকারী ঘটনা। রাজা লক্ষণসেনের সভাকবি জয়দেবের

---

[৫০] নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, 'যাত্রা', সনৎকুমার মিত্র (সম্পাদিত), *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, যাত্রা বিশেষ সংখ্যা, ৭ বর্ষ, ২ সংখ্যা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, পৃ.১১২-১১৩

[৫১] সুকুমার সেন, *নট নাট্য নাটক*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৩৭২

[৫২] A.B. Keith, *The Sanskrit Drama in its Origin, Development, Theory and Practice*, Oxford University Press, P-16

গীতগোবিন্দ কাব্যে রাধা-কৃষ্ণ লীলাই সংগীত ও অভিনয়ে রূপায়িত। নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় *গীতগোবিন্দকে* যাত্রা হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে :

> The well-known Sanskrit Idyll called the Gita Gobinda, by Jayadeva Goswami, which, as has been well observed, is nothing but a yatra in Sanskrit, is based on a part of the story, in as much as it depicts only the amours of Krishna with Radha in their various phases without referring to the other two periods of his life.[৫৩]

নিশিকান্তের এই মন্তব্যটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯) *গীতগোবিন্দ*-কে 'একটি নৃত্যসম্বলিত গীতিনাট্য'[৫৪] আখ্যা দিয়েছেন। উইলিয়াম জোন্স (১৭৪৬-১৭৯৪) *গীতগোবিন্দকে* বলেছেন রাখালী নাট বা (Pastoral Drama) অর্থাৎ গ্রামীণ নাটক বা লোকনাট্য – অনেকটা যাত্রার পূর্বরূপ।[৫৫] অর্থাৎ গৌড় বা সমতটে যে লোকাভিনয়ের ধারা প্রচলিত ছিল, *গীতগোবিন্দে* তারই আভাস দেখা যায়। দরবারি সংস্কৃতির পাশাপাশি এই লোকায়ত সংস্কৃতির চর্চা লৌকিক ধর্মাচারের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত যার মূল উদ্দেশ্য ছিল লৌকিক দেব-মাহাত্ম্য প্রচার। সুকুমার সেনের কথায় তাই সমর্থিত –

> সেকালে উৎসব উপলক্ষ্যে দুই ধরনের সাহিত্য-সঙ্গীতের আসর বসিত। একটি স্থাবর অপরটি জঙ্গম। স্থাবর আসর দেব মন্দিরের সামনে বসিত।... জঙ্গম উৎসবকে বলিত 'যাত্রা'। বাৎসরিক পূজা অথবা সাময়িক উৎসব উপলক্ষ্যে দেবতাকে রথে, শকটে অথবা শিবিকায় চড়াইয়া ভক্তেরা শোভাযাত্রা করিয়া নাটগীত করিতে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইত। এমনিভাবে পুন্য দিনে নদীস্নানেও লোকে যাইত। দেবতার শোভাযাত্রা হইতে আধুনিক 'যাত্রা' কথাটি আসিয়াছে।[৫৬]

দেশীয় পণ্ডিতবর্গ (দীনেশচন্দ্র সেন, অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়) ও বিদেশি সমালোচকেরা (জোনস, কীথ, পিকেলি, স্রোয়ডর, লেভি প্রমুখ) *গীতগোবিন্দের* সঙ্গে নাটকের আত্মীয়তা প্রত্যক্ষ করেছেন। এঁদের অনেকেরই মতে, 'যাত্রা' জাতীয় নাটগীতের আদিরূপ *গীতগোবিন্দ*।[৫৭]

গীতগোবিন্দ-প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী কাব্যনিদর্শন *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (১৯১৩)*[৫৮]। ভাষার দিক দিয়ে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* মধ্যযুগের লক্ষণাক্রান্ত হলেও ভাবের দিক দিয়ে এটি *গীতগোবিন্দের* অনুবর্তী বলেই ধারণা করা যায়। সমালোচক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (জন্ম ১৯৪২) লিখেছেন –

---

[৫৩] Nishikanta Chattpopadhyay, *The Yatras or The Popular Dramas of Bengal*, London : Trubner & Co.,1882 , উদ্ধৃত. সৈকত আসগর, (সম্পাদিত), *বাংলার লোকসংস্কৃতি : যাত্রাশিল্প*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্র.প্র. এপ্রিল ২০০২, পৃ. ৫৮৭

[৫৪] আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ঢাকা, বর্ণমিছিল, ১৯৭৮, পৃ.৯৩

[৫৫] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, চতুর্থ খণ্ড, মডার্ন বুক এজন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্র.সং.১৯৭৩, পৃ.৩৮২

[৫৬] সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, আনন্দ সং, কলকাতা, পৃ. ১৫

[৫৭] *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩৮২-৩৮৩

> শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে নানা দিক হইতে জয়দেবের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গীতগোবিন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। উভয়কাব্যের মধ্যে যে কেবল রচনাগত মিলই আছে তাহা নয়, উভয়ের মধ্যে গঠনগত সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়।[৫৯]

কাব্যটির আরম্ভ 'কংসের কারণে এ সৃষ্টির বিনাশে' অর্থাৎ কংস সৃষ্টি হননকারী। তাই তাকে বধ করার জন্য কৃষ্ণের আবির্ভাব। অর্থাৎ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। পরবর্তীকালে দেখা যায়, যাত্রাগানে যুগ পরম্পরায় ঐ একই আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যটির কাহিনি এগিয়েছে সংলাপের মাধ্যমে। যাত্রা চরিত্রের নৃত্যগীতাত্মক রূপটির আভাস *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* দেখা যায়। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৫-২০০৩) এ সিদ্ধান্তের সমর্থনে জানিয়েছেন :

> তবে মনে হয়, বেশধারী যাত্রা চরিত্রের ঈষৎ পূর্বাভাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মিলবে, এতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে নৃত্যগীতাত্মক লোকনাট্যের পূর্বরূপ ফুটে উঠেছিল এরকম অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নয়।[৬০]

এই নাট্যকলার আরম্ভ বৈচিত্র্যময় :

> খনে করতাল খনে বাজাএ মৃদঙ্গ।
> তা দেখি রাধিকার সখিগণে রঙ্গ।।৩।।
> আর যতবাদ্যগণ আছেন কাহ্নাঞি
> পতিদিনে নানা ছন্দে বাএ সেই ঠাই।।৪।।[৬১]

অর্থাৎ তখন করতাল-মৃদঙ্গ বাজিয়ে অভিনয় আরম্ভ হতো। বর্তমান সময়ের যাত্রার কনসার্ট বাজার মতই এর সূচনা হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, যমুনার ঘাটে খোলা আকাশের নিচে বাদ্য সহকারে এই অভিনয় রীতির মধ্যে পরবর্তীকালের যাত্রাগানের বীজ নিহিত রয়েছে।

চরিত্র নির্মাণে এ কাব্যটি পরবর্তীকালের কৃষ্ণযাত্রাকে প্রভাবিত করেছে, বিশেষভাবে বড়ায়ি চরিত্রটি। রাধা-কৃষ্ণের চরিত্র যেমন দেবত্ব অতিক্রম করে পল্লির দুই মিলনোন্মুখ নর-নারীর চিত্র, বড়ায়ি চরিত্রটি ও তেমনি লোকায়ত ও মানবিক:

> শ্বেত চামর সম কেশে।
> কপাল ভাঙ্গিল দুঈ পাশে।।
> ভ্রূহি চুন রেখ যেহ্ন দেখি।

---

[৫৮] *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* -পুঁথিটি বসন্তরঞ্জন রায় ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে (১৩১৬ বঙ্গাব্দে) বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে আবিষ্কার করেন। পরে ১৯১৩ সালে এটি প্রকাশিত হয়

[৫৯] অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চদশ সং অক্টোবর-২০১৪, পৃ.

[৬০] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৯

[৬১] অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চদশ সং অক্টোবর-২০১৪, পৃ.

কোটর বাটুল দুঈ আখি।[৬২]

এই বর্ণনায় অভিনয়-উপযোগী উপাদান দৃশ্যমান হয়। পরবর্তীকালে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু (চৈতন্যযুগে) এই রকম সজ্জায় 'বড়ায়ি'র চরিত্র প্রদর্শন করেছেন।[৬৩] শুধু তাই নয়, আঠারো-উনিশ শতকের কৃষ্ণযাত্রায় 'বড়ায়ি'র মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এ প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন:

> এই বড়ায়ি বুড়ির আদর্শ পরবর্তীকালেও যাত্রা-পাঁচালিতে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ...১৮শ-১৯শ শতাব্দীতেও কৃষ্ণযাত্রায় বড়াই চরিত্র না থাকলে চলিত না।[৬৪]

এছাড়া আধুনিক নাট্যের কমিক রিলিফ (Comic Relief) এর দেখা মেলে নারদ চরিত্রের হাস্যরসের মাধ্যমে। মৃত্যু পরোয়ানা কংসের কাছে ঘোষণা করার পূর্বেও তার আচার-আচরণে ছিল খুশির মেজাজ। সেই আচরণের প্রতিফলন:

> নানা পরকার করে অঙ্গভঙ্গ।
> তাক দেখি সব লোকের রঙ্গ।।২।।[৬৫]

সুকুমার সেন এই চারিত্রিক রূপ দেখে মন্তব্য করেন:

> কাব্যের গোড়াতে নারদ কংসকে কৃষ্ণ অবতারের ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছে। নারদের মনে খুব স্ফূর্তি। সে যেন যাত্রার আসরে সঙ সাজিয়াছে।[৬৬]

সুতরাং যাত্রার আসরের আদল *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*এ দৃশ্যমান। এই লোকনাট্যের ভঙ্গিটিই যাত্রার আদিরূপ। পরবর্তীকালের কৃষ্ণযাত্রার পালাগুলিতে এই রকম লোকনাট্যের প্রবহমানতা লক্ষ্যণীয়। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারী যাত্রাগানে মান-মাথুর কলঙ্ক-ভঞ্জনের সঙ্গে 'নৌকাবিলাস' গান করিতেন। গোবিন্দের যাত্রার দলে চল্‌তি দেখিয়া হুগলী শ্রীরামপুরের রাধাকৃষ্ণ দাস যাত্রার দল করেন। তিনি 'দানখণ্ড' পালা গাহিতেন। ইহা প্রায় একশত বৎসর পূর্বের কথা।[৬৭]

---

[৬২] অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, জন্মখণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চদশ সং অক্টোবর-২০১৪, পৃ. ২০৪

[৬৩] অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়, সামাজিক চালচিত্রে যাত্রাগান, ভারবি, কলকাতা, প্র. প্র. ১৯৯৮, পৃ. ২৪

[৬৪] ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, প্র. প্র ১৯৭৩, পৃ. ৩৩৪

[৬৫] অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চদশ সং অক্টোবর-২০১৪, পৃ. ২০০

[৬৬] সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা*, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২৫, উদ্ধৃত. অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়, সামাজিক চালচিত্রে যাত্রাগান, ভারবি, কলকাতা, প্র. প্র. ১৯৯৮, পৃ. ২৪

[৬৭] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *পদাবলী পরিচয়*, উদ্ধৃত. অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়, সামাজিক চালচিত্রে যাত্রাগান, ভারবি, কলকাতা, প্র. প্র. ১৯৯৮, পৃ.২৪-২৫

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এ কিছু কিছু ছুট ঝুমুর থাকার জন্যে অনেকে কাব্যখানির সঙ্গে ঝুমুরের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন-

> কালীয়দমন যাত্রার সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মাথুর পালার একটি ঝুমুর গাহিতেন–
>
> (আরম্ভ মাঘ মাস হইতে)
>
> ওরে নিহুর কালিয়া দুখ দিলিরে -(ধুয়া)
>
> মাঘে মাধব কৈলা মথুরাগমন
>
> পিয়া বিনে শূন্য দেখি এ তিন ভুবন।
>
> নীলকণ্ঠের মধুমাখা কণ্ঠে এই গান শুনিয়া পশুপাখিও কাঁদিত।[৬৮]

অর্থাৎ ঝুমুরের প্রয়োগ যাত্রাকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছিল। তাই বলা হয়, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ ঝুমুরের ব্যবহার যদি থেকে থাকে, তাও পরবর্তী যাত্রাগানকে প্রভাবিত করেছিল।

অনেক সমালোচকই কাব্যটির অভিনয়রীতি বা গঠনগত রূপটির মধ্যে *গীতগোবিন্দের* প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছেন। সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন – 'সেখানে (গীতগোবিন্দ) নাটের চেয়ে গীতেরই প্রধান্য।' এবং *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* সম্পর্কে তাঁর অভিমত – 'সেখানে গীতকে ছাপিয়ে নাট বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যথার্থই গীতি নাটকাব্য।'[৬৯] পরবর্তী সময়ে এই দুই আখ্যানকাব্যের অভিনয়রীতির সাদৃশ্য উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেন: জয়দেবের পদাবলী আর বড়ু চণ্ডীদাসের নাট্যকাব্য এক ভাবেই নৃত্য-(র) গীতাভিনীত হতো বলে মনে করি।[৭০]এই সঙ্গীত-নাটক গুণ সমন্বিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের বিবর্তিত রূপ কৃষ্ণযাত্রা। এ সম্বন্ধে ক্ষেত্র গুপ্ত লিখেছেন:

> Krishna Jatras with song as dialogue and three characters were most common, even before the chaitanya movement, 'Sri Krishna kirtan' of Badu Chandidas written before chaitanya or at least before Chaitanya influence spreaded, will bear strong testimony to this assumption, This 'Old Jatra' or 'Nata Giti' is one many such books. Many others were not preserved as they were scripts used for production only and were not regular manuscripts. [71]

নাট্যগবেষক মণীন্দ্রলাল কুন্ডুর ভাষ্যও একই সুরে বাঁধা:

> ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দের পর চিত্রপট অঙ্কন করে শঙ্করদেব নাচগান সহযোগে যে 'ভাওনা' করেছিলেন তার নাম ছিল 'চিহ্নযাত্রা'। এ-থেকে মনে হয়, 'যাত্রা' শব্দটি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই পূর্বাঞ্চলে নাটকের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হতে থাকে।

---

[৬৮] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *পদাবলী পরিচয়*, উদ্ধৃত. অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়, সামাজিক চালচিত্রে যাত্রাগান, ভারবি, কলকাতা, প্র. প্র. ১৯৯৮, পৃ. ২৫

[৬৯] সুকুমার সেন, বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ, পৃ.৭৪, উদ্ধৃত. অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়, *সামাজিক চালচিত্রে যাত্রাগান*, ভারবি, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ৩০

[৭০] সুকুমার সেন, বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ, রূপা, পৃ. ৮২

[৭১] Dr. Kshetra Gupta, *Lokasanskriti Gabeshna patrika*, vol: V, 1990. অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়, *সামাজিক চালচিত্রে যাত্রাগান*, পৃ. ২৫

শঙ্করদেব অবশ্য নাট, নাটক ও যাত্রার মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখেন নি। তবুও যাত্রার বৈশিষ্ট্য থেকে তাঁর নাটপালাগুলি বঞ্চিত ছিল না।[৭২]

গবেষক হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য (জন্ম ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) জানিয়েছেন :

জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অভিনয় লীলা ইত্যাদির সাক্ষ্যে যাত্রাগানকে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী বা তার পূর্ববর্তীকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাঙালীর নাট্যরসপিপাসা নিবৃত্তির অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।[৭৩]

অধ্যাপক সুশান্ত সরকার মনে করেন:

প্রাচীনকালে লৌকিক দেবতাদের সন্তুষ্ট করার মানসে, তাঁদের কৃপা লাভ কল্পে, নৃত্যগীতাদিসহ অভিনয় কলার ভিতর দিয়ে যেসব স্তুতি-স্তব, গাঁথা বর্ণিত হতো এবং এই প্রত্যাশায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গায়ক-বাদক-নর্তক দল যাত্রা করতো, এখান থেকেই যাত্রার উদ্ভব।[৭৪]

বস্তুত খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতকে নব্যভারতীয় আর্য ভাষার তথা দেশজ লৌকিক ভাষার প্রসারের ফলে, যাত্রানামক এই লোকনাট্য ধারার প্রসার ঘটতে থাকে। নৃত্যগীতবহুল যাত্রা অভিনয়শিল্পধারা জনচিত্তে আসন করে নেয়। যুগ প্রভাবে তাকে নাটগীত বলে আখ্যায়িত করা হলেও, এ যুগে তাই যাত্রাগান তথা যাত্রা।[৭৫]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের (১৫০০) রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস নিজে যাত্রা করতেন। কথিত আছে যাত্রা চলার সময়ে মণ্ডপ ভেঙে পড়ে তার মৃত্যু হয়।[৭৬] মৃত্যুর ঘটনাটি জনশ্রুতি হয়ে থাকতে পারে যার প্রমাণ নেই। বিশেষত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা ও রচনাকাল নিয়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত রয়েছে। কোন চণ্ডীদাস এর রচয়িতা তা নির্ণয় করা নিশ্ছিদ্র প্রমাণে সমর্থিত ও নির্ণিত নয়। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পালাটির বিপুল জনপ্রিয়তা এর অন্যরকম পরিবেশনার সম্ভাবনাও তৈরি করে। সেসব পরিবেশনা কথকতা, গান, পাঁচালির আঙ্গিকে হওয়াও অসম্ভব নয়। প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত যাত্রার সঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাসের জনশ্রুতি কতটা পরের কালের কল্পনা বা কোনো পালাকারের উদ্ভাবন তা বলা শক্ত। এ ছাড়াও চণ্ডীদাসের ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনির সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের আখ্যানের সাযুজ্যসহ তার অপঘাত মৃত্যুকে মহিমান্বিত করার প্রয়াস হতে পারে। তবে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* কাহিনি অত্যন্ত আকর্ষক, জনমনোহর এবং

---

[৭২] মণীন্দ্রলাল কুণ্ডু, *বাঙালির নাট্যচেতনার ক্রমবিকাশ*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১৬

[৭৩] হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, যাত্রা : কৃষ্ণকমল গোস্বামী, সনৎকুমার মিত্র (সম্পাদিত), যাত্রা বিশেষ সংখ্যা, ৭ বর্ষ, ২ সংখ্যা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, পৃ. ১৭৮

[৭৪] সুশান্ত সরকার, যাত্রা-সংস্কৃতি রূপান্তর(প্রবন্ধ), *যাত্রা উৎসব স্মরণিকা*, ১৯৭৬, পৃ. ১৭

[৭৫] সুশান্ত সরকার ও ড. নাজমুল আহসান (সম্পাদনা), *যাত্রা : উদ্ভব ও বিকাশ*, যাত্রা : সেকাল একালের বিশ্লেষাত্মক বিবেচনা, লোসাউক, খুলনা, প্র. প্র.১৯৯৪, পৃ.

[৭৬] তপন বাগচী, *বাংলাদেশের যাত্রাগান জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১২

সর্বসাধারণে প্রচলিত ছিল। সমস্ত বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও পূর্ণাঙ্গ রচনা হিসেবে এর তাৎপর্যও যথেষ্ট ছিল।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলা যাত্রার উন্মেষকাল হিসেবে কোনভাবেই প্রাচীনকাল বা দ্বাদশ শতাব্দীর সময়কালকে গ্রহণ করা যায় না। তথ্য প্রমাণের অনুপস্থিতি এই মতকে নিছক অনুমানে পর্যবসিত করেছে। অন্যান্য ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে যাত্রা আঙ্গিকের অস্তিত্ব থাকতেও পারে কিন্তু বাংলা ভাষার জন্ম যেহেতু আরও পরের ঘটনা (৭ম থেকে ১২শ শতাব্দী), তাই বাংলা যাত্রার উন্মেষের ক্ষেত্রে এই সময়কালকে গ্রহণ করা চলে না।

১.৫.২ ষোড়শ শতকে যাত্রার উদ্ভব সম্পর্কে মত

প্রাচীনকাল থেকে উৎসব অর্থে যাত্রার প্রচলন ছিল; কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় থেকে অভিনয় হিসেবে যাত্রার আবির্ভাবের অন্তত একটি তথ্য পাওয়া যায়; গবেষকগণ তাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। নবদ্বীপে জন্ম নিয়ে বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণ করে ও ঈশ্বর পূরীর শিষ্যত্ব নিয়ে চৈতন্যদেব তার ধর্মান্দোলনের সূত্রপাত করেন। এর মাধ্যমে মানবের জয়গান গেয়ে মানুষকে তিনি কাছে টেনে নেন। অবশ্য তাঁর আগে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিরা কিছুটা হলেও এই ক্ষেত্র তৈরি করেন। যার প্রমাণ মধ্যযুগের রচিত সাহিত্যে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ –– 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' চৈতন্যদেবের এই ধর্মান্দোলন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণও বটে। তিনি বাঙালির আত্মসম্মানকে নতুনভাবে চিনতে শিখিয়েছেন। সুকুমার সেন বলেছেন–

> ধর্ম মানে মানুষের সর্বাত্মক প্রকর্ষ। ধর্ম শুধু আধ্যাত্মিক উন্নতি আনে না। সেই সঙ্গে আনে তার চিত্তেরও উন্নতি অর্থাৎ সাংস্কৃতিক উন্নতি যাকে ইংরেজিতে বলে 'কালচারাল প্রগেস'। চৈতন্যের ধর্ম থেকে আমরা আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক স্পিরিচুয়াল ও কালচারাল অভ্রান্ত নির্দেশ পেয়ে এসেছি।[৭৭]

এই মত অনুসারে চৈতন্যদেব অনুভব করেছিলেন অভিনয়ের মাধ্যমে নিজস্ব দর্শন খুব সহজেই সবার সামনে তুলে ধরা সম্ভব। এমন মনোভাব নিয়েই তিনি নাটগীতের আসরে নামেন –– জনসমাজের চেতনাকে জাগ্রত করার চেষ্টা করেন; ভক্তি-রসের আবেগে তিনি সর্বস্তরের জনসাধারণকে সিঞ্চিত করতে চেষ্টা করেন। চৈতন্যদেবের প্রতিবাদের অস্ত্র ছিল ভাবৈশ্বর্য, মানসিক ঐক্য এবং সংঘশক্তি। এই সংঘ শক্তিকেই জাগরুক করতে চৈতন্যদেবের যাত্রায় অংশগ্রহণ। এভাবেই তিনি অচল সমাজের বুকে নতুন ভাব ও ভাবনার জাগরণ আনেন। মধ্যযুগের চরিত-সাহিত্য এ তথ্যটির যোগান দেয়। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ইতিহাস রচয়িতা এই যাত্রা পরিবেশনায় চৈতন্যদেবের

---

[৭৭] সুকুমার সেন, *চৈতন্যাবদান*, ১ম খণ্ড, দেশ পত্রিকা ৭/৯/১৯৮৫, উদ্ধৃত. অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়, *সামাজিক চালচিত্রে যাত্রাগান*, ভারবি, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ৩০

অংশগ্রহণকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে গ্রহণ করেন। বিশেষ করে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* দানখণ্ডের কাহিনি নৃত্যগীতের সাথে জনসাধারণ্যে প্রচারিত ছিল। তা একরকম গীতাভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল। এসবের গীতাভিনয়ে শ্রীচৈতন্যদেব নিজস্ব অভিনয়রীতি সৃষ্টি করেছিলেন এমন দাবি কেউ কেউ করেন। চারদিকে দর্শকবেষ্টিত কোলাহল আর মাঝখানে গীত, নৃত্য ও অভিনয়ের মাধ্যমে চৈতন্যদেব *রুক্মিণী-হরণ*, *ব্রজলীলা*, *রাবণবধ* পালা উপস্থাপন করতেন এমন সাক্ষ্য পাওয়া যায়। প্রকৃত অর্থে চৈতন্যদেবের অভিনয়ের কাল থেকেই উৎসব অর্থে কৃষ্ণজন্মযাত্রা শোভাযাত্রার জায়গা নিয়েছে। *চৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থের রচনাসাক্ষ্য :

> চারিমাস রহিলা সভে মহাপ্রভু সঙ্গে।
> জগন্নাথের নানা যাত্রা দেখে মহারঙ্গে ॥
> কৃষ্ণ জন্ম যাত্রা দিনে নন্দমহোৎসব।
> গোপবেশ হৈলা প্রভু লৈঞা ভক্তসব ॥[৭৮]

কারো কারো মতে, চৈতন্যযুগের কালপরিধিতে বিভিন্ন যুগের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যাত্রা শব্দের সঠিক অর্থে ব্যবহার অনেকটাই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে শ্রীচৈতন্যের (১৪৮৬-১৫৩৩) প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের বিস্তার ঘটে থাকতে পারে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে যাত্রা, শোভাযাত্রার খোলস থেকে মুক্ত হয় -- উৎসবকেন্দ্রিক পরিবেশনার বাইরে, আঙিনায় উঠে আসে। পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দের (১৯০৭-১৯৭৬) মন্তব্য:

> ...চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে শ্রীগৌরাঙ্গ যেদিন অদ্বৈত শ্রীরাম নিত্যানন্দ প্রভৃতি পারিষদদের নিয়ে 'রুক্মিণীহরণ' পালাভিনয় করেছিলেন, যাত্রার ইতিহাসে সে দিনটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সহজতম সাধনপদ্ধতির প্রবক্তা শ্রীগৌরাঙ্গের মতো বাংলার মাটির বৈশিষ্ট্যকে কে এমনভাবে চিনেছিল? তিনি অনুভব করেছিলেন, হাজার বক্তৃতা করে বাংলার মানুষকে যা বোঝানো যাবে না, একবার যাত্রাভিনয় করে তাই কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায়। উনিশ শতকের শেষপাদে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বাংলার রঙ্গমঞ্চকে ধন্য করে গিয়েছিলেন। তার সাড়ে চারশো বছর আগে ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ যাত্রা শিল্পকে কৃতার্থ করে রেখেছেন। যতদূর জানা যায়, গোরাচাঁদের এই অভিনয়েই এদেশে সুসংবদ্ধ পালাভিনয়ের সূচনা।[৭৯]

লক্ষ্য করা যায়, ঐতিহাসিক অর্থে এ সময় যাত্রা শব্দের অর্থ অভিনয়-প্রযুক্ত উৎসবে গিয়ে দাঁড়ায়। উৎসবের মাধ্যমে ধর্মীয় অনুষ্ঠান -- যার একদিকে ধর্মশিক্ষা অন্যদিকে বিনোদন। চৈতন্যদেব ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধের উৎকর্ষ

---

[৭৮] কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *চৈতন্যচরিতামৃত*, আদিলীলা, দশম পরিচ্ছেদ, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), আনন্দ, কলকাতা, প্র.সং ১৩৯২, নবম মুদ্রণ-১৪১৭, পৃ. ২৪৮

[৭৯] ব্রজেন্দ্রকুমার দে, *যাত্রার একাল সেকাল*, ইম্প্রেশন সিন্ডিকেট, কলকাতা, পৃ.৮২, উদ্ধৃত. তপন বাগচী, *বাংলাদেশের যাত্রাগান জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন-২০০৭, পৃ. ২৯

ও মহিমায় আগ্রহী ছিলেন। ফলে বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্য পাশাপাশি বিকশিত হয়। নবদ্বীপে ১৫০৯ খ্রিষ্টাব্দে চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়ির আঙিনায় কৃষ্ণলীলার আখ্যান ঘিরে *রুক্মিণী-হরণ* পালা অভিনীত হয়, এটি ঐতিহাসিক সত্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ (১৫৩০-১৬১৫) তা বর্ণনা করেছেন:

আচার্যরত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর
যাঁর ঘরে দৈবীভাবে নাচিলা ঈশ্বর ॥[৮০]

শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অদ্বৈত আচার্য, বড়ায়ের ভূমিকায় নিত্যানন্দ, নারদের ভূমিকায় শ্রীবাস অভিনয় করেন। আর রুক্মিণীর ভূমিকায় শ্রীচৈতন্য সেদিন অংশ নিয়েছিলেন – শাড়ি, হার, নূপুর এবং কৃত্রিম বেণীতে নিজেকে করেছিলেন সজ্জিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণনা করেছেন:

তবে আচার্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিনাদি রূপ প্রভু আপনি হইলা ॥[৮১]

চৈতন্য-চরিতামৃত ছাড়াও বৃন্দাবন দাসের (১৫০৭-১৫৭৯ সি.ই) *চৈতন্য ভাগবত (১৫৩৫ সি.ই)*, পরমানন্দ সেনের *শ্রীচৈতন্যোদয় এবং* লোচনদাসের *চৈতন্যমঙ্গল*-এ শ্রীচৈতন্যদেবের সপারিষদ কৃষ্ণলীলা অভিনয়ের বর্ণনা আছে। তা ছাড়াও শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে নবদ্বীপের জমিদার বুদ্ধিমন্ত খাঁ গ্রহণ করেন যাত্রার উদ্যোগ:

সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া
বলিলেন প্রভু 'কাচ সজ্জা কর গিয়া
শঙ্খ কাঁচুলি পাট-শাড়ি, অলংকার
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর গিয়া
সত্বরে চলহ বুদ্ধিমন্ত খান! তুমি।
কাচ সজ্জ কর গিয়া, নাচিবাঙ আমি ॥[৮২]

'কাচ' অর্থাৎ বেশসজ্জা, সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'কৃত্য'-শব্দজাত।[৮৩] সেকালে নটকৃত্যের জন্য যে সাজসজ্জার প্রয়োজন হতো, তাই 'কাঁচ' নামে অভিহিত। 'কাচ' সজ্জার অর্থ –– ভূমিকার অনুরূপ সাজসজ্জা গ্রহণ। যাত্রাদলের অধিকারীর মতো গৌরাঙ্গদেব অভিনেতার ভূমিকা বণ্টন করে দিতেন। এই অভিনয়-অসরে বা যাত্রাভিনয়ে দৃশ্যপট

[৮০] কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *চৈতন্যচরিতামৃত*, আদিলীলা, দশম পরিচ্ছেদ, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), আনন্দ, কলকাতা, প্র.সং ১৩৯২, নবম মুদ্রণ-১৪১৭, পৃ. ৬৩

[৮১] কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *চৈতন্যচরিতামৃত*, আদিলীলা, দশম পরিচ্ছেদ, সুকুমার সেন (সম্পাদিত), আনন্দ, কলকাতা, প্র.সং ১৩৯২, নবম মুদ্রণ-১৪১৭, পৃ.

[৮২] বৃন্দাবন দাস, *চৈতন্যভাগবত*, মধ্য খণ্ড, উদ্ধৃত. দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়, (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮,পৃ. ১২

[৮৩] উদ্ধৃত. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, চতুর্থ খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্র. সং. ১৯৭৩, পৃ.৪০৭

ও মঞ্চসজ্জা না থাকলেও চরিত্রদের সাজ-সজ্জা খুবই বাস্তবধর্মী হয়েছিল। এরূপ অভিনয়ের স্বীকৃতি মেলে লোচনদাসের *চৈতন্যমঙ্গল* (প্র.১৫৬০) কাব্যেও :

হৃদয়ে কাঁচুলি পরে শঙ্খ কঙ্কন করে,
দুটি আঁখি রসে ডুবু ডুবু।
পট্টবসন পরে, নূপুর চরণ তলে,
মুঠে পাই ক্ষীণ মাঝখানি।
রূপে ত্রিজগত মোহে, উপমা বা দিব কাহে
গোপীবেশে ঠাকুর আপনি ॥[৮৪]

বৃন্দাবনদাস অভিনয়ে একাত্ম শ্রীচৈতন্যের রূপ বর্ণনা করেন এভাবে :

আপনা না জানে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে।
বিদর্ভের সুতা হেন আপনার বাসে॥
নয়নের জলে পত্র লিখিলা আপনে।
পৃথিবী হইল পত্র, অঙ্গুলি কলমে ॥[৮৫]

মথুরা উপকণ্ঠে রুক্মিণীর নৃত্য-গীত পরিবেশিত হয় নাট্যের দৃশ্যকল্পনায় :

জগতজননীভাবে নাচে বিশ্বম্ভর।
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর ॥[৮৬]

এই ঐতিহাসিক পরিবেশনার কারণে যাত্রা-গবেষকদের বেশির ভাগই ষোড়শ শতাব্দীকে যাত্রার উন্মেষকাল হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। সুশীলকুমার দে (১৮৯০-১৯৬৮) উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে যাত্রার জন্মকাল সন্ধানেও প্রবৃত্ত হয়েছেন। যাত্রার জন্ম বৈষ্ণব যুগে হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। *Bengali Literature In The Nineteenth Century (1757-1857)* গ্রন্থে তাঁর অভিমত এই যে,

> The earliest reference to the Yatra probably dates from the Baisnab era. But Baisnabism, if it humanised literature to a certain extent, hardly ever secularised it. … The influence of Baisnabism, therefore, was hardly favourable to the development of the inherent dramatic elements in the Yatra; on the other hand, it cherished its musical peculiarities, developed its melodramatic tendency, and emphasised its religious

---

[৮৪] লোচন দাস, *চৈতন্যমঙ্গল*, মধ্য খণ্ড, উদ্ধৃত. দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়, (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ. ১২

[৮৫] বৃন্দাবন দাস, *চৈতন্যভাগবত*, মধ্য খণ্ড, উদ্ধৃত. দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়, (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ. ১২

[৮৬] পূর্বোক্ত

predilections. Indeed, we find the Baisnabas utilising the popular Yatra as a means of representing Krsna-lila and diffusing its novel ideas.[৮৭]

ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব আন্দোলনের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার বিকাশ ঘটতে থাকে। শ্রীচৈতন্য ও অন্যান্য বৈষ্ণব ধর্মগুরুরা প্রচারের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিলেন যাত্রাকে। বৈষ্ণব আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের জন্য শিল্প ও নৃত্য গবেষক কপিলা বাৎসায়ন (জন্ম ১৯২৮) আদি কৃষ্ণযাত্রা থেকে যাত্রার উদ্ভব বলে মনে করেন। তাঁর মতে:

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে চৈতন্যের একই বৈষ্ণব আন্দোলন থেকে দুটি স্রোতধারার উদ্ভব হয়। এর একটি হলো কীর্তন-গান, অন্যটি হলো কৃষ্ণ অথবা রাধা-কৃষ্ণের কাহিনীকে ঘিরে রচিত নাট্যাভিনয়সমূহ। পরে মনিপুরও এই দুটি শিল্পরূপকে গ্রহণ করে। এইভাবে আমরা দুটি অঞ্চলেই কীর্তন-সংগীতের সুস্পষ্ট এক ঐতিহ্যকে পাই আর পাই যাত্রাভিনয়কে।[৮৮]

কপিলা বাৎসায়ন ও সুশীলকুমার দে একে সংস্কৃত নাটকের সমসাময়িক লোকনাট্যের আঙ্গিক বলে চিহ্নিত করেছেন। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণও প্রায় একই মত পোষণ করেন:

বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের সময় হইতেই বোধহয় বর্তমান যাত্রার আবির্ভাব। বৈষ্ণবশাস্ত্র পাঠে বেশ বোঝা যায়, শ্রীচৈতন্যই সংকীর্তন ও কৃষ্ণবিষয়ক যাত্রাভিনয় বিশেষভাবে প্রচার করেন। ইহার পূর্বেও বাঙলায় যাত্রাভিনয় ছিল, কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদে যাত্রার আসরে নামিয়া অভিনয় ব্যাপারের প্রবর্তক মহাপ্রভু।[৮৯]

তবে শৈব-শাক্ত এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও যাত্রাকে লোকআঙ্গিকরূপে ব্যবহার করেছেন যদিও তা বৈষ্ণবদের মতো এতটা সার্থক ও ব্যাপকভাবে হয়নি। নাট্যব্যক্তিত্ব অহীন্দ্র চৌধুরী (১৮৯৫-১৯৭৪) পঞ্চদশ শতকেই যাত্রার জন্ম হয়েছে বলে ধারণা করেন। তাঁর মতে,

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আমাদের দেশের লোকেরা এই প্রকারের ভক্তিমূলক আমোদ-প্রমোদে উল্লসিত হোত। তারপরেই সংস্কৃত নাটকের ঐতিহ্য এবং প্রভাব অনুভূত হতে লাগল এবং যাত্রাও নতুনভাবে রূপায়িত হতে লাগল। প্রবেশ বহিরাগমন দুই অঙ্কের মধ্যবর্তী বিরতি, সাজসজ্জা এবং আরও নানাপ্রকার শিল্পসংক্রান্ত ও খুটিনাটি বিষয় ক্রমশ এতে সন্নিবেশিত হল। গদ্যে উপযুক্ত সংলাপের অভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলো গান দিয়ে রচিত হোত।[৯০]

আশুতোষ ভট্টাচার্য যাত্রার উদ্ভব সম্পর্কে মনে করেন:

সূর্যের নব নব যাত্রা উপলক্ষে এই সকল উৎসবের অনুষ্ঠান হইত বলিয়া কালক্রমে দেবতাবিষয়ক যে কোন উৎসবকে যাত্রা বলিত। ইহার সঙ্গে অন্য কোন দেবতাকে লইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাত্রা কিংবা 'মিছিল করে যাওয়া'র কোন

---

[৮৭] Susil Kumar De, *Bengali Literature In The Nineteenth Century* (1757-1857), Firma K.L. MUKHOPADHAYAY, Calcutta, Second Edition 1952, Page 407-408

[৮৮] কপিলা বাৎসায়ন, *ভারতের নাট্য-ঐতিহ্য*, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, পৃ. ১৬৫

[৮৯] অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, *বাঙলার প্রথম*, যাত্রা, সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ ১৯৮০,কলকাতা, পৃ. ১১৬

[৯০] অহীন্দ্র চৌধুরী, 'যাত্রা', *বাঙালীর নাট্যচর্চা*, শংকর প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭২, পৃ. ৭৭

> সম্পর্ক নাই। কালক্রমে বাংলাদেশের উপর যখন বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক প্রভাব বিস্তৃত হইল, তখন কৃষ্ণবিষয়ক উৎসবাদিই এই দেশে প্রাধান্য লাভ করিল; এই কৃষ্ণউৎসবসমূহ কৃষ্ণযাত্রা নামে পরিচিত হইল।[৯১]

প্রভাতকুমার গোস্বামী যাত্রা ও থিয়েটারের একটা তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রায় অভিন্ন সুরে যাত্রার উন্মেষকাল চিহ্নিত করেছেন পাশাপাশি বিকাশের প্রসঙ্গও নির্দেশ করেছেন:

> ষোড়শ শতাব্দীতে যাত্রার বীজ বাংলার মাটিতে উপ্ত হয়েছিল; তা অষ্টাদশ শতাব্দীতে অঙ্কুরিত হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীতে তা নানা শাখাপ্রশাখা সমন্বিত বৃক্ষে পরিণত হয়। 'যাত্রার' জন্মটা আগে হলেও তার বিকাশটা ঘটেছে থিয়েটারের পাশাপাশি।[৯২]

নাট্য গবেষক সৈয়দ জামিল আহমেদ (জ.১৯৫৫) 'The Evolution of the Performance space of Jatra' প্রবন্ধে জানিয়েছেন :

> In its nearly five- century-long history, *Jatra* has evolved from a simple devotional performance held in the open courtyards of homesteads to elaborate commercial ventures of itinerant professional troupes given in temporarily constructed performance space.[৯৩]

আধুনিক যুগে যাত্রা নিয়ে ব্যাপক নিরীক্ষা করেছেন পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে। পঞ্চাশ দশকের শুরুতে তিনি যাত্রা সম্পর্কে কিছু প্রবন্ধ লেখেন। এ সমস্ত প্রবন্ধে যাত্রার অতীত অবস্থা উদ্ধারের পাশাপাশি বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন তিনি। তাঁর মতে, যাত্রার জন্ম শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী সময়ে। 'যাত্রার পূর্বকথা' নামক প্রবন্ধে তিনি তাঁর এ বিষয়ক অভিমত জানিয়েছেন :

> ... ঠিক কোন্ সময়ে যাত্রার সূচনা হয়েছিল, এই আত্মভোলা জাত সে ইতিহাস রাখেনি। তবে সে যে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মের বহু পূর্বের, তাতে সন্দেহ নেই। দেবদেবীর প্রতিমা নিয়ে রাজপথে যে শোভাযাত্রা বেরুত, তার মধ্যে বিভিন্ন কণ্ঠের গান ও বিভিন্ন ব্যক্তির নাচের অনুষ্ঠান হত। এই শোভাযাত্রাই একসময় পথ থেকে উঠে এল মাঠে, বাগানে ও ধনীর প্রাঙ্গণে। শোভাযাত্রা তখন যাত্রায় নামান্তরিত হল। ক্রমে বিচ্ছিন্ন নাচগান দানা বাঁধল এবং এক একটি পৌরাণিক কাহিনী আশ্রয় করে পালায় গ্রথিত হলো; গ্রন্থনার জন্য ততটুকুই গদ্য সংলাপ আমদানি করা হল। গীতপ্রধান এই পালাগুলো কয়েক শতাব্দী পরে গীতাভিনয় নামে পরিচিত হয়েছিল।[৯৪]

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাট্যগবেষক সুরেশচন্দ্র মৈত্র তাঁর *বাংলা নাটকে বিবর্তন* গ্রন্থে বাঙালির ঐতিহ্যময় নাট্য আঙ্গিকের পর্যালোচনা করেন। পাঁচালী, যাত্রা, ঢপকীর্তন, কবিগান, তর্জা, ঝুমুর, সঙ প্রভৃতি

---

[৯১] আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, মুখার্জী এন্ড কোং কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ জুন ২০০৯, পৃ.৪৭-৪৮

[৯২] প্রভাতকুমার গোস্বামী, 'ঐতিহাসিক নাটক ও ঐতিহাসিক যাত্রা', *দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ২৯৩

[৯৩] Syed Jamil Ahmed, The Evolution of the Performance space of Jatra, *Jatra OUR HERITAGE*, Bangladesh Shipakala Academy, June 2000, page 29

[৯৪] ব্রজেন্দ্রকুমার দে, *যাত্রার একাল সেকাল*, ইম্প্রেসন সিন্ডিকেট, কলকাতা, পৃ. ৮১-৮২। উদ্ধৃত. তপন বাগচী, *বাংলাদেশের যাত্রাগান জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন-২০০৭, পৃ. ১৫

নাট্যআঙ্গিকের আলোচনা করে যাত্রাগান ষোড়শ শতকেই জন্ম নিয়েছে বলে তিনি তাঁর মত ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে : 'আমাদের মতে ষোড়শ শতকেই যাত্রার উদ্ভব হয়েছিল; অষ্টাদশ শতকে যাত্রা সাধারণ প্রমোদকলায় রূপান্তরিত হয়েছিল।'[৯৫] মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮) শ্রীচৈতন্য জীবনী পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকে নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আচার্যের বাসভবনে শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং কৃষ্ণলীলা অভিনয়ে সপারিষদ অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি মনে করেন এ সময় থেকেই অভিনয়কলা হিসেবে যাত্রার আরম্ভ হয়েছে।[৯৬] প্রভাত কুমার দাসের মতে,

> এ ঘটনাটি ঐতিহাসিক সত্য যে, ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্মের উত্থানের সময় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্যোগে ধর্মপ্রচারের বাহন হিসেবে যে অভিনয় অনুষ্ঠান সর্বপ্রথমে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল, তাকে যাত্রাগান হিসেবে অভিহিত করা হলেও, তখনও পর্যন্ত এই বিশেষ অর্থে যাত্রা শব্দটির ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রেম ও ভক্তির উদ্বোধনের লক্ষ্যে, বহু বাধা-বিচ্ছিন্ন সমাজের মধ্যে ঐক্য ও সাম্যবোধের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই এই লোকমাধ্যমটি ব্যবহার করেছিলেন শ্রীচৈতন্য।[৯৭]

ষোড়শ শতাব্দীতে যাত্রার উদ্ভব বিষয়ে একমত হয়ে যাত্রানট সম্রাট অমলেন্দু বিশ্বাস (১৯২৫-১৯৮৭) জানান,

> কোনো কোনো গবেষকের মতে সূর্যের কক্ষান্তর গমন উপলক্ষে যে উৎসব উদযাপিত হত তার প্রধান অঙ্গ অভিনয় ছিল বলে অভিনয় অর্থে যাত্রা বোঝায়। আবার কারো অভিমত দেবদেবীর দর্শন উদ্দেশ্যে রঙ্গ, কৌতুক-নৃত্য-গীত সহযোগে গমনপূর্বক অভিনয় প্রদর্শনের মাধ্যমে দেবমন্দিরে পূজা অর্পণ এবং সার্বিক কর্মকাণ্ডের লক্ষ্যে যে উৎসব সে উৎসবই যাত্রা। উৎসব উপলক্ষে গমন করে নৃত্য-বাদ্য-গীতাভিনয় সহকারে দেবার্চনার যে ক্রিয়া তা কালক্রমে অভিনয় অর্থে যাত্রা বলে প্রচলিত সত্যে পরিণত হয়েছে। কারো কারো মতে রামায়ণ গান ও পাঁচালি থেকে যাত্রার উৎপত্তি।... ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য স্বয়ং কৃষ্ণলীলায় অভিনয় করেছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলায় পাওয়া যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ সেজেছিলেন অদ্বৈত আচার্য আর শ্রীরাধা ও রুক্মিনীর দ্বৈত ভূমিকায় রূপ দিয়েছিলেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্য।[৯৮]

বাংলাদেশের অভিনেতা কামালউদ্দিন নীলু (জন্ম ১৯৫৫) মধ্যযুগে যাত্রার উদ্ভব বলে মনে করেন :

> The most popular dramatic form in Bengal was 'Jatra' which originated in the medieval period. Origin of drama in Egypt or Greece was held in honour of gods, the same event happened in case of 'Jatra' in Bengal which was on the pretext of 'Devpuja' (Worship of gods). During the performance of Jatra, physical movement were done with dance music. So 'Jatra', at that time was called 'Opera'.[৯৯]

---

[৯৫] সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *বাংলা নাটকের বিবর্তন*, *ক্যালকাটা বুক হাউস*, *কলিকাতা*, *পৃ.* ১২৯

[৯৬] মন্মথ রায়, লোকনাট্য, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ডঃ অজিতকুমার ঘোষ (সম্পাদিত) *শতবর্ষে নাট্যশালা*, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, জুন ১৯৭৩, পৃ. ১৬

[৯৭] প্রভাত কুমার দাস, *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, যাত্রা বিশেষ সংখ্যা, ১১ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ১৯৯৯, পৃ. ৬১১

[৯৮] অমলেন্দু বিশ্বাস, *বাংলাদেশের যাত্রাশিল্প*, শ্রাবণ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২৯-৩০

[৯৯] Kamaluddin Nilu, Jatra : its Nature and Development , *Jatra OUR HERITAGE*, Bangladesh Shilpakala Academy, June 2000, page 59-60

শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত অভিনয়কলাই স্বতন্ত্র যাত্রামাধ্যম হিসেবে পরিণতি লাভ করে। সংগীত গবেষক করুণাময় গোস্বামীর (১৯৪৩-) মতে, 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দৃষ্টান্তেই যাত্রা রচিত হয়।'[১০০]

সপ্তদশ শতাব্দীর কীর্তনগান থেকে যাত্রার উন্মেষ ঘটেছে বলে মাসুদা এম রশিদ মনে করেন। তাঁর মতে :

> Various cultural thinkers believe that with the emergence of the Kirton songs during the 17th century, the Jatra came into being, as the Kirtan songs took the form of Jatra songs.[১০১]

নাট্যকার ও অভিনেতা মমতাজউদ্দিন আহমেদ (জন্ম ১৯৩৫) তাঁর 'Practice of Jatra in Bangladesh : The Crisis and Development' নিবন্ধে বলেন,

> Open air opera has been popular in our country for a long time. This treatise is not meant for a detailed study. Some experts are inclined to go beyond the Vedic Age to seek the roots of this kind of open-air opera. [102]

নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখ (জন্ম ১৯২৫-২০০৯) জানিয়েছেন:

> যাত্রাগান পরিবর্তনশীল লোক-নাট্যের নানারূপেরই একটি রূপ। কিন্তু এ সম্পর্কে মতান্তরের অভাব নেই। কারও কারও মতে খৃষ্ট-জন্মের আগে থেকেই ভারতে নাকি কৃষ্ণ-বিজয় নিয়ে যাত্রা রচিত হত। তারই ধারা জয়দেবের মাধ্যমে মধ্যযুগের বাংলায় এসে পড়ে। বাংলাদেশের পাঁচালী-গান থেকেই যাত্রার উৎপত্তি, এ কথাও কেউ বলেন। তাঁদের মতে এর আগে যাত্রার অস্তিত্ব ছিল না। দুটি মত যে খুবই ভিন্ন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই সব বিভিন্নতার কারণ, বিচার বিশ্লেষণোপযোগী প্রচুর তথ্যের অভাব। অপ্রচুর তথ্য-ভিত্তিক আলোচনার ফাঁক অগত্যা ধারণা দিয়েই ভরে নিতে হবে।[১০৩]

চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে যাত্রাশিল্প বিকশিত হয়েছে এ সম্পর্কে আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি; বাংলার সামাজিক জীবনে চৈতন্যের অবদান অনস্বীকার্য হলেও যাত্রা শিল্পের বিকাশ তার মাধ্যমে হয়েছে এ মত গহণযোগ্য নয়। সামাজিক ইতিহাসের দলিল হিসেবে চৈতন্যদেবের পরিবেশনা সংক্রান্ত সংবাদটি নিঃসন্দেহে তাৎপর্য বহন করে। তাঁকে কেন্দ্র করে বাংলার ইতিহাস ও সামাজিক জীবনে বৈষ্ণব আন্দোলনের বিপুল বিস্তৃতি ঘটেছে এ কথা সত্য, কিন্তু যাত্রার বিকাশ তাঁর পৌরহীত্যে হয়েছে এ কথাটি অতিরঞ্জিত। হয়তো এই ঘটনাটিকে সত্যিতে পরিণত করেছে। বৈষ্ণব শাস্ত্রকাররা এক ধরনের ভক্তির প্রাবল্যে এই তথ্যটি প্রচার করে গেছেন। তাঁরা স্পষ্ট করে চৈতন্যদেবের জীবৎকালের একটি ঘটনাকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ১৫০৯ খ্রিষ্টাব্দে নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে 'রুক্মিনীহরণ' যাত্রাপালার অভিনয়ের বর্ণনাকে এর প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন তাঁরা।

---

[১০০] করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ জুন ২০০৪, পৃ. ৪৭৬

[১০১] Masuda M. Rashid Chowdhury, Jatra as a Cultural Identity, *Jatra OUR HERITAGE*, Bangladesh Shilpakala Academy, June 2000 page 19

[102] Momtazuddin Ahmed, Practice of Jatra in Bangladesh : the crisis and Development, *JATRA : OUR HERITAGE,* Bangladesh Shilpakala Academy, June 2000, page 78

[১০৩] আসকার ইবনে শাইখ, *বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎভূমি*, সাত রং প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬, পৃ. ১২৬

যেখানে অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস এবং চৈতন্য নিজে অভিনয়ে অংশ নেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনীগ্রন্থের লেখকগণ এ বিষয়ে সবিস্তারে ঐকমত্য পোষণ করেন। তাঁদের লেখায় সাজসজ্জার বর্ণনা থেকে যাত্রাদলের ভূমিকা বণ্টন অর্থাৎ অধিকারীর দায়িত্ব পালনও বর্ণিত আছে। কিন্তু এই যাত্রাভিনয়ের পরবর্তী সময়ে পুনরাবৃত্তি বা পুনঃপরিবেশনার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। এসময়ের পর যাত্রাশিল্পের পরিবেশনার নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত থাকার প্রমাণ মেলেনি। সুলতানি আমলে রামায়ণ-মহাভারত অনুবাদে পৃষ্ঠপোষকতা মিললেও যাত্রাঅনুষ্ঠান সংগঠনের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। চৈতন্যদেবের এই অভিনয়ের খ্যাতি বৈষ্ণব গ্রন্থগুলোতে বহুল প্রচলিত হতে দেখা যায়। তাতে কতটা ভক্তির প্রাবল্য কতটা বস্তুগত সত্য নিহিত আছে তা নির্ণয় করার মতো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তবে পরবর্তী দুশো বছরের অধিক সময় আর কোনো পরিবেশনা সংক্রান্ত তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অন্যদিকে *গীতগোবিন্দ* হতে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* আলোচনায় লোকজীবনে যে অভিনয় রীতির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় তাই পরবর্তীকালের যাত্রাগানের আদিরূপ কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। প্রাচীন কালে বাংলা যাত্রা উদ্ভবের ক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এছাড়া বাংলা ভাষার জন্মের পূর্বে কখনোই বাংলা যাত্রার উন্মেষ হতে পারেনা। আবার চৈতন্যদেবের কেবলমাত্র এক দিনের অভিনয়ে অংশগ্রহণের পরে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী এর দ্বিতীয় কোনো প্রমাণ মেলে না। ষোড়শ শতাব্দীকে যাত্রার সূচনা চিহ্নিত করা হলেও নিদর্শনগত অপ্রতুলতার দরুণ তা গ্রাহ্য হয় না। বরং আঠারো শতকের গোড়াতেই এর সূচনা ঘটেছে বলে ধরে নেওয়ার পক্ষেই পর্যাপ্ত যুক্তি রয়েছে।

১.৫.৩ আঠারো ও উনিশ শতকে যাত্রার উদ্ভব সম্পর্কে মত

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২৪-১৮৯১) ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে বাংলা যাত্রাগানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দেখান। তাঁর মতে:

> ... গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে কবির হ্রাস হইয়াছে। তাহার ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব হইতে যাত্রা বিশেষ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। শিশুরাম অধিকারী নামা এক ব্যাক্তি কেঁদেলীগ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণ তাহার গৌরব সম্পাদন করেন। তৎপূর্ব হইতে বহুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশ স্বরূপ এক প্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিদিত আছে। সঙ্কীর্তন ও পরে কবির প্রচারের মধ্যে তাহার প্রায়, লোপ হইয়াছিল। শিশুরাম হইতে তাহার পুনর্বিকাশ হয়। শিশুরামের পর শ্রীদাম সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিবর্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য হইয়াছে।[১০৪]

[১০৪] রাজেন্দ্রলাল মিত্র (সম্পাদিত), *বিবিধার্থ সংগ্রহ*, ১৭৮০ শকাব্দ, মাঘ, ৫৮ খণ্ড, পৃ. ২৩৫, উদ্ধৃত. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, চতুর্থ খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্র. সং. ১৯৭৩, পৃ. ৪৭১

তিনি মনে করেন যাত্রা হচ্ছে পূর্ব প্রচলিত সংস্কৃত নাটকের 'জঘন্য অপভ্রংশ স্বরূপ' । তাঁর এই বক্তব্য প্রকাশিত হয় ১৭৮০ শকাব্দে (১৮৫৯ সালে), এরও পঞ্চাশ বছর আগে (১৮০৯ সালে) অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথমপাদে তিনি বাংলা যাত্রার উন্মেষের তথ্য দেন।

সেলিম আল দীন (১৯৪৯-২০০৮) মধ্যযুগের বাংলা নাটক বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন। তাঁর মতে, 'অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে 'যাত্রা' কথাটার অর্থ সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই মূলত 'যাত্রা' নাট্যাদি অর্থে পরিচিতি লাভ করে।'[১০৫] 'পাঁচালী থেকে যাত্রার উদ্ভব' – সুকুমার সেনের এই অভিমতকে তিনি মানতে পারেননি। তাঁর মতে –

> যাত্রা নাট্য হিসেবে রূপলাভের পূর্বেই, যাত্রা-উৎসবে মধ্যযুগে, লীলানাটকের অভিনয় হতো। কৃষ্ণ জন্মযাত্রা বা জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষে লীলানাট্যের অভিনয় স্বয়ং চৈতন্যদেব দ্বারা সাধিত হয়েছিল। কিন্তু লীলানাট্য যে শুধু যাত্রা উপলক্ষেই অভিনীত হতো তা নয়। এর একটা আনুষ্ঠানিক রূপও ছিল। 'চৈতন্যভাগবতে' নিত্যানন্দের কৃষ্ণ ও রামলীলা বিষয়ক অভিনয় ছিল অনানুষ্ঠানিক, আচার্য চন্দ্রশেখরের গৃহ-প্রাঙ্গণে চৈতন্যদেবের নাট্যানুষ্ঠানও তিথি নক্ষত্র বা যাত্রা উপলক্ষে পরিবেশিত হয় নি। কাজেই একথা বলা যায় যে, লীলানাট্য আনুষ্ঠানিক শোভাগমন বা উৎসব উপলক্ষ ব্যতিরেকেও স্বতন্ত্রভাবে সেকালে অভিনীত হতো।[১০৬]

সেলিম আল দীনের মতে, আঠারো শতকের শেষে যাত্রার স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। চৈতন্যদেবের লীলানাটককে যাত্রার উৎস হিসেবে উল্লেখ করেছেন তিনি। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর যাত্রার সঙ্গীত নির্ভরতাকে সবিস্তারে বিশ্লেষণ করেন কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর যাত্রার উন্মেষের কোনো সুনির্দিষ্ট দালিলিক প্রমাণ দেননি। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর নাট্যচিন্তার বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে ধারণা করা যায়। ১৭৯৫ সালে হেরাসিম স্তেপানভিচ লেবেদেফ (১৭৪৯-১৮১৭) বাংলা নাটকের যাত্রা শুরু করেন, তার বিপরীতে বাংলা নাটকের ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো এমন মতের অনুসারী তিনি। ফলে লেবেদেফের নাটকের সময়কালে তিনি যাত্রার উন্মেষকে বিবেচনা করতে সচেষ্ট হন। বাংলাদেশে যাত্রা বিষয়ক প্রথম গ্রন্থপ্রণেতা মঈনউদ্দীন আহম্মদ (জন্ম ১৯৩৬) একই ধরনের মন্তব্য করেন:

> অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলার সমাজ জীবন দ্বিধা বিভক্তির যুগ। এই যুগে বাংলার গণমানসে একটা 'ভ্যাকুয়াম' সৃষ্টি হয়েছিল। এই সময় সেই শূন্যতা পূরণ করেছিল গ্রাম-বাংলার কয়েকটি মহৎসম্পদ – পাঁচালী, আখরাই, টপ্পা, কবি, বাউল, জারী ও শারীগান প্রভৃতির সংগে পালা বা যাত্রাগান।[১০৭]

---

[১০৫] সেলিম আল দীন, যাত্রার উদ্ভব বিষয়ে, *জাতীয় যাত্রা উৎসব স্মরণিকা ১৯৯৪-৯৫*

[১০৬] সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্র. প্র. জুন ১৯৯৬, পৃ. ১৮৭

[১০৭] মঈনউদ্দীন আহম্মদ, *যাত্রার যাত্রা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, প্র. প্র. অক্টোবর ১৯৮৫,পৃ. ৪

যাত্রা গবেষক তপন বাগচী (জন্ম ১৯৬৮) তাঁর *বাংলাদেশের যাত্রাগান : জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত* শীর্ষক পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ গ্রন্থে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়কাল থেকে যাত্রার উদ্ভব দেখিয়ে নিজস্ব মত প্রকাশ করেন। ১৮৬০ সালে কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০-১৮৮৮) *স্বপ্নবিলাস* ও *দিব্যোন্মাদ* পালা রচনা করেন, পালা দুটি যথাক্রমে ১৮৭২ ও ১৮৭৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণকমলের যাত্রাপালাই যাত্রাসাহিত্যের প্রথম মুদ্রিত দলিল। তাই ১৮৬০ সালকেই তিনি 'যাত্রার আনুষ্ঠানিক অভিযাত্রার মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবে'[১০৮] বিবেচনা করেন। তিনি যাত্রার মুদ্রিত পাঠকেই তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে যাত্রা একটি বিশিষ্ট ফর্মে নিজস্ব ঢঙে বিষয়বস্তুকে পরিবেশন করে। বাংলা মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠার (১৭৭৮) অনেক আগেই যাত্রার পরিবেশনার তথ্য পাওয়া যায়। ছাপাখানা প্রচলনের জন্য যাত্রার উন্মেষ থেমে থাকেনি। অন্যান্য আধুনিক সাহিত্য আঙ্গিকের মতো যাত্রা ততটা লিখিত পাঠ্যনির্ভর পরিবেশনা নয় – যতটা Improvisation ও Oral literature-এর বৈশিষ্ট্য সম্বলিত। এর সঙ্গে অনেকটা মিল রয়েছে প্রাচীন কবিগানের আখড়াই, হাফ আখড়াই, তরজা, কবির লড়ায়ের সঙ্গে। দেশজ অভিনয় রীতিগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্যই এটি। যেকারণে যাত্রাভিনয় পরিবেশিত হবার সংবাদ পাওয়া গেলেও তাঁর লিখিত বা মুদ্রিত পালার অস্তিত্ব কমই পাওয়া যায়। ইউরোপীয় নাটকের তুলনায় বা পাশ্চাত্য নাট্যাঙ্গিকের তুলনায় যাত্রাপালার এটি একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। গবেষক প্রসেনিয়াম নাটকের সমান্তরালে যাত্রাকে বিবেচনা করতে গিয়ে মুদ্রিত যাত্রার ভ্রান্তিতে পড়েছেন।

১.৬ পর্যালোচনা

উল্লিখিত বক্তব্যের আলোকে, বাংলা যাত্রার উদ্ভবের নানামাত্রিক মতামত পাওয়া যায়। গান-সর্বস্ব 'নাটগীত'কে যাত্রাগানে আসরস্থ করলেন চৈতন্যদেব। চৈতন্যের যুগে অভিনয়-পরম্পরায় মৌখিক ঐতিহ্যে যাত্রার যে বিস্তার ঘটেছিল পরবর্তী সময়ে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যের পৌরাণিক ও লৌকিক কৃষ্ণ কাহিনি-কেন্দ্রিক অভিনয় লীলা ষোড়শ শতকে চর্চিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। সতের শতকেও এমন কোনো অভিনেয় নাটগীতির পরিচয় পাওয়া যায় না। আঠারো শতকে এসে প্রচলিত কৃষ্ণলীলাই বাংলা যাত্রাগানে অবলম্বিত হয়। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪-১৮৮৯) মতে, 'প্রায় দেড়শত বৎসর হইতে চলিল শ্রীদাম-সুবল নামে দুই সহোদর কালীয়দমন যাত্রা করিত'।[১০৯] ১৮৭২ সালের *বঙ্গদর্শনে*, তিনি যাত্রার উন্মেষের দেড়শ বছর অতিক্রান্ত হিসেবে ইতিহাস তুলে ধরেন এবং শ্রীদাম-সুদাম নামে দুই সহোদরের কালীয়দমন যাত্রা পরিবেশনার তথ্য দেন

[১০৮] তপন বাগচী, *বাংলাদেশের যাত্রাগান জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩১

[১০৯] সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যাত্রা ও যাত্রার ইতিবৃত্ত, বঙ্গদর্শন; ফাল্গুন; ১২৮৯, সম্পাদক : সনৎকুমার মিত্র, *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, ৭ বর্ষ ২ সংখ্যা, যাত্রা বিশেষ সংখ্যা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৯১

এবং ধারাবাহিকভাবে প্রেমচাঁদ-বদন অধিকারীর নাম উল্লেখ করেন। সঞ্জীবচন্দ্রের রচনায় {রচনাটির প্রকাশকাল ১২৮৯ (১৮৮১) থেকে ১৫০ বছর অতীতে} ১৭৩১ সালকে যাত্রার সূচনাকাল চিহ্নিত করা হয়েছে। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৯০-১৯৭৭) তাঁর *গৌড়বঙ্গ-সংস্কৃতি (১৯৭২)* গ্রন্থে প্রায় দু'শ বছর আগে (অর্থাৎ আঠারো শতকের মাঝামাঝি, ১৭৭২ সালে) প্রাচীন ঝুমুর ও কীর্তন মিলে যাত্রার সৃষ্টি হয় বলে মনে করেন।[১১০] রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তথ্যানুযায়ী মতে শিশুরাম অধিকারী যাত্রার উন্মেষের প্রথম ও প্রধান যাত্রাকার। একই বক্তব্য সমর্থন করেন হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত[১১১]। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গুরুপরম্পরা স্থির করেন এভাবে : শিশুরাম – শ্রীদাম ও সুবল – পরমানন্দ – বদন – গোবিন্দ – নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।[১১২] বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যাত্রার উন্মেষের দেড়শ বছরের ইতিহাস তুলে ধরেন এবং শ্রীদাম-সুদাম নামে দুই সহোদরের কালীয়দমন যাত্রার পরিবেশনার তথ্য দেন। ধারাবাহিকভাবে প্রেমচাঁদ-বদন অধিকারীর নাম উল্লেখ করেন। ১৮৭২ সালের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত সঞ্জীবচন্দ্রের তিনটি প্রবন্ধই (যাত্রা, যাত্রার ইতিবৃত্ত ও যাত্রার ইতিবৃত্ত) বাংলা যাত্রার প্রথম বিধিবদ্ধ ইতিহাস রচনার প্রয়াস। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতেও, শিশুরামের পর শ্রীদাম-সুবল কৃষ্ণযাত্রায় ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন। ফলে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় যাত্রাশিল্পের নিরবিচ্ছিন্ন বিকাশের চিত্র উঠে আসে। সঞ্জীবচন্দ্রের রচনার প্রকাশকাল ১২৮৯ (১৮৮১) থেকে ১৫০ বছর অতীতে অর্থাৎ ১৭৩১ সালকে যাত্রার সূচনাকাল চিহ্নিত করা হয়। তাঁর এই মতকে যুক্তিসংগতভাবে গ্রহণ করা যায়। প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ অনুযায়ী ১৭৩১ সালে যাত্রার উন্মেষ ঘটলেও ধারণা করা যায় যে এই শতকের শুরুর দিকেই যাত্রার সূচনা হওয়া সম্ভব। সেই সুবাদে আমরা আঠারো শতকের প্রথমপাদে বাংলা যাত্রার উন্মেষ ঘটেছে বলতে পারি।

বাংলা যাত্রার উদ্ভবের কাল প্রাচীন যুগ –– এই বিতর্কে প্রাচীনকালে যাত্রার অস্তিত্বের সঙ্গে বাংলা ভাষার উদ্ভবের সময়টি সাংঘর্ষিক। আবার ষোড়শ শতক থেকে চৈতন্যদেবের অভিনয়ে অংশ গ্রহণের কাহিনি তথ্য বিচ্ছিন্ন, একক দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত। তাই ষোড়শ শতক থেকে বাংলা যাত্রার উদ্ভব –– এমন মতও গ্রহণযোগ্য নয়। বরং বিধিবদ্ধ ইতিহাস রচনার মত নিদর্শন আঠারো শতকের গোড়া থেকে মেলে –– যার ক্ষেত্রে কোনো ছেদ ঘটেনি বলা যায়। আমাদের উদ্দিষ্ট বিবর্তন সন্ধানের জন্য ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা অনিবার্য প্রাকশর্ত। সে অনুসারে তথ্য প্রমাণ সাপেক্ষে শিশুরাম অধিকারীকে প্রথম বাংলা যাত্রাকার হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আঠারো ও উনিশ শতকের যাত্রার বিবর্তনমূলক ইতিহাসের সূচনা ওখান থেকেই।

---

[১১০] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ২১৩

[১১১] *Indian Stage*, vol -2, Metropolitan Printing & Publishing House, Ltd, Calcutta p.115

[১১২] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় , *গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ২১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা যাত্রার উন্মেষপর্ব : আঠারো ও উনিশ শতকের বাংলা যাত্রা (১৭০১-১৯০০)

২.১ অবতরণিকা

১৭১৭ সালে মুর্শিদকুলী খানের (১৬৬০-১৭২৭) বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে বাংলায় নবাবী আমলের সূচনা ঘটে। এ সুবাদার বা নবাবরা অনেকটা স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন এবং দিল্লীতে রাজস্ব পাঠাতেন। মোগল সম্রাটের সনদের বলে নবাবরা নিযুক্ত হতেন। ১৭২৭ সালে অপুত্রক মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর পরে তাঁর জামাতা শুজাউদ্দীন মহম্মদ খান ক্ষমতায় বসেন। শুজাউদ্দীনের অধীনে হাজী আহ্ম্মদ এবং আলীবর্দী খান (১৬৭১-১৭৫৬) দুই ভাই রাজস্ব বিভাগে কর্মচারী নিযুক্ত হন। পরে বিহার প্রদেশ বাংলার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং আলীবর্দী খানকে প্রথম বিহারের নায়েব-নাজিম করা হয়। ১৭৩৯ সালে শুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র সরফরাজ খান বাংলার নবাব হন। সরফরাজের ইন্দ্রিয়পরতার সুযোগ নিয়ে আলীবর্দী খান ও তার ভাই বাংলা আক্রমণ করেন এবং তাকে যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করেন। পরবর্তী সময়ে দিল্লীর বাদশাহ এবং সভাসদকে উৎকোচ দিয়ে আলীবর্দী সুবেদারী পদের বাদশাহী সনদ লাভ করেন। আলীবর্দীর শাসনকাল থেকে (১৯৪০-৫৬) সুবা বাংলার নতুন ইতিহাসের সূচনা।[১১৩] আলীবর্দীর মৃত্যুর পর তাঁর স্নেহভাজন দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা বাংলার মসনদের উত্তরাধিকারী হন এবং খুব দ্রুতই প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হন। ১৭৫৭ সালে এই অভ্যন্তরীণ কোন্দলের সুযোগ নিয়ে ইংরেজ বণিক কোম্পানি কৌশলে বাংলা দখল করে নেয়। ফলে বাংলা এবং পরে ভারতবর্ষ মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী শাসন থেকে ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী শাসন ও সংকটের মুখোমুখি হয়। ১৭৬৪ সালে আরম্ভ হয় সরাসরি কোম্পানির রাজত্ব, যার প্রত্যক্ষ ফল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩)। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা দিতে না পারায় বহু পুরোনো জমিদারি লাটে উঠে কিংবা নিলাম হয়ে যায়। কোম্পানির দৌরাত্মে নষ্ট হয় বাংলার বাণিজ্য ও শিল্প। শাসন-সংস্কারের যুগে নষ্ট হয় গ্রামীণ কাঠামো। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) বলেছেন –

> পাশ্চাত্ত্য প্রতিষ্ঠানগুলির ভাবধারায় নিজস্ব অফিসারদের হাতে সমস্ত বিচার বিভাগীয় ও কার্যনির্বাহী ক্ষমতা কেন্দ্রভূত করার চেষ্টা করেও সরকার সম্প্রদায়গুলির প্রাচীন ক্ষমতা কেড়ে নিলেন অথবা দুর্বল করলেন, তার ফলে গ্রাম সমাজগুলি শেষ পর্যন্ত ছিন্নমূল গাছের মতো ভেঙ্গে পড়ল।[১১৪]

---

[১১৩] রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যযুগ, কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রা. লি. পৃ. ১৬-১৪৯

[১১৪] রমেশচন্দ্র দত্ত, *ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, বঙ্গানুবাদ : তরুণ স্যানাল, পৃ. ৪০৪, উদ্ধৃত. অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়, সামাজিক চালচিত্রে যাত্রাগান, ভারবি, কলকাতা, প্র. প্র. ১৯৯৮, পৃ. ৪৫

পরিণামে প্রাণের দায়ে পেটের তাগিদে নগরের দিকে ছুটতে থাকে মানুষ। তাই একদিকে গ্রামীণ সমাজ ভেঙেছে -- আর একদিকে গড়ে উঠেছে ইংরেজ বাণিজ্য রসধারা পুষ্ট কলকাতাকেন্দ্রিক নাগরিক সমাজ। এই সময়ের সাহিত্য সংস্কৃতির পরিমণ্ডল তাই অনেকটাই অবরুদ্ধ থাকে। তবে লোকসাহিত্যের একটি ধারা হয়ে যাত্রাগান প্রমোদ মাধ্যম হিসেবে আনন্দ দিয়েছে। ভূদেব চৌধুরীর ভাষ্য মতে –

> এই বিচ্ছিন্নতা ও বিলুপ্তির পদ্ধতি যখন চলছে, তখনো মুমূর্ষু গ্রাম বাংলা তার শেষ কয়টি মহৎ সম্পদ দান করেছে বাংলার সাহিত্যকে -- বাউল, জারি ও সারি গান প্রভৃতির সঙ্গে স্পষ্ট বিকশিত 'যাত্রাগান' ও সেই সব উদ্ভূত লোক সাহিত্যের একটি ধারা।[১১৫]

আঠারো শতকের প্রথম পাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমি যাত্রার উন্মেষের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। এ শতকের সূচনায় নবাবী আমলে বাংলাদেশের সমাজে এক নতুন পর্বান্তর ঘটে। এ সময়ে প্রথাগত সাহিত্য আঙ্গিক বা মুদ্রিত সাহিত্যের বিকাশের পূর্বক্ষণে এক সময়োপযোগী শিল্পমাধ্যম হিসেবে যাত্রার পরিবেশনার সূচনা হয়।[১১৬]

২.২ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা যাত্রা

কালীয়দমন বা কৃষ্ণযাত্রা আঠারো শতকে সর্বাধিক পরিবেশিত যাত্রা। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের বর্ণনায় এ যাত্রার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা যায়:

> প্রাচীন যাত্রার পালায় ছিল কালিয়দমন অভিনয়। সকলেই জানে যে, কালিয়দমন বলিলে কৃষ্ণকর্তৃক যমুনায় কালিয় নাগের দমন বুঝায়। কিন্তু সেকালে তাহা বুঝাইত না। কৃষ্ণলীলার যাহা কিছু সব কালিয়দমনের অন্তর্ভূক্ত ছিল। কালিয়দমন বলতে বুঝাইত গোষ্ঠ, রাস, দোল, নৌকাবিহার, মান, মানভঙ্গ, কংসবধ, প্রভাস ইত্যাদি। ঐ সমস্ত যাত্রা অভিনয়ে মহড়া দিবার পর 'গৌরচন্দ্র' পাঠ হইত। লোকে বলিত 'গৌরচন্দ্রী পাঠ'।[১১৭]

কৃষ্ণযাত্রার মূল উপাদান হচ্ছে -- *ভাগবত* ও *বিষ্ণুপুরাণের* প্রচলিত পৌরাণিক আখ্যান, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের নানা উপকরণ। এ সম্পর্কে নাট্য গবেষক সৈয়দ জামিল আহমেদ (জন্ম ১৯৫৫) জানিয়েছেন:

---

[১১৫] ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৪, উদ্ধৃত. অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়, সামাজিক চালচিত্রে যাত্রাগান, ভারবি, কলকাতা, প্র. প্র. ১৯৯৮, পৃ. ৪৬

[১১৬] রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর *বিবিধার্থ সংগ্রহ* গ্রন্থে ১৭৮০ শকাব্দ, অর্থাৎ তারও পঞ্চাশ বছর আগে বাংলা যাত্রার উন্মেষের তথ্য হাজির করেছেন। তাঁর দেয়াতথ্য মতে, শিশুরাম অধিকারীর মাধ্যমে যাত্রার পুর্নবিকাশ হয়। তাঁর এই মতটিকে সমর্থিত হতে দেখি বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর জবানীতে। ১৮৭২ সালের বঙ্গদর্শনে, তিনি যাত্রার উন্মেষের দেড়শ বছর অতিক্রান্ত হিসেবে ইতিহাস তুলে ধরেন এবং শ্রীদাম-সুদাম নামে দুই সহোদরের কালীয়দমন যাত্রা পরিবেশনার তথ্য দেন এবং ধারাবাহিকভাবে প্রেমচাঁদ-বদন অধিকারীর নাম উল্লেখ করেন। সঞ্জীবচন্দ্রের লেখাটি বাংলা যাত্রার প্রথম বিধিবদ্ধ ইতিহাস রচনার প্রয়াস। ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও তাঁর *গৌড়বঙ্গ-সংস্কৃতি(১৯৭২)* গ্রন্থে প্রায় দুশ বছর আগে যাত্রা আরম্ভ হয়েছে বলে মনে করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এর রচনায় যাত্রাশিল্পের উন্মেষ ও নিরবিচ্ছিন্ন বিকাশের চিত্র ওঠে আসে। সঞ্জীবচন্দ্রের রচনায় {রচনাটির প্রকাশকাল ১২৮৯ (১৮৮১) থেকে ১৫০ বছর অতীতে} ১৭৩১ সালকে যাত্রার সূচনাকাল চিহ্নিত করা হয়েছে। এই মতকে যুক্তিসংগতভাবে গ্রহণ করেই বাংলা যাত্রার উন্মেষ আমি আঠারো শতকের প্রথম পাদ থেকে বলছি।

[১১৭] অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, *বাঙলার প্রথম*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্র.প্র.১৩৮৭, পৃ.১১৮-১১৯

> Well known and popular ... *Krsna Yatra* is a genre of performance entirely religious in nature. Based on the myths and legends related to Krsna and Caitanya, *Krsna yatra* is performed with the objective of dissemination of religious devotion and doctrine. Both professional troupes as well as amateur devotees of the Krsna cult perform the genre.[১১৮]

সেকালের কৃষ্ণযাত্রা সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথ দত্তের 'কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা' গ্রন্থ থেকে জানা যায় :

> ছেলেবেলায় এক বদ্‌খদ্ জিনিস ছিল কেষ্ট যাত্রা। ... রাত্রি দেড়টা দুটো থেকে যাত্রা শুরু হ'ত। লোকে ঘুমে ঢুলত। সেই জন্য তারা মন্দিরা ও খরতাল বাজাত। সেই আওয়াজে ঘুমবাবাজি দেশ ছেড়ে পালাত। তখন কিন্তু হারমোনিয়াম ছিল। আর কি এক চ্যাঁচাত – 'এস হে, কেষ্ট হে'। তাদের কোপনী মারা গোছ কাপড় পরা, পিঠে একটা ন্যাকড়া ঝোলান গলার কাছে গেঁট বাঁধা, মাথায় পরচুলা, আর যো সো করে কতকগুলো ময়ূরের পালক গোঁজা। গায়ে ঘড়ি মাখা, কপোলে চন্দনের ফোঁটা, আর দু গালেতে এই সাজসজ্জা। নাকীসুরে সব চেঁচাত – 'বাপরে কেষ্টরে'। এইত পালা গাওয়া হ'ত। মাঝে মাঝে কেলুয়া ভুলুয়া এসে খানিকক্ষণ ভাঁড়ামো করত।[১১৯]

কালীয়দমনের সঙ্গে *রামায়ণ*, *চণ্ডীমঙ্গল* ও *মনসামঙ্গলের* কাহিনির প্রতিফলনও এ সময়ের যাত্রাগানে পরিলক্ষিত হয়। চণ্ডীযাত্রায় কালকেতু ও শ্রীমন্তের উপাখ্যান এবং মনসার ভাসান যাত্রায় বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি ব্যবহৃত হয়।

> হিন্দুস্থানে শুনি ইহা করিল প্রচার
> বাঙ্গালা দেশের ছাপ ভিন্ন রীতি তার ।।
> সঙ্কীর্তন নানা তাঁতি অপূর্ব সুন্দর
> গড়াহাটি রানিহাটি বিরহ মাথুর।।
> অভিসার মিলনাদি গোষ্ঠের বিহার
> কবি পশতো তালফেরা শুনিতে মধুর।।
> পাঁচালি অনেকভাতি রামায়ণ সুর।
> কত কথা তরজাতে সারিতে প্রচুর।।
> ভবানী ভবের গান মালসীমায়ূর।
> গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী বিজয়াতে ভোর।।
> বাইশ আখড়া ছাপ প্রেম চূর চূর।
> গোবিন্দমঙ্গল জারি গাইছে সুধীর।।
> চৈতন্যচরিতামৃত প্রেমের অঙ্কুর।
> শ্রবণে যাহার গানে ভকত আতুর।।[১২০]

---

[১১৮] *Acinpakhi Infinity : Indigenious Theatre of Bangladesh,* University Press Limited, Bangladesh, First publised 2000, P.35

[১১৯] উদ্ধৃত. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, *যাত্রাগানের ইতিবৃত্ত*, আশা প্রকাশনী, কলকাতা, প্র. প্র. ১৩৮৪, পৃ.৪৫

[১২০] গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প্র.প্র. ১লা অক্টোবর, ১৯৭২, পৃ ১৭০

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য এ বিবরণের ব্যাখ্যায় জানান:

> অষ্টাদশ শতকে গড়ানহাটি, রানিহাট প্রভৃতি ঢঙের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পালা-কীর্তন, কবি, পাঁচালি, রামায়ণ গান, তরজা, সারি, মালসি, গঙ্গাগীতি, বিজয়াসংগীত, আখড়াই, জারি, সাপুড়ের গান, ঝুমুর গান প্রভৃতির পাশে গোবিন্দমঙ্গল ও চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ এবং কালিয়দমন-রাস-চণ্ডী-চৈতন্য যাত্রার খুব প্রচলন ছিল।[১২১]

জয়নারায়ণ ঘোষাল (১৭৫২-১৮২০) এর *করুণানিধান বিলাস* এ আঠারো শতকে পরিবেশিত চার প্রকার যাত্রাগানের উল্লেখ রয়েছে:

> কালীয়দমন রাস চণ্ডীযাত্রা ধীর
>
> রচিত চৈতন্যযাত্রা রসে পরিপূর ॥[১২২]

কালীয়দমন যাত্রা, রাসযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা ও চৈতন্যযাত্রা ছাড়াও তিনি পাঁচালী-যাত্রার কথা তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আঠারো শতকে বা তার পূর্বে যাত্রাগানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সামান্য ধারণা করা গেলেও –– যাত্রার অভিনয়প্রণালী, বেশসজ্জা ও গীতরীতির ধারণা অস্পষ্ট। আসরে নৃত্যগীতের দল উপস্থিত হয়ে গান ও নৃত্য পরিবেশন করত, প্রয়োজন মতো কিছু কিছু তাৎক্ষণিক গদ্য সংলাপ বলত –– এসবই অনুমান সাপেক্ষ। আঠারো শতকের কৃষ্ণযাত্রায় উপকরণ ছিল সামান্য। অর্থের স্বল্পতার কারণে যাত্রাওয়ালারা সহজলভ্য বেশ-সজ্জাই ব্যবহার করতেন। যাত্রাভিত্তিক আখ্যানের রচয়িতা দেবদাস ভট্টাচার্যের বর্ণনায়:

> পাট দিয়ে তৈরি পরচুলা। কখনো পশম কখনো পশুর লোম কখনো তুলো, – যখন যেটা দরকার তাই দিয়ে কাজ চালানো। কৃষ্ণের চুল নীল হবে বলে নীলবড়ি গোলানো জলে চোবানো হত কাঁচা পাট। ব্রহ্মার মাথায় সোনার মুকুট কিন্তু মুখে সাদা দাড়ি সাদা গোঁফ –– গোঁফ দাড়ির জন্যে কাপাস তুলো লাগানো হত বেল কিম্বা গঁদের আঠা দিয়ে। বিষ্ণুর চুল কালো, ভুসোকালি দিয়ে কালো রঙ করে চুড়োর মতো লাগানো হত মাথায়। মহেশ্বরের চুলের জটা গেরুয়া হবে, তার জন্যে হরিতাল বা গেরিমাটি ব্যবহার করার রীতি ছিল। সাধারণত পটুয়াদের পটচিত্রে যে ভাবে প্রতিমা আঁকা হত, সে কালিঘাট কি বাঁকুড়া কি বীরভূম কি মেদিনীপুর –– পুরনো যাত্রাপালায় পৌরাণিক চরিত্রদের সে ভাবে সাজিয়েই আনা হত আসরে।[১২৩]

কাঁচা পাটের দাড়িগোঁফ এবং মাথায় দড়ির জটা নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হতেন মুনিগোঁসাই অর্থাৎ নারদ এবং শিষ্য ব্যাসদেব। এ সময় যাত্রাগানে বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে খোল, করতাল এবং বেহালা ব্যবহার হতো। তখন দশ-বার হাজার দর্শকের সামনে দশ-বারোটি খোল বাজত। আঠার শতকের শেষদিকে দর্শক-শ্রোতার সংখ্যা হ্রাস পায়,

---

[১২১] গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প্র.প্র. ১লা অক্টোবর, ১৯৭২, পৃ ১৭০

[১২২] জয়নারায়ণ ঘোষাল, *করুণানিধান বিলাস*, উদ্ধৃত. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, চতুর্থ খণ্ড, মডার্ণ বুক এজন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্র.সং. ১৯৭৩, পৃ.৪৭০

[১২৩] দেবদাস ভট্টাচার্য, *যাত্রা হল শুরু*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্র.প্র. এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ১৪-১৫

ফলে ঢোল বা খোলের পরিবর্তে তবলা ও বেহালাই গ্রহণযোগ্য হয়। আঠারো শতক বা তার পূর্বে পরিবেশিত যাত্রায় পৌরাণিক বিষয়েরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

২.৩ পৌরাণিক বা ধর্মীয় বা ভক্তিমূলক পালা

কৃষ্ণযাত্রা ছিল পালার একমাত্র পৌরাণিক বিষয়। এ সময় কৃষ্ণযাত্রার পালাই *কালীয়দমন* পালা নামে পরিচিত হয়। এ-ব্যাপারে নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন :

> প্রারম্ভেই বলিয়াছি, কৃষ্ণযাত্রার সাধারণ নাম 'কালিয়-দমন' ছিল। অবশ্য স্বীকার্য যে, এই যাত্রা শুধু নামের অর্থে সীমাবদ্ধ ছিল না; মানভঙ্গ, নৌকাবিহার, কংসবধ, প্রভাস প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকার লীলাই এই 'কালিয়-দমন' যাত্রায় অভিনীত হইত।[১২৪]

নৈতিক আদর্শ ও পুরাণের অদৃষ্টবাদ প্রচারই হয়ে ওঠে পৌরাণিক যাত্রার উপজীব্য। পাশাপাশি এ যাত্রায় আঙ্গিকে ও কলারীতিতে ভিন্নতা দেখা যায়। মিলনান্তক পরিণতি ভক্তিমূলক যাত্রার প্রায় অনিবার্য নিয়তি। পৌরাণিক যাত্রার আরও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্যের বক্তব্য:

> 'আখড়াই বন্দী নাচ দিয়া সূত্রপাত হইত।... যাত্রার আসরিক বন্দনা করা আখরাই বন্দীর উদ্দেশ্য। অল্পবয়স্ক ছেলেরা নর্তকী সাজিয়া গীত সংযোগে আখড়াই বন্দী নাচিত। এই নৃত্যে বিদেশী বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে বেহালা ব্যবহৃত হইত। দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ঢোল, বাঁয়া, তবলা ও মন্দিরা থাকিত।... পৌরাণিক যাত্রায় জুড়ি গায়কের গানের প্রচলন ছিল।'[১২৫]

এই জুড়ি গায়কের গায়ে সাদা পোশাক থাকে। তারা মাথায় পাগড়ি দিয়ে খোলা আসরের চারকোণে দাঁড়িয়ে গানের মাধ্যমে মঙ্গলাচরণ ও কাহিনির সূত্র বর্ণনা করে। আঠারো শতকের বাংলা যাত্রাগানে প্রচলিত কৃষ্ণলীলাই প্রধান অবলম্বন –– তাই এ শতকের আলোচনায় মূলত কৃষ্ণযাত্রারই বিবর্তন বিশ্লেষণ করা হবে।

২.৩.১ শিশুরাম অধিকারী

শিশুরাম অধিকারী আনুমনিক আঠারো শতকের মাঝামাঝি বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব বা কেন্দুলী গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র *বিবিধার্থ সংগ্রহ* গ্রন্থে শিশুরাম অধিকারীকে কালীয়দমন যাত্রার প্রবর্তক বলে উল্লেখ করেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও কিছু তথ্যের ভিত্তিতে এই মত সমর্থন করেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, প্রায় দু'শ বছর পূর্বে (অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি) ঝুমুর ও কীর্তনে মিলে যাত্রার সৃষ্টি হয়।[১২৬] যদি শিশুরাম অধিকারীকে যাত্রার প্রবর্তক বলে ধরা হয় তাহলে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি বা তার কিছু আগেই

---

[১২৪] নগেন্দ্রনাথ বসু, যাত্রা : উৎস ও ক্রমবিকাশ, সনৎকুমার মিত্র (সম্পাদিত), *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, ৭ বর্ষ ২ সংখ্যা, যাত্রা বিশেষ সংখ্যা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ.৫১-৫২

[১২৫] আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৫, ব্যবহৃত সংস্করণ ২০০৯, পৃ. ৫৮

[১২৬] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭২, পৃ.২৩

শিশুরামের জন্ম হয়েছে বলে ধারণা করা যেতে পারে। একই মত সমর্থন করেন হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত[১২৭]। এ বিষয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২৪-১৮৯১) বক্তব্য:

> ... গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে কবির হ্রাস হইয়াছে। তাহার ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব হইতে যাত্রা বিশেষ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। শিশুরাম অধিকারী নামা এক ব্যক্তি কেঁদেলীগ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণ তাহার গৌরব সম্পাদন করেন। তৎপূর্ব হইতে বহুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশ স্বরূপ এক প্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিদিত আছে। সঙ্কীর্তন ও পরে কবির প্রচারের মধ্যে তাহার প্রায়, লোপ হইয়াছিল। শিশুরাম হইতে তাহার পুনর্বিকাশ হয়। শিশুরামের পর শ্রীদাম সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিবর্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য হইয়াছে।[১২৮]

লেখক এখানে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে বাংলা যাত্রাগানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দেখান। তিনি মনে করেন যে, পূর্ব প্রচলিত সংস্কৃত নাটকের 'জঘন্য অপভ্রংশ স্বরূপ' হচ্ছে যাত্রা। এ শতকে শিশুরাম অধিকারী অধোপতিত যাত্রাগানকে নতুন করে বিন্যস্ত করেন। পরবর্তীকালে শ্রীদাম-সুবল ও পরমানন্দের অংশগ্রহণে কৃষ্ণযাত্রা নতুন শিল্পরূপ পায়।

২.৩.২ শ্রীদাম অধিকারী ও সুবল অধিকারী

শ্রীদাম ও সুবল দুই ভাই। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯) এর মতে, 'প্রায় দেড়শত বৎসর হইতে চলিল শ্রীদাম-সুবল নামে দুই সহোদর কালীয়দমন যাত্রা করিত'।[১২৯] ১৮২০ সালের ২১ অক্টোবর শ্রীদাম ও সুবল নামে দুজন কালীয়দমন যাত্রাওয়ালার উল্লেখ পাওয়া যায় *সমাচার দর্পণের* লেখায়: 'কালিয়দমন যাত্রাকারি শ্রীদাম ও সুবল দুই ভ্রাতা দুর্গোৎসবে মোং শ্রীরামপুরে যাত্রা করিতে আসিয়াছিল তাহাতে নবমী পূজার দিন দুই প্রহর সময়ে শ্রীদাম ঐ রোগে হঠাৎ মরিয়াছে...।'[১৩০] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গুরুপরম্পরা স্থির করেছেন এভাবে : শিশুরাম – শ্রীদাম ও সুবল – পরমানন্দ – বদন – গোবিন্দ – নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।[১৩১] রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতেও, শিশুরামের পর শ্রীদাম-সুবল কৃষ্ণযাত্রায় ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন। তবে কেউ কেউ শ্রীদাম-সুবলকে পরমানন্দের

---

[১২৭] *Indian Stage,* vol -2, Metropolitan Printing & Publishing House, Ltd, Calcutta p.115

[১২৮] রাজেন্দ্রলাল মিত্র, *বিবিধার্থ সংগ্রহ*, ১৭৮০ শকাব্দ, মাঘ, ৫৮ খণ্ড, পৃ.২৩৫, উদ্ধৃত. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, চতুর্থ খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্র. সং. ১৯৭৩, পৃ.৪৭১

[১২৯] সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যাত্রা ও যাত্রার ইতিবৃত্ত, বঙ্গদর্শন; ফাল্গুন; ১২৮৯, সম্পাদক:সনৎকুমার মিত্র, *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, ৭ বর্ষ ২ সংখ্যা, যাত্রা বিশেষ সংখ্যা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ.৯১

[১৩০] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত ও সংকলিত), *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, প্রথম খণ্ড(১৮১৮-১৮৩০), প্র. প্র.১৩৩৯, ব্যবহৃত পঞ্চম মুদ্রণ-১৪১৫, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ.১৪০

[১৩১] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় , *গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭২, পৃ.২১৩

শিষ্য হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১৩২] আঠারো শতকের মধ্যভাগে শ্রীদাম-সুবল কালীয়দমন যাত্রাওয়ালা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কথিত আছে, তাঁরা কালীয়দমন অভিনয় করার সময়ে কাছাকাছি জলাশয় বা পুকুরে কৃত্রিমভাবে বাঁশ-বাখারি-শোলা প্রভৃতি দিয়ে কালীয় সাপ তৈরি করতেন এবং সেই সাপের ফণার উপরে কৃষ্ণের পুতুল বসিয়ে পালা অভিনয় করতেন। সম্ভবত তাঁদের সময়ের পর থেকে কালীয়দমন যাত্রা কৃষ্ণযাত্রা নাম গ্রহণ করে। শিশুরাম, শ্রীদাম ও সুবলের যাত্রাগান বা পালার পাঠের কোনো খোঁজ এখনও পাওয়া যায় নি।

২.৩.৩ পরমানন্দ অধিকারী (১৭৩৩-১৮২৩)

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের দেয়া তথ্য মতে, পরমানন্দের জন্ম ১১৪০ বঙ্গাব্দে (১৭৩৩-৩৪ খ্রী.অ.) এবং মৃত্যু ১২৩০ বঙ্গাব্দে (১৮২৩-২৪ খ্রী.অ.)। ১১৭৫ বঙ্গাব্দ (১৭৬৮-৬৯) ও পরবর্তী সময়ে তাঁর যাত্রা বেশ জনপ্রিয় হয়।[১৩৩] সময়ের পালাবদলে পরমানন্দ যাত্রায় গদ্য সংলাপ যুক্ত করেন; কীর্তন অনুসারী তুক্কো বা তুক গানকে যুক্ত করে কৃষ্ণযাত্রায় প্রাণ দেন। পরমানন্দের প্রযোজনা প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয় হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের (১৮৭৯-১৯৬২) বর্ণনায়:

> ...he used to run the whole show by acting the part of a Duti (or a female go-between). Krishna and Radhika were but nominal characters. … There was not too much abundance of songs in Parma's Yatras. For producing poetic effect Parma used dialogues in greater proportion and the songs that followed those conversations were composed in Payer (or rhymed couplets) and they were often sung in the tune with which Payers were used to be sung. At the last end of that rhymed couplets, he used to sing in the tune of Kirtan… That was known us '' Tukko" and Paramananda was its creator.[১৩৪]

সঞ্জীবচন্দ্রের বর্ণনায়:

> গীতের ভাগ পরমার যাত্রায় অধিক ছিল না, কাব্যরস ঘটাইবার নিমিত্ত পরমা কথাবার্তাই অধিক কহিত। সেই কথার যে অংশ গীত ছিল, তাহা প্রায়ই পয়ারাদি ছন্দে রচিত এবং তাহা প্রায়ই পয়ারের সুরে গাওয়া হইত। কিন্তু তাহার শেষ ছত্রটিতে একটু করিয়া অমৃত থাকিত, শ্রোতার কর্ণে সেইটুকু ঢালিয়া দিবার নিমিত্ত কীর্তনের সুরে ছত্রটি গাওয়া হইত, লোকে একেবারে যেন আর্দ্র হইয়া যাইত। এই প্রণালীকে তখন তুক্কো বলিত।[১৩৫]

উল্লিখিত বর্ণনায় পরমানন্দ দূতীর ভূমিকায় অভিনয় করার সময় পাঁচালীর আবৃত্তির ঢঙে ঘটকালি আবৃত্তি করেন। পরবর্তীসময়ে উনিশ শতকের যাত্রাওয়ালারা টানাসুরে যে গদ্য সংলাপ আবৃত্তি করেন ধারণা করা যায় তা

---

[১৩২] ভারতী (মাঘ, ১২৮৮), দীনেশচন্দ্র সেন (HBL&L) এবং সুশীল কুমার দে (HOB-19) উৎস. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, চতুর্থ খণ্ড, মডার্ন বুক এজন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্র.সং. ১৯৭৩, পৃ.৪৮০

[১৩৩] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় , *গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ২১৭

[১৩৪] Hemendranath Dasgupta, *Indian Stage*, vol -1, Metropolitan Printing & Publishing House, Ltd, Calcutta, p.118

[১৩৫] যাত্রা ও যাত্রার ইতিবৃত্ত, *বঙ্গদর্শন*; ফাল্গুন; ১২৮৯, উৎস. সৈকত আসগর, (সম্পাদিত), *বাংলার লোকসংস্কৃতি : যাত্রাশিল্প*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্র.প্র. এপ্রিল ২০০২, পৃ.১৮-১৯

পরিমার্জিত পরমানন্দ সংস্করণ। সুরেলা পয়ার আবৃত্তির শেষে পরমানন্দ দু-একটি ছত্রে কীর্তনের সুর ধরেন। একেই 'তুক্কো' বলা হত। সঞ্জীবচন্দ্র দুটি তুক্কোর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন:

সারা বন বুলে বুলে,
বনফুল আনলাম তুলে,
তার বোঁটাগুলি দিলাম ফেলে,
কিনা তোমার শ্যামাঙ্গে বাজিবে বলে

দ্বিতীয়টি হল,

বধুঁ যেতে যেতে, প্রাণের বধুঁ
যেতে যেতে,
রথে হতে কি কথাটি বলতে ছিল।
বল্‌তে বল্‌তে অমনি বধুঁর
মুখের কথা মুখে রৈল।
নয়ন জলে ভেসে গেল ।।[১৩৬]

প্রথম তুক্কোটি মানের বা যুগলমিলনের, দ্বিতীয়টি সম্ভবত *অক্রূরসংবাদ* পালার অন্তর্ভুক্ত।[১৩৭] তখনকার যাত্রারসিক সমাজে পরমানন্দের তুক্কো অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। পরবর্তীকালে যাত্রাওয়ালারা পরমানন্দের মতো কীর্তনের সুরে তুক্কো গাইতে ব্যর্থ হয়, ফলে তাঁর মৃত্যুর পর হারিয়ে যায় তুক্কোর খ্যাতি। কৃষ্ণ যাত্রাকার নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পরমানন্দের একটি ঝুমুর, একটি মাথুর ও দুটি তুক্কো – মোট চারটি গান সংগ্রহ করেন। ঝুমুর গানটি নিম্নরূপ:

যার অঙ্গ বাঁকা বচন বাঁকা বাঁকা যুগল আঁখি।
হৃদয় নিদয় পাষাণময় যার শোন গো বিধুমুখী।।
যে মন চুরি করে বাঁশীর স্বরে জানে জগত-জনে।
তার সঙ্গে প্রেমপ্রসঙ্গ সে কি প্রেমের মর্ম জানে।।
সদা চরায় গো-পাল গোঙার গোপাল ফেরে বনের মাঝ।
তারই জন্যে ও রাজকন্যে কেনে লোকসমাজে লাজ।।
আজ দেবো সাজা দেখাব মজা ঘুচাবো বাড়াবাড়ি।

---

[১৩৬] যাত্রা ও যাত্রার ইতিবৃত্ত, *বঙ্গদর্শন;* ফাল্গুন; ১২৮৯, উৎস. সৈকত আসগর,(সম্পাদিত), *বাংলার লোকসংস্কৃতি : যাত্রাশিল্প*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্র.প্র. এপ্রিল ২০০২, পৃ.২৬-২৭

[১৩৭] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, চতুর্থ খণ্ড, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্র.সং. ১৯৭৩, পৃ.৪৭৮

পথ চেয়ে তার আকুল হ'য়ে পরমা আছে পড়ি।।[১৩৮]

পরমানন্দ নিজের দলের কৃষ্ণযাত্রায় দূতী সাজতেন। একটি শাড়িতে কুলাত না বলে তিনি দুটি শাড়ি পরতেন। তিনি যেখানে যাত্রা করতে যেতেন সেখান থেকে শাড়ি চেয়ে নিতেন। সঙ্গে কোনো অলঙ্কার রাখতেন না। শুধু খোল-করতালই তাঁর যাত্রায় ব্যবহৃত হয়। পরমানন্দের মান, মাথুর বা অক্রূর সংবাদের পয়ার, তুক্কো ও ঘটকালির মধ্যে ওতপ্রোত সম্পর্কের ফলে গোটা পালা শোনার আগ্রহ জন্মে। পাঠ প্রাপ্তির অভাবে তার পালার স্বরূপ নির্ণয় অসম্ভব; তবুও তাকে কালীয়দমন যাত্রায় নৃত্যগীতময় স্থায়ী রূপের পরিকল্পক বলা যায়।

২.৩.৪ প্রেমচাঁদ অধিকারী

পরমানন্দের সমসময়ে প্রেমচাঁদ অধিকারী যাত্রায় খ্যাতিমান হন। জনগণের কাছে 'থরকাটা প্রেমা' হিসেবে তাঁর পরিচিতি হয়। তাঁর যাত্রাগানের রীতি সম্বন্ধে সঞ্জীবচন্দ্র জানিয়েছেন:

> এ ব্যক্তির 'তুক্কো' ছিল না, চৌপদীই সমুদয়। তাহা ভিন্ন সে কীর্তন যাহা গাইত, তাহা একটু মাজিয়া ঘসিয়া লইত। খাঁটী মহাজনী পদ 'পত্তন' দিয়া গাইলে সামান্য লোকে বড় বুঝিত না। এইজন্য প্রেমচাঁদ মহাজনী পদ হাল্কা করিয়া সেই পদের পুরাতন ভাষার সঙ্গে প্রচলিত ভাষা মিশাইয়া, ঘোষা পদ মাজিয়া ঘসিয়া যাত্রা করিত।[১৩৯]

বোঝা যাচ্ছে, প্রেমচাঁদ নিজস্ব রচনায় 'তুক্কো' ব্যবহার করতেন না। তিনি সুপরিচিত বৈষ্ণব পদকে পরিবর্তন-পরিমার্জনের মাধ্যমে শ্রোতার মনোরঞ্জন করেন। সমকালীন পত্রিকা-পাঠকের চিঠিতে পাওয়া যায় তাঁর সাজসজ্জার ব্যবহার বৈচিত্র্য :

> আমারদিগের দেশীয় অধিকারী ও বেশকারী বেটারা চিরদিন একরকম বেশ করিয়া দেয়, কেবল থরকাটা প্রেমচাঁদ কতকগুলি বাইআনা বেশের সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র।[১৪০]

প্রেমচাঁদ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রায় কীর্তনের প্রাধান্য বেশি। পরবর্তীকালে কৃষ্ণকমল গোস্বামী অধিক সাফল্যের সাথে যাত্রায় এই রীতির প্রয়োগ ঘটান।

২.৩.৫ বদন অধিকারী

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে, প্রেমচাঁদের 'ছোকরা' বদন অধিকারী। দুর্গাদাস লাহিড়ি তাঁর *বাঙালির গানে* জানিয়েছেন, কলকাতার নিকটবর্তী শালিখা গ্রামে তাঁর বাস ছিল। বদন তাঁর যাত্রাগানে অনুপ্রাসের নতুন ব্যবহার আর তুক্কোর নব-সংস্কার প্রতিষ্ঠা করেন:

---

[১৩৮] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৭২, পৃ. ২১৫-২১৬

[১৩৯] যাত্রা ও যাত্রার ইতিবৃত্ত, *বঙ্গদর্শন*; ফাল্গুন; ১২৮৯, উৎস.সৈকত আসগর, (সম্পাদিত), *বাংলার লোকসংস্কৃতি : যাত্রাশিল্প*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্র.প্র. এপ্রিল ২০০২, পৃ.২৭

[১৪০] কস্যচিৎ পাঠকস্য-র পত্র, *সমাচার চন্দ্রিকা*, ২৮ ডিসেম্বর ১৮৩১, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত ও সংকলিত), *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, দ্বিতীয় খণ্ড(১৮৩০-১৮৪০), প্র. প্র.১৩৪০, ব্যবহৃত পঞ্চম মুদ্রণ-১৪০১, পৃ.২৮০

আর একদিনের করো দেখি মনে।
কী কথা না বলেছিলে বলো নিধুবনে।।
বলেছিলে সব সখী হও তোমার প্রজা।
আমি হব কোটাল রাই, তুমি হবে রাজা।।
তমালের পত্র পাড়ি তাহাতে লিখিয়ে।
চরণে দিলি যে রাধার কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।।[১৪১]

বদন অধিকারী গানের সাথে বেহালা বাজানোতেও পারঙ্গমতা দেখান। বদনের মৃত্যুর পর পুরাতন ধরনের কৃষ্ণযাত্রার জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। ১৮৭২ সালে *বঙ্গদর্শন* এর লেখক সঞ্জীবচন্দ্র বলেছেন যে, বদনের মৃত্যুর পর চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই বদলাতে থাকে কৃষ্ণযাত্রার সাবেক রীতি। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, বদন অধিকারী পুরাতন রীতির শেষ যাত্রাকার এবং তাঁর 'ছোকরা' শিষ্য গোবিন্দ অধিকারী নতুন কৃষ্ণযাত্রার প্রথম সূচনাকারী।[১৪২]

২.৪ উনিশ শতকের বাংলা যাত্রা

উনিশ শতকের তিন-চার দশক ধরে কালীয়দমন যাত্রাকারদের প্রভাব অব্যাহত থাকে। সময়ের পালাবদলে উনিশ শতকের কৃষ্ণযাত্রা থেকে 'কালীয়দমন' নামটি খসে পড়ে। এর ফলে পূর্বের কলারূপ, অভিনয় ও গীতরীতির সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটে। কৃষ্ণলীলা প্রকাশক যাত্রা আঙ্গিকে ও নতুন বিন্যাসে এই শতাব্দীতে নাগরিক ও গ্রামীণ সমাজে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পরমানন্দ অধিকারী কালীয়দমন যাত্রার গায়ন পদ্ধতি ও কলারীতিতে অনেক নূতনত্ব আনয়ন করেন। সেখানে নৃত্যগীত ও পয়ার আবৃত্তির সঙ্গে খুব সম্ভব বক্তৃতাধর্মী গদ্য সংলাপের ব্যবহার হয়। তাঁর এই রীতিই পরবর্তীকালের কৃষ্ণযাত্রায় অবিকলভাবে গৃহীত হয়। এই শাখার তিনজন যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারী, কৃষ্ণকমল গোস্বামী ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় এর কৃষ্ণযাত্রা, বাংলা যাত্রার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কৃষ্ণযাত্রাকে এরা ভিন্ন প্রযত্নে দর্শকের সামনে উপস্থাপন করেন। উনিশ শতকের পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিতে এই পালাকারদের বহুমুখী প্রতিভা কৃষ্ণযাত্রাকে জনপ্রিয় করে।

২.৪.১ গোবিন্দ অধিকারী (১৭৯৮-১৮৭০)

গোবিন্দ অধিকারী হুগলি জেলার খানাকুল-কৃষ্ণনগরের কাছে জাঙ্গিপাড়া গ্রামে আনুমানিক ১২০৫ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৈরাগী কুলোদ্ভব। বাল্যকালে সামান্য পড়াশোনার পর তিনি ধুরখালী গ্রাম নিবাসী গোলকচন্দ্র দাস

---

[১৪১] দূর্গাদাস লাহিড়ি (সম্পাদিত), *বাঙালির গান*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্র. প্র. ১৯০৫, ব্যবহৃত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সংস্করণ ২০০১, কলকাতা, পৃ. ৭২৫। *বাঙালির গানে* তাঁর ১১টি গান লিপিবদ্ধ আছে।

[১৪২] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, চতুর্থ খণ্ড, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্র.সং. ১৯৭৩, পৃ. ৪৮৫

অধিকারীর কাছে কীর্তন শেখেন। জীবনের প্রথমদিকে তিনি ঐ দলে কীর্তনের দোহার ছিলেন; পরে নিজেই একটা কীর্তনের দল গঠন করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি সেই কীর্তনের দলকেই যাত্রাদলে পরিণত করেন।[১৪৩] এই দলকে কেন্দ্র করেই তিনি ধীরে ধীরে পুরো বাংলায় কৃষ্ণযাত্রাকার হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেন।

উনিশ শতকের থিয়েটার ও অপেরার প্রাধান্য সত্ত্বেও নাগরিক ও গ্রামীণ জীবনে গোবিন্দচন্দ্র অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা গ্রহণযোগ্যতা পায়। তিনি সে সময় পরিবর্তিত রুচির সঙ্গে তাল রেখে নতুন ধরনের কৃষ্ণযাত্রা লিখেন। সেকালের শিক্ষিত ব্যক্তিরাও গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রাগান এবং দূতীর ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করতেন। গোবিন্দ অধিকারী একাধারে যাত্রার স্বত্ত্বাধিকারী, পালাগান লেখক, পরিচালক, প্রধান অভিনেতা এবং সংগীত রচনাকার ছিলেন। বাংলা যাত্রায় তিনি পরমানন্দের ঘটকালি প্রথা[১৪৪] তুলে দিয়ে পাকাপাকিভাবে গদ্য সংলাপের রীতি প্রবর্তন করেন। তিনি যাত্রাগানে প্রচুর সংলাপ ব্যবহার করে নাটকীয়তা আনেন। শুধু সংলাপ নয়, নাটকীয় কথোপকথনে তিনি চলতি জীবনের ছোঁয়া লাগান। এর সঙ্গে জনপ্রিয় কীর্তনাঙ্গ গান সংযোজন করে কৃষ্ণযাত্রাকে সবার আকর্ষণীয় করে তোলেন। তাঁর কোনো কোনো গান, যেমন শুকসারীর দ্বন্দ্ব বা চূড়ানূপূরের দ্বন্দ্ব পরবর্তীকালের শ্রোতাদের স্মৃতির মধ্যে বহুকাল জাগরুক ছিল।[১৪৫] শুকসারির রসের দ্বন্দ্ব থেকে উল্লেখ্য :

বৃন্দাবনবিলাসিনী রাই আমাদের।
রাই আমাদের রাই আমাদের
আমরা রাইয়ের রাই আমাদের।।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন,
শারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ,
নইলে শুধুই মদন।।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল,
শারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল
নইলে পারবে কেন?[১৪৬]

---

[১৪৩] দুর্গাদাস লাহিড়ি(সম্পাদিত), *বাঙালির গান*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্র.প্র.১৯০৫, ব্যবহৃত প্রথম পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সংস্করণ, এপ্রিল ২০০১, কলকাতা, পৃ. ৩২১

[১৪৪]

[১৪৫] *বাঙালির গান* -এ গোবিন্দ অধিকারীর ৬৪ টি গান মুদ্রিত হয়েছে। এ গুলির অধিকাংশই তাঁর পালাগানে অন্তর্ভুক্ত।

[১৪৬] দুর্গাদাস লাহিড়ি, *বাঙালির গান*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্র.প্র.১৯০৫, ব্যবহৃত প্রথম পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সংস্করণ : এপ্রিল ২০০১, কলকাতা, পৃ.-৩২১

পরবর্তী সময়ে তাঁর যাত্রার প্রচলন হ্রাস পায়, কিন্তু গানগুলি যাত্রাসঙ্গীত রসিকদের কণ্ঠে প্রচলিত হয়। তিনি স্থান কাল ও পাত্রোপযোগী লঘু ধরনের গান রচনা করতেন। *নিমাইসন্ন্যাস* পালায় জগাই মাধাইয়ের মদ নিয়ে স্তুতিমূলক গান:

মদের মত মজার জিনিস কিছু নাই।
ক্ষীর ছানা মাখন করি না ভক্ষণ
মদে বিচক্ষণ না হয় যতক্ষণ,
ততক্ষণ মদ খাই গো সদাই।।
মেটে ভাজা চাটে যে খেয়েছে মদ
সুধা তার কাছে লাগে অতি বদ,
কেটে দাও যদি মদের একটি নদ
তবে তাতে কোকনদ হতে চাই।।[১৪৭]

সুকণ্ঠ গায়ক ও সুদক্ষ সুরকার হবার কারণে তাঁর গান অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। তাঁর নিজস্ব অভিনয়-প্রতিভা ও গীত-রীতি সমকালীন দর্শকদের মুগ্ধ করে। এমনকি বৃন্দেদূতির[১৪৮] ভূমিকায় গোবিন্দ অধিকারীর অভিনয় এক কিংবদন্তিতে রূপান্তরিত হয়।[১৪৯] তাঁর রচনাগুলো পাঁচকড়ি দে *গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা* (পাঁচখণ্ড, ১৩৩৭-৩৯ বঙ্গাব্দ) নামে সম্পাদনা করেন। এ গ্রন্থে তাঁর *কলঙ্কভঞ্জন*, *মানভঞ্জন*, *মাথুর*, *সুবলমিলন*, *যোগিমিলন*, *প্রভাসমিলন*, *চাঁদধরা*, *ননীচুরি*, *কালীয়দমন*, *গোষ্ঠবিহার*, *মুক্তালতাবলী*, *দেয়াশিনীমিলন*, *কৃষ্ণকালী*, *দানলীলা* বা *নৌকাবিহার*, *অক্রূর সংবাদ*, *নিমাইসন্ন্যাস*, *অষ্টকালীয় নিত্যলীলা* প্রভৃতি পালা স্থান পেয়েছে।[১৫০] গোবিন্দের পালাগানগুলির উৎস কৃষ্ণ-কেন্দ্রিক অর্বাচীন পুরাণ, সমাজে প্রচলিত গ্রাম্য নাটক (pastoral drama), বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্যজীবন, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক আখ্যানকাব্য ইত্যাদি। তাঁর অগ্রজ শিশুরাম, পরমানন্দ, শ্রীদাম, সুবল ও বদন অধিকারী খুব সম্ভব ঐ একই উৎস থেকে কৃষ্ণযাত্রার (কালীয়দমন) কাহিনি সংগ্রহ করেন। তিনি পালাগানের প্রস্তাবনায় প্রথমে সমস্ত কাহিনিটি সংক্ষেপে বলে দিতেন। তারপর সে কাহিনিই যেন গান, পয়ার ও সংলাপে বিকশিত হত। যাত্রাপালায় তিনিই সর্বপ্রথম সার্থকভাবে গদ্যসংলাপ প্রবর্তন করেন। এর আগে অবশ্য পরমানন্দ অধিকারীর যাত্রায় গদ্যের ব্যবহার দেখা গেছে। কিন্তু সে গদ্য অত্যন্ত আড়ষ্ট ও প্রাচীনপন্থী। নাটকীয় ভঙ্গিতে ও

---

[১৪৭] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্র.সং. ১৯৭৩, পৃ. ৪৯৬

[১৪৮]

[১৪৯]'তাঁহার দূতীগিরি দেখিবার জন্য দশক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া লোকে যাত্রা শুনিতে যাইত। দূতী সাজিয়া যখন তিনি আসরে নামিতেন, তখন চারিদিকে একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া যাইত; আনন্দে শ্রোতৃকা হরিধ্বনি করিয়া উঠিতেন- *বাঙালির গান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৯

[১৫০] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, প্র.সং ১৯৭৩, কলকাতা, পৃ. ৪৯৭

বাস্তব রীতিতে গোবিন্দ অধিকারীর গদ্য সংলাপগুলি ছিল ঝরঝরে। *কালীয়দমন* যাত্রাপালা থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যাক:

> বলরাম – একি হল। রাখালেরা সব এমনধারা চেতনহারা হয়ে ধূলার ওপর পড়ে কেন? গাভীগণও সব মড়ারমত শুয়ে পড়েছে। তবে কি এখানে এসে কোন বিপদ হয়েছে নাকি? ডেকে দেখি।[১৫১]

আবার কোথাও কোথাও ছোট ছোট গদ্য সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলো স্পষ্টভাবে চিত্রিত হতো। *কলঙ্কভঞ্জন* (৫ম অঙ্ক) পালাতে দেখা যায়:

> কুটিলা– ওগো রাই ! এইবার দর্পচূর্ণ হবে গো !
>
> রাধা – কেন গো ননদিনী ! আমায় কি হয়েছে গো !
>
> কুটিলা –ওলো রাই ! অমন ধারা ফ্যাল ফ্যাল করে আকাশের দিকে চেয়ে কি দেখছিস গো ?
>
> রাধা – ওগো ননদিনি ! নীল গগনের শোভা দেখছি গো !
>
> কুটিলা – ওগো, তা নয় গো, তা নয়, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা চলে না গো। ও-সব ঢং বেশ বুঝি লো! ঢের জানি। তোর তো ও আকাশ দেখা নয় গো, ঐ আকাশের রং দেখে কালার রং মনে করা গো ! যা হ'ক ঢের ঢের মেয়ে দেখছি, কিন্তু তোর মত এমন জাহাবেজে মেয়ে কোন দেশে দেখি নাই গো !
>
> রাধা – ওগো ননদিনি ! তোমরা এখন আমাকে কলঙ্কিনী বলছো গো ! বেশ আমি যেন জন্মজন্ম কৃষ্ণকলঙ্কিনী থাকি।[১৫২]

এ জাতীয় ছোট গদ্য সংলাপের শেষে 'গো' অক্ষরটি বারবার ব্যবহারের ফলে কোথাও কোথাও গদ্যের মধ্যে একটা ছন্দ আসে। *গোষ্ঠবিহার* পালায়:

> 'সুবল– ওগো কানাই। তোমার কাজের তুলনা নাই গো।
>
> কৃষ্ণ–ওগো সুবল। আমি তো কোন কাজই দেখি না গো।
>
> সুবল–ওগো কানাই। কাজ দেখ না তো কি দেখ গো?
>
> কৃষ্ণ–কি দেখি বলি, শোন গো!'[১৫৩]

কৃষ্ণযাত্রায় আধুনিকতা আনয়নে এবং নিষ্ক্রিয় আখ্যানকে সক্রিয় করে তোলার রীতিতে গোবিন্দ অধিকারীর অবদান অনস্বীকার্য। পরবর্তীকালের যাত্রাগান তাঁর এই রীতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে পুরাণ ও লৌকিক কাহিনি অবলম্বন করে বাংলাদেশে যে ধরনের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাহিনি গড়ে উঠেছে, গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায় তা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহৃত হয়। তিনি নিজে দূতীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন বেশির ভাগ পালায়। রাধামাধবকর এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন –

---

[১৫১] অমিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের রূপরীতি ও আঙ্গিক*, প্র.প্র.আগস্ট-১৯৯০, ব্যবহৃত দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট-১৯৯৮, কলকাতা, পৃ.১৩

[১৫২] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ৪র্থ খণ্ড, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্র.সং. ১৯৭৩, পৃ. ৪৯৯

[১৫৩] অমিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের রূপরীতি ও আঙ্গিক*, প্র.প্র.আগস্ট-১৯৯০, ব্যবহৃত দ্বিতীয় সংস্করণ আগস্ট-১৯৯৮, কলকাতা, পৃ.১৩

> 'বৃদ্ধ বয়সেও স্ত্রীলোকের পোষাক পরিয়া বিন্দে দূতী সাজিয়া আসরে নামিতেন, অথচ কিছুমাত্র বেমানান বলিয়া মনে হইত না। অতি মধুর কীর্তনাঙ্গে তিনি সকলকে মোহিত করিয়া দিতেন।'[১৫৪]

গোবিন্দ সংস্কৃত নাটকের রচনা-রীতিকে অনুসরণ করে তাঁর পালা-নাটকে অংক ভাগ করেন। কোনোরকম দৃশ্য ভাগ না করে অংকের শুরুতে নাট্যস্থলের উল্লেখ করেন। সাধারণ জনগণ তাঁর কৃষ্ণযাত্রা দেখে কৃষ্ণলীলা, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব, বৈষ্ণবীয় প্রেমসাধনা প্রভৃতি গূঢ় ব্যাপারের অনেকটাই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এর সঙ্গে যাত্রা দর্শকদের মোটা দাগের নীতি ও জীবনাদর্শের প্রাপ্তি ঘটে। কখনো তারা দেবদেবীর দুঃখে, বেদনায়, বিরহবিচ্ছেদে কেঁদে ওঠে, কখনো দেবতাদের আনন্দে-আত্মহারা হয়ে যায় আবার কখনোবা সমস্ত কিছুকেই দেবতার লীলা ভেবে দুঃখ-দুর্ভাগ্যকে হাসিমুখে বরণ করে নেয়। দূতীর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় এবং মনোহর সংগীতের জন্যই গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রাগান এত জনপ্রিয় হয়েছিল।

২.৪.২ কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০-১৮৮৮)

কৃষ্ণকমল গোস্বামী নদীয়া জেলার ভাজনঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা মুরলীধর গোস্বামী, মা যমুনাদেবী। তাঁর আদিনিবাস পূর্ববঙ্গ। পিতার তত্ত্বাবধানে সাত বছর বয়সে তিনি বৃন্দাবনে ব্যাকরণ শিক্ষা লাভ করেন। এরও ছয় বছর পরে কৃষ্ণকমল নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর পাঠ শেষ করেন।[১৫৫] সংস্কৃতজ্ঞ ও সংগীতজ্ঞ পিতার নিকট থেকে তিনি সংস্কৃত ও সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করেন। ভক্তবৈষ্ণব, পদাবলীকার, ভাগবত-কথক, কীর্তন গায়ক এবং কৃষ্ণযাত্রাকার হিসেবে কৃষ্ণকমল গোস্বামী অল্পদিনেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় দেন। *স্বপ্নবিলাস (১৮৪২), দিব্যোন্মাদ* বা *রাই উন্মাদিনী(১৮৪২), বিচিত্রবিলাস(১৮৫৬), কালীয়দমন, নিমাইসন্ন্যাস, ভরতমিলন, গন্ধর্বমিলন* (রূপগোস্বামীর নাটক অবলম্বনে) প্রভৃতি এখন পর্যন্ত কৃষ্ণকমলের সন্ধানপ্রাপ্ত যাত্রাপালা।[১৫৬] কৃষ্ণকমল গোস্বামী গদ্য সংলাপের চেয়ে গীতি-সংলাপই বেশি ব্যবহার করেন। তাছাড়া তাঁর যাত্রাপালায় চৈতন্য-প্রভাবও লক্ষণীয়:

> রাধাকৃষ্ণের রূপক ছলে তিনি আরাধ্যের জীবনকাহিনী শুনাইয়াছেন।... বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস যে কথা দার্শনিকের ভাষায় কহিয়াছেন, তাহা কবির হস্তে নবজীবন লাভ করিয়াছে। চৈতন্যের কৃষ্ণবিরহের করুণ উচ্ছ্বাসে মাথুরের সৃষ্টি, তাঁহার উন্মুক্ত

---

[১৫৪]বিপিনবিহারী গুপ্ত , *পুরাতন প্রসঙ্গ ও বিচিত্র প্রসঙ্গ*, প্রসাদ সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), প্র.প্র. জানুয়ারি ২০১৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ.৩৭২

[১৫৫] দুর্গাদাস লাহিড়ি, *বাঙালির গান*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্র.প্র.১৯০৫, ব্যবহৃত প্রথম পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সংস্করণ : এপ্রিল ২০০১, কলকাতা, পৃ.২৬৫

[১৫৬] দীনেশচন্দ্র সেন ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণকমল গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। তিনিই কৃষ্ণকমলের যাত্রাগান, কবিত্ব, ভক্তিরস ও তত্ত্বাদর্শ সবিস্তারে আলোচনা করেন। অবশ্য তারও আগে ১৩১৭ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণকমলের দ্বিতীয় পুত্র নিত্যগোপাল গোস্বামী 'কৃষ্ণকমল গীতিকাব্য' সঙ্কলন ও প্রকাশ করেন।

> প্রলেপে *রাই উন্মাদিনী* জীবন পাইয়াছে ও *স্বপ্নবিলাস* সার্থক হইয়াছে। আমরা বলিতে পারি, রাই উন্মাদিনী, বিচিত্র বিলাস, স্বপ্নবিলাস প্রভৃতি কাব্য প্রবীণ চৈতন্য-চরিতামৃত মহীরুহের ফুল ও ফল।[১৫৭]

কৃষ্ণকমল গোস্বামী ভক্তিরস প্রসারের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণযাত্রাকে নতুন রূপে পরিবেশন করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত যাত্রাগান *স্বপ্নবিলাস* (১৮৭২)। এই পালাতে মুড়াপাড়ার জমিদার এবং আবদুল্লাহ্‌পুর ও ঢাকার নিকটবর্তী একরামপুরের অধিবাসীরা অভিনয় করেন। তারপর প্রায় দু'বছর ধরে এটি সারা ঢাকা শহরে প্রতি শনি ও রবিবারে অভিনীত হতে থাকে। বিক্রমপুরের অন্তর্গত আবদুল্লাপুরের অনুরাগীদের দ্বারা অভিনীত হয় তাঁর দ্বিতীয় পালা *দিব্যোন্মাদ* বা *রাই উন্মাদিনী*। দুটি যাত্রাগানেই কৃষ্ণবিরহে গোকুল ও বৃন্দাবনের দুরবস্থা, যশোদা-নন্দের বিলাপ, কৃষ্ণের সখা-সখিদের দুঃখ-বেদনা, শ্রীরাধার মর্মান্তিক কষ্ট এবং সবশেষে রাধাকৃষ্ণের পুনর্মিলন ও গৌরাঙ্গ অবতারের আবির্ভাব ঘোষণা করা হয়। *স্বপ্নবিলাসে* দেখা যায় কৃষ্ণ মথুরায় গেছেন, গোকুলের গোপ-গোপিনীরা তাঁর বিরহে বেদনাকুল হয়। একদিন রাতে মাতা যশোদা স্বপ্ন দেখে ব্যাকুল হয়ে কৃষ্ণকে বলেন :

> শুন ব্রজরাজ ! স্বপনেতে আজ,
> দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকালে?
> 'যেন' সে চঞ্চল চাঁদে, অঞ্চল ধরে কাঁদে,
> জননী, দে ননী দে ননী বলে।
> নীল কলেবর, ধুলায় ধূসর,
> বিধুমুখে যেন কতই মধুর স্বর,
> সঞ্চারিয়ে ডাকে মা বলে;
> যত কাঁদে বাছা বলি 'সর সর'
> আমি অভাগিনী বলি 'সর সর'[১৫৮]

সংলাপ প্রধান যশোদার এই গানে কীর্তনের লহর আর অনুপ্রাসের বিস্তার প্রকাশিত হয়। শ্রীরাধা, চন্দ্রাবলী ও সখিরা কৃষ্ণভ্রমে তমালকে আলিঙ্গন করেন। তারপর কৃষ্ণ ব্রজে এলে মা যশোদা তাঁর কোলের নীলমণিকে কোলে ফিরে পায়। অভিমানিনী রাধার উচ্চারণ:

> এক কর্ণ বলে, আমি কৃষ্ণনাম শুনিব
> আর এক কর্ণ বলে, আমি বধির হয়ে রব।।
> (ও নাম শুনবো না, শুনবো না নিলাজ বঁধুর নাম)

---

[১৫৭] দীনেশচন্দ্র সেন, ভূমিকা, কৃষ্ণকমল গীতিকাব্য, নিত্যানন্দ গোস্বামী (স), উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.২২

[১৫৮] স্বপ্নবিলাস, শ্রীনন্দালয়, উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৮৪

এক নয়ন বলে, আমি কৃষ্ণরূপ দেখিব,

আর এক নয়ন বলে আমি মুদ্রিত হয়ে রব।

(ও রূপ দেখব না, দেখব না, কালীয় কুটিলের রূপ।)[১৫৯]

এই পালায় গদ্যসংলাপ খুব কম। সমস্ত ঘটনাই কীর্তন আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েছে।

নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় (১৮৫২-১৯১০) সুইজরল্যান্ডের জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণকমলের যাত্রা বিষয়ে প্রথম গবেষণা করেন। তিনি কৃষ্ণকমলের রচনার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন:

> As the language of the Yatras belongs to the Middle Age – the Age of Chaitanya and his followers… and its virtues are its greater ease and simplicity consequent on its greater freedom from the pure Sanskrit forms:- It is fond of puns and alliteration- and I cannot forbear the temptation of quoting here a few specimens for the sake of my European readers, who are not only not used to such strange combination of words, but could hardly even conceive the possibility of their formation. For instances:-
>
> 'jeto kandey vacha vali sara sara,
> ami alehagini vali sara sara;
> Vallem nahi avasara, keva dive sara,
> Amnisara sara vali pheli em thele'
>
> Swapnavilasa
>
> Here the alliteration turns on the word sara which has three meanings :- 1) Cream….. 2) Away! Away! From the root sari to go, and 3) Avasara, which means leisure-
>
> 'Rayer nasaye nai nicvas
> Givane ki vicvas
> Bujhi niracvas kore' Pyari chere yaya,'
>
> Swapnavilasa
>
> Here the pun turns on the word Cvas in three different compounds, which give three different meanings :- 1) nicvas-respiration, 2) vi-cvas-confidence, hope; and 3) niracvas-hopeless.
>
> These illustrations of puns and alliterations are very simple and innocent in comparison to what are sometimes met with in the classical Sanskrit literature, and especially in the kavyas.[১৬০]

কৃষ্ণকমল সুদক্ষ কথক ও সুকণ্ঠ কীর্তন গায়ক ছিলেন। এছাড়া বৈষ্ণব ভাবরসে নিমজ্জিত সাত্ত্বিক প্রকৃতির এই মানুষটি নিজেই পদকর্তা ছিলেন। ফলে তাঁর যাত্রাগানে গীতরসের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। গোবিন্দ অধিকারীর রচনায় সংলাপ প্রাধান্য আর গানের বহর সামান্য ছিল। গোবিন্দই সর্বপ্রথম প্রাচীন যাত্রাগানে গদ্য সংলাপ প্রয়োগ

---

[১৫৯] উদ্ধৃত. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* ৪র্থ খণ্ড, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্র.সং. ১৯৭৩, পৃ. ৫০৮

[১৬০] Nishikanta Chattpopadhyay, *The Yatras or The Popular Dramas of Bengal,* London : Trubner & Co.,1882. উদ্ধৃত. সৈকত আসগর (সম্পাদিত), বাংলার লোকসংস্কৃতি : যাত্রাশিল্প, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্র.প্র. এপ্রিল ২০০২, পৃ. ৬১০

করে এর রীতি পদ্ধতি পরিবর্তনে সচেষ্ট হন। কিন্তু কৃষ্ণকমল এ রীতিকে যাত্রাগানের সঠিক রীতি বলে মানতে পারেননি। ফলে তিনি প্রাচীন নাটগীতির রীতির মতো গানকেই প্রাধান্য দেন। তাঁর রচনায় গদ্য সংলাপ প্রায়ই বর্জিত হয়। সেজন্য বৈদ্যনাথ শীল মনে করেন,

> 'কৃষ্ণকমল তাঁহার পূর্ববর্তী গোবিন্দ অধিকারীর শৈলীর অনুকরণ করেন নাই। কেননা দার্শনিকতা-বহুল গদ্য সংলাপ (যাহা গোবিন্দ অধিকারীর বিশেষত্ব) কৃষ্ণকমলের রচনায় নাই। ... কৃষ্ণকমলের রচনা-শৈলীই যাত্রার আদিম শৈলী।'[১৬১]

তাঁর জীবিতকালে এই গীতাত্মক, আবেগবহুল, রসভাষ্যযুক্ত কৃষ্ণযাত্রা পূর্ববঙ্গ ও কলকাতায় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। *স্বপ্নবিলাস*- এর তুলনায় পরবর্তী পালা *দিব্যোন্মাদ* বা *রাই উন্মাদিনী* রচনার দিক থেকে অপেক্ষাকৃত পরিণত সৃষ্টি। এখানে গৌরচণ্ডী দিয়ে আরম্ভ, এরপর কৃষ্ণবিরহে নন্দালয়ে যশোদার বিলাপ বর্ণিত হয়। তারপর রাধা বিরহের নানামুখী চিত্র অঙ্কিত হয়। ক্রমে ভাবাতিশয্যের ফলে শ্রীরাধা কৃষ্ণবিরহে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। চন্দ্রাবলী এ সংবাদ কৃষ্ণকে জানায়। কৃষ্ণ সব শুনে দুঃখিত হয়ে অচিরে ব্রজধামে ফিরে আসার আশ্বাস দেন। পরিশেষে কৃষ্ণকমল শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনে *দিব্যোন্মাদ* বা *রাই উন্মাদিনী* পালা শেষ করেন। শ্রীচৈতন্যের শেষ জীবনের দিব্যোন্মত্ত ভাব রাধা চরিত্রে আরোপিত হওয়াতে বর্ণনাটি অসাধারণত্ব পায়। দিব্যোন্মাদ পালার জনপ্রিয়তা সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন জানিয়েছেন :

> চৈতন্য যে কত সত্য, তাঁহার প্রেমের কথা কত যে মর্মান্তিক এবং তিনি যে বাঙালী হৃদয়ের কত আপনার জন, তাহা এই 'দিব্যোন্মাদ' যাত্রা শুনিয়া লক্ষ লক্ষ শ্রোতা বুঝিয়াছিল এবং এই লক্ষ লক্ষ লোক উক্ত গীতিনাট্যের প্রত্যেকটি গান জপমালা করিয়া রাখিয়াছিল।[১৬২]

কৃষ্ণকমলের *বিচিত্রবিলাস* তাঁর পূববর্তী পালা দুটির চেয়ে অনেকটা লঘু ধরনের। এতে গদ্য সংলাপ অনেক বেশি। গোচারণের অবসরে কাননে রাধাকৃষ্ণের মিলন, পাশাখেলা, রাধার মান, কৃষ্ণের রাধার মানভঞ্জন, শ্রীকৃষ্ণের রাধারূপ ধারণ, রঙ্গ পরিহাস ও পুনর্মিলন – এভাবেই পালার সমাপ্তি ঘটে। এ পালাটির ভক্তির উচ্ছ্বাস ও গীতি-আবেগ অনেকটা সংযত। তাঁর অনেক গান এখনও পদাবলী কীর্তনে গাওয়া হয়। কালোত্তীর্ণ এ সমস্ত গান আবহমান কাল ধরে বাঙালির হৃদয় জয় করে নেয়। *বিচিত্র বিলাস* পালায় কুন্দলতার কণ্ঠের গান এখনও স্মরণীয়:

> বিচ্ছেদ জ্বালায় জ্বলে মরতেছিল রাই
> পোড়া প্রাণ কেঁদে উঠল শুনে তাই।
> এখন ঘৃণায় দেখি যায় মোর প্রাণ!
> যার জন্য চুরি করি, সেই বলে চোর!
> কাল-ধর্ম্মে, বিধি! এ-কি অবিচার তোর!

---

[১৬১] বৈদ্যনাথ শীল, *বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা*, এ. কে. সরকার অ্যান্ড কোং, কলকাতা, পৃ. ১৭

[১৬২] দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, ২য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্র.প্র. ১৯৩৫ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ব্যবহৃত সংস্করণ ২০০৬, পৃ. ১০০৬

'যার জন্য চুরি করি, সেই বলে চোর!' – আজও এই চরণটি রসজ্ঞ বাঙালির কাছে প্রবাদপ্রতিম হয়ে আছে। দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) কৃষ্ণকমল গোস্বামীকে 'বৈষ্ণব পুনরুত্থানের সর্বশ্রেষ্ঠ'[১৬৩]পালাকার হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর পরবর্তী পালা *ভরতমিলন*-এর বিষয়বস্তু *রামায়ণ* থেকে গৃহীত হয়। নাটকীয়তার বৈচিত্র্য এ আখ্যানে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

যাত্রাশিল্প উনিশ শতকের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক চাহিদাকে মিটিয়ে তাঁদের রুচিকে মার্জিত করে এবং দর্শক তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। কৃষ্ণকমলের প্রথম দিকের রচনায় গানের প্রভাব প্রাধান্য পেলেও শেষদিকের দু-একটি পালায় নাটকীয়তা প্রাধান্য পায়। বাংলা যাত্রার ধারায় কৃষ্ণকমল কৃষ্ণযাত্রাকে সুরুচিসম্পন্ন ও ভাবগভীর আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠা করেন। পাশাপাশি পুরাতন গীতি প্রবণতাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।

২.৪.৩ নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৮৪২–১৯১১)

কৃষ্ণযাত্রার জগতে গোবিন্দ অধিকারীর একনিষ্ঠ শিষ্য নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। তিনি বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর রেল স্টেশনের তেরো মাইল উত্তরে ধ্বনি গ্রামে ১২৪৮ বঙ্গাব্দের ৬ মাঘ জন্মগ্রহণ করেন।[১৬৪] তেরো বছর বয়সে পিতৃহারা কিশোর নীলকণ্ঠ ভয়ানক দরিদ্র্য অবস্থার মধ্যে জীবন ও জীবিকার খোঁজে একসময় গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রার দলে যোগ দেন এবং নিজের অভিনয় দক্ষতা প্রমাণ করেন। কৃষ্ণযাত্রায় তাঁর মৌলিক অবদান অসামান্য। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের বক্তব্য: 'নীলকণ্ঠ গোবিন্দেরই সাক্ষাৎ শিষ্য এবং তাঁহার দক্ষতার উত্তরাধিকারী। নীলকণ্ঠেরও কৃতিত্ব দূতীর ভূমিকায়।'[১৬৫] নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় সে যুগের শ্রোতৃসমাজে 'কণ্ঠ' বা 'কণ্ঠ মহাশয়' নামে পরিচিত হন। সংগীতবহুল নীলকণ্ঠের যাত্রা সমকালে ব্যাপক প্রশংসিত হয়। সুবলচন্দ্র মিত্র (১২৭৯-১৩২০ বঙ্গাব্দ) নীলকণ্ঠের যাত্রার জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বলেন: 'বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদের পল্লীতে পল্লীতে তাঁহার যাত্রার সমাদর ছিল। তিনি সময় সময় গান গাহিতে গাহিতে একেবারে বিভোর হইয়া উঠিতেন, এমনকি ভাবে মূর্ছিত হইতেন।'[১৬৬]

মহাভারত, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* এবং বিবিধ পুরাণ প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত তাঁর পালাগুলির মধ্যে *চণ্ডালিনী উদ্ধার*, *প্রভাস যজ্ঞ*, *কংস বধ*, *যযাতির যজ্ঞ*, *কালীয় দমন*, *মানভঞ্জন*, *মাথুর* ও *দূতী সংবাদ* বিশেষ উল্লেখযোগ্য। *চণ্ডালিনী-উদ্ধার* পালার কাহিনি মূলত *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* থেকে গৃহীত। *ভাগবতের* নবম স্কন্ধের অন্তর্গত ষষ্ঠ অধ্যায়ে সৌভরি মুনির উপাখ্যান আছে। একদিন মুনি পত্নী (রাজা মান্ধাতার কন্যা) অজ্ঞতাবশত দেবোদ্দেশে আহরণ করা একটি ফল

---

[১৬৩] দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, প্র.প্র. ১৯৮৬, ব্যবহৃত তৃতীয় মুদ্রণ: আগস্ট ২০০২, পৃ. ৬৩৬

[১৬৪] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্র.সং. ১৯৭৩, পৃ. ৫২১

[১৬৫] সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ, কলকাতা, প্র. প্র. ১৯৪০, ব্যবহৃত অষ্টম মুদ্রণ ১৪১৪, পৃ. ৫২৩

[১৬৬] সুবলচন্দ্র মিত্র, *সরল বাঙ্গালা অভিধান*, নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, প্র.প্র.১৯০৬, ব্যবহৃত সংস্করণ- জানুয়ারি-২০১৩, কলকাতা, পৃ.৭৪৮

খেয়ে ফেলেন। ক্রুদ্ধমুনি এই অপরাধে পত্নীকে চণ্ডালগৃহে জন্মগ্রহণ করার অভিশাপ দেন। পরবর্তী সময়ে ঐ শাপগ্রস্থা মান্ধাতা-কন্যাই চণ্ডালিনী হয়ে জন্মগ্রহণ করে ফল বিক্রয়ের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন বাল্যলীলাচ্ছলে এই ফলবিক্রেত্রীর ফল ভক্ষণ করেন তখনই মুনিবাক্য অনুসারে চণ্ডালিনীর শাপমুক্তি ঘটে। *প্রভাসযজ্ঞ* পালার মূল উপজীব্য প্রভাসনদীর তীরে শ্রীকৃষ্ণের যজ্ঞ সম্পাদন এবং নন্দ, যশোদা, রাখালগণ ও শ্রীরাধার সঙ্গে সেখানে তাঁর মিলন। নীলকণ্ঠের *কংসবধ* পালার আখ্যানভাগ মূলত ভাগবতানুগ। তিনি এ পালায় শ্রীরাধার ভাবী বিরহের মর্মস্পর্শী বর্ণনা দেন। অভিশপ্ত রাজা নহুষের মুক্তির জন্য যযাতির যজ্ঞ সম্পাদনকে কেন্দ্র করে *যযাতির-যজ্ঞ* লিখেন নীলকণ্ঠ। এ পালার মূলে রয়েছে *মহাভারতে*র বনপর্ব, উদ্যোগ পর্ব, স্কন্দ-পুরাণের মহেশ্বর খণ্ড এবং *ব্রহ্মবৈবর্ত* পুরাণের কৃষ্ণ জন্ম খণ্ড।[১৬৭] পালা রচনায় নীলকণ্ঠ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সংলাপের বাক্যবিন্যাসগত কৌশলে এবং অধিকাংশ বহুপ্রচলিত কাহিনির অভিনব রূপায়ণে তিনি অসামান্য কল্পনা শক্তির পরিচয় দেন। সর্বস্তরের জনসাধারণের পাশাপাশি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪১-১৯১৯), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) এবং রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-১৮৮৬) প্রমুখ সমকালীন বিখ্যাত জনেরাও নীলকণ্ঠের যাত্রাগানে অভিভূত হন। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত* সূত্রে জানা যায় নীলকণ্ঠের সঙ্গে একাধিকবার পরমহংসদেবের সাক্ষাত হয়। রামকৃষ্ণ শিষ্য অভেদানন্দের (১৮৬৬-১৯৩১) লেখনিতে পাই তাদের প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা:

> সুমিষ্ট কণ্ঠে ভাবের সহিত যখন নীলকণ্ঠ আবার গাহিতে লাগিলেন, তখন পরমহংসদেব ভাবাবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। অপূর্ব সেই মূর্তি। নীলকণ্ঠও ভাবে গদগদ হইয়া দুই হস্তে পরমহংসদেবের শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া বারবার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে পরমহংসদেব বসিয়া আবার গান শুনিতে লাগিলেন। ... নীলকণ্ঠের গানের সঙ্গে পরমহংসদেব মধ্যে মধ্যে আখর দিতে লাগিলেন।[১৬৮]

সেকালের নবদ্বীপের বিখ্যাত সখের যাত্রাওয়ালা মতিলাল রায়ের সঙ্গে নীলকণ্ঠের বিশেষ হৃদ্যতার কথা কথিত আছে। বৃদ্ধ বয়সে তিনি গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হন এবং ভগীরথী তীরে ১৯১১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। কৃষ্ণযাত্রার যে রস গোবিন্দ অধিকারী বাঙালি দর্শককে উপহার দিয়েছিলেন, সে ভক্তি-রসস্রোতকে তাঁর কীর্তিমান শিষ্য নীলকণ্ঠ সারা বাংলার প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেন। সুকুমার সেন এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন:

> নাট্য-কর্মের ঐতিহাসিক প্রবাহ বাঙলাদেশে দুটি ধারায় বয়ে এসেছে। সে-দুটি ধারা হলো গীত-নাট ও নাটুয়া-নাচ। গীতি-নাট হলো "যাত্রা", নাটুয়া-কাচ হলো "নেটো"(লেটো)। যাত্রা পালার মুখ্য বিষয় ছিল কৃষ্ণলীলা, তার মধ্যে প্রধান ছিল কালীয়দমন। অন্য পৌরাণিক বিষয় নিয়েও যাত্রা হত। ... বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তার ও রুচি-পরিবর্তনের ফলে কৃষ্ণযাত্রা ছাড়া আর কোন যাত্রা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত অবধি পৌঁছতে পারে নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে যাত্রাগানের উপর

---

[১৬৭] গোপেশচন্দ্র দত্ত, *কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৬, পৃ. ২১৩

[১৬৮] স্বামী অভেদানন্দ, *আমার জীবনকথা*, প্রথম ভাগ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, প্র.প্র.১৯৬৪, ব্যবহৃত পঞ্চম সংস্করণ- ২০০৮, পৃ ৫৩

> বাংলা নাটকের ও অভিনয়-রীতির প্রভাব গাঢ় হয়ে পড়ল এবং "গীতাভিনয়" উৎপন্ন হল। প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রার ধারা নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত এসে রুদ্ধস্রোত হয়ে গেল।[১৬৯]

উনিশ শতকের শেষার্ধে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় পৌরাণিক যাত্রার পরিবেশনায় যাত্রার ঐতিহাসিক ধারাকে সমৃদ্ধ করেন। তিনি কৃষ্ণযাত্রার ধারাকে অনুসরণ করে কীর্তনাঙ্গ পালা রচনায় কৃতিত্ব দেখান।

উনিশ শতকের শেষভাগে নীলকণ্ঠের পাশাপাশি উত্তরাধিকার রক্ষার্থে বাংলার জনমানসকে গানে গানে জাগর রাখেন মধু মোহান্ত, শ্রীবাস দাস, রামচন্দ্র ঘোষ, কুঞ্জবিহারী ঘোষ প্রমুখ। তবে এঁদের মধ্যে কেউই নীলকণ্ঠের মতো মৌলিক রচনার স্বাক্ষর রাখেননি। মূলত গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রাগানই ছিল এদের প্রধান আশ্রয়। সেকালের পৌরাণিক যাত্রার আরও পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম-১৯৫২) এর বর্ণনায় :

> অক্রুর-সংবাদ কাহিনী আশ্রয়ে গোবিন্দ অধিকারীর সমসাময়িককালে লোচন অধিকারী কৃষ্ণযাত্রা লিখে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। প্রায় একই সময়ে কালীয়-দমন যাত্রার অনুকরণে রচিত ফরাসভাঙার গুরুপ্রসাদ বল্লভের চণ্ডীযাত্রা, বর্ধমানের লাউসেন বড়ালের মনসার ভাসান যাত্রা এবং পাতাই হাটার প্রেমচাঁদ অধিকারীর রামযাত্রা তৎকালীন দর্শকদের বহুমুখী আনন্দ দান করেছিল। পৌরাণিক যাত্রাকাহিনীর পাশাপাশি নন্দবিদায়, বিদ্যাসুন্দর ইত্যাদি যাত্রার ব্যাপক প্রসারে কৃষ্ণযাত্রার ধর্মীয় পরিবেশ ক্ষুণ্ন হচ্ছিল। উনিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের নতুন যাত্রা বা সখের যাত্রার অশ্লীল নৃত্য-গীত এবং কথোপকথন কৃষ্ণযাত্রার ভিতরও সঞ্চারিত হতে থাকে।[১৭০]

২.৫ নূতন যাত্রা

উনিশ শতকের উপনিবেশ যুগ পরিবেশ, কলকাতা-কেন্দ্রিক নাগরিকতা এবং নব্য অর্থনৈতিক অবস্থার পটভূমিকায় আধুনিক সাহিত্যের পাশাপাশি যাত্রাগানের ধারাও নানাখাতে বহমান ছিল। ইউরোপের অলৌকিক, ধর্ম ও নীতিকেন্দ্রিক নাট্যপ্রচেষ্টা রোমান্টিক নাট্যরীতির উদ্ভবের পর ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকে। পবিত্র সরকারের (জন্ম-১৯৩৭) মতে : 'ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বাংলা যাত্রার গড়নে এবং বক্তব্যে বেশ বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটে। এই সময় 'প্রাচীন' যাত্রা এবং 'নূতন' যাত্রা এই দুটি কথা চালু হয়।'[১৭১] পুরাতন যাত্রার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন–

> পুরাতন যাত্রায় বাদ্যভাণ্ডসহ নৃত্যগীতই ছিল প্রধান অঙ্গ। প্রয়োজনস্থলে কুশীলবদের দু-চার ছত্র Extempore গদ্যসংলাপ – এটাই ছিল সাধারণ রীতি। কিন্তু পুরাতন যাত্রাগানে অভিনয়ের চেয়ে নৃত্যগীতের বাহুল্যই ছিল সর্বাধিক এবং কাল যত অগ্রবর্তী হয়েছে, ততই যাত্রাগানের ভাগ হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু সংলাপের ক্রমবৃদ্ধি হলেও যাত্রার গীতাত্মক রূপটি কখনোই লুপ্ত হয় নি। উপাদান হিসেবে পৌরাণিক সুপরিচিত ঘটনা, যার মধ্যে কতকগুলি মোটাদাগের নীতি-উপদেশ ও তত্ত্বকথার

---

[১৬৯] সুকুমার সেন, *নট নাট্য নাটক*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্র. প্র. চৈত্র ১৯৭২, ব্যবহৃত দ্বিতীয় মুদ্রণ, ভাদ্র ১৯৯১, পৃ.৮৬-৮৭

[১৭০] রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ.৫১

[১৭১] পবিত্র সরকার, *নাটমঞ্চ নাটরূপ*, যাত্রা প্রিয় পরম্পরা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্র.প্র.২০০৮, পৃ.৩৮৩

> প্রাধান্য থাকত, তাই-ই একাধারে জনমনোরঞ্জন ও জনমনের উর্ধ্বায়নের জন্য অবলম্বিত হত। মূলতঃ ধর্মীয় ব্রতকৃত্য, অনুষ্ঠান, উৎসব দেব-দেবীর উপাসনা উপলক্ষে সেযুগে যাত্রাগানের আয়োজন করা হত। পরবর্তিকালে যাত্রাভিনয় থেকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান শিথিল হয়ে পড়লেও নীতি-উপদেশ প্রচার যাত্রাগানের একটা মূল লক্ষণ।[১৭২]

সুশীল কুমার দের (১৮৯০-১৯৬৮) লেখায় প্রতিভাত হয়:

> 'Again, we have here for the general theme not *Krsna-lila* as in *Kalya-daman Yatra* or even *Chandi-lila, Ram-lila* or *MansharKatha,* but essentially secular themes of mythology or fiction such as Nala-damayanti or Bidya-sundar began to be prominent; and later on with the degeneration of the Yatra in tone, temper and style, Bidya-sundar alone became the prevalent theme.'[১৭৩]

যাত্রা হল শুরু গ্রন্থের লেখক দেবদাস ভট্টাচার্যের বর্ণনায়:

> পুরোনো দিনে অর্কেস্ট্রা মানে খোল, করতাল, বেহালা, তানপুরা, বাঁশি – এই সব। ইংরেজ আসার পর থেকে তাদের উৎসবে, শোভাযাত্রায়, পার্টিতে কর্নেট, ক্ল্যারিওনেট, হারমোনিয়াম বাজানো শুরু হতে সেগুলো ক্রমশ ঢুকে পড়ল যাত্রায়। ঢাক ঢোল করতালের জায়গায় চলে এল তবলা।[১৭৪]

উনিশ শতকের যাত্রাগান মূলত প্রদর্শিত হয় জনগণের মনোরঞ্জনকে প্রাধান্য দিয়ে –– মধ্যযুগীয় ধর্মনীতি সংক্রান্ত মানসিকতা এ যুগের যাত্রাভিনয় থেকে ক্রমেই হারিয়ে যায়। পূর্বতন শতাব্দীর বিশেষ ভক্তি বা তত্ত্বের আদর্শ প্রচার উনিশ শতকের যাত্রার উদ্দেশ্য নয়, মূলত জনমনোরঞ্জনই হয়ে ওঠে এ নতুন যাত্রার প্রধান লক্ষ্য। এ সময় *বিদ্যাসুন্দর* পালায় পরিবেশিত নিষিদ্ধ তথা সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য প্রেম ও বারোয়ারি ইয়ার্কি যাত্রাগানের স্বাভাবিক ও সুস্থ ধারার মৃত্যু ঘটায়। সেখানে জায়গা করে নেয় নৃত্যগীতমুখর চটুলতায় ভরা যাত্রাগান। অন্যদিকে সখের লৌকিক যাত্রাগান ইতালীয় 'অপেরা'র রীতিকে অবলম্বন করে 'গীতাভিনয়' নামে পরিবেশিত হয়। উনিশ শতকের শেষভাগে নাট্যমঞ্চেও বহু অপেরাধর্মী গীতিনাট্য অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবন থেকেই এই রীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। নিচে উনিশ শতকে পরিবেশিত নূতন যাত্রার (সৌখিন যাত্রা, বিদ্যাসুন্দর যাত্রা, গীতাভিনয়) সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হল:

২.৫.১ সখের যাত্রা

উনিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকেই যাত্রায় মধ্যযুগীয় ভাব ও ভাবনার অবসান ঘটে। ইংরেজি শিক্ষা, ঔপনিবেশিক শাসন তথা বিশ্বসভ্যতার নানামুখী প্রভাবে বাঙালি বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন ও সমাজসচেতন ব্যক্তিতে পরিণত হয়। পরলোকের মঙ্গল সাধনের চাইতে মানুষ ইহলোকের আনন্দ লাভে আগ্রহী হয়। সুতরাং আনন্দভোগের আয়োজন ও পার্থিব জীবনধারাকেই মানুষ বরমাল্য দেয়। ভক্তি আবেগ-মিশ্রিত কৃষ্ণযাত্রা আস্তে আস্তে ম্রিয়মাণ হয়ে আসে

---

[১৭২] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চতুর্থ খণ্ড*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৩, পৃ. ৩৫৯-৩৬০

[১৭৩] Sushil Kumar De, *Bengali Literature in the Nineteenth Century(1757-1857),* Firma K.L. Mukhopadhyay, 2nd edition 1962, pg. - 410

[১৭৪] দেবদাস ভট্টাচার্য, *যাত্রা হল শুরু*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্র.প্র. এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ২৭

-- আবির্ভাব হয় নতুন যাত্রা ও যাত্রাওয়ালাদের। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবন সায়াহ্নে শৈশবের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ির যাত্রাভিনয় সম্পর্কে লিখেন :

> আমাদের সময়কার কিছু পূর্বে ধনীঘরে ছিল শখের যাত্রার চলন। মিহিগলাওয়ালা ছেলেদের বাছাই করে নিয়ে দল বাঁধার ধুম ছিল।... আমাদের বাড়িতে যাত্রাগান হয়েছে মাঝে মাঝে।... আমি দেখতে পেয়েছি তার গোড়াকার জোগাড়-যন্তর। বারান্দা জুড়ে বসে গেছে দলবল, চারিদিকে উঠছে তামাকের ধোঁয়া। ছেলেগুলো লম্বা-চুল-ওয়ালা, চোখে-কালি পড়া, অল্প বয়সে তাদের মুখ গিয়েছে পেকে। পান খেয়ে খেয়ে ঠোঁট গিয়েছে কালো হয়ে। সাজগোজের আসবাব আছে রঙকরা টিনের বাক্সোয়। দেউড়ির দরজা খোলা, উঠোনে পিল পিল করে ঢুকে পড়ছে লোকের ভিড়। চার দিকে টগবগ করে আওয়াজ উঠছে, ছাপিয়ে পড়ছে গলি পেরিয়ে চিৎপুরের রাস্তায়।...
>
> সব-তাতে মানা করাটাই বড়দের ধর্ম। কিন্তু একবার কী কারণে তাঁদের মন নরম হয়েছিল, হুকুম বেরল, ছেলেরাও যাত্রা শুনতে পাবে। ছিল নলদময়ন্তীর পালা। ... আর এই যাত্রার আসরে বড়োয় ছোটোয় ঘেঁষাঘেঁষি। তাদের বেশির ভাগ মানুষই, ভদ্দরলোকেরা যাদের বলে বাজে লোক। তেমনি আবার পালাগানটা লেখানো হয়েছে এমন- সব লিখিয়ে দিয়ে যারা হাত পাকিয়েছে খাগড়া কলমে, যারা ইংরেজি কপিবুকের মকশো করে নি। এর সুর, এর নাচ, এর সব গল্প বাংলাদেশের হাট ঘাট মাঠের পয়দা-করা; এর ভাষা পণ্ডিতমশায় দেন নি পালিশ করে।[১৭৫]

বস্তুত শৈশবের এই যাত্রা-অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনের নাট্যভাবনাকে প্রভাবিত করে।

উনিশ শতকের এই যাত্রাকে বলা হচ্ছে সখের যাত্রা। এই সখের যাত্রার ধরনধারণ ও রীতি-প্রকৃতি অনেকটাই আলাদা। সখের যাত্রা দলের গুমোর পেশাদার যাত্রা দলের চাইতে বেশি ছিল। সাধারণ পেশাদার দলে পঞ্চাশ-একশো টাকা দিলে এক রাত অভিনয় করে যেতেন। কিন্তু শখের দল টাকা না নিলেও নানা ঝামেলা করে আয়োজকদের তটস্থ রাখতেন। সখের দলের সাজ-পোশাক সম্পর্কে বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন:

> সখের দলের 'প্রম্পটার' সার্টের উপর ধুতি পরতেন। গায়ে থাকতো কোট। গলায় ঝুলত লাল ফিতেয় বাঁধা বাঁশি (হুইসল)। আর হাতের কাছে থাকতো ঘণ্টা। অভিনেতা ও জুড়ি-দোয়ারদের তিনি বাঁশি ও ঘণ্টা বাজিয়ে নির্দেশ দিতেন।
>
> ... সেকালে শখের দলের যারা আসরে বসতেন, তাদের সকলের পরনে থাকতো ধুতি-পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবী বোতাম কারও থাকতো বাঁকা গলা, কারো থাকতো কাঁধে বোতাম। অনেকে কামিজের ওপর ওয়েস্ট কোট গায়ে দিতেন। কোঁচান চাদর ব্যবহার করতেন প্রায় সকলে। চাঁদর কারও থাকতো গলায় কিংবা বুকে বাঁধা। জুড়িদের গায়ে সাধারণত থাকতো তসরের কিংবা দুধে-গরদের চাপকান। চাপকানের ওপর থাকতো গরদের চোগা, পরনে ঢিলে পায়জামা।[১৭৬]

উনিশ শতকের সখের যাত্রায় নিছক বাস্তবাভিমুখী আনন্দ বিতরণ ছাড়া আর কোনো গভীর উদ্দেশ্য থাকেনি। কলকাতা তখন বণিক-সভ্যতার পীঠস্থান হিসেবে গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। পরিবর্তিত সময়ের স্থূলরুচির সাথে তাল মিলিয়ে যাত্রাগানের বিষয়বস্তু, প্রকাশভঙ্গিমা ও আবেদন থেকে ভক্তি বা অধ্যাত্মচেতনা অনেকাংশে খসে

---

[১৭৫] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছেলেবেলা, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪০২, পৃ. ৭১৭-৭১৮

[১৭৬] বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, *যাত্রাগানের ইতিবৃত্ত*, আশা প্রকাশনী, কলকাতা, প্র. প্র. ১৩৮৪, পৃ.১৫

পড়ে। ক্রমে ক্রমে কলকাতার সখের যাত্রাভিনয়ের স্রোত গ্রামে গিয়েও পৌঁছায়। ফলে গ্রামে-গঞ্জেও পূর্বতন ভক্তিরসের স্থলে বাস্তবমুখী আনন্দদানই মুখ্য হয়ে ওঠে। সমসাময়িক *সমাচার দর্পণ*, *সমাচার চন্দ্রিকা*, *সংবাদ প্রভাকর* প্রভৃতি পত্রপত্রিকা থেকে জানা যায় যে, পুরাতন রীতির যাত্রায় অনেকের মন উঠছিল না। কৃষ্ণলীলার জায়গায় একালের উপযোগী ধর্মভাবজনিত কাহিনি, যেমন: *নলদময়ন্তী* ও *বিদ্যাসুন্দরের* কাহিনি জনচিত্তকে আকর্ষণ করে। ১৮২২ সালে *সমাচার দর্পণে* কলিরাজার যাত্রার প্রথম উল্লেখ করা হয়:

> এইক্ষণে শ্রুত হইল যে কলিকাতাতে নূতন এক যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে অনেক ২ প্রকার ছদ্মবেশধারী আরোপিত বিধি গুণগণ বর্ণনাকারী মনোহর ব্যবহারী অর্থাৎ সং হইয়া থাকে তাহার বিবরণ প্রথমতো বৈষ্ণব বেশধারী ২ সং আইসে দ্বিতীয়ত ঃ ১ সং কলিরাজা তৃতীয়ত ঃ ১ সং রাজার পাত্র চতুর্থ ১ সং দেশান্তরীর বেশধারী বিবিধ উপদেশদানকারী পঞ্চম ২ সং চট্টগ্রাম হইতে আগত পরিষ্কৃত বেশান্বিত এক সাহেব আর বিবি ষষ্ঠ ২ সং ঐ সাহেবের দাসদাসী এ সকল সং ক্রমে আগত একত্র মিলিয়া বিবিধ বেশবিন্যাস বিলাস হাস্য রহস্য সম্বলিত অঙ্গ ভঙ্গ পুরঃসর নর্ত্তন কোকিলাদি স্বর নাক্বত মধুর স্বরে গান নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র বাদন আশ্চর্য ২ প্রশ্নোত্তর ক্রমে পরস্পর মৃদুমধুর বাক্যালাপ কৌশলাদি দ্বারা নানা দিগ্দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ সর্ব্বজন মনোমোহন প্রভৃতি করেন এই অপূর্ব্ব যাত্রা প্রকাশে অনেক ২ বিজ্ঞ লোক উৎসুক এবং সহকারী আছেন অতএব বুঝি ক্রমে ২ ঐ যাত্রার অনেক প্রকার পরিপাটী হইতে পারে।[১৭৭]

১৮২২ সালের ২৩ মার্চ তারিখের *সমাচার দর্পণে* আর একটি যাত্রার প্রসঙ্গ উল্লিখিত –

> নেপ্তেখন্ত উইলেম ফেঙ্কলিন সাহেব কামরূপা নামে যে গ্রন্থ ইংরেজী ভাষাতে মুদ্রিত করিয়াছিলেন সেই গ্রন্থ মোকাম ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত জগমোহন বসুজ বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জমা করিয়া তাহা হইতে কামরূপ নামে যাত্রা প্রকাশ করিয়াছেন। গত ৪ চৈত্র শনিবারে ঐ ভবানীপুরের শ্রী শ্যামলসুন্দর সরকারের বাটীতে ঐ যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে।[১৭৮]

দক্ষিণ ভবানীপুরের অন্য একটি যাত্রা সম্প্রদায় গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে *নলদময়ন্তী* পালা পরিবেশন করে। এই নূতন যাত্রার সংবাদ পরিবেশিত হয় *সমাচার দর্পণের* পাতায় -

> নানা প্রকার রাগ রাগিনী সংযুক্ত গান হয় ও বাদ্য নৃত্য এবং গ্রন্থ মত পরস্পর কথোপকথন এ অতিচমৎকার ব্যাপার সৃষ্টি হওয়াতে বিস্তর টাকা চাঁদা করিয়া ঐ সুরসিক ব্যক্তিরা ব্যয় করিয়াছেন।[১৭৯]

বোঝা যাচ্ছে, এ সময় থেকে কলকাতায় পুরাতন কৃষ্ণযাত্রার প্রভাব হ্রাস পায় এবং এক ধরনের লঘুকৌতুকময় নৃত্যগীতবহুল সখের যাত্রার প্রচলন হয়। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের মধ্যে কৃষ্ণযাত্রার পুরাতন ধরনের

---

[১৭৭] *সমাচার দর্পণ*, ২৬ জানুয়ারি ১৮২২, ১৪ মাঘ ১২২৮, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত ও সংকলিত), *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, প্রথম খণ্ড(১৮১৮-১৮৩০), প্র. প্র.১৩৩৯, ব্যবহৃত পঞ্চম মুদ্রণ-১৪১৫, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ.১৪০

[১৭৮] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত ও সংকলিত), *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, প্রথম খণ্ড(১৮১৮-১৮৩০), প্র. প্র.১৩৩৯, ব্যবহৃত পঞ্চম মুদ্রণ-১৪১৫, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ.১৪০-১৪১

[১৭৯] *সমাচার দর্পণ*, ১৩ জুলাই ১৮২২, ৩০ আষাঢ় ১২২৯, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত ও সংকলিত), *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, প্রথম খণ্ড(১৮১৮-১৮৩০), প্র. প্র.১৩৩৯, ব্যবহৃত পঞ্চম মুদ্রণ-১৪১৫, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ.১৪১

ভক্তিরসসিক্ত বিষয় ও মঞ্চসজ্জা –– কলকাতার দর্শক সমাজে ধীরে ধীরে অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে। তখন পালা পরিচালনায় ও অভিনয়ে নারীরা সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করে। *সমাচার দর্পণ* পত্রিকার পাতায় পাওয়া যায় সেই বিবরণ :

> মনিপুরের এক সম্প্রদায় যাত্রাওয়ালা সংপ্রতি আসিয়াছে ইহারা এই কলিকাতার মধ্যে কোন ২ স্থানে যাত্রা করিয়াছে কেহ ২ দেখিয়া থাকিবেন সংপ্রতি ২৯ শ্রাবণ শনিবার রাত্রিতে কলুটোলানিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল শীলের বৈঠকখানায় ঐ যাত্রা হইয়াছিল তাহারদিগের নৃত্যগীতাদি আরম্ভ ও শেষ পর্য্যন্ত দর্শন ও শ্রবণ করিয়া তদ্বিবরণ স্থুল লিখিতেছি।
>
> আশ্চর্য্য সম্প্রদায় এই স্ত্রীলোকের দল
>
> স্ত্রীলোকেতে কৃষ্ণ সাজি করয়ে কৌশল।।
>
> ললিতা বিসাখা চিত্রা আর রঙ্গদেবী।
>
> সুদেবী চম্পকলতা তং বিদ্যাদেবী।।
>
> ইন্দুরেখা সাজি সবে রাসলীলা করে।
>
> পুরুষে বাজায় বাদ্য নারী তাল ধরে।।
>
> কৃষ্ণের সহিত রঙ্গ করয়ে রসিকা।
>
> রসিকার রূপ গুণ নাহিক নাসিকা।।
>
> গুণবতীদিগের গুণ অতি উচ্চস্বরা।
>
> শুনিলে সে মিষ্টস্বর না যায় পাসরা।।
>
> বাদ্য তালে নৃত্য বটে কিন্তু লম্ফঝম্প।
>
> গান করে জয়দেব মুদ্রা তার কম্প।।[১৮০]

এই সংবাদ প্রচারের কয়েকমাস পরে *সমাচারদর্পণ* এর পাতায় *রাজা বিক্রমাদিত্য* যাত্রার বিবরণ লক্ষণীয় –

> গত ২ বৈশাখ শনিবার রাত্রিতে শ্রীযুক্ত বাবু জগন্মোহন মল্লিকের কালু ঘোষের দরুণ বাগান বাড়ীতে রাজা বিক্রমাদিত্যের যাত্রা হইয়াছিল এ যাত্রার সম্প্রদায় সংপ্রতি প্রস্তুত হইয়াছে শুনা গিয়াছে যে জোড়াসাঁকো নিবাসি কতকগুলি রসিকগুণী এবং ভদ্রলোকের সন্তান একত্র হইয়া সোয়াক করিয়া এই ব্যাপার করিয়াছেন চারিপাঁচস্থানে ইহার আমোদ-প্রমাদ হইয়াছিল... রাজা বিক্রমাদিত্যের অষ্টসিদ্ধির প্রকরণ যাহার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক প্রকাশ আছে সেই পদ্ধতিমত রাজা অমাত্য লইয়া সভায় আছেন এমত কালে একটা রাক্ষস তিনটা শবের মস্তক হস্তে করিয়া রাজসভায় উপনীত হওত জিজ্ঞাসা করে ইহার মধ্যে উত্তম মধ্যমাধম কহিয়া দেও রাজা পণ্ডিতবর্গকে..... তাহার উত্তর করিতে অনুমতি দেন ইত্যাদি ইহাতে নানা প্রকার সং অতি সুসজ্জিত হইয়া আইসে এবং ব্যক্তি বিশেষের সং আসিয়া প্রথমতো নানা রাগরাগিনীযুক্ত সুস্বরে গান করে এই সকল দর্শন শ্রবণ করিয়া তাবৎ লোক হায় হায় ধ্বনি করিয়াছিলেন। [১৮১]

---

[১৮০] সমাচার দর্পণ, ১৯ আগস্ট ১৮২৬, ৪ ভাদ্র ১২৩৩, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত ও সংকলিত), *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৪১-১৪২

[১৮১] সমাচার দর্পণ, ৫ মে ১৮২৭, ২৩ বৈশাখ ১২৩৪, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত ও সংকলিত), সংবাদপত্রে সেকালের কথা, পূর্বোক্ত, পৃ.১৪২

গ্রামীণ শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে, যাত্রার দল গঠনে এক সময় কীভাবে উৎসাহী গ্রামবাসীরা উদ্যোগী হতেন, আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সে বিষয়ে চমৎকার একটি বর্ণনা দিয়েছেন, তাঁর *পূজা-পার্বণ* গ্রন্থে:

> পূজার কয়দিন রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, এই কারণে যাত্রার দল অন্বেষণ করিতে হয়। সে সময় ভাল যাত্রা দুর্লভ, যেমন-তেমন যাত্রাতেই কাজ চলিত। পূজার দুইমাস আড়াইমাস পূর্বে, অনেক যাত্রাদলের উৎপত্তি হইত। যাত্রার পালা ও অধিকারী পাইলেই যাত্রার দল গড়িয়া উঠিত। যাহার যাত্রা বৃত্তি সে তাহা করিত, অধিকারী বাছিয়া বাছিয়া দলে আনিত, জাতি বিচার ছিল না। তাহারা সন্ধ্যার পর আখড়া দিত, আর ভালোমন্দ যাহাই হউক, একটা দল গড়িয়া উঠিত। কৃষ্ণযাত্রা বা সখী-সংবাদ বেশী ছিল। বোষ্টমরা সেসব যাত্রার দল গড়িত।[১৮২]

আমাদের সুপ্রাচীন নাট্যকলা যাত্রাগান কীভাবে জনসাধারণের রুচি অনুসরণ করে পরিবর্তিত হয়েছে এ বর্ণনায় তারই পরিচয় পাওয়া যায়। যাত্রার তদানীন্তন শ্রোতারা কৃষ্ণযাত্রায় বৃন্দাদূতীর হাতনাড়ায় বিরক্ত হওয়ায়, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ থেকে নতুন নতুন যাত্রাপালা তৈরি হয় এবং এভাবেই নানাস্থানে অনেক সখের দলের উদ্ভব হয়। সেই প্রাচীনযুগে কীভাবে শারদোৎসবকে উপলক্ষ্য করে, গ্রামীণ পরিবেশে যাত্রার আসর বসত তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন যোগেশচন্দ্র রায়:

> দেবীর সন্ধ্যারতির পর আসর পড়িয়াছে। গালিচায় ব্রাহ্মণেরা বসিবেন, শতরঞ্জিতে অন্য ভদ্রলোকেরা, মাদুর শপে অন্যেরা, খেজুর-শপে আরও অন্যেরা, আর অতি নিম্নশ্রেণির জন্য তালপাতার চাটাই। কে কোন্ আসনে বসিবে, বলিয়া দিতে হইত না। আটচালায় যাত্রা সম্প্রদায়ের জন্য খেজুর-শপ পাতা থাকিত। তাহাদের এক এক সম্প্রদায়ে ২৫/৩০ জন থাকিত। গ্রামে কেহ তাহাদের বাসা দিত। সকালে তাহাদের লোক আসিয়া হাঁড়ি, কাঠ, পাতা, শপ ও সারাদিনের সিধা লইয়া যাইত। তারপর অধিকারী আসিলে যাত্রা শুরু হইত। সে সময় এদিকে সেদিকে ঢাক পিটিয়া গ্রামবাসীকে যাত্রা শুনিতে ডাকা হইত। সে সময় এদিকে সেদিকে ঢাক পিটাইয়া গ্রামবাসীকে যাত্রা শুনিতে ডাকা হইত। আটজন জুড়ী, আটজন ছোকরা গান করিত। জুড়ীরা পেন্টুলেন-চাপকান-চোগা পরিত। পালা অনুসারে ছোকরাদের বেশ হইত। ক্রমশ রাত্রি বাড়িতে থাকে, চারিদিক নিস্তব্ধ, বাহিরে অন্ধকার, ভিতরে লণ্ঠনের মৃদু আলো। শীতের আবেশ হইয়াছে, শ্রোতাদের কেহ কেহ ঢুলিতেছে, কেহ হাই তুলিতেছে, কেহ খুঁটি ঠেস দিয়া বসিয়াছিল, তাহার মাথা একপাশে হেলিয়া পড়িয়াছে, কেহ উস-খুস করিতেছে, একটু শুইতে চায়, কেহ কলিকা ফুঁকিতেছে।[১৮৩]

যাত্রার এই অবস্থা, উনিশ শতকের শেষ দুটি দশকে মতিলাল রায়ের প্রচেষ্টায় পরিবর্তিত হয়।

২.৫.২ বিদ্যাসুন্দর যাত্রা

শোষণে অত্যাচারে জর্জরিত গ্রামীণ বাঙালি পিছনে সব স্থাবর–অস্থাবর সম্পত্তি ফেলে এলেও গ্রামবাংলার সংস্কৃতিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে নগর কলকাতায়। তবে বনেদি জমিদারের সঙ্গে 'নিও-রিচ' (neo-rich) শঙ্কর সৌখিন বাবুদের রুচি ও মেজাজ ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে সুশীল কুমার দের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য –

---

[১৮২] উদ্ধৃত. প্রভাতকুমার দাস, যাত্রার সঙ্গে বেড়ে ওঠা, কারিগর, কলকাতা, প্র.প্র.২০১৪, পৃ. ২০৪

[১৮৩] উদ্ধৃত. প্রভাতকুমার দাস, যাত্রার সঙ্গে বেড়ে ওঠা, কারিগর, কলকাতা, প্র.প্র.২০১৪, পৃ. ২০৪-২০৫

> ...yet the wealthy aristocracy, which for a long time constituted the main support of society and great patron of arts and literature, was slowly breaking down under the stringent rules which put up their large estates to public auction at the mercy of the highest bidder. The class of upstart zaminders who stepped into their place could not be expected to posses the same inherited tradition of culture and refinement as marked the ancient aristocracy of the land.[১৮৪]

শহরে এই 'নব্য' বাবুদের মনোরঞ্জনের জন্য ছাঁটকাট করা অন্নদামঙ্গল কাব্যের শৃঙ্গাররসসিক্ত বিদ্যাসুন্দর অংশ নিয়ে তৈরি হয় নতুন যাত্রাপালা *বিদ্যাসুন্দরের পালা*। সুকুমার সেন জানান, 'অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে, সম্ভবত তার আগেও, বিদ্যাসুন্দর যাত্রা ধর্মীয় বৈঠক ও শহরে বারোয়ারিতে সমাদৃত ছিল – বাংলায় নেপালে এবং হয়ত মিথিলাতেও।'[১৮৫] বলা যায়, বাবুদের সেবাদাসী হয়ে থাকে লোকশিল্পের এই নতুন সংস্করণ। সৃষ্টি হয় নতুন রকমের পুরোনো যাত্রা। তখন বুলবুলি ওড়ানো, ঘুড়ি ওড়ানো থেকে আরম্ভ করে ঘোড়দৌড়ও ছিল বাবুদের নতুন সখের সামগ্রী। তাই ঐ বিদ্যাসুন্দর যাত্রাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে সখের যাত্রাদল। শহুরে যাত্রা যখন তার অস্তিত্বকে রাখার জন্য আপ্রাণ সচেষ্ট, গ্রামীণ আঙ্গিনায় তখনও কৃষ্ণযাত্রার শেষ আবেশ বিরাজ করছে। এই সময়ের যাত্রাকে সুকুমার সেন তিনটি ভাগে ভাগ করেন:

> অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে যাত্রার তিনটি সম্পূর্ণ পৃথক রীতি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পুরনো ভক্তি-রসময় পদ্ধতি রয়ে গেল 'কৃষ্ণযাত্রা'য় বা 'কালিয়দমন'-এ, চৈতন্য-যাত্রায় চণ্ডীযাত্রায়। নতুন অশ্লীল কৌতুক রসাত্মক রীতি খাড়া হল বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর, বিট-বার নারীর, ঘেসেড়া-ঘেসেরানীর, ভিস্তি মেথেরানীর সঙ্গে আর আদিরসাল ধারা পুষ্ট হল বিদ্যাসুন্দর যাত্রায়।[১৮৬]

শহুরে রুচির সংস্পর্শে এসে যাত্রাগান ভিন্নমাত্রায় প্রবাহিত হয়। খেমটা, টপ্পা, হাফ-আখড়াই ইত্যাদি 'বাবু সমাজে'র নানা অনুষঙ্গের প্রবেশ ঘটে এই শিল্পে। এই মিশ্ররীতির আসরে জায়গা করে নেয় বিভিন্ন সঙ। সুকুমার সেন লিখেছেন –

> ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু হইতে কলকাতা অঞ্চলে প্রাচীন যাত্রা পদ্ধতিতে একটা পরিবর্তন ঘটেছিল। কৃষ্ণলীলা-চৈতন্যলীলা-দেবীলীলার স্থানে দক্ষযজ্ঞ-ধ্রুবচরিত্র-কমলেকামিনী-নলদময়ন্তী-শ্রীবৎস চিন্তা ইত্যাদি পৌরাণিক উপাখ্যান এবং বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর মতো অপৌরাণিক আদিরসাত্মক আখ্যায়িকা অধিক আদরণীয় হইতেছিল। সেইসঙ্গে নাচগানের বাহুল্যে এবং সঙের ও ভাঁড়ামির আবশ্যিকতা দেখা দিয়েছিল।[১৮৭]

---

[১৮৪] Sushil Kumar De, *Bengali Literature in the Nineteenth Century(1757-1857)*, Firma K.L. Mukhopadhyay, 2nd edition 1962, p.25

[১৮৫] সুকুমার সেন, *নট নাট্য নাটক*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ব্যবহৃত দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯১, পৃ. ৮৬

[১৮৬] 'বিচিত্র সাহিত্য'- মঙ্গলযাত্রা, নাটগীত ও পাঁচালী কীর্তন, পৃ. ৪১, উদ্ধৃত. অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়, *সামাজিক চালচিত্রে যাত্রাগান*, ভারবি, কলকাতা, প্র. প্র. ১৯৯৮, পৃ. ৪৭

[১৮৭] সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, উদ্ধৃত. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, *বাঙলার প্রথম*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্র.প্র.১৩৮৭, পৃ.১২৩

উনিশ শতকের প্রথম ভাগেই কৃষ্ণযাত্রার পাশাপাশি কলকাতায় ও তার চারপাশে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দল গড়ে ওঠে। *বিদ্যাসুন্দর যাত্রা* সম্বন্ধে তৎকালীন *সমাচার দর্পণের* (১৮২১ সালে ১৬ জুন) খবর : 'বিদ্যাসুন্দর যাত্রা।। ভারতচন্দ্র রায় কৃত অন্নদামঙ্গল ভাষাগ্রন্থের অন্তঃপাতি বিদ্যাসুন্দর বিষয়ক এক প্রকরণের ধারানুসারে এক যাত্রা সৃষ্টি হইয়াছে।'[১৮৮] ঐ বিদ্যাসুন্দর যাত্রাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে সখের যাত্রাদলের। বরাহনগরের রামজয় মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ১৮২২ সালে প্রথম বিদ্যাসুন্দর যাত্রা করেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা সাক্ষ্য:

> এ দলে রাধামোহন (চট্টোপাধ্যায়) প্রথমে সাজতেন সুন্দর এবং পরে রাজা বীরসিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। ঈশানচন্দ্র অভিনয় করতেন বিদ্যার ভূমিকায় এবং কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায় সুন্দরের অংশ নিতেন। সেকালে সুপ্রসিদ্ধ ওস্তাদি গায়ক নিমাই মিত্র, তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস ভট্টাচার্য ও কেবলরাম পাল এই যাত্রার প্রারম্ভে 'নান্দী' অংশে গান গাইতেন। ঢোল বাজাতেন বিখ্যাত ঢোল বাজিয়ে রামধন মিস্ত্রী।[১৮৯]

জোড়াসাঁকোর রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় (মৃ.১২৬৯ বঙ্গাব্দ) যে শখের দল গড়েন –– তাতে 'নন্দবিদায়' নামে একটি যাত্রায় প্রথম স্ত্রী-পুরুষের মিলিত অভিনয়ের সূচনা ঘটে। নূতন যাত্রায় গান ও সুর বড়ো রকমের জায়গা দখল করে নেয়। 'উচ্চাঙ্গের রাগ রাগিনীর আলাপ, খেয়াল, টপ্পা, হাফ-আখরাই গান এবং কীর্তন গানের ব্যবহার এ সকল যাত্রাভিনয়ে দৃষ্ট হয়।' নূতন যাত্রায় গানের সঙ্গে নাচের মিশ্রণ ঘটে। সুরবৈচিত্র্য, প্রচুর দামি সাজ-পোশাক, থিয়েটারি ধরনের সংলাপ –– এ নূতন যাত্রার চিহ্ন। *নল-দময়ন্তী*, *রাজা বিক্রমাদিত্য*, *নন্দ বিদায়* এবং বিশেষ করে বিদ্যাসুন্দর পালা এ সময় বিখ্যাত হয়।

হাওড়া জেলার উত্তর ব্যাঁটরার ঠাকুরদাস দত্তের **(১৮০১-১৮৭৬)** তত্ত্বাবধানে বিদ্যাসুন্দরের একটি দল গঠিত হয়। পালা রচনায় তিনি অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের বর্ণনায়:

> একই পালা তিন চার পাঁচ রকমে রচনা করিতে পারিতেন।... তিনি বিদ্যাসুন্দরের পাঁচরকম পালা রচনা করেন। একটি নিজের দলে (১২৩৭/৩৮) [ব্যাঁটরার উমাচরণ মুখোপাধ্যায় এই দলে মালিনী সাজিয়াছিলেন], একটি গজার দলে, একটি টাকীর মুনসীদের দলে, একটি কালী হালদারের দলে এবং একটি কৈলাস বারুই-এর দলে অভিনীত হয়। পাঁচখানি বিদ্যাসুন্দর পালার কোনখানির সঙ্গে কোনখানির মিল নাই।[১৯০]

বিদ্যাসুন্দরের পাশাপাশি তিনি রচনা করেন *হরিশচন্দ্র*, *লক্ষ্মণ-বর্জন*, *রাবণবধ*, *শ্রীবৎস-চিন্তা* এবং *কলঙ্কভঞ্জন* প্রভৃতিপালা। সংগীত-নির্ভরতা তাঁর যাত্রাপালার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও বরাহনগরের ঠাকুরদাসের এক প্রতিদ্বন্দ্বী

---

[১৮৮] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত ও সংকলিত), *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, প্রথম খণ্ড(১৮১৮-১৮৩০), প্র. প্র.১৩৩৯, ব্যবহৃত পঞ্চম মুদ্রণ-১৪১৫, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ.১৪০

[১৮৯] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (খণ্ড ৪), মডার্ণ বুক এজন্সী প্রইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৩, পৃ. ৫৫৮

[১৯০] অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, *বাঙলার প্রথম*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্র.প্র.১৩৮৭, পৃ.১২৩

দল বিদ্যাসুন্দর যাত্রা আরম্ভ করে। সেকালের বিখ্যাত গায়ক ও নর্তক মধুসূদন ভট্টাচার্য মালিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। রাধামোহন চট্টোপাধ্যায় নকিব, রামচন্দ্র ভাদুরী বিদ্যা এবং রাজনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দর সাজতেন। ঠাকুর দাসের মৃত্যুর পর তাঁর দলের অন্যতম অভিনেতা রামধন ভাঙা দলের লোকজন জুটিয়ে পেশাদারি দল তৈরি করেন। এই বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় নিমাই মিত্র, তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপরাম চট্টোপাধ্যায় ও কাশীনাথ ভট্টাচার্য সুরে পয়ার আবৃত্তি করতেন এবং গানে দোয়ারকিও করতেন। পালা আরম্ভের আগে টানাসুরে পালা সম্পর্কে বিবৃত করা হয়। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় ছড়া কাটান। এটি কালীয়দমন যাত্রার পরিবেশনার সাবেক রীতি। এভাবে বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় আদি কৃষ্ণযাত্রার আঙ্গিক স্বীকৃত হয়। বিখ্যাত কালোয়াত বিশ্বনাথ ধ্রুপদী এই দলে উচ্চাঙ্গের গানে অংশ নিতেন। রামধনের ঢোল ও নারায়ণ দাসের বেহালার জন্য এই দলের সংগীত খ্যাতি লাভ করে। পৃষ্ঠপোষক নবীনচন্দ্র বসুর কাছ থেকে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার 'সাট' (পাণ্ডুলিপি) নিয়ে বরাহনগরে নতুন বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দল করেন। এই দলে নন্দ যুগী অসাধারণ দক্ষতায় মালিনীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। যাত্রার শুরুতে বা গাওনার মাঝে মাঝে বিরতির সময়ে সং বের করার রীতি তখন থেকেই প্রচলিত হয়। বরাহনগরের নিকটবর্তী এঁড়েদহের ঠাক্‌রো যুগী ও শিবে যুগী বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় খ্যাতি অর্জন করে। সময়ের পালাবদলে এই দলটিও ভেঙ্গে যায়। সেই ভাঙা দল নিয়ে রিষড়াগ্রামের কৈলাস বারুই নতুন বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দল গঠন করেন। বিদ্যাসুন্দর যাত্রার যে 'ভোড়াইগান' (অর্থাৎ প্রভাতে নিদ্রাত্থাণের গান) আছে, সেটি এঁরই রচনা, গোপাল উড়ের নয়। যেমন:

গা তোললো নিশি অবসান প্রাণ
বাঁশবনে ডাকে কাক মালী কাটে কপিশাক
ধোপার পিঠে বোঝাই দিয়ে রজক যায় বাগান।
আজকার মত আসি, উঠ ওলো প্রাণপ্রেয়সী।
স্বস্থানেতে গেল শশী, জাগিল সব প্রতিবাসী
বিধুমুখে মধুর হাসি, কোকিল করে গান।[১৯১]

ভবানীপুরের বেলতলার দল বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় কিছু নতুনত্বের সূচনা করে। তাঁদের দলপ্রধান ছিলেন বেহালা-বাদক ভিক্ষুক প্যারীমোহন। প্যারীমোহনের রূপের খ্যাতির জন্য তাঁর প্রতি এক নৃত্যগীত পটীয়সী বারাঙ্গনার নজর পড়ে। সেই নারীর সহযোগিতায় প্যারীমোহন বেলতলার দল নামে বিদ্যাসুন্দরের যাত্রাদল গড়ে তোলেন।

[১৯১] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.২৫

অভিনয়ের রীতি-পদ্ধতি, সাজ পোশাক ও সংগীত পরিচালনা সবক্ষেত্রে প্যারীমোহন তৎকালীন যাত্রায় আধুনিকতা আনয়ন করেন। জনপ্রিয়তার কারণে সে সময় তাঁর পালার গানগুলো মানুষের মুখে মুখে গীত হয়:

আমি আর যাবনা তোমার সনে, তুমি ফচ্‌কে মেয়ে।
পুরুষ দেখলে অমনি থাকো তার পানেতে চেয়ে।।
ঘরে থাকো ঘোমটার আড়ে, মাঠে ঘাটে রঙ্গ বাড়ে।
পুরুষ দেখতে পড়ো ঘাড়ে, কুলের ভয় থাকে না।
নষ্ট মেয়ের দুষ্ট স্বভাব কখনও ঘোচে না।।[১৯২]

এই বিদ্যাসুন্দর যাত্রাভিনয়ে মহিলা শিল্পীরা অংশ নেন। সেই সময় রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের (?-১৮৫৯) রক্ষিতার পরিচালনায় একটি বিদ্যাসুন্দর যাত্রাদল গড়ে ওঠে। বারাঙ্গনা-গায়িকারা এই দলে যোগ দেন। হাড়কাটা গলির ধনি স্বরূপ দত্ত আরেকটি বিদ্যাসুন্দর যাত্রা দল গড়ে তোলেন। ১৮২৭ সালে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের বর্ণনায় হলধরের যাত্রার দলের উল্লেখ পাওয়া যায়: 'বাবুদের বাড়ি বাড়ি বিদ্যাসুন্দর পালা, শুম্ভ-নিশুম্ভ প্রভৃতি পালা অভিনয় করিয়া সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল।'[১৯৩]

বিদ্যাসুন্দর পালার অভিনয় ক্রমে গ্রামে-গঞ্জেও বিস্তার লাভ করে। এই সময়ে ধনেখালির কাছে বোসো গ্রামে এক সখের দল হয়। নিরক্ষর বাগ্‌দী এই পালায় যে গান বেঁধেছিলেন তা সবাইকে চমকে দেয়:

কি শোনাব রূপের কথা, একমুখে বা বলব কত।
উন্মত্ত হয় পতিব্রতা, মন্মথ হয় অভিভূত।।
বদনে দিয়েছে দেখা ঈষৎ গোঁফের রেখা,
ইথে কি কুল যায় গো, রাখা, কুলবতীর কুল হত।।[১৯৪]

২.৫.২.১ গোপালচন্দ্র দাস (১৮১৯-১৮৫৯)

তৎকালীন উৎকল দেশে (বর্তমানে উড়িষ্যা) কটক জেলার জাজপুর গ্রামে গোপালচন্দ্র দাসের জন্ম হয়। তিনি কৈশোরেই কলকাতায় আসেন। তখন মনোহারী দ্রব্য বিক্রয় করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। পরে তিনি বৌবাজারের ধনী বাসিন্দা রাধামাধববাবুর যাত্রাদলে যোগদান করেন। দুর্গাদাস লাহিড়ির (১২৬০-১৩৩৯) বর্ণনায় ওঠে আসে গোপালের প্রথম যাত্রাদলে প্রবেশের বর্ণনা:

---

[১৯২] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.২৬

[১৯৩] অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, *বাঙলার প্রথম*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্র.প্র.১৩৮৭, পৃ.১২৭

[১৯৪] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.২৭

> গোপাল যখন কলকাতায় আসে তখন তাহার বয়স ১৮/১৯ বৎসর।... সেই সময় কলিকাতার বহুবাজারে রামমোহন সরকার নামক এক গণ্যমান্য লোক বাস করিতেন। তিনি বিদ্যাসুন্দরের একটি যাত্রার দল স্থাপন করেন। রাধামোহনের বয়স তখন ত্রিশ বৎসর। যাত্রার আখড়াই রাত্রিকালে হইত, কিন্তু সারাদিন বৈঠক চলিত। বহুবাজারের মতিলাল গোষ্ঠী, (হৃদয়রাম) বাঁড়ুজ্যে গোষ্ঠী, ধর গোষ্ঠী সকলেই এই যাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে 'স্টোলমেক্স' অনুবাদক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যাত্রায় সখী সাজিতেন। একদিন মধ্যাহ্নের বৈঠক চলিতেছে, এমন সময় একজন ফেরিওয়ালা 'চাঁপা কলা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার বৈঠকখানার বাবুদের কর্ণে আসিল। বিশ্বনাথ মতিলাল তৎক্ষনাৎ হুকুম দিলেন – 'ওরে কে আছিস্ রে, গান্ধার বলছে, চাঁপা কলাওয়ালাকে ধরে আন।' লোকজন গিয়া চাঁপা কলাওয়ালাকে ধরিয়া আনিল। এই চাঁপা কলাওয়ালা গোপাল উড়ে।[১৯৫]

রাধামোহনের দলের সাথে হঠাৎ সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়ায় গোপালের জীবনে নতুন সম্ভাবনার পথ খুলে যায়। দলের প্রসিদ্ধ ওস্তাদ গাইয়ে হরিকিষণ মিশ্রের কাছে গোপালের সংগীত শিক্ষা শুরু হল এবং কিছুদিনের মধ্যে তিনি ঠুংরি গানে দক্ষ হয়ে উঠেন। অত্যন্ত সতর্ক ও খুঁতখুতে যাত্রা-অধিকারী রাধামোহন সরকার প্রায় দু'বছর প্রস্তুতির পর শোভাবাজারে নবকৃষ্ণ দেবের (১৭৩৩-১৭৯৭) বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর পালায় মালিনীবেশে গোপালকে উপস্থাপন করেন। প্রথম অভিনয়েই গোপাল নৃত্যগীতে দর্শক-শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেন। রাধামোহনের মৃত্যু হলে গোপাল যাত্রাদলের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গোপালচন্দ্র দাসের প্রযোজনায় 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রার প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে। পালাকে জনপ্রিয় করার জন্য তিনি যাত্রায় বহু পরিবর্তন আনয়ন করেন। গোপাল তাঁর পালাগুলির নৃত্যে নতুন রীতি প্রবর্তন করেন। পয়ারের ব্যবহারকে এড়িয়ে তিনি গান ও নাচকে একত্রে বেঁধে একটি ব্যালে তৈরি করেন। বৈষ্ণব পরিমণ্ডল প্রভাবিত তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' পালায় অনূঢ়া নায়িকা পরকীয়ায় আসক্ত হয়। তবে এই পালা আদিরস-ভিত্তিক এবং আধ্যাত্মিকতা বর্জিত। প্রচলিত ঝুমুর সংগীত ও কৃষ্ণযাত্রার গঠনরীতির সঙ্গে যুক্ত হয় গোপালের নিজস্ব ঠাট। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের (১৮৬০-?) বর্ণনায় :

> সহজ বাঙ্গালা ভাষায় গান সংগ্রহ করিয়া গোপাল নতুন পালার সৃষ্টি করিল। শুনিতে পাই গোপাল উড়ের গান –– গোপালের দ্বারা একটিও রচিত নহে। কৈলাস বারুই, শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় ও হুগলী জেলার সিঙ্গুর-গোপালনগর নিবাসী ভৈরব হালদার প্রভৃতির অনেক ভালো গান বিদ্যাসুন্দরের টপ্পায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। যিনিই গান বাঁধুন না কেন অস্তিত্ব আর কাহারও নাই, আছে কেবল গোপাল উড়ের।[১৯৬]

---

[১৯৫] দুর্গাদাস লাহিড়ি, *বাঙালির গান*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্র.প্র.১৯০৫, ব্যবহৃত প্রথম পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সংস্করণ : এপ্রিল ২০০১, কলকাতা, পৃ.৩৬০

[১৯৬] হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, *গোপাল উড়ের টপ্পা*, ভূমিকা, উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ. ২৯

দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন –– 'শব্দমন্ত্রে গোপাল উড়ে কত উৎসবের রাত্রিকে যে উজ্জ্বল করিয়াছেন – তাহার ইয়াত্তা নেই। সেই তরল হাস্য সে নৃত্য, সেই সকল মিষ্টি কথা, যে দেখিয়াছে, শুনিয়াছে, সে জীবনে ভুলিবে না।'[১৯৭] জনপ্রিয়তার কারণে পরবর্তীকালে 'গোপাল উড়ের টপ্পা' কখনও খণ্ডিতভাবে, কখনও পুরো পালা আবার কখনও অন্য রচয়িতার *বিদ্যাসুন্দর* নাটক বা যাত্রাপালায় একাধিকবার সংযুক্তি বা মুদ্রণ ঘটে। এমনকি বহুগান পরবর্তীকালের গ্রামোফোন রেকর্ডেও ধারণ করা হয়। সেকালে সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত গোপালের গান :

ভ্রমরেতে গুনগুন করে, কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া।।
ভ্রমরা ভ্রমরী সনে, আনন্দিত কুসুম বনে,
আমার ঐ ফুল বাগানে,
তিলেক নাই বসন্ত ছাড়া।।

গোপালের বিদ্যাসুন্দর পালায় গদ্য সংলাপের কোনো প্রয়োগ ছিল না। পালার প্রেক্ষাপট রচনা করা হয় কালুয়া মেথরানি ও ভিস্তির গান দিয়ে। পালায় প্রথম থেকেই নাচ-গান দিয়ে আসর জমিয়ে তোলার প্রয়াস লক্ষণীয়।

সময়ের বিবর্তনে গানের ভাষাতেও পরিবর্তন দেখা যায়। এতে প্রভাব পড়ল সমকালীন বাবু সংস্কৃতির। *কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা* গ্রন্থে মহেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৮-১৯৫৬) জানিয়েছেন: 'তখনকার দিনে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা বড় লোকপ্রিয় ছিল। তাহার ভিতর মালিনীর পালা খুব ভালো গাওয়া হইত। মালিনী আসিয়া গাহিত, 'ঐ দেখা যায় আমার বাড়ি, চৌদিকে মালঞ্চ ঘেরা।'[১৯৮]

মূলত ভারতচন্দ্রের (১৭১২-১৭৬০) *বিদ্যাসুন্দর*কে উপজীব্য করেই গোপালের পালাটি বিন্যস্ত হয়েছে। ভারতচন্দ্রের বাকভঙ্গিও কোথাও কোথাও গৃহীত হয়েছে। দৈবস্তুতি, কৌতুক, নিষিদ্ধ প্রেমের প্রতি দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা এ পালার উপজীব্য। ভিনদেশি এক রাজকুমার সুন্দরের সঙ্গে গুপ্তপ্রণয়ের ফলে রাজকুমারী বিদ্যার গর্ভবতী হওয়া এবং পরে দেবী কালিকার বরে বিদ্যা-সুন্দরের বিবাহ – এ কাহিনির বিন্যাসে গোপালের পালা শ্লীল-অশ্লীলতাকে ছাপিয়ে সকলের মনে সাড়া জাগায়। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় আরও জানিয়েছেন:

> গোপাল উড়ের টপ্পায় একদিন বঙ্গদেশ মোহিত হইয়াছিল।... প্রত্যেক গান সুরের সঙ্গে একেবারে যেন মাখামাখি হইয়া আছে। গানের ভাষা শুনিলেই, সুর যেন কোথা হইতে আপনা আপনিই কণ্ঠে আসিয়া পড়ে।[১৯৯]

---

[১৯৭] দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, ২য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্র.প্র. ১৯৩৫ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ব্যবহৃত সংস্করণ ২০০৬, পৃ. ১০০৯

[১৯৮] মহেন্দ্রনাথ দত্ত, *কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা*, উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ. ৩০

[১৯৯] হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, *গোপাল উড়ের টপ্পা*, ভূমিকা, উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ. ৩১

বাংলার বৈষ্ণব কীর্তনের ছন্দের সঙ্গে ওড়িয়া নৃত্যের ছন্দের প্রয়োগ নৈপুণ্যে তাঁর যাত্রা জনতার কাছে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। শহুরে রুচি ও জনপ্রিয়তার চাহিদায় রাধাকৃষ্ণের স্থলে বিদ্যাসুন্দর জায়গা করে নেয়। প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৮৩) অভিজ্ঞতাও হুতোমের মতোই:

> পূজার সময় নবমীর রাত্রে বাটীতে বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা হচ্ছে – ভবানীবাবু সমস্ত রাত্রি তাকিয়ার উপর হাত দিয়া ঝিমুচ্ছেন – একবার বোধ হচ্ছে যেন পড়ে গেলেন। ভোরে তোপের শব্দে চমকিয়া উঠিলেন, চোক খুলে চারিদিকে ফেল্ ফেল্ করিয়া দেখ্তে দেখ্তে যাত্রাওয়ালাদের বলিলেন – "শালারা! সারারাত কেবল মালিনীর গান শুনায়ে হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়েছিস্ – কৃষ্ণ বাহির কর – যাত্রাতে কৃষ্ণ নাই? তো বেটাদের থামে বেঁধে মারব।" কৃষ্ণ বাহির করিবার গোল হইতে হইতে সূর্য্য উদয় হইয়া পড়িল। নিকটস্থ দুই এক ব্যক্তি বলিল কৃষ্ণ এসময় গোষ্ঠে গমন করিয়াছেন – এখন কৃষ্ণ কোথায় পাওয়া যাবে?[২০০]

সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৭-১৮৮১) ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) এর উদ্যোগে জোড়াসাঁকো থিয়েটার প্রতিষ্ঠা হয়। গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিঠিতে (১৪ জুলাই ১৮৬৭) প্রকাশ :

> My dear Goonoodada--
> The Origin of the Jorasanko Theatre, is now hidden in the deep folds of rusty antiquity!! … It was *GOPAL OORIAH'S JATRA*, that suggested us the idea of projecting a theatre. [২০১]

অর্থাৎ যাত্রা শুনেই জোড়াসাঁকো নাট্যশালা গড়ে তোলার আগ্রহ বোধ করেন তাঁরা। এভাবে সমসাময়িককালে তো বটেই পরবর্তীকালেও যাত্রায় গোপালের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব সমাদৃত ছিল। তাঁর যাত্রাপথেই আরেকটি থিয়েটার সূচনা হয়। ব্যোমকেশ মুস্তফীর বর্ণনায়:

> অর্দ্ধেন্দুবাবু দুইবার যাত্রা করিয়া [ঊষা অনিরুদ্ধ ও শকুন্তলা]... বাজনার প্রতি একটু বেশী আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং শকুন্তলার যাত্রার দল ভাঙ্গিয়া গেলে, প্রথমে ধর্ম্মদাসবাবুর বাড়ীতে তাহার পর ১৭৯ নং আপার চিৎপুর রোডে একটি একতান-বাদনের দল গঠন করেন। নগেন্দ্রবাবু, রাধামাধববাবু, হিঙ্গল খাঁ, নন্দবাবু যোগেন্দ্রবাবু, এই দলে যোগ দেন। এই বাজনার দলেও অর্দ্ধেন্দুবাবু একটি নূতন প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। এতদিন যত কনসার্টের দল হইয়াছে সবাই 'ডি' সুরে বাজাইত। অর্দ্ধেন্দুবাবু নিজের দলে একবারে 'এফ' বাজনার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। চড়া সুরে বাজাইবার খাতিরে এই দলের বিশেষ আদর ছিল। ১২৭৭ সালের [ইংরেজি ১৮৭০] রাসপূর্ণিমার দিন শোভাবাজার বেনেটোলায় কাঁন্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্যর বাড়িতে হাওড়া ব্যাঁটরার এক নাট্য সম্প্রদায় 'প্রভাবতী' অভিনয় করেন। 'প্রভাবতী' সেক্সস্পীয়ারের 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস'

---

[২০০] টেকচাঁদ ঠাকুর, মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), *প্যারীচাঁদ রচনাবলী*, কথাকলি, ঢাকা, প্র.প্র.১৯৬৮, পৃ.২০৪

[২০১] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫-১৮৭৬)*, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, প্র. প্র.১৩৪০, ব্যবহৃত সপ্তম সংস্করণ ১৪০৫, পৃ.৬২

> অবলম্বনে লিখিত। এই অভিনয়ের সঙ্গে অর্দ্ধেন্দুবাবুর এই বাদ্যসম্প্রদায় বাজাইয়াছিলেন। এই সময়ে হাটখোলার প্রসিদ্ধ মহাজন ব্রজেন্দ্র কুমার সাহা ওরফে দিপু সাহার গদীর কর্ম্মচারী শ্রী গোবিন্দনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তির সহিত নাট্যসম্প্রদায়ের আলাপ হয়। আখড়ার খরচ চালাইতে স্বীকৃত হওয়ায় অর্দ্ধেন্দুবাবু আবার থিয়েটারের দল গড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্বে সে হরলাল মিত্রের স্ট্রীটে শ্রী অরুণচন্দ্র হালদারের বাড়িতে বাগবাজার 'অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায়' সধবার একাদশীর আখড়া দিতেন, সেই স্ট্রীটের ২৮ নং বাড়ী গোবিন্দবাবুর শ্বশুরবাড়ী। ইহার উত্তর পূর্ব কোণে বড় বৈঠকখানায় এবার দল বসিল। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা নরেন্দ্রবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু, রাধামাধববাবু ও ধর্ম্মদাসবাবু। এইবার যে দল বসিল ইহাই সুপরিচিত ন্যাশনাল থিয়েটারের মূল।'[২০২]

তবে গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি বাবুসমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করলেও শিল্প হিসেবে কোন বিশেষত্ব অর্জন করতে পারেনি। এ সময়ে যাত্রার 'বিকৃতি' সম্পর্কে বলতে গিয়ে অজিতকুমার ঘোষ জানিয়েছেন:

> ভারতচন্দ্রের পরে আমাদের সাহিত্যের ধারা বিকৃত এবং নিম্ন রুচির খাতে বহিতে লাগিল। মুসলমান রাজত্বের অবসান হইয়াছে, ইংরাজ শাসনও দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। রাজ্যের মধ্যে অরাজকতা, সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা এবং লোকের মনে শৈথিল্য এবং অনাস্থা বাস করিতেছে। এই রকম অবস্থার মধ্যে কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সাহিত্যের উৎপত্তি হইতে পারে না, এবং ভারতচন্দ্রের পরে সেই কারণেই বহুদিন পর্যন্ত কোন কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের অভ্যুদয় হয় নাই। অথচ দেশের লোকের রসপিপাসা বর্তমান, তাহাই মিটাইবার জন্য এই সময়ে কবি, পাঁচালী, তর্জা, হাফ আখড়াই এবং যাত্রা প্রভৃতি গানের ব্যাপক চর্চা হইতে লাগিল। এই সব গানের রচয়িতারা ভারতচন্দ্রের সাহিত্য আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুরুর কবিত্বশক্তি, এবং রচনানৈপূণ্য তাঁহাদের মধ্যে ছিল না, কিন্তু গুরুর অশ্লীলতা অবাধ এবং অপরিমিত প্রশ্রয় পাইয়া তাহাদের সাহিত্যের হাট জমাইয়া রাখিল। নিম্ন রুচিগ্রস্থ দর্শকবৃন্দও এই বিকৃত রস প্রবাহে মনের আনন্দে সাঁতার কাটিতে লাগিল। রুচি এবং শালীনতার লেশটুকু পর্যন্ত তাহারা নির্বিকার চিত্তে নির্বাসন দিয়াছিল। তখনকার যাত্রাও সাহিত্যের এই সর্বাঙ্গীন বিকৃতি ও অশ্লীলতার সহিত যোগ রক্ষা করিয়াছিল।[২০৩]

যাত্রার এই অধঃপাতে যাওয়া সম্পর্কে গবেষক সমালোচকদের মধ্যে ঐকমত্য দেখা যায়।

২.৫.৩ গীতাভিনয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭) স্থাপনের সমসময়েই সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা ঘটে। একই সময়ে স্বাজাত্যবোধ ও আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ বাঙালি ১৮৫৭ সালে হিন্দুমেলার প্রচলন করে। এই নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জেগে ওঠে মঞ্চাশ্রয়ী বাংলা নাটকের আকাঙ্ক্ষা আর অশ্লীলতাযুক্ত যাত্রাগানের রসাস্বাদনে অনাগ্রহ। এই রকম নাটক-যাত্রাগানের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হয় 'গীতাভিনয়' – যা অচিরেই জনপ্রিয়তা পায়। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য জানিয়েছেন –

---

[২০২] ব্যোমকেশ মুস্তফী, *বঙ্গীয় রঙ্গালয়*, এক্ষণ (শারদীয় ১৩৮০), পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭

[২০৩] অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, জেনারেল, কলিকাতা, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত অষ্টম সংস্করণ জুন ১৯৯৯, পৃ ১১

> যাত্রার গীতাভিনয় পূর্ব প্রচলিত দীর্ঘ গীত রীতি হইতে পৃথক এক ধরণের সংক্ষিপ্ত বহু গীতযুক্ত পালা যাহাতে সংলাপ, বক্তৃতা, গীত ও দোহার ব্যবহৃত হয় এবং ভক্তি ও করুন রসের প্রাধান্য থাকে।[২০৪]

সংবাদ প্রভাকরের ভাষ্যমতে –

> প্রচলিত যাত্রাগুলির প্রতি যথার্থ সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিগণের নিদারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। রঙ্গভূমি করিয়া নাটকের অভিনয় করা অধিক ব্যয়সাধ্য বিবেচনায় কলিকাতার কয়েকজন শিক্ষিত যুবক সামান্যতঃ তৎপ্রণালীতে গীতাভিনয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা এদেশের শ্লাঘনীয় অনুষ্ঠান সন্দেহ নাই।

গীতাভিনয়ের অন্যতম স্রষ্টা মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) উল্লেখ করেন:

> ইউরোপীয় রঙ্গভূমিতে নাটকাভিনয়কালে গানের অভাব দেখিয়াই তাঁহারা এই সংস্কারের বশ্যতাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যে ইউরোপ নয়, ইউরোপীয় সমাজ আর স্বদেশী সমাজ যে বিস্তর বিভিন্ন, ইউরোপীয় রুচি ও দেশীয় রুচি যে সম্যক স্বতন্ত্র পদার্থ তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। ... আমরা চাই দেশে পূর্বে যাহা ছিল, তাহা ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও। আমরা চাই সেই যাত্রার গান সংখ্যায় কমাইয়া ও গাইবার প্রণালীকে সংশোধিত করিয়া নাটকের স্বভাবানুযায়ী কথোপকথনাদি বিবৃত হউক।

সেই সংশোধিত যাত্রাগানের নাম 'গীতাভিনয়'। এরপর ১৮৭২ সালে স্বাদেশিক চেতনায় জাগ্রত বাঙালি 'ন্যাশনাল থিয়েটার' স্থাপন করে। সেই রঙ্গমঞ্চের অধিনায়ক হয়ে এলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। *শর্মিষ্ঠা* নাটকের মধ্য দিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) বাংলা নাটকে প্রবেশ – বাগবাজার যাত্রাপার্টিতে *শর্মিষ্ঠা গীতাভিনয়*-এ গান রচনার মধ্য দিয়ে গিরিশচন্দ্রের বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ। স্বভাবত সমকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্রে 'অপেরা', 'গীতাভিনয়' এবং 'যাত্রা' নিয়ে কূট বিতর্ক দেখা যায়। ১৮৭৯ সালের ২৩ জানুয়ারি *সংবাদ প্রভাকর* এ উল্লেখ আছে –

> ন্যাশনাল থিয়েটার।। বিগত শনিবার রজনীতে উক্ত জাতীয় নাট্যশালায় আমরা বিশুদ্ধ আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছে। অধ্যক্ষগণ গীতাভিনয় (অপেরা) সংসারের এবং তৎসহ সাধারণ দর্শক মণ্ডলীর রুচি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। গত কয় বর্ষ ধরিয়া জাতীয় নাট্যশালায় 'সংস্কৃত যাত্রা' যাহা অপেরা নামে অভিনীত হইয়া আসিয়াছে, অধ্যক্ষগণ এক্ষণে তৎপরিবর্তে প্রকৃত গীতাভিনয় প্রদর্শন জন্য অগ্রসর হইয়াছেন।...'[২০৫]

শাহরিক এই ভিন্ন প্রেক্ষাপট সত্ত্বেও গ্রামে তখন 'গীতাভিনয়' সর্বস্তরের জনসাধারণের মন জয় করে নেয়। পল্লীবাংলার এই জনপ্রিয়তা যাত্রাগানের প্রতি ঐতিহ্যবাহী ভালবাসারই রূপান্তর। অচিরেই গীতাভিনয় 'যাত্রা' হয়ে দাঁড়ায়। 'গীতাভিনয়ে' খোলা আসরে কুশীলবরা নিজ নিজ ভূমিকানুসারে অভিনয় করেন। কিন্তু গীতাভিনয়ে মঞ্চ নাটকের তুলনায় গানের সংখ্যা বেশি প্রাধান্য পায়। গীতাভিনয়ের বিস্তারে শিক্ষিত সমাজে স্বস্তি আসে। ইংরেজি

---

[২০৪] গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প্র.প্র.১লা অক্টোবর-১৯৭২, পৃ.১৯২

[২০৫] বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৪র্থ খণ্ড)*, প্রকাশ , পৃ. ৪৭৫-৪৭৬

শিক্ষার প্রভাবে এদেশের শিক্ষিত নগরজীবনে যাত্রায় প্রদর্শিত কালুয়া-ভুলুয়া, কৃষ্ণ-গোপিনী, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি কাহিনির প্রতি বীতরাগ জন্মে। মঞ্চাভিনয়ে আগ্রহ থাকলেও সকলের পক্ষে জমিদারের মত অঢেল অর্থব্যয়ে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্য অনেকে গীতাভিনয়ের প্রতি উৎসাহিত হন। অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *শকুন্তলা* (প্র. ১৮৬৫) প্রথম মুদ্রিত গীতাভিনয়–

> We acknowledge in our last issue the receipt of *Sakontollah* by Baboo Unoda Persad Banerjee. This is the first Opera in Bengalee. It has been written in a simple and elegant style, and the interest is well sustained throughout. The songs are appropriate and exquisite. We had the pleasure of witnessing the performance more than once, and we must say that it did credit to those who were enagaged in it. We hope the Opera will supersede and degenerate Jattra.[২০৬]

প্রচলিত মঞ্চ-নাটকগুলিতে গান জুড়ে পরিবেশিত হয় গীতাভিনয়। আবার গীতাভিনয়ের ভিন্নব্যাখ্যাও দেখা যায়:

> গানই যাত্রার সর্বস্ব, গান লইয়াই যাত্রার কারবার। যাত্রার আরম্ভ গানে, এবং গানের উন্নতিতেই তাহার উন্নতি। এজন্যই যাত্রার আর একটি নাম হইতেছে গীতাভিনয়। এই গীতাভিনয়ের প্রভাবে বাঙ্গালা নাটক এমন একটা বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে, যা অন্য কোন ভাষার নাটকে নাই বলিলেই চলে।[২০৭]

ঢাকাতেও একই চিত্র প্রত্যক্ষ করা যায়:

> Nawabpore is grand arena of histrionic display and asthetic performance in Dacca, while in music, its excellence is unrivalled… when theatrical performance had not attained that degree of perfection which it now boasts, and when it spread was not so universal as at present, it placed on the stage two or three pieces of country Jatras composed by Krishna Kamal Goswame. Since, then, fashion has undergone a radical change. Jatra have vanished, yielding to Operas.[২০৮]

১৮৬৫ এর ১৪ নভেম্বর, মঙ্গলবার কার্তিক পূজার রাত্রিতে বৌবাজারের বাবু রাজেন্দ্র দত্তের বাড়িতে মধুসূদন দত্তের *পদ্মাবতী* মঞ্চনাটকের গীতাভিনয় *পদ্মাবতী* অভিনীত হয়। *সংবাদ প্রভাকর* পাতায় সে খবর পাওয়া যায়:

> শুদ্ধ যবনিকা অবলম্বন করিয়া ইহার অভিনয় হয়। নট-নটী বিদূষক ও নায়কনায়িকাগণ দর্শকবৃন্দের সর্ব্ববিষয়ে মনোরঞ্জন করিয়াছেন। দিন দিন ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইলে জগত্তৃপ্তিকর সঙ্গীত বিদ্যার নষ্টকোঠা উদ্ধার হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। শ্রীযুত রাজা

---

[২০৬] Hindu Patriot, 22 May, 1865. উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৩৯

[২০৭] অমরেন্দ্রনাথ রায়, রঙ্গদর্শন, ২২ কার্তিক ১৩৩৩, পৃষ্ঠা ১৪। উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৪০

[২০৮] The Bengal Times, Dacca, 11 April 1887, Alexandar Fobes (Ed). উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৪০

> সত্যশরণ ঘোষাল, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, বাবু হীরালাল শীল, বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক ও মৌলবী আবদুল লতিফ প্রভৃতি বিস্তর সম্ভ্রান্ত লোক অভিনয়স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।[২০৯]

১৮৬৭ সালে গিরিশচন্দ্র ঘোষ যাত্রার পথ ধরেই থিয়েটারে প্রবেশ করেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫০-১৮৮২), ধর্মদাস সুর (১৮৫২-১৯১০), রাধামাধব কর (১৮৫৩-?) এবং আরো অনেকের প্রচেষ্টায় সে সময় বাগবাজারে এক সখের যাত্রাদল প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৭১ সালে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৭-১৮৮৭) মাতুলপুত্র অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় এক যাত্রার দল গড়েন। বর্ধমান স্কুলের শিক্ষক রমাপতি রায় এই যাত্রাদলের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *সীতার বনবাস* অবলম্বনে একটি পালা নির্মাণ করেন। রঙ্গলাল সে পালায় গান লেখেন। ঢাকা জেলাতেও *সীতার বনবাস* পালা অভিনীত হয়। জেলা গেজেটিয়ার সূত্রে তার খবর পাওয়া যায় :

> The Basaks of Nawabpur introduced the jatra, and the first performance was `Sitar Banobas'. This was followed by Islampur Hindus, who staged Swapna Bilas. … Jatras used to be accompanied by Hindu Kheyal Thumri.[২১০]

২.৬ বিভিন্ন যাত্রাকার

২.৬.১ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় বা মদন মাস্টার (?-১৮৭৫)

মদনমোহন বা মদন মাস্টার চন্দননগরে যাত্রাদল গড়েন। হুগলি কলেজে শিক্ষকতার সুবাদে মদনমাস্টার নামে সমধিক পরিচিত হন। তাঁর লিখিত *প্রহ্লাদ চরিত্র, ধ্রুবচরিত্র, দূর্গামঙ্গল, গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী, রামবনবাস* ও *হরিশচন্দ্র* পালা খ্যাতি অর্জন করে। মদন মাস্টারের কোন পালার সন্ধান পাওয়া যায়নি – কেবল *বাঙালির গানে* (প্র.১৯০৫) সংকলিত হয়েছে কিছু গান। *দক্ষযজ্ঞ* পালায় তাঁর গান তখনকার সময়ে জনপ্রিয়তা পায় –

> তাই ভাবি গো মনে, বিনা নিমন্ত্রণে,
> কেমন করে যজ্ঞে যাই বল না।
> তোমরা সবে যাবে, সমাদর পাবে,
> আমি গেলে পিতা কথাও কবেন না।।
> একে নারী আমি ভিখারীর ঘরণি,
> বিধাতা করেছেন জনম-দুঃখিনী,

---

[২০৯] সংবাদ প্রভাকর, ১৬ নভেম্বর, ১৮৬৫, রামচন্দ্র গুপ্ত(স)। উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৪০

[২১০] Dhaka District Gazetteer, Government of Bangladesh. P 342. উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৪২

শিব-অপমানে হয়ে হয়ে অপমানী,

শিব-নিন্দে আমার প্রাণে সবে না।।[২১১]

মতিলাল রায়ের সমসময়ে মদন মাস্টার যাত্রাদল গড়েন। মৃত্যুর পরপরই তাঁর দলে ভাঙ্গন দেখা যায়। হরিহর শেঠ (১৮৭৮-১৯৭২) এর বর্ণনায়:

> মাস্টারের দলের প্রসিদ্ধ বাদক মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও নবীনচন্দ্র গুঁই নামক আর এক ব্যক্তি ঐ দল হইতে বাহির হইয়া উভয়ে পরপর দুইটি স্বতন্ত্র যাত্রাদল গঠিত করেন। এ সময়ে বৌমাস্টারের দলও বর্তমান ছিল। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বৌকুণ্ডুর দলও মদন মাস্টারের দল ভাঙ্গিয়া গঠিত হইয়াছিল।[২১২]

মদন মাস্টারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রবধূ কৈলাস কামিনী দেবী ভাঙ্গা দলকে 'বৌ মাস্টারের দল' নামে গড়ে তোলেন। এই দলের প্রথম পালা *শ্রীমন্তের মশান। ধ্রুব চরিত্র, দণ্ডীপর্ব, হরিশচন্দ্র, রামবনবাস, প্রভাস যজ্ঞ* প্রভৃতি এ দলে অভিনীত উল্লেখযোগ্য পালা। বৌমাস্টারের গানের সুর 'মাস্টারি সুর' হিসেবে জনপ্রিয় হয়। রাধামাধব কর এর বর্ণনা : 'বৌ মাষ্টারের দল 'ধ্রুবচরিত্র' পালা গাইয়া আপামর সাধারণের মনোরঞ্জন করিত। ... দুই রানির নাচ; – তাহাদের অপরূপ নৃত্যভঙ্গী তখনকার কলাকুশলীর বিস্ময়োৎপাদন করিত।'[২১৩] *ধ্রুবচরিত্র* পালায় জনপ্রিয় রানির গান:

রাজ-সিংহাসনে বসিতে বাসনা করো না।

জন্ম জন্মান্তরে পুণ্যপুঞ্জ কোরে,

জন্মাইতে পারো যদি মম উদরে

তবু হয় কি না হয়,–

আমার উত্তম কুমার আছে জান না।[২১৪]

সাজ সরঞ্জাম ও অভিনয়ের কলাকৌশলে মদনমাস্টার অনেক নতুনত্বের পরিচয় দেন। নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬-১৯৩৮) তাঁর *বিশ্বকোষ* (১৫ খণ্ড) গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, মদনবাবু প্রথম যাত্রায় জুড়িগানের প্রবর্তন করেন। অভিনয়ের সময়ে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে আসরের চারপাশ থেকে জুড়ির দলের দাঁড়িয়ে উঠে বিভিন্ন রাগে তালে উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশনের রীতি পরবর্তী কালের যাত্রাগানকে প্রভাবিত করে। মতিলাল রায় এবং সমসাময়িক

---

[২১১] দুর্গাদাস লাহিড়ি, *বাঙালির গান*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্র.প্র.১৯০৫, ব্যবহৃত প্রথম পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সংস্করণ : এপ্রিল ২০০১, পৃ.৭২৫-৭২৬

[২১২] হরিহর শেঠ, চন্দননগরের কথক কবিওয়ালা ও যাত্রা, প্রবাসী, মাঘ ১৩৩১, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (স), উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ. ৫৬

[২১৩] বিপিনবিহারী গুপ্ত , *পুরাতন প্রসঙ্গ ও বিচিত্র প্রসঙ্গ*, প্রসাদ সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), প্র.প্র. জানুয়ারি ২০১৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ.৩৭৩-৩৭৪

[২১৪] দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ. ৫৭

যাত্রাওয়ালারা মদন মাস্টারের আদর্শেই জুড়ির প্রবর্তন করেন। সেকালে পেশাদার যাত্রাদলের অভিনেতা বা বালকেরা রেকাবি হাতে শ্রোতাদের কাছে পেলা বা উপহার চাইত। এ রীতি যাত্রাগানকে সকলের দৃষ্টির সম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করে। মদন মাস্টার নিজের দল থেকে পেলা চাওয়ার প্রথা একেবারে বন্ধ করে দেন।[২১৫] তিনি সাজসজ্জার প্রচুর উপকরণ ব্যবহার করেন এবং আসর জাঁকজমক পূর্ণ করে তোলেন।

২.৬.২ হরিমোহন রায় (? - মৃত্যু ১৮৯১)

রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) পৌত্র এবং বিচারপতি রমাপ্রসাদ রায়ের (১৮১৭-১৮৬২) পুত্র হরিমোহন রায় আশৈশব লালন করেছেন যাত্রাভিনয়ের বাসনা। তাঁর দলের কৃষ্ণযাত্রা বিশেষ খ্যাতি পায়। ১৮৫৮ সালের ৩১ জুলাই রামনারায়ন তর্করত্নের (১৮২২-১৮৮৬) মঞ্চনাটক *রত্নাবলী* বেলগাছিয়া থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। ১৮৬৫ সালে সেই নাট্য-কাঠামোয় হরিমোহন রচনা করেন *রত্নাবলী* (১৮৬৫-৬৬) গীতাভিনয়। এরপর হরিমোহনের *জানকী-বিলাপ* গীতাভিনয় ১৮৬৭ তে প্রকাশ পায়। পরের গীতিকা *মালিনী* (প্র. ১৮৭৫) শ্রীরাধার মানভঞ্জন ঘিরে রচিত। সমকালীন মঞ্চনাটককে উপজীব্য করে তিনি পালা রচনা করেন। তবে যাত্রার রচনারীতি মেনেই সংগীত-আধিক্য ছিল। গীত রচনায় পালাকার হরিমোহনের সাবলীলতা লক্ষণীয়:

যাহার লাগিয়ে জাগিয়ে যামিনী,
রয়েছ বসিয়ে শ্যাম সোহাগিনি,
যাহার লাগিয়া সুরাগে রাগিয়ে,
ওগো সুধামুখি! রাই,
সোহাগে গলিয়ে, ত্যজিয়ে ভবন,
সাজায়েছ আজ নিকুঞ্জ কানন,
কুসুম ভূষণে সেজেছ মোহন,
কুলশীল লাজে দিয়েছ ছাই।[২১৬]

এরপর তিনি *শ্রীবৎস-চিন্তা* (১৮৬৬), *জানকী-বিলাপ* (১৮৬৭) ও *মানিনী* (১৮৭৫) রচনা করেন।

২.৬.৩ মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২)

নাট্যজগতে মনোমোহন বসু 'যাত্রানুসারী নাট্যকার' হিসেবে পরিচিত। তিনি প্রচলিত যাত্রার সংস্কার সাধন করেন। তাঁর প্রথম নাটক রামাভিষেক (১৮৬৭)। এরপর তিনি *সতী* (১৮৭৩), *হরিশ্চন্দ্র* (১৮৭৫), *পার্থ পরাজয়* (১৮৮১),

---

[২১৫] নগেন্দ্রনাথ বসু, যাত্রা : উৎস ও ক্রমবিকাশ, উদ্ধৃত. সম্পাদক : সনৎকুমার মিত্র, *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, ৭ বর্ষ ২ সংখ্যা, যাত্রা বিশেষ সংখ্যা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ.৬০-৬১

[২১৬] দুর্গাদাস লাহিড়ি, *বাঙালির গান*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্র.প্র.১৯০৫, ব্যবহৃত প্রথম পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সংস্করণ : এপ্রিল ২০০১, কলকাতা, পৃ.৯১৫

রাসলীলা (১৮৮৯) প্রভৃতি রচনা করেন। তাঁর রচিত গীতাভিনয়গুলি যাত্রা ও নাটকের মাঝামাঝি একটি ভিন্ন প্রকরণ। রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনা মতে –

> যাত্রানুসারী হলেও মনোমোহনের নাটকগুলি একটি স্বতন্ত্র নামকরণের দাবী রাখে। সমকালীন বাঙালি সমাজের রসতৃপ্তির জন্য তিনি নাটকে গানের বহুল প্রয়োগ করেছিলেন। এর ফলে সমকালীন স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি তাঁর রচনাগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করলেও সেগুলি নাটকের সামগ্রিক শর্ত পালনের পথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল। এজন্য নাটক হিসেবে চিহ্নিত না হয়ে সেগুলো গীতাভিনয় রূপে খ্যাত হল।[২১৭]

২.৬.৪ ব্রজমোহন রায় (১৮৩১-১৮৭৬)

ব্রজমোহন রায় হুগলি জেলার তেতুঁলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অকালে পিতৃহীন-ভ্রাতৃহীন ব্রজমোহন রায় মাত্র ১২ বছর বয়সে উপার্জনে ব্রতী হন। পাঁচালির পালাকার ব্রজমোহন রায় ১৮৭২ সালে যাত্রার দল করেন। সুগায়ক ব্রজমোহন কৃষ্ণযাত্রা, রামযাত্রা পরিবেশন করলেও চণ্ডীযাত্রা পরিবেশনায় তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি *সাবিত্রী-সত্যবান, অভিমন্যু-বধ, কংস-বধ, তারকাসুর-বধ, রামাভিষেক, লক্ষ্মণ-বর্জন, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, দানববিজয়, শতস্কন্ধ-রাবণবধ* প্রভৃতি পালা রচনা করেন। গদ্য সংলাপের পাশাপাশি পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে তাঁর নাটকের সংলাপ লিখিত। পয়ারছন্দে পালার কাহিনির অংশবিশেষ বর্ণনা এবং বক্তৃতাধর্মী সংলাপের মাধ্যমে ভক্তি, করুণ ও বীর রসকে প্রাধান্য দেয়া তাঁর পালার বৈশিষ্ট্য। পুরাণের নানা প্রসঙ্গকে তিনি সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে একীভূত করে নির্মাণ করেন। মঞ্চনাটকের ধারায় তিনি অঙ্ক ও গর্ভাঙ্কের বিন্যাস করেন। মহাভারতের বন-পর্বের সাবিত্রী চরিত্রের মর্মকথা আশ্রয় করে তিনি রচনা করেন *সাবিত্রী-সত্যবান* পালা। এ পালায় দীর্ঘ সংলাপের ব্যবহার হ্রাস পায়। উদাহরণস্বরূপ:

> সাবিত্রী: ...কালের অতি আশ্চর্য গতি! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণেরও কালে লয় আছে; অল্পজীবী জীবগণেরত কথাই নাই। সাগরতরঙ্গের ন্যায় এক আসছে আর যাচ্ছে, সংসারের রীতিই তো এই। যখন দিব্যচক্ষে এই সমস্ত দর্শন করছেন, তখন কেন আমাকে কু-প্রবৃত্তির অনুগামিনী কর্ত্তে প্রবৃত্ত হচ্ছেন? আপনি ক্ষমা করুন। আমি ধর্মসাক্ষ্যরূপে সত্যবানকে যখন পতি কামনা করেছি, তখন কিছুতেই নিবৃত্ত হতে পারবো না। (দ্বিতীয় অঙ্ক– দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)[২১৮]

২.৬.৫ হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬)

কাঙাল হরিনাথের জন্ম বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালীর মজুমদার বংশে। সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সমাজ-চিন্তক হরিনাথ মজুমদার উনিশ শতকের বাঙালির নব চিন্তার উন্মেষ ঘটান। তিনি কাঙাল ফিকিরচাঁদ বা কাঙাল হরিনাথ

---

[২১৭] রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৯৫

[২১৮] ব্রজমোহন রায়, সাবিত্রী-সত্যবান, দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.২৯৩

নামেও পরিচিত ছিলেন। লোকায়ত পাঁচালি, কবিগান আর কীর্তনের সংমিশ্রণই তাঁর লেখনীর সহায়। জলধর সেনের (১৮৬১-১৯৩৯) বর্ণনায় –

> বাল্যকালে কবির গান শুনিতে শুনিতে বা কাঙালের কথাতেই বলি 'গিলিতে গিলিতে' অশিক্ষিত বালক হরিনাথের কবিত্বশক্তির স্ফূর্তি হয়।[২১৯]

কাঙাল হরিনাথ সৃষ্টি করেন নীতি শিক্ষামূলক পাঠ্যপুস্তক, ধর্মকথা, কবিতা, পাঁচালি-নাটক-গীতাভিনয়, চিন্তামূলক প্রবন্ধ, উপন্যাস প্রভৃতি রচনা। গদ্য-পদ্য মিলিয়ে তিনি ৪০ টি গ্রন্থ রচনা করেন। *বিজয়া*, *অক্রূর-সংবাদ*, *সাবিত্রী নাটিকা*, *ভাবোচ্ছ্বাস*, *কৃষ্ণকালী-লীলা*, *কংসবধ*, *প্রভাসমিলন*, *নন্দবিদায়*, *পাষাণোদ্ধার*, *রামলীলা*, *শিববিবাহ*, *শুম্ভ-নিশুম্ভবধ* তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি। হরিনাথের ব্যাখ্যায় এই ধর্মাশ্রিত রচনার কারণ:

> গ্রামের যুবকগণ যাহাতে নির্দোষ আমোদ উপভোগ করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে পারেন, সেইজন্য হরিনাথ অনেকগুলি পৌরাণিক নাটক, যাত্রা, পাঁচালী ও কীর্তন রচনা করিয়া নিজেই শিক্ষার ভার গ্রহণপূর্বক যুবকগণের দ্বারা সেই সকল নাটক ও যাত্রার অভিনয় করাইতেন। কখনবা পাঁচালী দল করিয়া গান করিতেন। ইহাতে যেমন যুবকগণের হৃদয়ে নির্দোষ আমোদ উপভোগের স্পৃহা উত্তেজিত হইত, তেমনি গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা পৌরাণিক পবিত্র ইতিহাসের অভিনয় দর্শন করিয়া নয়ন মন চরিতার্থ করিতেন। ধর্ম্মপ্রাণ হরিনাথ এই রূপে দেশের মধ্যে ধর্ম্মের ভাব ও সুনীতি বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন।[২২০]

কাঙাল হরিনাথের মৃত্যু শতবর্ষে প্রকাশিত *কাঙাল হরিনাথ মজুমদার নির্বাচিত রচনা* গ্রন্থে *সাবিত্রী* ও *ভাবোচ্ছ্বাস* গ্রন্থ দুটি যাত্রাপালা হিসেবে গৃহীত হয়। দুটি পালারই আখ্যান *মহাভারত* থেকে গ্রহণ করা হয়। প্রথম পালাটি সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনি এবং শেষেরটি রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনি। ১৮৭০ সালে দক্ষযজ্ঞের কাহিনি-ঘেরা হরিনাথের *কবিকল্প* প্রকাশ পায়। পাঁচটি অংক এবং বিভিন্ন গর্ভাঙ্কের বিভাজনে বিস্তার লাভ করে সেই কাহিনি। পরবর্তীকালে 'গ্রামবার্ত্তা' প্রকাশিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হরিনাথ মজুমদারের *সাবিত্রী* গীতাভিনয় পাবনার ব্রজলাল সরকারের বাড়িতে পরিবেশিত হয়। এ আয়োজনের উদ্যোক্তা মুকুন্দলাল পাবনার মালঞ্চী এলাকায় এই অভিনয় সমাচার চিঠিতে জানিয়েছেন ––

---

[২১৯] জলধর সেন, *কাঙাল হরিনাথ (১ম খণ্ড)*, কলিকাতা, ১৩২০, পৃ. ৫, উদ্ধৃত. আবুল আহসান চৌধুরী (সম্পাদিত), কাঙাল হরিনাথ মজুমদার (নির্বাচিত রচনা), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্র.প্র মার্চ ১৯৯৮, পৃ.৪

[২২০] জলধর সেন, *কাঙাল হরিনাথ (১ম খণ্ড)*, পৃষ্ঠা ১৭, উদ্ধৃত. দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ. ৪৬

> আপনার সাবিত্রী নাটক মহদুদ্দেশ্যে পরিপূরক বিশেষ পৌরাণিক বিধায় তদাভিনয় দর্শনে কি বৃদ্ধা, কি বালক, কি যুবক, স্ত্রী সকলেই বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। থর্স..... রাজার দৃশ্যটি যে কি চমৎকার বোধ হয়, তাহা লিখিয়াও শেষ করিতে পারিনা।[২২১]

সাবিত্রী (১৮৭৪) এবং *ভাবোচ্ছ্বাস* (১৮৮৪) – এ দুটি পালার মাধ্যমে কাঙাল হরিনাথ মজুমদার বাংলাদেশের যাত্রাশিল্পে মর্যাদার আসন লাভ করেন।

২.৬.৭ মতিলাল রায় (১৮৪৩-১৯০৮)

প্রখ্যাত পালাকার ও অভিনয়শিল্পী মতিলাল রায় বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার ভাৎশালা গ্রামে ১২৪৯ সালের ২১ মাঘ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মনোহর রায়।[২২২] পালাকার মতিলাল রায় প্রায় চল্লিশটি পৌরাণিক পালা রচনা করেন। তাঁর যাত্রাপালা জনপ্রিয়তার কারণে সমকালে জনগণের মুখে মুখে প্রচলিত হয়। মঞ্চে নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্রের পূর্ণ দাপটের পাশে, পূর্ণ উদ্যম ও প্রতিযোগিতার সঙ্গে রচিত মতিলালের পালায় জনগণ আলোড়িত হয়। দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার জন্য সমাজ ও নীতিমূলক বক্তব্যকে পালার অন্তর্ভূক্ত করে প্রকাশ করতে তাঁর দল ছিল অনন্য। তিনি গীতাভিনয়কে ভাঁড়ামি বা অশ্লীলতার দায় থেকে মুক্ত করে সর্বজনের উপভোগ্য করে তোলেন। জনপ্রিয়তার পাশাপাশি লোকশিক্ষার প্রসারেও ভূমিকা নেয় তাঁর যাত্রা সম্প্রদায়। গীতাভিনয়ে খ্যাতি অর্জন করেন মতিলাল রায়।

ঈশ্বর গুপ্তের উৎসাহে মতিলালের কাব্যচর্চার আরম্ভ হয়। দোগাছিয়ার হরিনারায়ণ রায় চৌধুরীর উদ্যোগে তিনি যাত্রাদল তৈরি করেন। *রামায়ণের* কাহিনি অবলম্বনে তিনি যথাক্রমে রচনা করেন *তরণীসেন বধ* ও *রাম বনবাস*। ১৮৭৩ সালে হরিনারায়ণের সঙ্গে মতানৈক্যে দলটি বন্ধ হয়ে যায়। রাজকৃষ্ণ দাস, গোবিন্দ দাস, নীলকণ্ঠ দত্ত, গোপাল দাস প্রমুখ দশজন অংশীদার নিয়ে তিনি তৈরি করেন নিজস্ব যাত্রা সম্প্রদায়। *সীতাহরণ* গীতাভিনয়ের উপহার অংশে (ভূমিকা) মতিলালের সেই উদ্যোগের কথা ব্যক্ত হয়: ''আমি ১২৮০ বঙ্গাব্দের ২৪ শে অগ্রহায়ণ 'নবদ্বীপ বঙ্গ গীতাভিনয় সম্প্রদায়' সংস্থাপনে সাহসী হই।''[২২৩] বাল্মীকির *রামায়ণ* আর কৃষ্ণদ্বৈপায়নের *মহাভারত* অবলম্বনে মতিলালের বেশির ভাগ পালার কাহিনি নির্মিত হয়েছে। তাঁর *অহল্যা-উদ্ধার, হরধনুর্ভঙ্গ, রামবিবাহ, রামবনবাস, ভরতাগমন, সীতাহরণ, সীতা-অন্বেষণ, তরণীসেন বধ, রাবণ বধ, রামরাজা, লক্ষ্মণভোগ* প্রভৃতি

---

[২২১] মুকুন্দলাল সরকার, *গ্রামবার্তা প্রকাশিকা*, ১০ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা ১৮৭৩, হরিনাথ মজুমদার (স)। উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৪৭

[২২২] দুর্গাদাস লাহিড়ি, *বাঙালির গান*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্র.প্র.১৯০৫, ব্যবহৃত প্রথম পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সংস্করণ : এপ্রিল ২০০১, পৃ.৭৩২

[২২৩] দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৪৮

কাহিনি *রামায়ণ* অবলম্বনে লিখিত। আর *মহাভারত*কে আধার করে তিনি রচনা করেন *যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ*, *দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ*, *পাণ্ডব নির্বাসন*, *ভীষ্মের শরশয্যা*, *কর্ণবধ*, *যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক*, *যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ* ও *যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহন*। আবার কৃষ্ণলীলা ঘিরে লিখেছেন *ব্রজলীলা*, *নরকাসুর বধ* ও *কালীয়দমন*। এছাড়াও *গয়াসুরের হরিপদ্মলাভ*, *শ্রীক্ষেত্রমাহাত্ম্য*, *উমাসংবাদ* এবং *দুর্বাসার পারণ* বা *অম্বরীষের যজ্ঞ* তাঁর অন্যান্য পালা। সংলাপ, কথকতা ও সংগীত মিশ্রণে তিনি পৌরাণিক জগতকে অনায়াসেই মূর্ত করে তোলেন। মতিলাল রায় যাত্রায় অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন। *যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে* তাঁর ধর্মনিরেপেক্ষ ভাবনা প্রতিষ্ঠার মনস্কামনা ব্যক্ত : 'যে কোন নামেই হউক, শিব, সূর্য, হরি, গণেশ, কালী, কি অন্য কোন নাম, যা বলে ডাক, তাতেই মঙ্গল হবে, শব্দ ভেদ মাত্র, মূলে সব এক।'[২২৪] মতিলালের গীতাভিনয়ে সংলাপ অনেকটাই সংগীতের অনুগামী। কথকতা-ধর্মী সহজতা, পাঁচালি স্বরূপ চাপান-উতোর এবং সংগীত বহুলতায় তাঁর সংলাপ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। যমক আর অনুপ্রাসে তিনি পাঁচালিকার দাশরথি রায়কে অনুসরণ করেন। তারই পরিচয় মেলে *গয়াসুরের হরিপদ্ম লাভ* (প্র. ১৮৯৬) গীতাভিনয়ে :

> ওহে দয়াময়, আর এ সময়
> পাষাণ হতে কিবা ভয়।
> দেখুক সবে সুরে আজ গয়াসুরের
> শিরে কার পদদ্বয়।[২২৫]

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ যাত্রাপালায় কুরুপুরদাসী চপলার সংলাপ আর গানে আছে একই আলংকারিক সহজতা। ভক্তিরসাশ্রিত পুরাণ চরিত্রের সংলাপ-গানের পাশাপাশি নাগরিক জীবনের দৈনন্দিন কথার ভাঁজ লক্ষণীয়:

> চপলা।। কার ইচ্ছে নয় সে সুখে থাকি, ছোটথেকে বড় হতে কে না চায়? চাকরানি ভাবেন রাজরানি হব, রাজরানি ভাবেন ইন্দ্রানী হব, ইন্দ্রানী ভাবেন ব্রহ্মাণী হব, ব্রহ্মাণী ভাবেন শিবানী হব, শিবানী ভাবেন নারায়ণী হব, এমনি চারি যুগ হয়ে আসছে।... যদিও পষ্টা পষ্টি নেই, কষ্টা কষ্টি করেও ত সব চলছে! ওলো ঘোমটার ভেতর খেমটা নাচ সকলেরই আছে, তবে, ঢাকা থাকে বলে লোকে টের পায় না; নইলে বাকি ত আর কিছুই নাই। ডুব দিয়ে জল, সবাই খান, খুলে বল্লেই পাগল।[২২৬]

---

[২২৪] দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ. ৪৯

[২২৫] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ. ৫০

[২২৬] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ. ৫১

গীত

মনের কথা খুলে বল্লেই হয় সকলে পাগল।
সুদু আমি নই, বুঝে বলতে হয়, একবার আপন মন
ভেবে দেখলে মেটে সকল গোল।
দেখনা কেন সবাই, আগুন হতে ছাই,
আবার সেই আগুনকে ছাইয়ে ঢেকে রাখে দেখতে পাই,
তেমনি লজ্জা ভয় কুমন হলেই হয়,
তাইতো কূলবতী রমণীর কুমন দমন রয়,
নইলে দেখতে মুলুক ময়দান, একবারে দিগ্বিজয়,
তবে বেঁধে মারে সয় ভাল নিদেন কালের বোল।।[২২৭]

এ সমস্ত পালাতে সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুসারী অংকের নির্দেশ থাকলেও দৃশ্য বিভাজিত হয় নি। পুরাণ-চরিতের পাশাপাশি চৈতন্য-মানস ঘিরে মতিলাল রচনা করেন *নিমাই-সন্ন্যাস* (১৮৮৪) পালা।

১৮৭৮ সালের ৬ মার্চ কেশবচন্দ্রের বড় মেয়ে সুনীতির সঙ্গে বিয়ে হয় কোচবিহারের রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণের। এই বিয়ের উৎসবে উপস্থিত কেশবচন্দ্রের অনুরোধে নবদ্বীপের ভূমিপুত্র মতিলাল রায়ের কলমে রূপ পায় *নিমাই সন্ন্যাস*। মতিলালের বয়ানে ওঠে আসে পালার উৎস ও উপজীব্য কথা: '...চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক, ও মহাত্মা বৈষ্ণবগণের উপদেশ অবলম্বন করিয়া এই নিমাই-সন্ন্যাস রচনা করিয়াছি।'[২২৮]

মতিলালের অনুসরণেই মঞ্চের জন্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) রচনা করেন *চৈতন্যলীলা* (প্র.১৮৮৪) ও *নিমাই সন্ন্যাস* (প্র.১৮৮৫)। মতিলালের রচনায় নিমাই আত্ম-স্বরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। তিনি হলেন পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ-সর্বশক্তিধর, যেন গীতার বাণীস্বরূপ 'সম্ভবামি যুগে যুগে'।

কেশবচন্দ্রের জীবদ্দশায় তাঁর বাসভবন 'কমলাকুটিরে' মতিলালের পালা অভিনীত হয়। পালা রচনার পাশাপাশি শ্রীধর চরিত্রের অভিনয়েও মাত করেন তিনি। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এর বর্ণনায় পাই দর্শক হিসেবে মুগ্ধ

[২২৭] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্র.প্র.-২০০৮, পৃ. ৫১

[২২৮] উদ্ধৃত. দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ. ৫২

শ্রীরামকৃষ্ণকে: 'আবেগময় প্রাণমুগ্ধকর ভক্তিরসের প্রবল স্রোতে পরমহংস সমাধিপ্রাপ্ত হইলেন। অনেকে পরে মোহ অপগত হইলে রামকৃষ্ণ পরমহংস- মতি মতি বলিয়া স্বয়ং উত্থানপূর্বক রায়মহাশয়কে আলিঙ্গন করিলেন।'[২২৯]

মতিলাল অভিনীত *ভীষ্মের শরশয্যা* পালা দেখার অভিজ্ঞতা অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৮১-১৯৭৪) বর্ণনায় উঠে আসে:

> একটি ছোট ছেলেকে গঙ্গাদেবী সাজিয়ে আসরে নামিয়ে দিত। ছেলেটি এই গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসতো –– 'মরিরে, মরিরে, প্রাণকুমার আমার! এ দশা তোর কে করিল? এ বিশ্বমাঝে কোন পাষণ্ড, আমার পুত্রের প্রাণ হরে নিল।' এই গান শুনে সভার হাজার হাজার লোক অশ্রুসম্বরণ করতে পারতেন না। গানটির সঙ্গে অধিকারী মতিলাল রায় মহাশয় নিজে বেহালা বাজিয়ে গানের সুরকে আরও মর্মান্তিক করে তুলতেন।[২৩০]

মতিলাল রায় সম্পর্কে তাঁর পুত্র ভূপেন্দ্রনারায়ণের বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য –

> পিতৃদেবের চেষ্টায় হীন যাত্রাওয়ালারা ভদ্রসমাজে স্থান পাইয়াছিল। পূর্বে অধিকাংশ ভাগ ইতর শ্রেণির লোক লইয়া যাত্রাদল সৃষ্টি হইত। কিন্তু পিতৃদেবই অধিকাংশ ভদ্রসন্তান দ্বারা যাত্রাদলের পূর্ণসংস্কার করেন এবং দৃশ্যাদিসহ বক্তৃতা ও গীতাবলী যোগে সুরুচি সম্পন্ন সমাজ হিতৈষী নাটকাদি রচনা করিয়া নাটকের ও সমাজের প্রভূত উন্নতি করেন।[২৩১]

আসরে সামান্য 'আহার্য' বা প্রপ নিয়ে অভিনয় মতিলাল রায়ের সময় থেকেই আরম্ভ হয়। *হরধনুভঙ্গের* পালায় মাঝখানে খিলান দেওয়া ধনুক ব্যবহার করতেন তাঁর দলের অভিনেতারা, খিলানটি খেলার কৌশলে মড়মড় করে সে ধনু ভেঙে পড়ছে এমন দেখাত। ভীষ্মের শরশয্যাও অভিনব কৌশলে দেখানো হত –

> তিনটি লোহার রড অর্ধবর্তুলাকৃতির কয়েকটি লোহার পাতের সঙ্গে সঙ্গবদ্ধ হয়ে একটি মানুষের শোওয়ার মতো স্থান সৃষ্টি হয়েছিল। লোহার তারগুলি ফ্রেমটির পায়ার কাজও করতো। অর্জুনশরে বিদ্ধ হবার সময়ে ভীষ্মবেশী মতিলাল আশ্চর্য কৌশলে শুয়ে পড়তেন সেই লৌহশয্যায়। [২৩২]

স্বদেশপ্রেমের জোয়ারে এই ধারাটি সমৃদ্ধ হয় – আনন্দে ভরে উঠে দর্শক চিত্ত। প্রযোজনা অধিকারীরা পৌরাণিক পালাতে প্রয়োগ ও রচনারীতি সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেন। নতুন যুগের হাওয়া লাগে পালাকারদের রচনায়। যুদ্ধোত্তর সমসাময়িক ঘটনা, যেমন: দুর্ভিক্ষ, সামাজিক রীতিনীতি, ন্যায়-অন্যায়, দেশবিভাগ, স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশের শান্তি প্রভৃতি নানা বিষয়ের দিকে ঝোঁক যায় পালাকারদের। পৌরাণিক কাহিনির পাশাপাশি ইতিহাস ও

---

[২২৯]বঙ্গভাষার লেখক, পৃ ৮৯৬, উদ্ধৃত. দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ. ৫২

[২৩০] অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারতের শিল্প ও আমার কথা, পৃ ৪০-৪১, উদ্ধৃত. দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ. ৫৩

[২৩১] উদ্ধৃত. প্রভাত কুমার দাস, *যাত্রার সঙ্গে বেড়ে ওঠা*, কারিগর, কলকাতা, প্র.প্র.২০১৪, পৃ. ১৮

[২৩২] অরুণকুমার নন্দী, 'যাত্রার রূপান্তর' প্রবন্ধে, স্মারক পুস্তিকা, ৩৫-৩৯ পৃষ্ঠা, সম্ভবত হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, উদ্ধৃত. পবিত্র সরকার, *নাটমঞ্চ নাটরূপ*, যাত্রা প্রিয় পরম্পরা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্র.প্র.২০০৮, পৃ. ৩৯০

কল্পনা জায়গা করে নেয় পালাকারদের কলমে। এই বিবর্তন শুধু কাহিনি সংযোগেই নয়। পালায় পদ্যের সংলাপের জায়গায় স্থান পায় গদ্য সংলাপ। গীতিবাহুল্য কমতে শুরু করে, ২০-২৫টি গানের জায়গায় আসল ৬-৭ টি গান। সংক্ষেপে বস্তুধর্মী বক্তব্য প্রকাশের প্রচেষ্টা দেখা যায়। এ সমস্ত পালাতে সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুসারী অংকের নির্দেশ থাকলেও দৃশ্য বিভাজিত হয় নি। পুরাণ-চরিতের পাশাপাশি চৈতন্য-মানস ঘিরে মতিলাল রচনা করেন *নিমাই-সন্ন্যাস* (১৮৮৪) পালা। মতিলালের অনুসরণেই মঞ্চের জন্য গিরিশচন্দ্রঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) রচনা করলেন *চৈতন্যলীলা* (প্র.১৮৮৪) ও *নিমাই সন্ন্যাস* (প্র.১৮৮৫)। মতিলালের রচনায় নিমাই আত্ম-স্বরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। তিনি হলেন পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ-সর্বশক্তিধর, যেন গীতার বাণীস্বরূপ 'সম্ভবামি যুগে যুগে'। তাঁর পালার শচীকে শান্তনার ছলে নিমাইয়ের সংলাপ:

> যখন আপনার পৃশ্নিনাম ছিল, তখন আমি আপনার পুত্র; পরে অদিতি, তাতেও বামন হয়ে আপনার গর্ভে জন্ম লয়েছি; যখন দেবহূতি হয়েছিলেন তখন কপিল নামে আমিই আপনার কুমার; যখন কৌশল্যা, তখন রাম নাম ধারণ করে আমিই আপনার নন্দন; যখন দেবকী, তখন কৃষ্ণরূপে আমিই আপনার সুত; নবদ্বীপেও আপনার গর্ভে আমার জন্ম; আরও আপনার গর্ভে আমার দুই জন্ম গ্রহণ করতে হবে। (তৃতীয় অঙ্ক – তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)[২৩৩]

এছাড়াও নিজের দলে *হরধনুর্ভঙ্গ* পালায় বিশ্বামিত্র, *মারুতি মিলনে* ধৌম্য, *ভীষ্মের শরশয্যায়* ভীষ্ম এবং *পারিজাত হরণে* নারদ সেজেছিলেন তিনি। পালাকার হিসেবে নয়, অভিনয় প্রতিভাতেও সমসাময়িক যাত্রাজগৎকে সম্মোহিত করেন মতিলাল। এ প্রসঙ্গে কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী এর বক্তব্য:

> ... তিনি অভিনয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া স্থান কাল ও পাত্রভেদে এমন সারগর্ভ বক্তৃতা দিতেন যে শ্রোতামণ্ডলী বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইত। ...তিনি মুনি ঋষির বেশে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তির উৎকর্ষ-সূচক বক্তৃতা করিতেন তাহা শ্রোতৃ মণ্ডলীর হৃদয় স্পর্শ করিত।[২৩৪]

মতিলালের নীতি উপদেশ সর্বস্ব যাত্রা লোকশিক্ষার বাহন হিসেবে ক্রমশ জনরুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। মানুষের মন শুধু শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি। দেবতার স্তবগানে ক্লান্ত দর্শক আনন্দের সন্ধানে মরিয়া হয়ে ওঠে। প্রভাতকুমার দাস জানিয়েছেন, 'অপেরাধর্মীতার সঙ্গে সেই প্রথম আসরে এসে যুক্ত হল থিয়েট্রিকেল কায়দা কানুন।'[২৩৫] মতিলালের যাত্রা তাঁর যুগকে ছাড়িয়ে পরবর্তী সময়ের বহু যাত্রা ও যাত্রাকারকেও

---

[২৩৩] মতিলাল রায়, *নিমাই-সন্ন্যাস*, দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (২)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৫১৯-৫২০

[২৩৪] কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী, *নবদ্বীপ-মহিমা*, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী (সম্পাদিত), নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নদীয়া, প্র.প্র.১২৯১, ব্যবহৃত পরিবর্ধিত সংস্করণ ২০১১,পৃ. ২৪৫-২৪৬

[২৩৫] প্রভাত কুমার দাস, *যাত্রার সঙ্গে বেড়ে ওঠা*, কারিগর, কলকাতা, প্র.প্র.২০১৪, পৃ.১৮

প্রভাবিত করে। মতিলালের ধারায় ধনকৃষ্ণ সেন অনুজপ্রতিম ছিলেন। তাঁর সমকালেই ধনকৃষ্ণ পালাকার হিসেবে খ্যাতি পান।

২.৬.৮ গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২)

উনিশ শতকে ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাবে কলকাতাকেন্দ্রিক নব্যবাবু সমাজের উদ্ভব ঘটে। নতুন রুচির সাথে তাল মিলিয়ে গড়ে ওঠে নতুন প্রমোদ মাধ্যম। এ শতকের শেষ প্রান্তে এসে যাত্রা অভিনয় শিল্প হিসেবে একটা রূপ পরিগ্রহ করতে সমর্থ হয়। এ সময় নট-নাট্যকার-নির্দেশক গিরিশচন্দ্র ঘোষ জাতীয় ঐতিহ্যকে স্বীকার করে যাত্রা নামক ধারাটিকে নাটকের সাথে একীভূত করার চেষ্টা চালান। *অভিমন্যুবধ*, *সীতার বনবাস*, *সীতাহরণ*, *পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস* – প্রভৃতি গিরিশচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য যাত্রাপালা। মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) পৌরাণিক নাটক *শর্মিষ্ঠা* (১৮৫৮) যাত্রামঞ্চে অভিনীত হয়। মনোমোহন বসুর *হরিশচন্দ্র* (১৮৫৭), *পার্থ পরাজয়* (১৮৮১) এবং *রাসলীলা* (১৮৮৯) পৌরাণিক যাত্রা হিসেবে অভিনীত হয়।

২.৬.৯ ধনকৃষ্ণ সেন (১৮৬৪-১৯০২)

সুদর্শনের রাজ্যাভিষেক ধনকৃষ্ণ সেনের (রচনা-১৮৮৮, প্র-১৯০৬) প্রথম পালা। তখন তিনি বিদ্যাসাগর কলেজের স্নাতক শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। স্বল্পায়ু ধনকৃষ্ণের সমস্ত পালারই মুদ্রণ-প্রকাশ ঘটে তাঁর মৃত্যুর পর । তিনি *অনুধ্বজের হরিসাধন*, *সত্যনারায়ণ লীলা*, *বিল্বমঙ্গল*, *উমাতারা বা জটিল*, *হংসধ্বজের মহামুক্তি*, *রাবণের মোহমুক্তি*, *রুক্মাঙ্গদ*, *রাজার হরিবাসর*, *পাণ্ডব মিলন বা কর্ণবধ* ও *পৃথুরাজার শতাশ্বমেধ যজ্ঞ* প্রভৃতি গীতাভিনয় রচনা করেন। ধনকৃষ্ণের ভক্তিরস প্রধান গীতাভিনয়গুলিতে পুরাণ-প্রসঙ্গ ও তত্ত্বালোচনা স্থান পায়। তিনি পালায় ছোট ছোট সংলাপ সংযুক্ত করে অনেক ক্ষেত্রে রূপান্তর করেন। মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর কাব্যের মিলন ঘটিয়ে সংলাপের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন। তাছাড়া বিবেকের গানের সঙ্গেও মিলিয়েছেন গদ্য সংলাপ।

মতিলালের *গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ* গীতাভিনয়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ধনকৃষ্ণের *অনুধ্বজের হরিসাধন* গীতাভিনয়ে। আবার তাঁর *সত্যনারায়ণ-লীলায়* মতিলালের *সুবচনী মাহাত্ম্যের* ছাপ স্পষ্ট। অনুপ্রাসের ব্যবহারে গানগুলিতেও মতিলালের প্রভাব দেখা যায়। *সতী মালাবতী* পালার গানে তাই দৃশ্যমান:

যবে সে ভাবের অভাব হয়ে ভ্রান্তভাবে
সে দিন যেন না থাকি ভবে।
যে ভাবে ভাবি তোমারে ভাবের ভাবী বিনে কে বুঝিবে।
আমি পুত্র তুমি পিতা, আসন-বসন-জীবন দাতা;
এ ভাবের হলে অন্যথা, নরকেও স্থান নাহি হবে।
তব স্নেহ তরুছায়া সদা শীতল করে কায়া

কি ছার ঐশ্বর্য মায়া, স্বপ্নে মমতায় না ভুলিবে।[২৩৬]

পালাকার ধনকৃষ্ণের অভিনয়ের কোন নিজস্ব দল ছিল না। উনিশ শতকের শেষে যাত্রার দর্শকপ্রিয়তার কারণে অসংখ্য যাত্রাদল আত্মপ্রকাশ করে। অধিকাংশ দল কর্তাই ভিন্নজনের পালা অভিনয় করে দল চালান। বর্ধমান জেলার বক্কেশ্বর পান (পাইন) ও তাঁর ভাই পীতম্বর যাত্রা বা গীতাভিনয়ের দুটি স্বতন্ত্র দল গড়েন। পাইনদের এই যাত্রাদল ধনকৃষ্ণর সমস্ত পালাই অভিনয় করে। তবে ত্রৈলোক্যর দলেই অভিনীত হয়েছে বেশিরভাগ যাত্রা। *সুদর্শনের রাজ্যাভিষেক* পালার বিজ্ঞাপনে (ভূমিকা) প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৭-১৯১৮) বয়ানে তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় :

> মহাত্মা ধনকৃষ্ণ সেন মহাশয় স্বর্গারোহন করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত প্রায় অধিকাংশ গীতাভিনয়ই আমরা প্রকাশ করিয়াছি। এই সুদর্শনের রাজ্যাভিষেক গীতাভিনয়খানি তাঁহার নাট্যতরুর প্রথম ফল। ইহার সুরসে একদিন সমগ্র বঙ্গভূমি প্লাবিত হইয়াছিল। এই নাটক অভিনয় করিয়াই ত্রৈলোক্য নাথ পান মহাশয়ের যাত্রা-সম্প্রদায় বিশেষ প্রতিপত্তি প্রসার লাভ করে। তজ্জন্য মহাত্মার অতি সাধের ও অতি যত্নের 'সুদর্শন' আজ জনসমাজে বাহির করিয়া অতিশয় তৃপ্তি লাভ করিলাম। এক্ষণে ইহাতে সাধারণের সুখতৃপ্তি হইলে আপনাকে পরমসুখী মনে করিব।[২৩৭]

২.৬.১০ নিমাইদাস-নিতাইদাস এবং রসিকলাল চক্রবর্তী (১৮২০-১৮৯৩)

উনিশ শতকের যাত্রা ও যাত্রাকারদের আরও অনুসন্ধান পাওয়া যায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থে। তাঁদের শৈল্পিক বোধ কখনো বিচ্ছিন্নভাবে, কখনো সংযুক্তভাবে প্রয়াস চালিয়েছে বাংলা যাত্রার পালাবদলে। সে সমস্ত ঘটনা প্রসঙ্গ থেকে কিছু উল্লেখ করা হল:

১) যাত্রাওয়ালা নিমাইদাস ও নিতাইদাসের প্রসঙ্গকথা জানা যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪৯-১৯২৫) জীবনস্মৃতিতে:

> 'পূজার তিনদিন বাড়ির উঠানে যাত্রা হইবে। ... সে কি আমোদ ! ... বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যাত্রা শুনিবার জন্য চোখে ঘুম আসিত না। এগারোটা রাত্রে যেই ঢোলে চাঁটি পড়িল অমনি বিছানা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া একছুটে তিনি বাহিরের মজলিশে গিয়া হাজির হইতেন। উঠানে লোকে লোকারণ্য। ... এই তিন দিন সকলের জন্যই নির্বিচারে অবারিত দ্বার! অনেকগুলি মশালচী মশাল হাতে হাতে উঠানের চারিদিকে দাঁড়াইয়া। ... লালপাগড়ীধারী দারোয়ানেরা 'বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে' করিয়া লোকদিগকে বসাইবার চেষ্টা করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে বেত্রচালনা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না।

---

[২৩৬] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৫৯

[২৩৭] উদ্ধৃত. দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ. ৬০

... তখনকার শ্রেষ্ঠ যাত্রাওয়ালা নিমাইদাস এবং নিতাইদাসের যাত্রাই এ বাড়িতে হইত। যাত্রাওয়ালা ছোকরাদের পোশাক ছিল – জরির চাপকান, জরির কোমরবন্দ এবং পালকওয়ালা মুকুটের মত জরির টুপি। জরি অবশ্য ঝুটা। যে কালে যে পোশাকের ফ্যাশন, যাত্রাওয়ালারাও সাধারণত তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে।

এই যাত্রার 'কেলুয়া ভুলুয়া প্রভৃতি সং ছেলেদের বিশেষ চিত্তাকর্ষক ছিল। 'শুম্ভ নিশুম্ভ'র পালায় যখন রক্তবীজ সাজঘর হইতে 'রে রে রে রে' করিয়া ডাকাতি হাঁক দিতে দিতে আসরে আসিত তখন ছেলেদের একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইত। ডাকাতদের মত তাহার লম্বা চুল, ইয়া চৌগোঁপ্পা, মালকোঁচামারা রক্তবস্ত্র, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, হাতে ঢালতলোয়ার –– সে এক ভীষণ চেহারা। আর মুকুটভূষিতা আলুলায়িতকেশা দুর্গা যে সাজিত, সে যেন রূপে আলো করিয়া আসিত। আর তাহার তলোয়ার খেলারই বা কি কসরৎ। বন বন করিয়া তলোয়ার ঘুরাইত যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইত। আবার রাক্ষসের মুখোশ-পরা ধুম্রলোচন পথসংক্ষেপ করিবার জন্য যখন ছেলেদের বসিবার স্থান দালানের রোয়াক দিয়া আসরে নামিত, তখন ছেলেরা সত্যসত্যই ভয়ে আঁতকাইয়া উঠিত –– কেহ কেহ তারস্বরে ক্রন্দনই জুড়িয়া দিত।[২৩৮]

২) রসিকলাল চক্রবর্তী (১৮২০-১৮৯৩) একদল কিশোরকে সঙ্গী করে 'বালক সংগীত যাত্রা' দল গড়ে তোলেন। পীতবসন পরে, মাথায় ফুলের কেয়ারি দিয়ে রাখাল সাজত কৃষ্ণযাত্রার এই বালক দল। ছড়ার ব্যবহারে এই যাত্রা কিছুটা বিদেশি অপেরার চেহারা পায়। মূলত *নিমাই সন্ন্যাস, কংসবধ, মায়ের ছেলে* প্রভৃতি পালা রসিকলালের বিখ্যাত পরিবেশনা। তিনি পালায় ছড়ার পাশাপাশি গান বাঁধেন:

দেখরে জ্ঞানচক্ষু মেলে সেকি কালী দহে ডুবার ছেলে।।
বিশ্বময়ই শুনি তারে বিশ্বময় সবাই বলে।
ও মন আচে পঞ্চভূতে ব্যাপ্ত কৃষ্ণ অনলে কি জলে স্থলে।।
ঐ দেখ কৃষ্ণ কান্তি-আভা নীলময় নভোমণ্ডলে ।
ও মন ঐ দেখ, কৃষ্ণরূপের প্রভা পড়ে ক্ষেত্র মাঝে দুর্ব্বাদলে।।
নবঘন শ্যামের বর্ণ দেখরে ঐ নীরদ জলে।
ও মন ঐ দেখ শ্যামের শ্যামল-বর্ণ বৃক্ষপত্র ছলে।।
অন্তরে আছেন কৃষ্ণ, চেয়ে দেখ হৃদয়কমলে।
ও মন সে যে অন্তর বাহির, দেখে তারে ভাসে রসিক নয়ন-জলে।[২৩৯]

নাগরিক রুচির চাহিদা মেটাতে প্রচলিত এই নাট্যধারা ছিল অনেকটাই ব্যর্থ চেষ্টা। তাই শহরে-আধাশহরে এমনকি মফস্বলেও পাশ্চাত্যরীতির নাটকাভিনয় প্রসারিত হয়। ফলে দিনে দিনে যাত্রাকে পাশ্চাত্যধারার মঞ্চাভিনয়ের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে টিকে থাকতে হয়। উনিশ শতকের শেষপ্রান্তে যাত্রা কলকাতা-বর্ধমান-হুগলি-নদিয়া জেলার

[২৩৮] বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, *জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি*, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্র.প্র. ১৯২০, ব্যবহৃত সুবর্ণরেখা সংস্করণ ১৪১৯ (বঙ্গাব্দ), পৃ.১২-১৩

[২৩৯] উদ্ধৃত. দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ. ৫৮

আঙিনাকে অতিক্রম করে বরিশাল-ফরিদপুর-ময়মনসিংহ-যশোর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে গড়ে ওঠে যাত্রাগানের ছোট-বড় বহুদল। যাত্রানট সূর্যকুমার দত্তের (১৮৭৩-১৯৭৭) সাক্ষাৎকারে জানা যায়:

> মূলত দলের প্রধান কার্যালয় ছিল নৌকো – যেন একটা গোটা বাড়ি। নৌকাগুলো এত পরিচিত ছিল যে, দেখেই বলা যেত, কোন দলের কোনটি। বছরের ৭/৮ মাস ওই ছিল যাত্রাশিল্পীদের ঘরবাড়ি। এক মোকাম থেকে আর এক মোকামের পথে নদীবক্ষে, নৌকাতেই চলত রিহার্সেল, গান-বাজনা।[২৪০]

আর এভাবেই উনিশ শতকের যাত্রাতরী বিশ শতকের প্রবহমানতায় এগিয়ে যায়।

২.৭ পর্যালোচনা

ষোড়শ থেকে উনিশ –– পুরোনো যাত্রার একচ্ছত্র অধিষ্ঠানের কালে যাত্রাকে নানারকম উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে। কৃষ্ণযাত্রা, মনসার ভাসান যাত্রা, শিবযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা ইত্যাদি ধর্মীয় দেবনির্ভর এবং ভক্তিমূলক বিষয়বস্তু নিয়ে পুরোনো যাত্রার পরিবেশনা হয়। আঠারো শতকে উদ্ভব হয়ে উনিশ শতকেই বাংলা যাত্রার বিষয় ও বিষয়ীর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এই সময়ে 'প্রাচীন যাত্রা' এবং 'নূতন যাত্রা' এই দুটি কথায় যাত্রাকে নতুন করে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচিত হয়। পূর্বে যাত্রাগান পরিবেশনা মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল, ফলে আমরা সেইসব প্রসিদ্ধ লোকের নামেই যাত্রার দলগুলিকে পরিচিত হতে দেখি –– যেমন পরমানন্দ অধিকারীর দল, কৃষ্ণকমল অধিকারীর দল, গোপাল উড়ের দল, এমনকি বউ মাস্টারের দল। কিন্তু পরে অধিকারী বা ব্যক্তির পরিচয় খুব কমই চিহ্নিত থাকে। নব পর্বে কেবল সাংগঠনিক বিচারেই নতুন নয় বিষয়বস্তুর উপস্থাপনেও নতুনযাত্রায় অভিনবত্ব আসে। এখন সংগঠিত বাণিজ্যিক পটভূমিকায় দলের নামেই পরিচিতি হয়।[২৪১]

অতীতে বাংলা যাত্রার একটি বিশিষ্ট রূপ মঙ্গলকাব্যের পটভূমিকাকে মান্য করেই একটা নির্দিষ্ট কালসীমার মধ্যে গড়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে যে চণ্ডীযাত্রা, মনসার ভাসান যাত্রা, রামযাত্রা ইত্যাদির ভিত গড়ে ওঠে, তার মূলেও রয়েছে দুর্দম অন্যায়কে ধ্বংস করে দেবতার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতা। পাশাপাশি *গীতগোবিন্দ* নামাঙ্কিত কীর্তনগানের একটা ধারাও তৈরি হয়, যা পরবর্তী সময়ে উনিশ শতকে কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রমুখের হাতে উৎকর্ষ লাভ করে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণনগর, কলকাতা ও তার কাছাকাছি অঞ্চলগুলিতে যাত্রায় নিম্নরুচির অনুপ্রবেশ ঘটে। কবিগান, খেউর, আখড়াই, হাফ-আখড়াই ইত্যাদির প্রভাবে নাগরিক, আধা-নাগরিক রুচির সর্বাঙ্গীন অবনমন ঘটে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর পালাটি যাত্রায় গৃহীত হবার ফলে এ নিম্নরুচিতে আরেকটি মাত্রা সংযোজিত হয়। একসময় রাধাকৃষ্ণলীলার পাশাপাশি রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনিই যাত্রার প্রধান

---

[২৪০] সূত্রধার, *শতাব্দীর যাত্রাগান*, দেশ, বিনোদন সংখ্যা, ১৩৭৫, সাগরময় ঘোষ (স), পৃষ্ঠা ১০০৩, উদ্ধৃত. দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ. ৬০

[২৪১] পবিত্র সরকার, *নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ*, যাত্রা প্রিয় পরম্পরা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্র.প্র.২০০৮, পৃ.৩৮৩-৩৮৪

বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। সময়ের সঙ্গে নগরের মানুষের চাহিদা মেটাতে যাত্রার বিষয়বস্তুতেও পরিবর্তন ঘটে। তাই নূতন যাত্রায় মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য নল-দময়ন্তী, রাজা বিক্রমাদিত্য, নন্দ বিদায় এবং বিদ্যাসুন্দর ইত্যাদি মানবিক বিষয় স্থান পায়।

আমরা লক্ষ্য করি, আঠারো শতকের আগে পর্যন্ত যে সমস্ত যাত্রা পাওয়া যায় তাতে কৃষ্ণযাত্রারই নানা আঙ্গিকের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। বিষয়বস্তুর নতুনত্ব আগে আসলেও প্রকরণের নতুনত্ব এসেছে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের শেষ দিকে। নানান সময়ে কৃষ্ণযাত্রায় প্রকরণগত নূতনত্ব ঘটে। কালিয়দমন যাত্রার পুরানো রীতির শেষধারক ছিলেন বদন অধিকারী। প্রায় এক প্রজন্ম আগে পরমানন্দ দাস যাত্রাগানে যে 'তুক্কো' প্রথা প্রবর্তন করেন, বদন সে তুক্কোকে আরও পরিমার্জিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে কবিগানের সরাসরি প্রভাব স্বীকার করে গানে অনুপ্রাসের ব্যবহার শুরু করেন। তবে প্রায় প্রতি যুগেই যাত্রার আঙ্গিকে প্রচুর রদবদল ঘটে। আগে গানই ছিল যাত্রার বিশিষ্ট প্রকরণ। বিবৃতি ও সংলাপ – দুটোই সংগীতের মাধ্যমে উপস্থাপিত হত। গানের সংখ্যা কমে গিয়ে নতুন যাত্রায় সংলাপের অংশ বৃদ্ধি পায়। উনিশ শতকের প্রথম পাদ থেকে ইংরেজি শিক্ষা, পাশ্চাত্য দর্শন, বস্তুবাদ, আধুনিক সমাজভাবনা ও কালপ্রভাবজনিত ইতিহাসবোধ প্রভৃতির প্রভাবে বাঙালির চৈতন্যে সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। ভঙ্গুর গ্রামীণ সমাজের জায়গায় নব্য বাবু সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্য আর বহুমুখিতা উনিশ শতকের নাগরিক জীবনকে বিনোদিত করলেও সমান দাপটে যাত্রাগান জনপ্রিয়তা পায়। তাই সাহিত্যকেন্দ্রিক এই মাধ্যমটি কখনো গ্রামে কখনো শহরে – কোথাও প্রাচীনরূপে, কোথাও আধুনিকতার প্রভাবে পরিবর্তিত সামাজিকতায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। উনিশ শতকের যাত্রা নতুন গড়ে ওঠা মেট্রোপলিটন সংস্কৃতির বিভিন্ন পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, বিভিন্ন ধারায় বিচিত্র আঙ্গিকে বিকশিত হয়। দেশীয় পরিবেশনার বিভিন্ন ধারার সঙ্গে যাত্রার কাহিনিকথন ও উপস্থাপনায় পরিবর্তন নিয়ে আসে। কলকাতার বাবু কালচারের চাহিদা যেমন যাত্রাকে পূরণ করতে হয়, তেমনি পরিবর্তনের সামনে পড়া গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে তাদের বিনোদন জোগায় যাত্রা। এই পর্বের যাত্রায় পুরাণ নির্ভরতার পাশাপাশি গীতি-নির্ভরতা লক্ষণীয়। তবে সমকালীন বিষয়কে উপজীব্য করে যাত্রা রচিত হতে কমই দেখা গেছে। পরিচিত কাহিনির পুর্নকথন, নতুন জীবনবোধ, পৌরাণিক চরিত্রের মানবিক দুঃখ-কষ্ট-বেদনা নির্মাণ, অলৌকিকতার নির্মোক ছাড়িয়ে মাটির উপরে দাঁড়ানো এ সময়ের যাত্রার বৈশিষ্ট্য। উনিশ শতকের সমাজসংস্কারজাত কোনো ভাবনার ছায়াপাতও যাত্রায় ঘটেনি। এমনকি ইংরেজ শাসনের সমর্থন বা ব্যঙ্গ রসিকতাও যাত্রার চৌহদ্দীতে প্রবেশ করেনি। সমাজের পরিবর্তনে যাত্রা প্রভাবিত হয়েছিল নিঃসন্দেহে, কিন্তু তার উপস্থাপনে এর কোনো স্পষ্ট পদচারণা লক্ষ করা যায় না। বরং যাত্রা একনিষ্ঠ দেশজ অনুধ্যানে গড়ে ওঠার অনুশীলন করে। স্পষ্টত ইয়ং বেঙ্গল ও বাবু কালচারের বাইরে শাশ্বত বাংলার

দর্শকদের কাছে তার আবেদন ছিল। এই দেশজ বোধই বিশ শতকের যাত্রায় এসে স্বাদেশিকতায় রূপান্তর লাভ করে। উনিশ শতকের যাত্রা মূলত তার নিজের দাঁড়াবার ঠাঁইটুকু খুঁজে নিতে সমর্থ হয়। আঠারো থেকে উনিশ শতকব্যাপী বিষয় অভিনবত্বে ও আঙ্গিক বৈচিত্র্যে বাঙালি দর্শক তাদের নানানমুখী আবেগকে যাত্রায় প্রত্যক্ষ করে। সেখানে পৌরাণিক যাত্রার একাধিপত্য থাকলেও পাশাপাশি স্থান করে নেয় সখের যাত্রা, গীতাভিনয় ও বিদ্যাসুন্দর যাত্রা। পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার বিষয় ও আঙ্গিকে নতুনত্ব আসে। যুগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে যাত্রা আপন চেহারার নানান প্রকাশভঙ্গি নিয়ে দর্শকদের বিনোদিত করে।

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলা যাত্রার বিকাশ : বিশ শতকের প্রথমার্ধ (১৯০১-১৯৪৭)

৩.১ স্বাদেশিক চেতনা

বিশ শতকের প্রথম থেকেই বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক-বৌদ্ধিক জীবনে স্বাদেশিক বোধের সঞ্চার ঘটে। তবে উনিশ শতকের শেষার্ধে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭), গোপালকৃষ্ণ গোখলে (১৮৬৬-১৯১৫), বালগঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬-১৯২০) প্রমুখের দ্বারা বিভিন্ন কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে এর সূচনা হয়। এই সময়ে হিন্দুমেলার গঠন -- এই স্বদেশচেতনাকে একটা সুস্পষ্ট রূপরেখা দান করে। ১৮৬১ সালে রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) মেদেনিপুর থেকে 'শিক্ষিত বঙ্গবাসীর মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা স্থাপনের এক প্রস্তাব' (Prospectus of a society for the promotion of national feeling among the educated natives of bengal) পেশ করেন। ১৮৬৫ সালে কলকাতায় রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬), গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১-১৮৬৯), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫) ও নবগোপাল মিত্র (১৮৪০-১৮৯৪) 'স্বাদেশিকদের সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুর পরিবারের আর্থিক সাহায্য এবং রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্রের চেষ্টায় 'হিন্দুমেলা' স্থাপিত হয়। ১৮৬৭ সালের ১২ এপ্রিল এর প্রথম অধিবেশন বসে। এ মেলারই নবম অধিবেশনে (১২৮১ মাঘ ৩০) তেরো বছর আট মাস বয়সী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) পাঠ করেন, 'হিন্দুমেলার উপহার' কবিতাটি। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৯০৩) 'ভারতসঙ্গীত'-এর অনুকরণে রচিত এ কবিতাটিতে ভারতের পতনের আশঙ্কা প্রতিধ্বনিত হয়েছে:

১৮

ভারত কঙ্কাল আর কি এখন
পাইবে হায়রে নূতন জীবন,
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া
আর কি কখন দিবেরে জ্যোতি ।

১৯

তা যদি না হয় তবে আর কেন
হাসিবি ভারত ! হাসিবিরে পুনঃ
সেদিনের কথা জাগি স্মৃতিপটে

ভাসে না নয়ন বিষাদ জলে ? [২৪২]

হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জাগরণ এবং জনগণের মধ্যে ঐক্যস্থাপন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *জীবনস্মৃতিতে* এই সর্ম্পকে লিখেছেন : "মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মিলে সব ভারতসন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশে স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।"[২৪৩] হিন্দু মেলা সেই সময়ে এক ধরনের স্বাদেশিকতার আবহ তৈরি করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) উপন্যাসে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্যান্য নাট্যকারদের নাটকে, হেমচন্দ্রের কবিতায় ধ্বনিত হয় এই দেশাত্মবোধেরই সুর। তখনকার দিনের ইংরেজি শিক্ষিত সমাজে রাজভক্তি এবং জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণ একই সঙ্গে ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই দ্বিতীয় চিন্তায় দীক্ষিত ছিলেন। এ সময়ের স্বদেশ সাধনার আর একটি দৃষ্টান্ত 'সঞ্জীবনী সভা' (১৮৭৬)। এই গুপ্তসভার প্রেরণা ছিল ইতালির 'মাটসিনির কার্বোনারি' নামক গুপ্তসভা। এরও পরিচালক ছিলেন রাজনারায়ণ বসু; উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় হিতসাধন।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা ভারতের ইতিহাসে যে রাজনৈতিক-সামাজিক উত্থান-পতন, তা বাংলা যাত্রার চর্চাতেও প্রাণ-সঞ্চার করে। বিশ শতকের সূচনাকালের স্বদেশি আন্দোলন ব্রিটিশ ভারতের জাতীয় ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। 'দ্য পাইয়োনিয়ার' পত্রিকায় ১৯০৩ এর ডিসেম্বরে প্রথম বঙ্গচ্ছেদের আভাস পাওয়া যায়। বৃহৎ বঙ্গে এ নিয়ে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ১৯০৫ এর ১৬ অক্টোবর বড়লাট কার্জনের স্বেচ্ছাচারী `Measure of administrative redistribution' এর বিধানে বিভক্ত হয় বঙ্গদেশ।[২৪৪] বঙ্গভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ-শাসকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হল সমগ্র বঙ্গবাসী। উইল ডুরান্টের (১৮৮৫-১৯৮১) চেতনায় 'It was in 1905, then, that the Indian revolution begun.'[২৪৫] লর্ড কার্জন (১৮৫৯-১৯২৫) ঘোষিত বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের ক্ষণ থেকে (৭ আগস্ট, ১৯০৫) পঞ্চম জর্জ কর্তৃক দিল্লী দরবারে এর আনুষ্ঠানিক রহিতকরণ পর্যন্ত (১২ ডিসেম্বর, ১৯১১) এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক মেয়াদ বিস্তৃত ছিল।[২৪৬] এ আন্দোলন ছিল আত্মসচেতন ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাঙালি জাতির সর্বাত্মক স্বাদেশিকতার আন্দোলন। বিদেশি দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশজাত দ্রব্য গ্রহণ হয়ে ওঠে বঙ্গভঙ্গ

---

[২৪২] নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৪০১, পৃ.২৯

[২৪৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, স্বাদেশিকতা, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃ.৮৭

[২৪৪] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৯।

[২৪৫] Durant Will, *THE Case for INDIA*, Simon and Schuster, New York, p.123

[২৪৬] হরিদাস মুখোপধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬১, ব্যবহৃত সংস্করণ জানুয়ারি-২০০৪, পৃ.২১

বিরোধী আন্দোলনের মূলমন্ত্র। ১৮৮৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে জাতীয় কংগ্রেসই পরাধীন ভারতবাসীর মুক্তিকামী সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান। বিশেষ করে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ১৯১৯ থেকে ১৯৪২ সময়কালকে 'গান্ধীযুগ' নামে অভিহিত করা যেতে পারে। এ সময় রাজনীতিতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর (১৮৫৬-১৯৪৮) যুগান্তকারী অবদান ছিল 'অহিংসা নীতি'। গান্ধীজী গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, পশুশক্তি যতই স্পর্ধিত কিংবা শক্তিশালী হোক না কেন, সত্য ও ন্যায়ের পথে নৈতিক শক্তির সাহায্যে তাকে পরাস্ত করতে হবে। আত্মশক্তির এই উদ্বোধনের নাম সত্যাগ্রহ। ব্যাক্তিগত জীবনে তাঁর কাছে সত্যকে শিল্পতুল্য মনে করতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের অভিব্যাক্তি – '... I see or find Beauty in Truth or through Truth' [247] রাষ্ট্রিক প্রচেষ্টায় শক্তি প্রয়োগের নীতি নয়; মনোবল, নিরস্ত্র সংগ্রাম এবং গণজাগরণই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জোয়ার সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে প্রবাহিত হয়। এছাড়া ১৯০৮ সালে বীর ক্ষুদিরামের ফাঁসির আদেশ হয়। ইতোপূর্বেই মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে সমগ্র ভারত ও বাংলার ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক জনতা বৃটিশ শোষকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। আর এই গণজাগরণের গান গাইবার জন্য এই দেশের মাটিতে আবির্ভূত হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭), হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯৩১), অতুল প্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩) প্রমুখ। যাত্রাজগতেও এই নবজাগরণের ঐকতান ধ্বনিত হয়। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর (জন্ম-১৯৩৬) গবেষণায় বাঙালির সেই সময়ের চিত্র প্রতিভাত হয়:

> বাঙালিরা প্রবলভাবে মাতৃভাষা বাংলার চর্চা করছিল; বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৮-৯৪) তাঁর *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় এবং নিজের উপন্যাস ও প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে বিশেষভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। বাঙালী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) ইউরোপ-আমেরিকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন। রাজনৈতিকভাবে বঙ্গপ্রদেশ ভারতের অন্যসব প্রদেশের তুলনায় যে অগ্রবর্তী ছিল তাতেও সন্দেহ নেই। ১৯০৮ সালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) তখনো অতটা খ্যাতিবান হন নি, কিন্তু তিনি লিখেছেন, 'যতই দিন যাচ্ছে ততই, জাতি সুগঠিত হচ্ছে।[২৪৮] জাতি বলতে এখানে তিনি অবশ্য অখণ্ড ভারতীয় জাতির কথাই ভাবছিলেন, কিন্তু বাস্তবে যা সুগঠিত হচ্ছিল তা প্রথমিকভাবে বাঙালীর জাতীয়তাবাদ, এবং বাংলা যেহেতু ভারতের অন্তর্গত এবং সমগ্রভারতই ব্রিটিশের অধীন, তাই সেটা ভারতীয় জাতীয়তাবাদেরও অংশ হয়ে যাচ্ছিল। বঙ্গবিভাগ যে ভারত জুড়েই এক 'জাগরণের' সৃষ্টি করেছে তাঁর এই উপলব্ধিতে কোনো ভ্রান্তি নেই।[২৪৯]

---

[247] Syed Mahammad Shahed, *Asthetic of Gandhi*, Adorn publication, Dhaka, 2012, p-15

[২৪৮] Rameshchandra Majumdam, *History of the Freedom Movement in India*, Vol. 11, Calcutta, 1963, p.131

[২৪৯] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি* (১৯০৫-১৯৪৭), সংহতি, ঢাকা, প্র.প্র. জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৬-১৭

বঙ্গভঙ্গের ফলে কলকাতায় হরতাল হয়, রাখীবন্ধনে মানুষ একে অপরের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন, খালি পায়ে হেঁটে পথে পথে করেন স্বদেশি গান ও কীর্তন। তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'বন্দে মাতরম'। রবীন্দ্রনাথ এই বিদ্রোহে কণ্ঠ মিলিয়ে 'বিজয়া সম্মিলন' নামে কলকাতায় একটি ভাষণ দেন। সে ভাষণ শেষ হয়েছে একটি গান দিয়ে – 'বাংলার মাটি, বাংলার জল,/ বাংলার বায়ু, বাংলার ফল/ পুণ্য হউক হে ভগবান।'[২৫০] স্বদেশি আন্দোলনের সময় সংবাদপত্রগুলো ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) তাঁর *দি বেঙ্গলী* পত্রিকার সম্পাদকীয়র মাধ্যমে সরকারকে সতর্ক করে দেন। ১৮৮৩ সালে পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কারাদণ্ড ভোগ করেন। ব্রিটিশ ভারতে তিনিই প্রথম আদালত প্রদত্ত রাজনৈতিক কারাদণ্ডভোগকারী ব্যক্তি। অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) দেশে ফিরে স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিয়ে ইংরেজি দৈনিক *বন্দেমাতরম* সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। বিপ্লবী আদর্শের পত্রিকার সম্পাদক হবার কারণেই তিনিও রাজদ্রোহ মামলায় অভিযুক্ত হয়ে কয়েকমাস জেল খাটেন। পরবর্তী জীবনে জেল থেকে বেরিয়ে আধ্যাত্মিকতার পথ ধরে পণ্ডিচেরী আশ্রমে গিয়ে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন শুরু করেন। *অমৃত-বাজার* পত্রিকাও স্বদেশি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তখন বাংলা ভাষায় কলকাতা থেকে পাঁচটি দৈনিক এবং কলকাতাসহ বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে ৫৭ টি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।[২৫১] রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে সাপ্তাহিক *যুগান্তরের* সম্পাদকের এক বছরের কারাদণ্ড হয়। সান্ধ্য দৈনিক *সন্ধ্যার* অত্যন্ত সাহসী সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়েরও কারাদণ্ড হতো, কিন্তু তার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। বরিশাল শহর থেকে প্রকাশিত *বরিশাল হিতৈষী* পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধেও মামলা হয়। তিনি এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। এ সময় জাতীয়তাবাদের একটা ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল সর্বত্র। ন্যাশনাল কলেজ, ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন গঠিত হয়। জাতীয় ধারার বিকল্প শিক্ষার কথা চিন্তা করা হচ্ছিল। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০), গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) নতুন এক সিরাজউদ্দৌলাকে নাটকে উপস্থাপন করেন। অনুপ্রেরণাটা উভয়ের ক্ষেত্রেই পরিপূর্ণভাবে জাতীয়তাবাদী। সার্বিক বিচারে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন বাংলার জন্য একটা উজ্জ্বল সময়। তবে ধর্মীয় বিভাজন ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জাতীয়তার ইহজাগতিকবোধকে দুর্বল করে তোলে। ফলে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পায়; ১৯৪৭ সালে ঘটে নির্মম বিভাজন।

এই সামাজিক-রাজনৈতিক জাগরণের ফলে যাত্রার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য বিবর্তন দেখা দেয়। স্বাদেশিক, রাজনৈতিক, সামাজিক পালার আকারে যাত্রা সময়ের দাবি পূরণ করতে এগিয়ে আসে। সমকালীন সমাজকে ধারণ করেই যাত্রা রচিত ও পরিবেশিত হতে থাকে। সুদীর্ঘকাল ধরে যাত্রার আসরে মূলত রাধাকৃষ্ণ, ভীমার্জুন বা

---

[২৫০] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৩৬, পৃ.

[২৫১] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি* (১৯০৫-১৯৪৭), ঐ, পৃ.২১

বিদ্যাসুন্দরেরই প্রাধান্য ছিল, কিন্তু নতুন যুগে স্থান জুড়ে নেয় ঐতিহাসিক চরিত্র। যাত্রায় ক্রমে সামাজিক চরিত্রও স্থান পেতে থাকে। কেবল ধর্মীয়-পৌরাণিক-ঐতিহাসিক নয়, পরিপার্শ্ব সমাজের নরনারীরাই অধিকার করে নেয় যাত্রার আসর। বিশ শতকে যাত্রা নতুন যুগের আধুনিক জীবন চেতনাকে আত্তীকরণ করতে থাকে। পৌরাণিক কাহিনি ও আধ্যাত্মিকতার স্থানে ধর্মনিরপেক্ষ আনন্দ-কৌতুক ও লোকশিক্ষার বিষয় যাত্রায় স্থান পেতে থাকে। ফলে সাধারণ লোকজীবনে যাত্রা শুধুমাত্র বিনোদন হিসেবে ভূমিকা রাখেনি। সচল সংস্কৃতির সহজাত বিবর্তনে ইতিহাস সচেতনতা এবং দেশাত্মবোধ খুব সহজে যাত্রায় স্থান করে নেয়। বিশেষ করে এদেশে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে ও জনজাগরণে স্বদেশি যাত্রার ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। পাশাপাশি সমাজ-সংস্কার, নীতি ও আদর্শ প্রচারে যাত্রা শহর ও গ্রামাঞ্চলে বক্তব্য উপস্থাপনের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। কলকাতাকে কেন্দ্র করে এবং দেশের আরও বেশ কিছু স্থানে এসময় পেশাদার যাত্রার দল গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে যাত্রা আরও জীবনঘনিষ্ঠ হয়। আধুনিক নাট্যধারার অভিনয়-আঙ্গিক এবং মননশীলতা ইউরোপীয় নাট্যকলার প্রভাবে সম্প্রসারিত হলেও, যাত্রা তার পরিবর্তিত ধারায় নিজস্ব প্রবাহ থেকে বিচ্যুত হয়নি –– বিবর্তিত হয়েছে; মৌলিকত্ব হারায়নি।[২৫২] আলোচ্য সময়পর্বে বাংলা-যাত্রার প্রসার ঘটে প্রধানত তিন ধারায় –– স্বাদেশিক, ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক এবং সামাজিক। এ সময়ে পৌরাণিক তথা ধর্মনির্ভর যাত্রাপালার পরিবর্তে জীবনঘনিষ্ঠ ঐহিকতার বিস্তার যাত্রার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৩.২ জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিক যাত্রা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর *জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি (১৯০৫-১৯৪৭)* গ্রন্থে 'জাতীয়তাবাদ' বলতে বাঙালি সমাজে প্রচলিত কয়েকটি ধারণার উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, প্রথমটির প্রবক্তা বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' নিবন্ধে গুরু শিষ্যের কথোপকথনে গুরু শিষ্যকে জানাচ্ছেন, 'পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদিগের মত প্রভাবশালী, ক্ষমতাশালী ও ধার্ম্মিক কোনো জাতি নহে।'[২৫৩] এধারণাটি 'শুধু ধর্মীয় নয়, সর্বোপরি বর্ণবাদীও বটে।' দ্বিতীয় ধারণাটির ধারক মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১) তাঁর 'গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা প্রস্তাব এক' – এ তিনি বলেছেন, 'এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন সম্বন্ধ যে, ধর্ম্মে ভিন্ন কিন্তু মর্মে ও কর্মে এক – সংসার কার্য্যে ভাই না বলিয়া থাকিতে পারি না।' ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে এ বক্তব্য সাম্প্রদায়িকতাহীন হলেও এতে দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণা স্পষ্ট। তৃতীয় মতটি আরো

---

[২৫২] অধ্যাপক সুশান্ত সরকার ও ড. নাজমুল আহসান সম্পাদিত *যাত্রা : উদ্ভব ও বিকাশ*, লোকনাট্য ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কেন্দ্র (লোসাউক), খুলনা, ৩০ জুন ১৯৯৪, পৃ. ৯৮

[২৫৩] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি*, সংহতি, ঢাকা, প্র. প্র.২০১৫, পৃ. ৩৬-৩৭

নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে, 'বঙ্গবাসীকে বাঙ্গালী বলে, এই বাঙ্গালী এখন হিন্দু মুসলমান দুই শাখায় বিভক্ত। [...] বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত না হইলে কাহারো উন্নতি লাভের আশা নাই।'[২৫৪] এই মতে বাসস্থানই হচ্ছে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। চতুর্থ মতটি আরো আবেগতাড়িতভাবে দাবি করেছে,

> পুরুষানুক্রমে যুগ যুগান্তর ধরে বাঙ্গালী দেশের গণ্ডীর মধ্যে বাস করি, আর এই বাঙ্গালা ভাষাতেই সর্বক্ষণ মনের ভাব ব্যক্ত করেও যদি বাঙ্গালী না হয়ে আমরা অপর কোনো একটা জাতি সেজে বাঁচতে চাই, তাহলে আমাদের তো আর কখনও উত্থান নাই-ই, অধিকন্তু চিরতমসাচ্ছন্ন গহ্বরে পতনই অবশ্যম্ভাবী।[২৫৫]

যে বাসভূমির ভিত্তি বাঙালি জতীয়তাবাদের ভিত্তি বলে দাবি করা হয়েছিলো, তারই বিভাজনের প্রস্তাবে তথা পরিকল্পনার প্রতিবাদে বাঙালির জাতীয়তাবাদী বোধের স্ফূরণ ঘটে। তবে স্বদেশি যুগের সূচনা ঘটে ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ থেকে, ১৯১১ এর বঙ্গভঙ্গরদ পর্যন্ত। ১৯১২ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ে তা বিকশিত হয়। ১৯১৮-৪৭ সাল পর্যন্ত গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সংঘঠিত হয়। এই তিন পর্যায়ে জাতীয়তাবাদী ধারণা বিকশিত হয়। এই পর্বের যাত্রাপালাগুলো অনেকটা সেই চেতনায় ঋদ্ধ।

স্বদেশি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন দিয়ে, ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগ পর্যন্ত এ প্রয়াস কার্যকর ছিল। স্বদেশি আন্দোলনের মতো স্বদেশি যাত্রাও এ সময়ের সৃষ্টি। জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষা, সমাজ বন্ধন, নীতি শিক্ষা, স্বদেশি চেতনা তথা ইংরেজ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে এ সময়ের যাত্রাপালা জনমত গঠনে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে। স্বাদেশিকতার নীতি ধারণ এবং স্বাদেশিক বোধে উজ্জীবিত হওয়ায় এ সময় পরিবেশিত যাত্রা স্বদেশি যাত্রা বলে চিহ্নিত হয়। স্বদেশি যাত্রার বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে মিলন কান্তি দে জানিয়েছেন : 'গানের সঙ্গে বক্তৃতা আর বক্তৃতার সঙ্গে গান, বিষয়বস্তু হবে জাতীয় জাগরণ ও সমাজ সচেতনতামূলক-এ হচ্ছে স্বদেশি যাত্রার চরিত্র। প্রচলিত ব্যবস্থার বাইরে উন্মুক্ত স্থানে এ শ্রেণির পালা সহজেই পরিবেশন করা যায়।'[২৫৬] স্বদেশি যাত্রা যুগে মুকুন্দদাস, ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী প্রমুখ যাত্রাওয়ালা যাত্রাভিনয়ের ভেতর দিয়ে জাতীয়তাবোধ এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে প্রবলভাবে ভূমিকা রাখেন।

৩.২.১ মুকুন্দদাস (১৮৭৮-১৯৩৪)

বরিশালে এই স্বদেশি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন সব্যসাচী কর্মযোগী অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-২৩)। ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে বরিশাল টাউন হলে স্বদেশি প্রচারের বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন – 'আমরা যেসব

---

[২৫৪] আমির উদ্দীন আহমদ, 'মুসলমান শিক্ষা সমিতি', বাসনা, ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩১৬, উদ্ধৃত. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম(সঙ্কলিত), *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত* (১৯০১-১৯৩০), ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ ২৫৯

[২৫৫] নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী, 'আমাদের কাজ', সওগাত, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৬, পূর্বোক্ত, পৃ.১৬২

[২৫৬] মিলন কান্তি দে, *যাত্রাশিল্পের সেকাল-একাল*, ঢাকার ৪০০ বছরের যাত্রা পরিক্রমা, ইত্যাদি, ঢাকা, প্র.প্র. ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ.৮৭

বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছি তা যদি কেউ যাত্রা আকারে গ্রামে গ্রামে প্রচার করে তাহলে আমাদের এইরূপ সভা বা বক্তৃতার চেয়ে অনেক কার্যকরী হয়।'[২৫৭] সেই সভায় উপস্থিত যজ্ঞেশ্বর বা যজ্ঞাই হলেন পরবর্তীকালের বিখ্যাত চারণকবি মুকুন্দদাস। সম্ভবত তিনি এই বক্তৃতার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। গবেষক মিলন কান্তি দের ভাষায় :'সে যুগের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের অনুপ্রেরণায় ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন প্রচারে যে নতুন যাত্রা জন্ম দিলেন তিনি (মুকুন্দদাস), সেটাই স্বদেশী যাত্রা নামে পরিচিত।'[২৫৮]

১৯০২ সালে রামানন্দ (বা হরিবোলানন্দ) নামক এক ত্যাগী সাধুর নিকট দীক্ষা নিয়ে তিনি 'মুকুন্দদাস' নামগ্রহণ করেন।[২৫৯] ১৯০৩ সালে মুকুন্দদাস বরিশালে 'একসেনসিয়ার' নামে একটি ক্লাব এবং 'বাণীকুঞ্জ সাহিত্য সভা'র সাথে সম্পৃক্ত হন। একসেনসিয়ার ক্লাবটিতে সমকালীন জাতীয়তাবাদী বই, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি সংগ্রহ করা হতো এবং সেগুলো পঠনপাঠন ও পর্যালোচনা করা হত। এই ক্লাবে নিয়মিত যাতায়াত করার ফলে আধুনিক সাহিত্য, সমাজ ও রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে তাঁর মনে স্পষ্ট ধারণা জন্মে। 'স্বদেশী আন্দোলনের সময় (১৯০৫) তিনি বরিশাল কালীবাড়ির তান্ত্রিক-সাধক সোনাঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।'[২৬০] শক্তি উপাসক সোনাঠাকুরের ধর্মীয় চেতনা ও দেশপ্রেম তাঁকে স্বাদেশিক চেতনায় পরিপুষ্ট করে। সে সময় অশ্বিনীকুমার দত্ত, জগদীশ মুখোপাধ্যায় (১৮৬১-১৯৩২), সেবব্রতী কালীশচন্দ্র (মৃ.১৩২১) সহ অনেক শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ সোনাঠাকুরের কালীবাড়িতে জড়ো হতেন। এদের সংস্পর্শে আসার কারণে মুকুন্দদাস ক্রমশ সমাজ ও রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেন। ১৯০৫ সালের দিকে বরিশালের বিপ্লবী নেতা ও শঙ্কর মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রজ্ঞানন্দ (১২১৮-১৩৬৭), সতীশ চক্রবর্তীর (১৮৯১-১৯৬৮) বোন সরোজিনী দেবীর কাছে তিনি শক্তিধর্মে দীক্ষা নেন। তখন থেকেই ধর্মভাবনার ওপর দেশমাতৃকা ও গণমানুষের প্রতি অনুরাগ ও ভালোবাসা তাঁর অন্তরে স্থান পেতে শুরু করে। মুকুন্দদাসের নেতৃত্বে স্বদেশিয়ানায় মেতে ওঠে খোলামঞ্চ যাত্রা-আসর, গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর। তাঁর যাত্রা হয়ে ওঠে স্বাধীনতা আর স্বাধীনতাকামী মানুষের মন্ত্র। দেশমাতৃকার পূজায় তিনি প্রথম গাইলেন:

আমাদের জন্মভূমি, দেবতার লীলাভুমি।
দেবগণ আসুক নেমে পূর্ণ হউক কামনা।।
সার্থক হবে তবে এ জনম সবাকার।
ছেলের গৌরব হবে গরবিনী মা আমার।।

---

[২৫৭] নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, *চারণকবি বিজয়লাল জীবন সাহিত্য*, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ২০০৫, পৃ.১২৮

[২৫৮] মিলন কান্তি দে, *যাত্রাশিল্পের সেকাল-একাল*, ঢাকার ৪০০ বছরের যাত্রা পরিক্রমা, ইত্যাদি, ঢাকা, প্র.প্র. ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ.৮৭

[২৫৯] সুবলচন্দ্র মিত্র, *সরল বাঙ্গালা অভিধান*, নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্র.প্র.১৯০৬, ব্যবহৃত সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৩, পৃ.১০৬০

[২৬০] *ভারতকোষ (পঞ্চম খণ্ড)*: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ.৩৪৩

জগৎ লুটিবে পায় ঘুচে যাবে যত দায়,

মিটে যাবে মুকুন্দের চিরদিনের বাসনা।। [২৬১]

দেশমাতার বন্দিদশা ঘোচানোর সংকল্প নিয়ে তিনি হাজার হাজার শ্রোতার সামনে উপস্থিত হতেন। 'বঙ্গভঙ্গের উন্মাদনার যুগে মুকুন্দদাস বাংলার প্রান্তে প্রান্তে দেশমাতৃকার পরাধীনতার গ্লানি ও স্বদেশভূমির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার কথা পৌঁছে দিয়েছিলেন।'[২৬২] চারণের বেশে শ্রোতারা দেখতেন এক সন্ন্যাসীকে –– মাথায় পাগড়ি, দেহে গেরুয়া আলখাল্লা, কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস আর উদাত্ত সংগীত:

আমি দশ হাজার প্রাণ যদি পেতাম, –

তবে ফিরিঙ্গি বণিকের গৌরব রবি

অতল জলে ডুবিয়ে দিতাম।

শোন সব ভাই স্বদেশী, হিন্দুমুসলেম ভারতবাসী, –

পারি কিনা ধরতে অসি জগৎকে তা দেখাইতাম।[২৬৩]

উৎসাহ উদ্দীপনায় হাজার হাজার যুবক তখন ঐ দশ হাজারির দলে যোগ দিতে এগিয়ে আসে। শ্যামাসুন্দরী আর গুরুদয়াল দের পুত্র যজ্ঞেশ্বর বিক্রমপুরের ভূমিপুত্র হলেও মুকুন্দদাস পরিচয়ে বরিশালেই বেড়ে ওঠেন। তিনি মাত্র উনিশ বছর বয়সে বরিশালের নায়েব নাজির বীরেশ্বর গুপ্তের কীর্তনের দলে যোগ দেন। মুকুন্দদাস ছিলেন রাজনৈতিক নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের একনিষ্ঠ শিষ্য। 'বরিশালের কংগ্রেসনেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের নিকট স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে মুকুন্দদাস 'দেশাত্মবোধক গান' ও 'যাত্রা' রচনা করে মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন।'[২৬৪] প্রথম যাত্রাপালা *মাতৃপূজায়* (১৯০৫) স্বদেশি চেতনার পরিচয় স্পষ্ট:

ফুলার আর কি দেখাও ভয়,

দেহ তোমার অধীন বটে।

মন তো তোমার নয়।

হাত বাঁধবে, পা বাঁধবে,

ধরে না হয় জেলেই দিবে –

মন কি ফিরাতে পারবে,

সে তো পূর্ণ স্বাধীন রয় বন্দে-মাতরাম্ মন্ত্র কানে,

---

[২৬১] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৯

[২৬২] দর্শন চৌধুরী, *বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস*, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ-২০০৩, পৃ. ৩৫-৩৬

[২৬৩] গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৭২, পৃ.৩৬৩

[২৬৪] *বাংলা পিডিয়া (৮ম খণ্ড)*:বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩ , পৃ. ২০০১

বর্ম এঁটে দেহে মনে।
রোধিতে কি পারবে রণে –
তুমি কত শক্তিমান।[২৬৫]

বিদেশি শাসকের নির্মম নির্যাতনে এতটুকুও দমে না গিয়ে মুকুন্দদাস বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট ফুলার সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বজ্রকণ্ঠে উপরিউক্ত গানটি গেয়েছিলেন। মুকুন্দদাস হারমোনিয়াম ও ডুগি তবলা সহযোগে পালা পরিবেশন করতেন। সংলাপ ও গানের সঙ্গে কখনো কখনো থাকত ব্যঙ্গবিদ্রুপ ও কৌতুকরস, যাতে গ্রামগঞ্জের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ মনের আনন্দে রাতভর যাত্রাগান উপভোগ করে। মুকুন্দদাসের গানে সেদিন যে বাণী ঝরে তা শৃঙ্খলিত দেশজননীর মুক্তির আশ্বাস বহন করে। যখন তিনি গাইতেন –

ভয় কী মরণে, রাখিতে সন্তানে
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে।
তাথৈ তাথৈ থৈ দ্রিমী দ্রিমী দং দং,
ভূত পিশাচ নাচে যোগিনী সঙ্গে।
দানব দলনী হয়ে উন্মাদিনী,
আর কি দানব থাকিবে বঙ্গে।।
সাজ রে সন্তান হিন্দু মুসলমান,
থাকে থাকিবে প্রাণ না হয় যাইবে প্রাণ।
লইয়া কৃপাণ হও রে আগুয়ান,
নিতে হয় মুকুন্দে-রে নিও রে সঙ্গে।[২৬৬]

তখন শত শত নবীনচিত্ত দেশের জন্য আত্মবলিদানের আকাঙ্ক্ষায় উত্তাল হয়ে উঠতো। দেশের কর্তব্যহীন বাবুদের লক্ষ্য করে তাঁর ব্যঙ্গাত্মক উচ্চারণ:

বাবু বুঝবে কি আর মলে!
কাঁধে সাদা ভূত চেপেছে, একদম দফা সরালে।
খেতে ভাত সোনার থালে,
নাউ সেটিসফায়েড্ স্টিলের থালে,
তোদের মত মূর্খ কি আর দ্বিতীয়টি মেলে।
ছিল ধান গোলাভরা, শ্বেত ইদুঁরে করল সারা,
চোখের ওই চশমা জোড়া দেখনা তোরা খুলে।[২৬৭]

---

[২৬৫] মুকুন্দদাস, *মাতৃপূজা*, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ৩৬২

[২৬৬] জয়গুরু গোস্বামী, *চারণকবি মুকুন্দদাস*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ২১৪

মাতৃপূজার এই গানের পর মুকুন্দদাসকে ইংরেজ সরকার আর সহ্য করতে পারলেন না। এই একটি কথা 'শ্বেত ইঁদুরে করল সারা' অর্থাৎ ইংরেজকে 'শ্বেত ইঁদুর' বলায় মুকুন্দদাসের কারাদণ্ড হয়। গোয়েন্দা পুলিশের রির্পোটে Mukundalaldas - the notorious jatrawalla of Barishal - রাজরোষে পড়লেন।[২৬৮] এ গানের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশি-বয়ান:

> ...the well known white rat song in popular even now amongst Bengali agitators….It is one of the four songs which formed the charge against Jatrawalla Mukundadas.[269]

বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট দেশাত্মবোধের জোয়ার তিনি তাঁর পালাগানে জোরালো কলমে, দরাজ গলায় ও ব্যক্তিত্বের রসায়নে বহুদূর পৌঁছে দিলেন। একদিকে বাঙালির বিলাতি দ্রব্য বর্জনের অবিচল প্রয়াস, অপরদিকে বৃটিশ আমলাতন্ত্রের লাঠির আঘাতে বিলাতি প্রশাসনের দম্ভ ও নির্যাতনের প্রকাশ ঘটেছে মুকুন্দের উচ্চারণে। মুকুন্দদাসের যাত্রাগান সম্পর্কে জয়গুরু গোস্বামীর বক্তব্য :

> মুকুন্দাসের গান ঘুম ভাঙ্গানির গান, মরা গাঙ্গে বান ডাকবার গান, শৃঙ্খল মোচনের গান, ফাঁসির মঞ্চে মরণজয়ী গান। তাই মুকুন্দদাসের গান একান্তভাবেই মুকুন্দদাসের নিজস্ব সৃষ্টি। ভাবে-ভাষায়, সুরে-ছন্দে-রচনায় পরিবেশনায় অনবদ্য। মুকুন্দদাস একটি যুগ, একটি ইতিহাস, একটি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং ভবিষ্যৎ বাংলার নির্ভীক চেতনার এর নির্ভরযোগ্য প্রতিশ্রুতি।[২৭০]

তাঁর দেশাত্মবোধক গান গ্রামে-গঞ্জে প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণার কাজ করে এবং এই দেশাত্মবোধের চড়া সুরের জন্য তাঁর যাত্রাদল অচিরেই 'স্বদেশী যাত্রা' নামে খ্যাতি অর্জন করে; তিনিও আখ্যাত হতে লাগলেন চারণ কবির মর্যাদায়।[২৭১] মুকুন্দদাসের রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে ঐতিহাসিক হীরালাল দাশগুপ্ত (১৮৯০-১৯৭১) জানিয়েছেন:

> যাত্রাগানের সাহায্যে মুকুন্দের স্বদেশী প্রচার দিগ্বিজয়-যাত্রা এগিয়ে চলেছে। গ্রামে গ্রামে বন্দরে বন্দরে শ্রুত হচ্ছে তাঁর জয়ধ্বনি। তাঁর রচিত 'মাতৃপূজা' শুধু ক্ষণিকের উত্তেজনা সৃষ্টি করেনা। এই সঙ্গীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মোৎসর্গে এগিয়ে এসেছে সহস্র সহস্র যুবক।[২৭২]

বরিশাল, মাদারীপুর, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ সহ বিভিন্ন এলাকায় তিনি যাত্রাপালার মাধ্যমে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বার্তা পৌঁছে দিতে থাকেন। ১৯০৬ সালে শান্তিভঙ্গের কারণ দেখিয়ে, সরকার বিভিন্ন

---

[২৬৭] মুকুন্দদাস, *মাতৃপূজা*, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৭২, পৃ.৩৬২

[২৬৮] দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্র. প্র. ২০০৮, পৃ.৯

[২৬৯] দেবজিত্ বন্দ্যোপাধায়, *বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষাপটে বাংলার মঞ্চগান*, পশ্চিমবঙ্গ, আক্টোবর, ২০০৫, পৃ.৩৫

[২৭০] জয়গুরু গোস্বামী, *চারণকবি মুকুন্দদাস*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্র.প্র সেপ্টেম্বর ১৯৭২

[২৭১] অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়, *সামাজিক চালচিত্রে যাত্রাগান*, ভারবি, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৯৮, পৃ. ৫৬

[২৭২] হীরালাল দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৭, পৃ.৯৯

জেলায় মুকুন্দদাসের যাত্রা মঞ্চায়নের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এক জেলায় নিষেধাজ্ঞা জারি হলে তিনি অন্য জেলায় গিয়ে *মাতৃপূজা* পালা পরিবেশন শুরু করেন। ১৯০৮ সালে সমগ্র বাংলাদেশ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে। একই বছর অশ্বিনীকুমার দত্ত স্বদেশি আন্দোলনের কারণে গ্রেপ্তার হন; লক্ষ্ণৌর কারাগারে দুবছর কারারুদ্ধ থাকেন। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর বিশ্লেষণে দেখা যায়:

> চারণ কবি মুকুন্দদাস নিজে যে অত্যন্ত প্রতিভাবান ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন ও স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ততার পেছনে অশ্বিনীকুমারের অনুপ্রেরণা যে কার্যকর ছিল তাও সত্য। মুকুন্দদাস স্বদেশী গান ও যাত্রা লিখে মানুষকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন। অশ্বিনীকুমারের রাজনীতি মুকুন্দদাসকে চারণ কবিতে পরিণত করার মূল প্রেরণা।[২৭৩]

অশ্বিনীকুমারসহ বাংলাদেশের মোট নয়জন রাজনৈতিক নেতাকে সুদূর পশ্চিমে নির্বাসিত করা হয়। এ বছরে ডিসেম্বর মাসে বরিশাল জেলার পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলে উত্তর শাহবাজপুর দাদপুরের কাছে মেঘনা নদীতে চলন্ত নৌকা থেকে পুলিশ দলসহ মুকুন্দদাসকে গ্রেফতার করে বরিশালে নিয়ে আসে। পাঁচ হাজার টাকা জামিনে তিনি মুক্ত হন। কিন্তু মামলার তিন দিন আগে বরিশালের রাস্তায় ভ্রমণকালে তিনি পুনরায় গ্রেপ্তার হন। সরকারের দমননীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, কোনও আইনজীবী মুকুন্দদাসের রাজদ্রোহ মামলা পরিচালনা করার সাহস পান নি। এ প্রসঙ্গে গবেষক স্বরোচিষ সরকার (জ.১৯৬০) জানিয়েছেন:

> মামলার নির্দিষ্ট তারিখে শেষ পর্যন্ত উকিল ছাড়াই মুকুন্দদাস কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ান এবং আইনের সাহায্য নিতে সময় প্রার্থনা করেন। তার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয়। বরিশালের আইনজীবীদের এই ভীরুতা বা চারিত্রিক দুর্বলতা মুকুন্দদাসকে গভীরভাবে আহত ও ক্ষুব্ধ করে। জেল হাজতে ফেরার পথে বার লাইব্রেরীর সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তাই সেদিন তিনি উকিলদের উচ্চকণ্ঠে ভর্ৎসনা করেছিলেন।[২৭৪]

পরবর্তীকালে ভোলা মহকুমার আইনজীবীগণ তাঁর মামলা পরিচালনায় এগিয়ে আসেন। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজের এই রাজদ্রোহ মামলার বিচারে মুকুন্দদাসের তিন বছর জেল ও তিনশত টাকা জরিমানা হয়। পাশাপাশি তাঁর ভাই প্রকাশক রমেশ চন্দ্রকে ছয়মাস এবং মুদ্রক নিবারণ মুখোপাধ্যায়কে চারমাস সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। *মাতৃপূজা* পালাটি পাণ্ডুলিপি অবস্থায় নিষিদ্ধ হয় বলে এর কোনও কপি পাওয়া যায় না। *মাতৃপূজার* পরে জেলফেরত মুকুন্দদাস গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১২) *বলিদান* নাটকের যাত্রারূপ দেন *সমাজ* (১৯১১-১২) নামে। এটি ১৯২৯ সালে কাশিপুর, আনন্দময়ী আশ্রম, বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয়। ২৪টি দৃশ্যে বিভক্ত এ পালায় তিনি সমাজের কুলীনপ্রথা, যৌতুকপ্রথা তথা পণপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। নানা বিষয়ে অন্ধ সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি খুলে

---

[২৭৩] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি* (১৯০৫-১৯৪৭), ঐ, পৃ.২৪

[২৭৪] স্বরোচিষ সরকার, *মুকুন্দদাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ নভেম্বর ১৯৯৯, পৃষ্ঠা.৪৩

দেয়াই ছিল *সমাজ* শীর্ষক যাত্রাপালাটির লক্ষ্য। অস্পৃশ্যতা বর্জন, বিদেশি পণ্য বর্জন, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ইত্যাদি *পল্লীসেবা* (১৯২৫) পালার বিষয়বস্তু। পালাটিতে পল্লির কল্যাণের জন্য দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে উদ্বোধিত করার আহ্বান আছে। পাশাপাশি ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর লবণ আন্দোলনের কথা স্থান পেয়েছে। বিশ শতকের প্রথম দশকে যে বিদেশি পণ্য বর্জন আন্দোলন সমগ্র বাঙালির চৈতন্যকে কাঁপিয়ে তুলেছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে *পল্লীসেবার* প্রজাগণ গেয়ে ওঠে:

বিদেশী চিজ আর কিনব্না
কত্ত কছম করি,
তবে দেশের টাকা রইবে দেশে
লক্ষ্মী ঘরে আসবে রে ফিরি।[২৭৫]

মুকুন্দদাসের কাছে 'চিন্তা ও কার্যের স্বাধীনতাই জীবন' বলে বোধ হতো। তিনি ছিলেন কর্মযোগী। এই কর্মযোগ সাধনায় দেবতার আশীর্বাদ চাই। তাই তিনি রণরঙ্গিণী অসুরনাশিনী শ্যামার চরণে আশিস প্রার্থনা করে তাকে জাগাতে চেয়েছেন:

জাগো গো জাগো জননী,(ওমা শ্যামা)
তুই না জাগিলে শ্যামা
কেউ জাগিবে না মা;
তুই না নাচালে কারো
নাচিবে না ধমনী।[২৭৬]

কেবল শ্যামা মাকে নয়, *পল্লীসেবা* পালায় সমগ্র দেশবাসীকে জাগানোর জন্যই মুকুন্দদাস চারণ কবির ব্রত গ্রহণ করলেন:

দাঁড়াবে বাঙ্গালী আপন ভুলিয়া
সাজাই বাংলা নূতন সাজে।
মাভৈঃ উঠরে ও বাঙ্গালী বীর
কতকাল রবি নত করি শির,
শুনেছি রে জয় বাঙ্গালী জাতির
অনাহত শব্দ ধ্বনির মাঝে।[২৭৭]

---

[২৭৫] পল্লীসেবা, পুলক চন্দ, *জাগরণের চারণ মুকুন্দদাস ও তাঁর রচনাসমগ্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২৬৩

[২৭৬] পল্লীসেবা, পুলক চন্দ, *জাগরণের চারণ মুকুন্দদাস ও তাঁর রচনাসমগ্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ.৩০৩

[২৭৭] পল্লীসেবা, পুলক চন্দ, *জাগরণের চারণ মুকুন্দদাস ও তাঁর রচনাসমগ্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২৮৩

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে ইংরেজ সরকার কৌশলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে খিলাফত আন্দোলনের সময় থেকে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের উপর দেশের সাহিত্যিক-রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতে থাকেন। মুকুন্দদাসও *পল্লীসেবা* পালায় 'সুলভা' চরিত্রের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যের বাণী শুনিয়েছেন:

ভাইরে ভাই
হিন্দু আর মুসলমান
এক মায়েরই দুটি সন্তান রে,-
একত্র হইয়া সবে
মায়ের পূজা কর ভবে,
ধন্য হবে মানব জীবন,
বন্দেমাতরম্।[২৭৮]

জাতি, বর্ণ, ধর্ম সম্প্রদায়ের ভেদ তুচ্ছ করেছেন বলেই তাঁর গান হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রাণে উন্মাদনা জাগিয়েছিল এবং সকল শ্রেণির কাছে জনপ্রিয় ছিল। ১৯২১ সালে হুগলীতে কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে মুকুন্দদাসের দেখা হয়। তখন তিনি কবির অনুমতি নিয়ে তাঁর *পল্লীসেবা* পালায় যুক্ত করেছিলেন কবির রচিত একাধিক গান। তার মধ্যে একটি হচ্ছে:

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছে জুয়া।[২৭৯]

উদ্দীপনাময় এ সমস্ত গানের সঙ্গে মুকুন্দদাস আবেগ ও জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে জনগণের মোহনিদ্রা ভেঙে দিতেন। মাথায় পাগড়ি ও গৈরিক ভূষণধারী মুকুন্দদাস প্রত্যেক পালায় গায়ক চরিত্রে অংশগ্রহণ করতেন। পালায় কামান্ধ জমিদার ব্রজেশ্বরের অত্যাচার, দেওয়ান হরগোবিন্দের স্বার্থপর কুটিলতা, সুদখোর রাজীব দত্তের হৃদয়হীনতা ও নব্যবাবুদের কর্তব্যহীনতাকে তুলে ধরা হয়েছে। আর আশ্রমবাসী প্রেমানন্দ জনচিত্তে ঈশ্বরভক্তি, দেশপ্রেম ও মনুষ্যত্ববোধ জাগিয়ে তোলার পাশাপাশি আত্মনির্ভরশীল একটি গ্রাম নির্মাণের আদর্শ প্রচার করেছেন।'শহরমুখী প্রবণতা বন্ধ করে গ্রামে ফিরে গিয়ে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে গ্রামের উন্নতি করার মধ্য দিয়ে দেশসেবার মন্ত্র রয়েছে এ পালায়।'[২৮০] সতীশের উচ্চারণে এ বক্তব্য আরও স্পষ্ট:

---

[২৭৮] পল্লীসেবা, পুলক চন্দ, *জাগরণের চারণ মুকুন্দদাস ও তাঁর রচনাসমগ্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৩০৬

[২৭৯] গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ, *৩০০ বছরের যাত্রা শিল্পের ইতিহাস*, পুষ্প, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১৮২-১৮৫

[২৮০] তপন বাগচী, *বাংলাদেশের যাত্রাগান জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৫৬-১৬৬

সতীশ ।। নিতাই দাদা বললেন শহরের নেশা ছাড়তে হবে, তা না হলে বাংলার অন্ন-সমস্যার সমাধান কিছুতেই হবে না। শহরমুখো হয়ে গেছে জাতি, তাকে আবার পল্লীমুখী করতে হবে।[২৮১]

মুকুন্দদাসের *কর্মক্ষেত্র* পালায়ও ব্রিটিশ উপনিবেশ বিরোধিতার পাশাপাশি স্বাদেশিকতা ও সমাজ চেতনার সন্ধান পাওয়া যায়। দেশাত্মবোধক এ পালায় দেশি পণ্য ও স্বদেশের প্রতি অনুরাগের আবেগ ধ্বনিত:

এডিটার খোঁজ রাখে কজনার
আমরা ত্রিশ কোটি মায়ের ছেলে
নাম ছাপে সে দু-চারজনার ।...
রামা আজ দিল্লি যাবেন
শ্যামা যাবেন কাছার ।
স্টারে নাচবেন কুসুমকুমারী
আ মরি খবরের বাহার।। [২৮২]

অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী মুকুন্দদাস অনায়াসে উচ্চারণ করেছেন হিন্দু-মুসলিম মিলনের বাণী :

রাম-রহিম না জুদা করো
মনটা খাঁটি রাখো জি।
দেশের কথা ভাবো ভাইরে
দেশ আমাদের মাতাজি ।
হিন্দু-মুসলমান এক মায়ের ছেলে
তফাৎ কেন কর জি।
দুভাইয়েতে দু ঘর বেঁধে
করি একই দেশে বসতি।।[২৮৩]

কর্মক্ষেত্রের চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে ফেরিওয়ালার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় :

ছেড়ে দাও রেশমি চুড়ি, বঙ্গনারী
কভু হাতে আর পরো না
জাগো গো ও জননী ও ভগিনী
মোহের ঘুমে আর থেকো না ।[২৮৪]

---

[২৮১] মুকুন্দদাস, পল্লীসেবা, পুলক চন্দ, *জাগরণের চারণ মুকুন্দদাস ও তাঁর রচনাসমগ্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ২৯০

[২৮২] মুকুন্দদাস, কর্মক্ষেত্র, পুলক চন্দ, *জাগরণের চারণ মুকুন্দদাস ও তাঁর রচনাসমগ্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়রি ২০১১, পৃ. ৩১৭

[২৮৩] কর্মক্ষেত্র, পুলক চন্দ, *জাগরণের চারণ মুকুন্দদাস ও তাঁর রচনাসমগ্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়রি ২০১১, পৃ. ৩৫৬

[২৮৪] কর্মক্ষেত্র, পুলক চন্দ, *জাগরণের চারণ মুকুন্দদাস ও তাঁর রচনাসমগ্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়রি ২০১১, পৃ. ৩৯২

এ গানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণের নগ্নরূপটি উন্মোচিত হওয়ায় মুকুন্দদাস রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হন। পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপে অনুশোচনায় হাতের রেশমি চুড়ি ভেঙে ছুঁড়ে ফেলতেন সমাগত বঙ্গনারীরা। তাঁর লক্ষ্য ছিলো গানের মাধ্যমে দেশবাসীকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা এবং প্রতিটি মানুষের মনে বিদেশি বর্জন, স্বদেশি গ্রহণ নীতিকে পৌঁছে দেয়া। [২৮৫] এই নাটকে আদর্শ চরিত্র হলো এক বাউল। এখানকার কর্মযজ্ঞের তিনি প্রাণপুরুষ। এই বাউল সকলকে দেশি পণ্য কিনতে ও দেশকে ভালবাসতে উদ্বুদ্ধ করেন। বাউল বিশ্বাস করেন, দেশের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র হচ্ছে পল্লি। পল্লির উন্নতির জন্য গৃহশিল্প যেমন চাই, তেমনি দরকার সমবায় ব্যাঙ্ক। এই পালার সর্বাধুনিক চরিত্র বাউলের মেয়ে গার্গী স্কুল শিক্ষয়িত্রী। ঘরে ঘরে আদর্শ গৃহিণী তৈরির মাধ্যমে সে নারীর আত্মজাগরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। মুকুন্দদাসের *কর্মক্ষেত্র* নাটকটি ১৯৩২ সালের ২০ এপ্রিল তারিখের গেজেট ঘোষণায় নিষিদ্ধ হয়। ১৯৩১ সালের ভারতীয় প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) আইনের ১৯ ধারায় বইটি বাজেয়াপ্ত হয়।[২৮৬]

চারণ চরিত্রের অক্লান্ত রূপকার চারণ কবি মুকুন্দদাস। *কর্মক্ষেত্রে* বাউল, *পল্লীসেবায়* সন্ন্যাসী, *ব্রহ্মচারিণী*তে প্রেমানন্দ এবং *সমাজে*র ভাবুক সত্য তাঁর চারণ চরিত্রেরই প্রতিনিধি। স্বদেশি আন্দোলনের পাশাপাশি জমিদারের অন্যায় শাসন বা সুদখোরের অত্যাচার হয়ে ওঠে তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য। পরবর্তী পালা *পথ*ও ১৯৩২ সালের ২৩ এপ্রিলের প্রকাশিত গেজেটের মাধ্যমে নিষিদ্ধ হয়। একই আইনের একই ধারাবলে ১৯৩২ সালের ১৪ নভেম্বর প্রকাশিত গেজেটের মাধ্যমে *পথের গান* এবং ১৬ নভেম্বর প্রকাশিত গেজেটের মাধ্যমে মুকুন্দদাসের *কর্মক্ষেত্রের গান* সঙ্গীত সংকলন গ্রন্থ দুটি বাজেয়াপ্ত হয়।[২৮৭] তিনি পালাগান করে বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে পুলিশি নির্যাতন সহ্য করে পারিবারিক চিন্তা ও বৈষয়িক স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে মানুষকে জাগিয়ে তোলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে এবং নজরুলের আগে মুকুন্দদাস মা-মাটি-মানুষের গান গেয়ে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে মুক্তিমন্ত্রে দেশকে উদ্দীপিত করেন। খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিক ইব্রাহিম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮) তাঁর স্মৃতিকথায় মুকুন্দদাসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। নোয়াখালীর একজন মৌলভীকে নিয়ে তিনি ময়মনসিংহ শহরে মুকুন্দদাসের যাত্রা দেখতে যান। এই মৌলভী মনে করতেন যাত্রা দেখা একটা গুনাহুর কাজ। কিন্তু মুকুন্দদাসের যাত্রা দেশপ্রেমের কথা বলে। ফলে তা ওয়াজ নছিহতের মতোই মানুষের চেতনার উদ্‌গীরণে ভূমিকা রাখে বলে তিনি উপলব্ধি করেন। অর্থাৎ যাত্রা দেখার পর মৌলভীর ধারণার রূপান্তর ঘটে। তাঁর ভাষায় : 'মানুষের সেবার জন্য মানুষকে হক পথে পরিচালনার জন্য

---

[২৮৫] নলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, চারণকবি বিজয়লাল জীবন সাহিত্য : পুস্তক বিপনী, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১২৮-১৮১

[২৮৬] শিশির কর, *ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই*, আনন্দ, কলকাতা, প্র. স. সেপ্টেম্বর ১৯৮৮, ব্যবহৃত চতুর্থ স. আগস্ট ২০১২, পৃ.২৩৩

[২৮৭] শিশির কর, ঐ,পৃ.২৩৩

উনি [মুকুন্দদাস] যে সব কথা বললেন, সে যে সত্যিকার ওয়াজ নছিহত।'[২৮৮] পরাধীনতার বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এ দেশের মানুষকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে শেখান। সেদিন তার গান শুধুমাত্র ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত রাজনীতিবিদদের উৎসাহিত করেনি, উৎসাহিত করেছিল বাংলার সর্বস্তরের জনসাধারণকে। শুধু তাই নয় পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পর্বে এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে তাঁর গান এদেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করে – জাগিয়ে তোলে।

৩.২.২ কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৭৫-১৯৫০)

কুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় হাওড়া জেলার পাঁচলা বাসুদেবপুরের অধিবাসী ছিলেন।[২৮৯] তাঁর *মাতৃপূজা* পালাটি দর্শকপ্রিয়তা পায়। মার্কেণ্ডীয় পুরাণের আখ্যান অবলম্বনে লিখিত পালার ভূমিকায় পালাকার জানিয়েছেন:

> প্রকৃতির মর্যাদা অক্ষুণ্ন না থাকিলে রাজ্যের নীতিবিরোধ ও প্রজাপীড়ন হয় – ফলে প্রজাগণের মানসিক শক্তির তিরোধান ঘটে! উত্তরোত্তর নির্যাতন সহিতে সহিতে প্রজাদিগের যখন সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রান্ত হয়, তখন প্রতিকার সাধনে সমবেত চেষ্টার স্বতই উদ্রেক হয়! তজ্জন্যই রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির বিরোধ ঘটে।[২৯০]

কুঞ্জবিহারীর *মাতৃপূজায়* রচিত হয় সমকালীন ভারতভূমির কথা। দানবরাজ শুম্ভের ক্ষমতার অপব্যবহারে স্বর্গরাজ্য অধিকার, অত্যাচারে-পীড়নে জর্জরিত দেবতা-প্রজাদের সমবেত প্রয়াসে মাতৃভূমির উদ্ধরণ –– এই কাহিনির আড়ালে যেন সমকালীন স্বদেশগাঁথাই প্রচারিত হয়:

> আর আমরা পরের মাকে মা বলিয়ে ডাকবো না।
> জয় জননী জন্মভূমি, তোমার চরণ ছাড়ব না।।
> ফিরবো না আর পরের দ্বারে, ভাসব না আর নয়ন নীরে।
> কি সুধা তোর হৃদয় ক্ষীরে জীবনে মা ভুলব না।
> কি করুণা কি মহিমা, কি অতুল মধুরিমা!
> সুজলা, সুফলা শ্যামা এমন মা আর পাব না।। [২৯১]

পালায় রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির বিরোধ সহজেই নজরে পড়ে ইংরেজ সরকারের। ফলে *মাতৃপূজা* প্রকাশের জন্য লেখক কুঞ্জবিহারী, মুদ্রাকর নবীনচন্দ্র পাল এবং প্রকাশক জ্যোতিপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় দণ্ডিত হন। গোয়েন্দা রিপোর্টে প্রকাশিত:

---

[২৮৮] ইব্রাহীম খাঁ, *যাত্রাগান*, বাতায়ন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুলাই ১৯৬৭,

[২৮৯] গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৭২, পৃ.৩৭০

[২৯০] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.১৩

[২৯১] উদ্ধৃত. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৭২, পৃ.৩৭১।

A seditious play spun around the legend of the war between the Gods and the Demons. Author, printer and publisher convicted in Calcutta for performance in 1909. [২৯২]

এতদিন পর্যন্ত পুরাণ ও ধর্মের চাদরে আচ্ছাদিত যাত্রায় সরাসরি রাজদ্রোহের প্রচার ছিল না। আর তাই ১৮৭৬ এর Dramatic Performance Act- এর আওতার বাইরে ছিল যাত্রাভিনয়:

Nothing in this Act applies to any Jatras or performance of a like kind at religious festival.[293]

বঙ্গ-ভঙ্গের প্রেক্ষাপটে ধর্মের আবরণ খসে পড়ে। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (১৮৯২-১৯৬১) বিশ্লেষণে পাই:

'মাতৃপূজা' ছিল পুরাণের ছদ্মবেশে খাঁটি পোলিটিকাল নাটক, সিম্‌বলিক নাটক দ্ব্যর্থ বাহক নাটক। নাটকের প্রধান চরিত্র ছিল সুরেন্দ্র। তাঁকে সুররাজ ইন্দ্রও মনে করা চলত, আবার বঙ্গ-ভঙ্গ-বিরোধী-আন্দোলনের নায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেও কল্পনা করা যেত। নাটকের সংঘাতকে দেব-দানবের দ্বন্দ্ব বলেও গ্রহণ করা যেত, আবার দ্বিধা-বিভক্তা বঙ্গ-মাতার অখণ্ড রূপারোপের তখনকার সংগ্রামও কল্পনা করা যেত।[২৯৪]

৩.২.৩ হারাধন রায় (১২৭২-১৩২৬)

হাওড়া জেলার কল্যাণপুরের অধিবাসী হারাধন রায় হাওড়া-কুলকাশা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পৌরাণিক যাত্রা রচনাকার হিসেবে তিনি খ্যাত। তাঁর যাত্রায় সংগীত প্রাধান্য ও সংলাপ রচনায় সংস্কৃত প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৯৯ সালে গড়ে ওঠা চন্দন নগরের প্রসন্ন নিয়োগীর যাত্রাদলের সঙ্গী ছিল তাঁর ভাই শ্যাম নিয়োগী, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর রামপদ মুখোপাধ্যায়। হারাধন রায় ছিলেন এ দলের মুখ্য পালাকার। প্রসন্ন নিয়োগীর দলে হারাধনের *মহাশ্বেতা বা কাদম্বরী* (১৯০৫), *নলদময়ন্তী* (১৯০৫), *পার্থ-পরীক্ষা* (১৯০৭), *সুরথ উদ্ধার* (১৯০৭), *মীরা উদ্ধার* (১৯০৮), *যোগমায়া* (১৯১২), *রাম অবতার* (১৯১৩) পালাগুলি জনপ্রিয়তা পায়।

৩.২.৪ অহিভূষণ ভট্টাচার্য (মৃ. ১৯১০)

বর্ধমান জেলার কোক্‌সিমলা গ্রামের অধিবাসী অহিভূষণ ভট্টাচার্য (মৃ.১৯১০)। জনপ্রিয়তার কারণে ভূষণের যাত্রা-গানের স্বরলিপি প্রকাশ পেয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত *বীণাবাদিনী* পত্রিকায়। অহিভূষণ ভট্টাচার্য অন্যান্য পালাকারের রচনায় ও প্রকাশে সাহায্য করতেন। হুগলির ব্যবসায়ী মহেন্দ্র সাঁতরার দল সাঁতরা কোম্পানির তিনি প্রধান পালাকার ছিলেন। পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক পালা রচনায় তার খ্যাতি ছিলো। দীর্ঘ সংলাপের ব্যবহার ও জুড়ির গানের পরিবেশনায় গড়ে উঠতো তাঁর যাত্রাপালা। সংগীত প্রধান এসব যাত্রাপালায় ধর্মবোধ ও

---

[২৯২] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.১৩

[২৯৩] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.১৩

[২৯৪] শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, *বাঙলার নাটক ও নাট্যশালা*, পৃ.৩২

ভক্তিভাবের প্রেরণা জাগ্রত হয়। অহিভূষণের পালা কখনো অঙ্কে বিভক্ত, আবার কখনো শুধু দৃশ্যে বিভক্ত, আবার কোন কোন পালা অংক ও দৃশ্যের সমন্বয়ে গঠিত। অহিভূষণ উনিশ শতকের শেষে লেখেন গীতাভিনয় *তুলসী লীলা* (১৮৯৭)। শঙ্খচূড়ের গানে এ পালায় ত্রিপদী মিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার হয়।

যে জন না চেনে তোরে দেখাস এ দণ্ড তারে
নাহি ডরি কালদণ্ডে তোর।
ধরি ব্রজ বাম করে পরাজিনু বাসবেরে
তোর দণ্ডে কি ভয় পামর।।[২৯৫]

কথোপকথনেও প্রায় একই রকম ব্যবহার লক্ষণীয়:

যম ।। রাখ দেখি প্রাণ তব কালদণ্ডাঘাতে। (দণ্ডাঘাত)
শঙ্খচূড় ।। হের এই অবাধে ধরিনু বাম হাতে।। (নিক্ষিপ্ত দণ্ড বামহস্তে ধারণ)
অগ্নি ।। দেবরাজ, শীঘ্র বজ্র প্রহার দানবে।
শঙ্খচূড় ।। কেন ক্ষোভ থাকে সাধ পূর্ণ কর তবে।।
অগ্নি ।। এত গর্ব সাহস কতক্ষণ রবে?
শঙ্খচূড় ।। যতক্ষণ ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন দানবে।[২৯৬]

অহিভূষণের *সুরথ উদ্ধার* (১৯০১) পালাটি মার্কেণ্ডেয় পুরাণের শ্রীশ্রীচণ্ডী অবলম্বনে দেবীদুর্গার মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিত। এ পালায় গানের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ। নিম্নোক্ত কিরাতগণের গানটি লক্ষণীয় :

মোদের পরণাম লে, মোদের পরণাম লে।
কর আশিষ, শ্মশান মা দোয়া দিস,
বনকে শিকার মেলে যেন পালে পালে।।
মেলে সজারু বরা, শিয়াগোস জংলী কাড়া,
মায়ীর শ্মশান পূজায় যেন গোধা মেলে।।[২৯৭]

আবার পাগল বা ক্ষ্যাপার মত একক বিবেক চরিত্রের গানে প্রকাশ পেত ন্যায়-অন্যায়-ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গ:

আপন বুঝে চল এই বেলা

---

[২৯৫] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.১৫

[২৯৬] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২০০৮, পৃ.১৫

[২৯৭] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.১৫

ঐ বাস্তু শকুন উড়ছে মাথায় গো

বসে যুক্তি দিচ্ছেন হাড়গেলা

ঐ দেখনা ঐ একটা জনা সিংহীর মামা ভোম্বলদাসকে চিনতে জুরায়না

উনি গর্ত থেকে মারছেন উঁকি গো, বার করে লম্বা গলা।।

ঐ দেখ খ্যাঁকশেয়ালীর ছানা, ল্যাজগুটিয়ে আছেন যেন কত পোষ মানা,

সেথা পিঁজরেতে কালপেঁচা বসে দিতেছেন কত শলা।[২৯৮]

বাংলার দুর্গাপুজোতে বাঈজিনাচ পরিবেশন করাই ছিলো তখনকার মুখ্যঘটনা। *বোধনে বিসর্জন* প্রহসনে অহিভূষণ সে চিত্রই তুলে ধরেছেন। পালায় সরস্বতী ও কার্তিক দেব এই চরিত্র দুটির আড়ালে বাঙালির নব্য শিক্ষিত যুবক-যুবতীর উগ্র আধুনিকতাকে প্রকাশ করা হয়েছে। অহিভূষণ বাংলা যাত্রা পালায় প্রথম বিবেক[২৯৯] চরিত্রের প্রবর্তন করেন। *নাট্যতত্ত্বমীমাংসা* গ্রন্থে সাধনকুমার ভট্টাচার্য জানিয়েছেন : 'বিবেকই হচ্ছে বাংলা যাত্রা-নাটকের পতাকাচিহ্ন।'[৩০০] এ ব্যাপারে ব্রজেন্দ্রকুমার দের বক্তব্য :

> স্বর্গীয় অহিভূষণ ভট্টাচার্যই সর্বপ্রথম যাত্রার আসরে বিবেক নিয়ে এলেন। তাঁর এই যুগান্তকারী সৃষ্টির জন্যে তিনি যাত্রাজগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 'সুরথ উদ্ধার' পালায় অহিভূষণের দিবোদাসরূপী বিবেক ''আপন বুঝে চল এই বেলা'' এই গানে যাত্রাজগতকে যত মাতিয়াছে ততখানি মাতিয়ে তুলতে আর বুঝি কেউ পারে নি। অহিভূষণের বিবেক আজও আছে যাত্রাপালায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এ যুগে তার সাজ পালটেছে, কিন্তু কাজ পালটায় নি।[৩০১]

---

[২৯৮] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.১৬

[২৯৯]'বিবেক' নামক চরিত্র প্রধানত নৈতিক বিষয় নিয়ে গান গায়। প্রেতাত্মা, ভাগ্য, বাউল, পিতামহ, উন্মাদ – বিভিন্ন বেশে বিবেক মঞ্চে আগমন করে সংগীত পরিবেশন করে। বিবেক গানের একটি গভীর তাৎপর্য আছে। মনস্তত্ত্ব ও দর্শনবাদের চেতনায় সাজানো হয় এর পঙক্তিমালা। নানান রকম কারিগরি কলাকৌশলের সাহায্যে সিনেমা-থিয়েটারে যেমন অভিনীত চরিত্রের দ্বান্দ্বিক মুহূর্তের প্রকাশ ঘটানো হয়, যাত্রাপালায় ঠিক এ কাজটিই করে বিবেক। ঘটনার চলমানতায় ক্লাইমেক্স সৃষ্টি করে বিবেক। পালায় কোন চরিত্র যখন লোভে-মোহে-প্রলোভনে বিভ্রান্ত হয়ে ভালো-মন্দের টানাপোড়েনে পড়ে, তখনই কিংকর্তব্যবিমূঢ় এই চরিত্রকে বিবেক নির্দেশ দিয়ে যায় গানে গানে। পাশাপাশি, দর্শক-মনের প্রতিনিধিত্বও করে সে। সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের মতে,

> প্রকৃতপক্ষে যাত্রার সঙ্গে মধ্যযুগের ইংরেজী Mystery Play বাইবেলের ঘটনাবলী নিয়ে লেখা নাটকের প্রচুর সাদৃশ্য আছে। বিবেক, বলে যে চরিত্রটি যাত্রার একটি অপরিহার্য অঙ্গ, সে রকম রূপকে কেন্দ্রীয় এক বা একাধিক চরিত্র Mystery Play গুলোতে দেখা যায়।[২৯৯] (*বাংলা নাটকে দেশ বিভাগ*)

[৩০০] সাধনকুমার ভট্টাচার্য, *নাট্যতত্ত্বমীমাংসা*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্র.প্র.১৯৬৩, পৃ.৪৫৩

[৩০১] অরূপ আস (সম্পাদিত), *তাঁতঘর একুশ শতক*, ষোড়শ ও সপ্তদশ সংখ্যা/ নবপর্যায় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সংখ্যা, ১ লা মার্চ বইমেলা ২০০৮, পৃ. ১৮৬

৩.৩ ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পালা

ঐতিহাসিক কাহিনির উপর ভিত্তি করে রচিত পালাকে ঐতিহাসিক পালা হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। অতীতের কাহিনি ও সমকালীন উপাদান যা ঐতিহাসিক গুরুত্বের যোগ্য, তা ঐতিহাসিক পালার বিষয়বস্তু হতে পারে। সৈয়দ জামিল আহমেদের মতে, In which the characters and the events, drawn from history, are intermingled with those of fictional nature to project heroism, patriotism, nationalism, and communal harmony (of the Hindus and Muslims)....[302] আর সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে রচিত পালাকে রাজনৈতিক পালা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যাত্রায় এ সময় পৌরাণিক কাল পেরিয়ে ঐতিহাসিক পালার কাল আসে। গানের স্থলে সংলাপ প্রক্ষেপণও হয় উচ্চস্বরে। রাজা-বাদশার ঘোষণা ও খবরদারির ভাষা চড়াসুরেই দর্শক হৃদয়ে স্থান পায়। ঐতিহাসিক কাহিনি ক্রমেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কালীশ মুখোপাধ্যায় স্মারক পুস্তিকার একটি নিবন্ধে জানিয়েছেন, '১৯২০ থেকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যেসব যাত্রা দেখেছিলাম তার শেষের দিকে ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকই যেন বেশি দেখেছি। পৌরাণিক নাটকের সংখ্যা যেন কমে আসছিল।'[৩০৩] প্রভাতকুমার গোস্বামী জানিয়েছেন :'যাত্রায় যে উচ্চগ্রামের জমজমাট সংলাপ তা ঐতিহাসিক চরিত্রে সংযোজিত করার অনেক সুবিধা। এইসব কারণে ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে যাত্রার পালাও রচিত হইয়া থাকে।'[৩০৪] পৌরাণিক পালাকারেরা ঐতিহাসিক পালা রচনায়ও পারদর্শিতা দেখালেন। কারও কারও মাধ্যমে ঐতিহাসিক পালায়ও পরিবর্তন আসে। গবেষক প্রভাতকুমার গোস্বামী এমন কীর্তিমান কয়েকজন পালাকারের নাম উল্লেখ করেছেন:

> এই পরিবর্তন যারা আনেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ব্রজেন্দ্রকুমার দে [এঁর ঐতিহাসিক নাটক : বঙ্গবীর, রাজতিলক, রাজসন্ন্যাসী, চাঁদের মেয়ে, চাষার ছেলে, বিচারক, বাঙালী প্রভৃতি], ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ [এঁর ঐতিহাসিক নাটক : 'মদনমোহন']; কানাইলাল শীল [এঁর ঐতিহাসিক নাটক: 'দল মাদল']; সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় [এঁর ঐতিহাসিক নাটক : 'পলাশীর পরে'], নন্দগোপাল রায়চৌধুরী [তাঁর ঐতিহাসিক নাটক : 'রাণী দুর্গাবতী'], জিতেন্দ্রনাথ বসাক [এঁর ঐতিহাসিক নাটক : 'বিদ্রোহী বাঙালী', 'লাল বাঈ']। এ *ছাড়া* 'রাজা সীতারাম'-এর রচয়িতা বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়; শিবাজী , পৃথ্বীরাজ, রানী ভবানী প্রভৃতি রচয়িতা আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নামও করা যেতে পারে।[৩০৫]

---

[৩০২] Syed Jamil Ahmed, *Acinpakhi Infinity : Indigenious Theatre of Bangladesh,* University Press Limited, Bangladesh, First publised 2000, P.247

[৩০৩] রূপান্তরের শতবর্ষ, স্মারক পুস্তিকা(২২-২৮), পৃ. ২৬, উদ্ধৃত. পবিত্র সরকার, *নাটমঞ্চ নাটরূপ*, যাত্রা প্রিয় পরম্পরা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্র.প্র.২০০৮, পৃ.৩৮৯

[৩০৪] প্রভাতকুমার গোস্বামী, *দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক*, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ.২৯৪

[৩০৫] প্রভাতকুমার গোস্বামী, , *দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক*, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ.৩০৬

ব্রজেন্দ্রকুমার দে ঐতিহাসিক পালার সার্থক রূপকার ছিলেন। ১৯৪২ সালে তিনি রঞ্জন অপেরার জন্য লেখেন কাল্পনিক পালা *রাজনন্দিনী*। এই কাল্পনিক পালা থেকে ঐতিহাসিক পালার বিস্তার প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য:

> আমার বর্ণিত স্বর্ণযুগে প্রথমে যে পরিবর্তন এল, তা হল কাল্পনিক পালার প্রবর্তন। রঞ্জন অপেরায় অভিনীত *রাজনন্দিনী*তে এর যাত্রারম্ভ। এইসব পালা প্রথম-প্রথম পৌরাণিক ধাঁচে লেখা হত। যাঁরা পালা রচনা করতে গিয়ে পৌরাণিক আখ্যান খুঁজে-খুঁজে হয়রান হতেন, তাঁদের কাছে এক নতুন পথ খুলে গেল। যাত্রারসিকেরা সঙ্গে-সঙ্গে নতুন পদ্ধতিকে স্বাগত জানালেন। ক্রমে এই কাল্পনিক পালার প্রসার ঐতিহাসিক পালার রূপেও বিস্তৃত হল।[৩০৬]

ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের *সম্রাট আলমগীর*, *শাহানশাহ্ আকবর*, *বেগম আসমান তারা*, *তাজমহল*, *নাচমহল*, *বিবি আনন্দময়ী*, *দেবী সুলতানা* পালা বাংলাদেশের মঞ্চে সফলতার সাথে অভিনীত হয়। গৌড়চন্দ্র ভড়ের *কণ্ঠহার*, *জনতার আদালত*, *জলসাঘর*; নির্মল মুখোপাধ্যায়ের *কান্নার কূলে*, *রণভেরী*, *কবরের নীচে*, *বাসর হলো না*; রঞ্জন দেবনাথের *ঝড় থামলো*, *চিড়িতনের বিবি*, *দীপ নিভে যাই*, *মাটির কেল্লা*, *অভিশপ্ত সূর্যগড়*; সঞ্জীবন দাসের *আবীর ছড়ানো মুর্শিদাবাদ*; কমলেশ ব্যানার্জির *রক্তনদীর ধারা* প্রভৃতি পালা, ঐতিহাসিক বক্তব্য প্রচারে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া কানাইলাল নাথ-এর *কে ঠাকুর ডাকাত*; নুরুল ইসলামের *ফকির বিদ্রোহী মুসা শাহ*; হীরেন্দ্র কৃষ্ণ দাসের *রাজমুকুট*, *বেঈমানের চক্রান্ত* বাংলাদেশের যাত্রামঞ্চে জনপ্রিয় হয়। বিশ শতকের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক পালাকার ও তাঁদের সৃষ্টিকর্মের প্রতিনিধিত্বশীল কিছু পালা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল:

৩.৩.১ হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (১৮৭১-১৯২৬)

হাওড়া জেলার কল্যাণপুরের বাসিন্দা হরিপদ চট্টোপাধ্যায় হুগলি নর্মাল স্কুলের শিক্ষা শেষে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে কিছুকাল পড়াশোনা করেন। তাঁর দীর্ঘ যাত্রাপালায় তিনি গদ্য ও পদ্য উভয় ধরণের সংলাপই ব্যবহার করতেন। দীর্ঘ সংলাপের পাশাপাশি আদিরসাত্মক 'দ্বৈত গান', 'গণের গান', 'একানে বালকের গান' ঠাঁই পেয়েছে তাঁর নানান পালায়। তিনি বাল্মীকির রামায়ণের কাহিনি ঘিরে প্রথম পালা *লবণ-সংহার* (প্র.১৮৮৫) রচনা করেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড ঘিরে তিনি রচনা করেন *মহীরাবণ* (প্র.১৯০১) পালা। 'পল্লী-রমণীদের গণের গান' এই পালার অন্যতম আকর্ষণ ছিল। শ্রীমদভাগ্বত অনুসরণে *প্রহ্লাদ চরিত্র* (প্র.১৯০৪) পালা মথুরানাথ সাহার দলে অভিনীত হয়। এ পালায় হিরণ্যাক্ষ-পত্রী উপদানবী, নারদ, হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী কয়াধু ও পুত্র প্রহ্লাদ সকলের মুখেই ধ্বনিত হয়েছে সংগীতময় সংলাপ। নরসিংহ-মূর্তিধারী বিষ্ণুর হাতে হরবিদ্বেষী হিরণ্যক শিপুর হত্যা এবং পুত্র প্রহ্লাদের হরিভক্তি নিয়েই এ পালা লিখিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ:

> প্রহ্লাদ ।। (সুরে) ব্যথা, তোর আর রবে নামা, ছেলের কথা শোন মা কানে,
> ব্যথাহারী হরি যে মা, ভবের ব্যথা যায় মা নামে।

[৩০৬] ব্রজেন্দ্রকুমার দে, *যাত্রার সেকাল ও একাল*, ইস্প্রেশন সিন্ডিকেট, কলকাতা, ১৯৮৪

কয়াধু।। এ কি হল প্রহ্লাদ রে! কাঁদাইলি মোরে
আসিয়াছে পিতা তোর যুদ্ধ হতে ফিরি,
কহিয়াছে চণ্ডালিনী বড় রানি কৃষ্ণমূর্তি তোর হাতে,
সেই হতে রাজা জ্বলন্ত-আগুন সম
তোরে অন্বেষিছে প্রতি দ্বারে দ্বারে।
জাদুরে আমার! ত্যজ ছেলেখেলা
অন্য অন্য শিশু সম যাও পাঠশালে,
মন দিয়া তথা গিয়া কর অধ্যয়ন
পিতা তোর করিবে যতন
ভাল বেশে করিবেরে কোলে।

প্রহ্লাদ (সুরে)।। পিতার কোলে আর যাব না, জগৎ
পিতার কোল পেয়েছি, গুরুর গৃহে আর
যাব না, হরি জগৎগুরু তা জেনেছি।[৩০৭]

এখানে গানের কথকতা-ধর্মী সুর-সংলাপ। মতিলাল রায়ের অনুসরণে পৌরাণিক যাত্রাপালার বিবর্তন শুরু হয়। পরবর্তীকালে হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ে এসে তা ইতিহাসাশ্রিত পালা রচনার ধারায় মোড় নেয়। মথুরসা'র দলের মাধ্যমে পাঞ্জাব *কেশরী রণজিৎ সিং* ও *পদ্মিনী* পরিবেশন করে তিনি নতুনভাবে গ্রহণযোগ্যতার পরিচয় দেন। হরিপদ চট্টোপাধ্যায় এর *পদ্মিনী* (প্র.১৯১০) পালা ঐতিহাসিক কাহিনি ঘিরে রচিত। চিতোরের ভানুসিংহের (রত্নসিংহ) স্ত্রী পদ্মিনীর সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে তাকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় দিল্লির বাদশাহ্ আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেন। রাজপুত্র রানা যুদ্ধে হেরে গেলে পদ্মিনী জহরপানে নারীত্বের মর্যাদা রক্ষা করে। সমকালীন যাত্রারীতির একই আদর্শ বজায় রাখতে পালাশেষে বৈকুণ্ঠের বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পাদমূলে ভীমসিংহ, পদ্মিনী, লক্ষ্মণসিংহ, উমা বাইদের মিলনাত্মক পরিণতি। হরিপদ এর ভূমিকা:

> যাত্রার ঐতিহাসিক নাটক প্রণয়নে আমার এই প্রথম উদ্যম এবং যাত্রাতেও ইহা প্রথম অভিনয় বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। দেবদেবী প্রাণময় হিন্দুসমাজ পৌরাণিক কথা শুনিতে এবং দেবদেবীর চিত্র দেখিতে অতি ভালবাসেন, কিন্তু কালভেদে ও রুচিভেদে বর্তমান কালে নানা বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়। নাটক প্রণয়নের ও অভিনয়ের যাহা উদ্দেশ্য, তাহা রক্ষা করিতে হইলে নাট্যকারকে সময় অবস্থা দেখিয়া লইয়া তাহারই মুখাপেক্ষী হইতে হয়। উপস্থিত মুহূর্তে গ্রন্থকার তাহারই অধীন।[৩০৮]

---

[৩০৭] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.১৩

[৩০৮] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-

কর্নেল দ্বিতীয় জেমস টডের (১৭৮২-১৮৩৯) ইতিহাস গ্রন্থ *Annals and Antiquities of Rajasthan* (প্র.১৮২৯) ছিল এই যাত্রাপালার প্রধান অবলম্বন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের *সরোজিনী* বা *চিতোর আক্রমণ* (প্র.১৮৭৫) মঞ্চনাটকের সঙ্গে এর নাট্যগঠনে মিল পাওয়া যায়। *পদ্মিনী* যাত্রাপালায় থিয়েটারি সুরেরও প্রচলন করেন হরিপদ। রঙ্গালয়ের সুরকর্তা ভূতনাথ দাসকে যাত্রাজগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন তিনি। পরবর্তীকালে তাঁর সূত্রেই নবদ্বীপের দেবকণ্ঠ বাগচীও যাত্রার সঙ্গে যুক্ত হন। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের দলেই ভৃগু-চরিত পালা অভিনয়ের সূত্রে যাত্রায় ক্লারিনেট বাদন স্থায়ীভাবে চালু করেন ক্ল্যারিনেট-বাদক নারায়ণচন্দ্র দত্ত (১৮৮৩-১৯৬৭)। হরিপদ-এর যাত্রাপালায় প্রতি অংকের শেষে ঐকতান বাদনের নির্দেশ মেলে।

পদ্মিনী পালা থেকেই জুড়ি আর বালকগণের গান উঠে যায়। সেখানে স্থান পায় যাত্রা-ব্যালে[৩০৯]। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় যাত্রায় কিছু পরিবর্তন হয়। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনায় সেই পরিবর্তনের চিত্র লক্ষণীয়:

> অল্প বয়সে ছেলেরা মেয়ে সেজে আসরে জড় হয়ে নেচে নেচে গান করতো। সেকালে এই নাচগানকে বলা হতো 'আখড়াই বন্দী'। এই নৃত্য বর্জিত হলো। তা'ছাড়া সেকালে পাগড়ি চোগা-চপকান, পাজামা পরা উকিল বেশধারী বুড়ি' নামক একদল গায়ক অভিনেতা যাত্রাভিনয়কালে বারে বারে আবির্ভূত হয়ে 'উক্তিগীত' গেয়ে যেত। এদের সংখ্যা ৪ থেকে ১০ পর্যন্ত হতো। জুড়ির মতো উকিলের সাজ-পোষাকে একদল বালক গায়ক সংখ্যায় ৪ থেকে ১৬ জন এবং তাদের সঙ্গে থাকতো একটি সর্দার। তারাও অভিনয়কালে বারে বারে দল বেঁধে গান করে যেত। এদের বলা হতো 'হাফ-জুড়ি'। এও বর্জিত হলো।[৩১০]

উনিশ শতকের শেষে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের মঞ্চনাটক *আলিবাবা* নাচে-গানে দর্শকদের মধ্যে আলোড়ন তোলে। নৃত্য-নির্দেশক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসুর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। হরিপদ তাঁকে যাত্রায় এনে 'ব্যালে'র নৃত্য-রীতি চালু করেন। উনিশ শতক থেকে যাত্রায় আদি-রসাত্মক গানের যে চলন ছিল হরিপদর রচনায় তার স্বরূপ মেলে খাতিম-বাঁদির যুগল নাচ-গানে:

> খাতিম।। তুতা বাঁদিরে তু মোর জানের জান লক্কা পিয়ারা।
>
> বাঁদি।। খসম রে খসম, মুই মোরগিয়া, মোরগিয়া আর দিসনেজ্ঞ আশকার।।
>
> খাতিম।। তুতা বাঁদিরে তু মোর আসমানের পরী।
>
> বাঁদি।। মাইরি মাইরি মাইরি – আয় তোরে কলজেয় ধরি।।[৩১১]

২০০৮, পৃ.১৮

[৩০৯] যাত্রা-ব্যালের প্রধান উদ্দেশ্য হলো গান ও নাচের মাধ্যমে দর্শকদের মনোরঞ্জন করা।

[৩১০] *যাত্রাগানের ইতিবৃত্ত*, আশা প্রকাশনী, কলকাতা, ঐ, পৃ.৭

[৩১১] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-

অলর্ক (প্র.১৯১২), *বিধুর* (প্র.১৯১৪), *রাম-নির্বাসন* (প্র.১৯১৬) –– এই ত্রয়ী পুরাণনির্ভর পালার পাশাপাশি হরিপদ ভারতের ইতিহাসকে ঘিরে রচনা করলেন *ক্ষণাদেবী* (১৯২০)। গ্রন্থকার ভূমিকায় জানিয়েছেন:

> মহারাজ বিক্রমাদিত্য এবং তাঁহার নবরত্ননামক পণ্ডিত সভা পৃথিবীতে সর্ব্বজনবিদিত। নবরত্নের পণ্ডিতগণ প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন।... কিম্বদন্তীর আরও প্রবাদ এই যে, বিক্রমাদিত্য ক্ষণাদেবীর অতুল রূপ সৌন্দর্য্য আর অনুপম গুণরাশি দেখিয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। আমরা ক্ষণাদেবী নাটকে বিক্রমাদিত্যের শেষোক্ত দোষটি বর্ণনা করিয়াছি। সেইজন্য অভিনয়কালে কোন কোন দর্শক বিক্রমাদিত্য-চরিত্রের পতন দেখিয়া দুঃখিত হইতেন এবং আমাদিগকে অনুযোগ করিতেন। এই অমূলক অনুযোগ অন্যায় বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে বিক্রমাদিত্য চরিত্রের কতকগুলি দোষ দেখাইলাম। সত্যিই বিক্রমাদিত্য দোষস্পর্শহীন আদর্শ চরিত্র ছিলেন না।[৩১২]

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় এভাবেই ইতিহাসের নতুন ব্যাখ্যা দিলেন। তাঁর ইতিহাসনির্ভর পালা *রণজিতের জীবন যজ্ঞ* প্রকাশের তিন বছর পরে ব্রিটিশরাজ বাজেয়াপ্ত করে এবং পালাকার হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে। বীরযোদ্ধা রণজিত সিংহের সংলাপে প্রতিভাত হয় স্বাধীনতার সংলাপ:

> আমি আজ হতে জননী জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষারূপ মহাব্রত গ্রহণ করলাম, মাতৃসেবা মহাব্রত গ্রহণ করলাম। এ ব্রত আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত। এ ব্রত উদ্‌যাপন আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত। এই মহাকার্য্যের একটি সরল সহজ নাম 'রনজিৎ রাজার জীবন যজ্ঞ'।[৩১৩]

এ পালায় সংগীতের মাধ্যমে ধ্বনিত হয় ভারতমাতার বিলাপ:

> কি ছিলাম কি হয়েছি আরও কি আছে কপালে।
> শত শত কোটী সন্তান, জননী একা কেন ভাসে নয়নের জলে।।
> পেটে অন্ন নাই, নাই পরনে বসন, পর অত্যাচারে ক্ষিন্ন মন।
> মা হয়ে কেমনে, দেখি রে নয়নে, ভাসে দুনয়নে পেটের ছেলে।।[৩১৪]

*পদ্মিনী*র সঙ্গে বাজেয়াপ্ত হয় ভিন্ন পালা *দুর্গাসুর*। হরিপদর পরবর্তী পালা *জয়দেব* যেমন যাত্রার আসরে, তেমনি মঞ্চনাটকের ধারায় জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

২০০৮, পৃ.১৯

[৩১২] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.২০

[৩১৩] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.২০

[৩১৪] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.২০

৩.৩.২ অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল (মৃ.১৯০৯)

রয়াল বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৯৩ সালে অন্নদাপ্রসাদ ঘোষালের *নাগযজ্ঞ* মঞ্চস্থ হয়। এরপর মঞ্চ ছেড়ে যাত্রায় চলে আসেন অন্নদাপ্রসাদ। ভাগবত আর মহাভারতের বিষয়বস্তু তাঁর পালায় উঠে এসেছে। *অজামিলের বৈকুণ্ঠ লাভ* (প্র.১৯০২) *ভাগবতের* অধ্যায় ঘিরে রচিত। অজামিলের বাবা-মার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিষ্ণুভক্তি নাটকের মূল অবলম্বন। মহাভারতের আখ্যানে জমদগ্নি হত্যায় ক্ষুব্ধ পরশুরামের আর সন্তপ্ত কার্তবীর্য মহিষীর প্রতিহিংসা ও যুদ্ধ-কাহিনির বিস্তারে লেখেন *কার্তবীর্য সংহার* (প্র. ১৯০২)। কাশীরাম দাসের মহাভারতের বিভিন্ন পর্ব অবলম্বনে রচনা করেন *অর্জুন পরাভব* এবং *জয়দ্রথ বধ*। ভক্তি, বীর ও করুণ রসের প্রাধান্য লক্ষ করা যায় অন্নদাপ্রসাদের যাত্রাপালায়।

৩.৩.৩ অঘোরনাথ কাব্যতীর্থ (১৮৭২-১৯৪৩)

অঘোরনাথ কাব্যতীর্থের জন্ম ১৮৭২ সালে নড়াইল জেলার মল্লিকপুর গ্রামে। কাব্যতীর্থ তাঁর অর্জিত উপাধি হলেও কৌলিক পদবি ছিল ভট্টাচার্য। কেউ কেউ তাঁর নাম 'অঘোরচন্দ্র' বলে উল্লেখ করেছেন। কলকাতার 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি' স্কুলে তিনি হেড পণ্ডিত ছিলেন। সংগীত মুখ্য অঘোরচন্দ্রের যাত্রাপালাসমূহে গণের গান, একানে বালকের গান, আদি-রসগান, যাত্রাব্যালের পাশাপাশি দীর্ঘ নাট্যসংলাপের ব্যবহার ছিল। প্রথম পালা *কল্কি অবতার* (প্র ১৯০২) বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়। *কল্কি-পুরাণ* আশ্রিত এই গীতাভিনয় বৌ-কুণ্ডুর দলে ১৮৯৮ সালে অভিনীত হয়। পৌরাণিক পালার পাশাপাশি তিনি ভক্তিবাদী ও ঐতিহাসিক পালাতেও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এরপর তিনি *মগধবিজয় (১৯০৩), দাতাকর্ণ (১৯০৪), সমুদ্রমন্থন (১৯০৪), হরিশচন্দ্র (১৯১৪)* ইত্যাদি পালা রচনা করেন। তাঁর পরবর্তী পালা *অনন্ত-মাহাত্ম্য (১৯১৬)* ও *কুরু-পরিণাম (১৯২১)* শশিভূষণ অধিকারীর দলে অভিনয় হয়। সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে নাটকের প্রস্তাবনায় তিনি ব্যবহার করেছেন কুশীলবদের নাচ-গান। *কুরু-পরিণামের* সূচনায় তাই দেখা যায়:

> নট।। কিবা শোভা মনোলোভা দেখলো সই চাঁদবদনী।
>
> নটী।। তোমার তরে থরে থরে (দেখ) ফুটেছে ফুল গুণমণি।।
>
> নট।। কুহু কুহু তানে কোকিল ঝঙ্কারে।
>
> নটী ।। গুণ গুণ রবে অলি মধুর গুঞ্জরে।
>
> নট।। ধীরে নীল নীরে নাচিছে নবনলিনী।।[৩১৫]

মনসা-মঙ্গল এর কাহিনি অবলম্বনে অঘোরচন্দ্র রচনা করেন *বেহুলা-লখিন্দর* (প্র.১৯২৩)। অঘোরচন্দ্র কখনও গদ্য, কখনো বা পদ্য সংলাপের পাশাপাশি সরাসরি ব্যবহার করেছেন গান। এছাড়াও তিনি *বিজয় বসন্ত* বা *সৎমা*

---

[৩১৫] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.১৩

(১৯২১), *অদৃষ্ট* (১৯২১), *চন্দ্রকেতু* (১৯২২), *মেবার কুমারী* (১৯২৩), *চিত্রাঙ্গদা* (১৯২৩), *তরণীর যুদ্ধ* (১৯২৪), *নহুষ উদ্ধার* (১৯২৫), *প্রতিজ্ঞা পালন* (১৯২৫), *রাধাসতী* (১৯২৫), *তারাকাসুর বধ* (১৯২৬), *নলদময়ন্তী* (১৯২৭), *শতাশ্বমেধ* (১৯২৯), *নদের নিমাই* (১৯৩৫), *প্রহ্লাদ* (১৯৩৫), *অনুধ্বজের হরিসাধনা* (১৯৩৬), *জয়দেব* (১৯৩৭), *যাজ্ঞসেনী* (১৯৩৮) প্রভৃতি পালা রচনা করেন। তাঁর রচিত যাত্রাপালায় তিনি মূল কাহিনির বাইরে দু-একটি চরিত্র সৃষ্টি করে তাদের মুখে হাস্যরসাত্মক সংলাপ জুড়ে দিতেন। অঘোরনাথ এর যাত্রার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ জানিয়েছেন :

> তিনি তাঁর পালায় গণের গান, একানে বালকের গান, যাত্রা ব্যালে, আদিরসাত্মক দ্বৈতসংগীত, হাস্যরস সৃষ্টির জন্য বিষয়ের যোগ নেই এমন চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। দীর্ঘ সংলাপ ছিল অঘোরনাথের পালায়। পালায় কীর্তনাঙ্গের গানও প্রয়োগ করেছেন। দ্বৈতসংগীত গাইবার জন্য ঝাড়ুদার-ঝাড়ুদারনি, ঘেসেড়া-ঘেসেড়ানি এনে দর্শক মন মাতিয়েছেন অঘোরনাথ।[৩১৬]

৩.৩.৪ ভোলানাথ রায় [কাব্যশাস্ত্রী] (১৮৯১-১৯৩৩)

বর্ধমান জেলার রায়ান গ্রামের ভোলানাথ রায় কাব্যশাস্ত্রী পৌরাণিক ও ইতিহাসাশ্রিত কাহিনিকে সমগুরুত্বে তাঁর পালায় স্থান দেন। প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি দর্শকচিত্ত অনায়াসেই দখল করে নেন। দু-খানি পৌরাণিক পালার পর একটি করে ঐতিহাসিক পালা রচনা তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল।[৩১৭] শুধু তাই নয়, চরিত্র সৃষ্টির দিকে ভোলানাথ প্রথম যত্নবান হলেন। যা পরবর্তীকালে ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র পরিচর্যায় অসামান্যতা অর্জন করে। ভোলানাথ মাত্র সতেরোখানা পালা লিখে যাত্রায় পরিবর্তন নিয়ে আসেন। এ যাত্রাগুলোর একটি বাদে সবগুলোই গণেশ অপেরা পার্টিতে অভিনীত হয়। দলগত অভিনয়ের আদর্শ মাথায় রেখেই তিনি শুধু একটি দলের প্রতি মনোযোগী ছিলেন। পালা সম্পর্কে তাঁর যাবতীয় চিন্তাকে সুশৃঙ্খলভাবে একটি কেন্দ্রে স্থায়ী করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি এতটা সাফল্য অর্জন করেন। ভোলানাথের প্রথম যাত্রা *কুবলাশ্ব* (প্র.১৯১৬)। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের আখ্যান অবলম্বনে লিখিত এ পালার শুরুতে আছে দেববালাগণের সরস্বতী বন্দনা:

> সমল মানসে বিমল আলো, দেওমা নিখিল-বন্দিনী।
> শীতল করিতে ভূতলে এস না, শ্বেতশতদল বাসিনী।।[৩১৮]

পাশাপাশি পদ্য সংলাপেও মিত্রাক্ষর পয়ার দৃশ্যমান:

> নারায়ণ।। কে তব সম্মুখে দেখ, ভক্ত প্রাণধন,
> দাঁড়ায়ে মোহন রূপে ভুবন-মোহন।

---

[৩১৬] গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ, *৩০০ বছরের যাত্রাশিল্পের ইতিহাস*, পুষ্প প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৬,পৃ.

[৩১৭] প্রভাত কুমার দাস, *যাত্রার সঙ্গে বেড়ে ওঠা*, কারিগর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানু-২০১৪,পৃ.২০

[৩১৮] গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৭২, পৃ.৩৯৩

কুবলাশ্ব।। কে তুমি মধুর ভাষী অসিতবরণ?
হৃদে যেবা করে খেলা, তুমি কি সে ধন?
নারায়ণ।। হের হের ভক্তবর, মেলিয়া নয়ন
আমি সেই ভয়হারী হরিনারায়ণ।
কুবলাশ্ব।। মুখে হরি হৃদে হরি, সম্মুখেতে হরি,
কত ছলা জান কালা বিনোদ-বিহারী।[৩১৯]

যাত্রার সংগীত আধিক্যকে প্রথম পালা থেকেই আশ্রয় দেন ভোলানাথ। পালাকারের বক্তব্য:

> বঙ্গের খ্যাতনামা সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞ, বেহুলাবাদ্য-নিপুণ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ অধিকারী মহাশয় স্বীয় সঙ্গীত সম্প্রদায়ে অতীব দক্ষতার সহিত ইহার অভিনয় করেন।[৩২০]

শশিভূষণ অধিকারী বর্ধমান জেলার কালনার বাসিন্দা বেহালা বাদক। তাঁর খ্যাতি ছিল সর্বস্বীকৃত। গ্র্যান্ড অপেরা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা শশিভূষণ যাত্রাদলে অভিনয়ের সঙ্গে আনুষঙ্গিক সংগীত পরিবেশনের বিশেষ প্রচলন করেন। তিনি বড়িশা নিবাসী সূর্যকুমার কাহারের (সূর্য ওস্তাদ) প্রধান বেহালা শিষ্য ছিলেন।

ভোলানাথ তাঁর যাত্রায় দীর্ঘ সংলাপের স্থলে ছোট ছোট সংলাপ ব্যবহার করেন, সংগীতে আনেন নতুনরীতি। পালারচনায় তিনি ক্ষেত্রবিশেষে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) রচনাধারাকে অনুসরণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৯) প্রভাবে সর্বত্র জরুরি অবস্থায় পালা রচনায় সাময়িক সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়। সেই সময় গণেশ অপেরা পার্টির নিবেদনে ভোলানাথের *পৃথিবী* পালার মঞ্চায়ন প্রসঙ্গ স্থান পায় পত্রিকার পাতায়:

> Last Tuesday [16 October 1917] at 5 p.m. the Ganesh Opera party held a performance of the grand mythological five-act drama by Babu Bholanath Roy called the Prithivi on the stage of Manomohan Theatre, which was filled up with the highest number of enthusiastic audience.[৩২১]

১৯২১ সালে গণেশ অপেরা পার্টির পরিবেশনায় মঞ্চস্থ হয় তাঁর *আদিশূর* যাত্রাপালা। কনৌজরাজ সিংহ আর বাংলার রাজা আদিশূরের যুদ্ধ ও রাজনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ তক্ষশীলের কর্মকাণ্ড নিয়ে এ যাত্রাপালা রচিত। ভোলানাথ ভূমিকায় জানিয়েছেন:

---

[৩১৯] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.২৩

[৩২০] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, পৃ.২৩

[321] *Amrita Bazar Patrika,* 18 october 1917. উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, পৃ.২৪

> অধঃপতিত বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছৃঙ্খল বন্যায় ভারতবর্ষে যখন বৈদিক ধর্ম্ম বিলুপ্ত প্রায়; তখন বাঙ্গলায় আদিশূর রাজা। তাঁহার প্রকৃত নাম শূরসেন, তাঁহার রাজধানী কর্ণসূবর্ণ – বর্ত্তমান ঢাকা। তিনি বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে রাজসূয়-যজ্ঞে ব্রতী হন এবং বাহু যুদ্ধবিগ্রহ, রক্তপাত ও অগ্নিকাণ্ডের পর তাঁহাদিগকে ছাপ্পান্নখানি গ্রাম ও বিপুল অর্থাদি দান করিয়া নিজ রাজ্য স্থাপনা করেন; বর্ত্তমান ২৮ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সন্তানগণ সকলেই সেই আদিশূরের আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের বংশজ। তাঁহাকে এই পরিবর্ত্তন সাধনে অনেক সৎ-অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইয়াছিল। নাটকীয় হিসাবে সমালোচনায় তাঁহার চরিত্র দূষণীয় হইলেও উদ্দেশ্য হিসাবে বিচার করিলে তিনি মহান, তিনি বাঙ্গলার গৌরব, তিনি প্রত্যেক বঙ্গবাসীর পুণ্য-স্মৃতি। কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কৌশল অবলম্বন করিতে হয় না কাহাকে? চন্দনের অনুসন্ধানে পথরোধক কণ্টকগুল্মে অগ্নিসংযোগে কুণ্ঠিত কে? ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও একদিন না করিতে হইয়াছে কি? ধ্বংস যে স্থাপনারই একটা নীতি।[৩২২]

তবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) ব্যাখ্যা হল আদিশূর পুত্রেষ্টিযাগার্থ ৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, শ্রীহর্ষ ও ছান্দড় নামে 'পঞ্চ ব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ হইতে আনয়ন করেন।'[৩২৩] ভোলানাথের পালায় পরিবেশিত হয়েছে একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেম। *আদিশূর* পালার সংগীতে প্রকাশ পায় সেই চিত্র:

> আমার সোনার বাঙ্গলা দেশ।
> সোনায় গড়া সযতনে নখ হতে এর মাথার কেশ
> সোনার রবি সকাল বেলায় ঢলে পড়ে সোনার গায়,
> সোনার পাখা প্রজাপতি সমীকরণে নাচে ধায়;
> সোনা ছড়ায় মেঘের জলে সবুজ ক্ষেতে সোনা ফলে,
> সবটুকু এর সোনা মাখা, এ সোনার কথার নাইকো শেষ।[৩২৪]

জনপ্রিয়তার জন্য এ গান খানি জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষের কণ্ঠে [H.M.V. Record No. P8853] গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণ করা হয়। পরবর্তীকালে তাঁর *জরাসন্ধ* পালায় সংগীতের পাশাপাশি সংলাপেও স্বদেশিয়ানা প্রকাশ পেয়েছে। ব্রিটিশ সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করে। *বামনাবতার, ধর্মদ্বন্দ্ব, জাহ্নবী* ও *বৃত্রসংহার* প্রভৃতি ভোলানাথের উল্লেখযোগ্য পালা।

---

[৩২২] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.২৪-২৫

[৩২৩] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার, বিবিধ প্রবন্ধ, *বঙ্কিম রচনাবলী (২)*, পৃ. ৩২৩-৩২৫

[৩২৪] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.২৫

৩.৩.৫ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৫১)

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবনের একটা বড় সময় ধরে যাত্রাপালা রচনা ও নির্দেশনা দেবার কাজে যুক্ত ছিলেন। প্রথাগত যাত্রা পালার পরিবেশনার অর্থে না হলেও যাত্রা পালা রচনা ও অভিনয় করার ক্ষেত্রে তিনি নিরীক্ষা চালান। সে সময়ে অবস্থাপন্ন বাড়িতে আমন্ত্রিত যাত্রা গানের যে অভিনয় হত তার তুলনায় স্বতন্ত্র ছিল এই উদ্যোগ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ছিল তার কাজের ক্ষেত্র; সেখানে অভিনয়ের জন্য যাত্রা লিখেছেন তিনি, যা প্রধানত তাঁর নিজস্ব শৈলীরই প্রকাশ। ছবি আঁকা, ছবি লেখা শেষ করে পালা রচনায় মনোনিবেশ করেন। তার নিজের কথায়:

> দশ এগারো বছর ছবি আঁকি নি।...কী জানি, কেন মন বসতো না ছবি আঁকতে। নতুন নতুন যাত্রার পালা লিখতুম ছেলেদের নিয়ে যাত্রা করতুম, তাদের সাজাতুম, নিজে অধিকারী সাজতুম, ফুটো ঢোল বাজাতুম, স্টেজ সাজাতুম। বেশ দিন যায়। (জোড়াসাঁকোর ধারে)

প্রকৃত অর্থে জোড়াসাকোর পরিবেশেই যাত্রা চর্চার প্রচলন ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাত্রা করবার শখ পোষণ করেন। সেখানে অধিকারী, জুড়ির দল আনিয়ে যাত্রা করা হয়। তার সঙ্গে অবনীন্দ্রের লোকশিল্পের প্রতি আগ্রহও যুক্ত হয়। যাত্রার মাধ্যমটি তাঁর *ক্ষীরের পুতুল*, *কুটুম কাটাম* এর খেয়ালি কল্পনার জগতের থেকে বেশি দূরে নয়। যদিও তাঁর দীর্ঘ যাত্রাচর্চা পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে আসেনি; এমনকি সেগুলো পরিবেশনার সময়ে প্রকাশিত হয়নি। ১৯৩৩ সাল থেকে একধারে দশ বছর যাত্রা চর্চা করেছেন অবনীন্দ্রনাথ। সেসবের অনেক পাণ্ডুলিপি হারিয়েও গেছে। ছোটোদের জন্য রামায়ণ মহাভারতের কাহিনি নিয়ে তিনি পালা রচনা করেছেন। যেগুলো পড়ে রবীন্দ্রনাথ 'বিশুদ্ধ পাগলামির কারুশিল্প' বলে মন্তব্য করেছেন। এসব রচনা আয়তনের বেলায় বড় ছোট হয়েছে। তাঁর রচনাবলীর ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে এই যাত্রাপালা গুলো সংকলিত করেছে। এর সংখ্যা পঁচিশেরও বেশি। *খুদ্দুর যাত্রা*, *পুতুলখেলুড়ির কথা*, *যাত্রাগানে রামায়ণ*, *লম্বকর্ণ পালা*, *সিন্ধবাদ বিবরণ পদ্য*, *ভূতপতরীর যাত্রা*, *ফসকান পালা*, *বৃক ও মেঘ পালা*, *পুতলীর পালা*, *কথামালা যাত্রার সং*, *এসপার ওসপার* ও *কুঞ্জুষের পালা* প্রভৃতি তাঁর রচিত পালা।

এসব পালা নিছক শিশুদের অনাবিল আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করার জন্যই লেখা হয়। তাতে কাহিনির ক্ষেত্রে প্লটের নিটোলতা রাখা হয়নি। দৃশ্য বা অঙ্ক বিন্যাস ছাড়াই দ্রুত লয়ে যাত্রা এগিয়ে যায়। সরস আবহ সংগীত ও বহু রকমের গানের প্যারডি এসব যাত্রাপালার মূল আকর্ষণ ছিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তিনি বাল্মীকি, কৃত্তিবাস বা মূল কাহিনির সঙ্গে নিজের কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। যাকে বলা যায়,

> উপস্থাপন মুন্সিয়ানায় অবনীন্দ্রনাথের প্রতিটি যাত্রা পালাই উপভোগ্য। হাস্যরসে ভরপুর। গল্পের টানে নয়, সরসতার আকর্ষণেই অবনীন্দ্রনাথের যাত্রা আমাদের বিশেষত ছোটোদের আকৃষ্ট করে। এই উপভোগ্যতা মঞ্চায়নে যতখানি স্পষ্ট, পড়ার সময় ততখানি নয়। আসলে মঞ্চোপযোগী, সেভাবে পাঠোপযোগী নয়। [৩২৫]

প্রকৃতই উদ্ভট রসের কাহিনির সঙ্গে নাচগানতালকে পরিবেশন করে তিনি যাত্রাপালার আকারের ক্ষেত্রে নিরীক্ষা করেন। অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাচর্চা সৃজনশীল সাহিত্যিকের বিশেষ নিরীক্ষার নিদর্শন। এ সূত্রে তাঁর যাত্রাভাবনা পরবর্তী প্রজন্মর নিকট পথের দিশারী হতে পারে:

> খাঁটি যাত্রা দৃশ্যপটের ধার দিয়েও যেত না জানি, তবে যাত্রাটা অবাধে চলত কেমন করে একটা জানার বিষয়।...নজর করে দেখি যে, জুড়ি দোহার এই কজই ছিল যাত্রাওয়ালাদের সিন কনসার্ট এবং নানা তোড়-জোড় দেবার সহায়। ধর, কালিদাসের শকুন্তলা আরম্ভ হল –... যাত্রাওয়ালা এখানে নির্ভয় – সে গানের পর জুড়ির গান বর্ণনা জুড়ে দর্শকের মনোরথ তেজে নিয়ে ফেলে আশ্রমের কাছ... – সচল মনোরথ (স্বচ্ছন্দ গতি পেলে সুর ও ছন্দের সাহায্যে) – এই ছিল যাত্রার বিশেষত্ব। থিয়েটারে যেটা ঘটানো অসম্ভব, সেটা সুসম্ভব হ'ল যাত্রার অধিকারীর কাছে। ...
>
> যাত্রার অর্থই হচ্ছে চলাচল। পুরো পালাটা শেষ হওয়া পর্যন্ত মূহূর্তের বিশ্রাম দিলে সেখানে কাজ চলে না। পুরো যাত্রা বা পালা-গান তিন চার ভাগে তিন চার দিন ধরে চলার নিয়ম ছিল, কাজেই প্রত্যেক ভাগ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা পুরো জিনিস করে খাড়া করা হত। থিয়েটারের বই এভাবে ভাগ করা মুশকিল।[৩২৬]

ছেলেবেলায় শোনা কৃষ্ণযাত্রা, দাশুরায়ের পাঁচালি, ফরাসি-বয়েত, নিধুবাবুর টপ্পা, গোপাল উড়ের গান, উর্দু গজল সব একত্রে মিলিয়ে নতুন ধরনের বিনোদন পরিবেশনের কথা ভাবেন। দর্শক এবং অভিনেতাদের মধ্যে দূরত্ব কমানোও এই পালাভিনয়ের উদ্দেশ্য। তাই ঠাকুরবাড়িতে *এসপার ওসপার* অভিনয়ের সময় এক দরজা থেকে আর এক দরজা পর্যন্ত দড়ি টেনে দর্শকদের জায়গা আর অভিনেতাদের এলাকা আলাদা করে দেওয়া হলে অবনীন্দ্রনাথ আপত্তি করেছিলেন। তিনি মনে করেন : 'যারা দেখতে আসবে তাদেরও দলে টেনে নে, তবেতো জমবে যাত্রা।' তাই হয়েছিল। আত্মবিস্মৃত দর্শকরাও অসতর্কে অভিনয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সবার সঙ্গে বসে পা গুটিয়ে দেখলেন যাত্রা, যাবার সময় প্রচুর হেসে বলে গেলেন, 'এ জিনিস অবন ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না।'[৩২৭]

---

[৩২৫] প্রভাতকুমার দাস (সম্পাদিত), *যাত্রা আকাদেমি পত্রিকা*, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ : যাত্রার আসরে নি:সঙ্গ পথিক, ৫ম সংখ্যা, ১৪১৭, পৃ. ৯

[৩২৬] প্রভাতকুমার দাস (সম্পাদিত), *যাত্রা আকাদেমি পত্রিকা*, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যাত্রা ও থিয়েটার, ৫ম সংখ্যা, ১৪১৭, পৃ. ১-২

[৩২৭] প্রভাত কুমার দাস, যাত্রার সঙ্গে বেড়ে ওঠা, *কারিগর*, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানু ২০১৪, পৃ.২০

৩.৩.৬ ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায় [বিদ্যাবিনোদ] (১৮৯৩-১৯৬৮)

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে আধুনিক বাংলা যাত্রার অগ্রগতিতে যেসব ব্যক্তির ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে, ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের (বঙ্গাব্দ ১৩০১) ২ ডিসেম্বর 'বড় ফণী'র জন্ম হুগলি জেলার চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত গরলগাছা গ্রামের মাতুলালয়ে। তাঁর পৈত্রিক নিবাস বর্ধমান জেলার কালনা মহুকুমার বাখনাপাড়া। পেশাদার যাত্রার সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় সংযোগ। ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদের নির্দেশনায় প্রতিটি প্রযোজনা নতুন প্রাণ পেত। তিনি পালা পরিচালনা করতেন দলের সার্বিক উন্নতির কথা মনে রেখে। পালার প্রতিটি চরিত্র, গানের ব্যবহার, পোশাকের সমন্বয় নিয়ে তিনি প্রাণপাত করতেন। শুধুমাত্র কাহিনি নির্বাচনেই নয় –– পালা রচনা, অভিনয়, প্রযোজনা, সংলাপ, সংগীত, মেকআপ, পোশাক প্রতিটি দিকেই তিনি অতিনূতনত্ব এনেছিলেন। যাত্রার পালাবদলে ফণীভূষণের ভূমিকা সম্পর্কে জানাতে গিয়ে গবেষক প্রভাতকুমার দাস মন্তব্য করেন:

> অপেরা ও থিয়েট্রিক্যাল যাত্রার রূপান্তরে আধুনিক যাত্রার যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল, পালা নাটকের গঠন বৈশিষ্ট্য, যাত্রা আসরে তার প্রয়োগ উপস্থাপনা ও অভিনয় রীতির বিবর্তনে, পরবর্তী কয়েক দশকে যারা বাঙালির যাত্রাচর্চার পালাবদল নিয়ন্ত্রণ করেছেন, ফণীভূষণ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। [৩২৮]

বাসুদেব ভাগবতের আখ্যান ঘিরে রচিত। পুরাণ নির্ভর এ পালা সাধনচন্দ্র ভাণ্ডারীর দল ভাণ্ডারী অপেরার অভিনয়ে জনপ্রিয় হয়। দৈত্যরাজ পৌণ্ড্রবাসুদেব কৃষ্ণের হাতে নরকাসুর বধ হওয়ায় কৃষ্ণবিদ্বেষী হয়ে ওঠে। কৃষ্ণপূজার বদলে তিনি দৈত্যরাজের পূজা প্রচলনের আদেশ করেন। রাজ্যে কৃষ্ণপূজা দৃশ্যত বন্ধ হলেও রাজাপূজার প্রচলন সম্ভব হয় না। এদিকে দ্বারকায় কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে পৌণ্ড্রবাসুদেব কৃষ্ণপত্নী সত্যভামাকে অপহরণ করে। ফলে দৈত্যরাজের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ হয় এবং উপস্থিত যুদ্ধে দৈত্যরাজ পৌণ্ড্রকে মরতে হয়। পৌণ্ড্র নিজেকে বাসুদেব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কৃষ্ণের বাসুদেব হওয়াকে সে মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু বাসুদেব ছিল প্রচ্ছন্ন কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণের সঙ্গ পাবার আশায় সে চুরি করে কৃষ্ণপত্নী সত্যভামাকে:

> দেবী সত্যভামাকে অপহরণ করেছিলুম তোমার মতো একখানা পারের তরণী কাছে পাব বলে। দেবী সত্যভামা আমার মা। এখন বলছি দয়াময়, বাসুদেব আমি নই- তুমিই বাসুদেব (মৃত্যু)।

ভক্তির জোরে পরিণামে মুক্তি পায় দৈত্যরাজ পৌণ্ড্রবাসুদেব। পালার শেষ সংলাপে তারই আভাস:

> নারায়ণ।। এসো ভক্ত পৌণ্ড্র! আজ তোমার মহানির্বাণ – মহাবিচ্ছেদের পরিণামে পেলে অনন্ত মিলন! অনন্তের যাত্রী তুমি – তোমার পথের আলোকধারী আজ স্বয়ং বাসুদেব।[৩২৯]

---

[৩২৮] প্রভাত কুমার দাস, যাত্রার সঙ্গে বেড়ে ওঠা, *কারিগর*, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানু ২০১৪, পৃ.৬৯

[৩২৯] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-

ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ তাঁর *অভিনয় শিক্ষা* গ্রন্থে জানিয়েছেন,

> বাংলা নাট্য-সাহিত্যের উন্নতি করিতে হইলে লক্ষ্য রাখিতে হইবে খাঁটী বাঙ্গলা ভাষা, বাংলা নাট্যকলা, বাংলা ইতিহাস, দর্শন-শাস্ত্র ও বিজ্ঞান, এইগুলির সহায়তা ব্যতিরেকে একখানি নাটক রচনা করা শক্ত – নাটক রচনা করিবার ইহারাই জ্ঞানের ভাণ্ডার।[৩৩০]

গদ্য-পদ্য সংলাপের পাশাপাশি গানের বিচিত্র ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন ফণীভূষণ:

> তোদের ঘুমিয়ে থাকাই কাল হলো ভাই, ঘুমিয়ে থাকাই কাল।
> ঘুমিয়ে থেকে বিলিয়ে দিলি ইহকাল পরকাল।
> জাগতে হলে মাথায় তোদের কোটি বজ্রপাত,
> জাগার দিনে দিনের আলোয় দেখিস গভীর রাত,
> তোরা বন্ধ গৃহে স্তব্ধ রবি বলরে কতকাল।[৩৩১]

দেবকণ্ঠ বাগচীর সংগীত সংযোজনায় *বাসুদেব* পালার গান জনমনে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। ফণীভূষণ স্বাধীনতার দাবিতে বারবার সোচ্চার হন, যা আজও শোষণের বিরুদ্ধে সমকালীন। তাঁর *ব্রহ্মচারী* পালায় পাওয়া যায় সেই স্বদেশি গান:

> ও ভাই আকাশ এল দেশে
> রক্তখেগো রাজা তোদের নিচ্ছে রক্ত শুষে।।
> প্রতিবাদী দেশের ছেলে
> যাচ্ছে জেলে প্রতিফলে
> সত্যবাদী জীবন দিলে বন্দুকে আর ফাঁসে।।
> লোকের কাছে সাজতে সাধু
> লোক দেখানো ঢালছে মধু
> শোষণ নীতি রাখতে শুধু রাখেন গুণ্ডা পুষে।।[৩৩২]

এ যাত্রাপালায় ফণীভূষণ গানের সঙ্গে দীর্ঘ সংলাপ ব্যবহার করেন। ব্রিটিশ পুলিশের রোষে ফণীভূষণের *বামন অবতার* আর *রত্নেশ্বর* পালার অভিনয় বন্ধ হয়। এছাড়া তাঁর *মুক্তি* যাত্রাপালা রাজরোষে পড়ে। ফণীভূষণ এই

২০০৮, পৃ.২৬

[৩৩০] ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ, *অভিনয় শিক্ষা*, ডায়মণ্ড লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ, পৃ.৭২

[৩৩১] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.২৬

[৩৩২] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.২৭

পালাজুড়ে আত্মার মুক্তির কথা বলেন। কিন্তু সপারিষদ বড়লাট মনে করলেন যে, এই পালা রাষ্ট্রদ্রোহের কারণ হতে পারে। তাই বাংলার প্রেসিডেন্সিতে এর অভিনয় রদ হয়ে যায়। ফণীভূষণের পরবর্তী পালাগুলি ছিল রামায়ণ-মহাভারত নির্ভর এবং গীতিপ্রধান। রামায়ণের আখ্যান অনুসরণে *মায়াচক্র*, *মেদিনী* এবং *চন্দ্রহাস* তাঁর লিখিত উল্লেখযোগ্য পালা। পাশাপাশি চণ্ডীদাস, রামকৃষ্ণ, সাধু তুকারাম এবং কবি কালিদাস প্রভৃতি বহু সাধক জীবনকে ঘিরে তিনি যাত্রাপালা রচনা করেন। রামকৃষ্ণ নাট্যসমাজ, ভাণ্ডারী অপেরা, আর্য অপেরা, নবরঞ্জন অপেরা, নিউ গণেশ অপেরা, নাট্যভারতী প্রভৃতি দলে তিনি প্রায় দুই শতাধিক চরিত্রে অভিনয় করেন। কণ্ঠোৎক্ষেপণ ও আঙ্গিক অভিনয়ে একটা স্বতন্ত্র ধারার তিনি সূত্রপাত করেন। পরাধীন দেশে পুরাণের আবরণে তিনি অনেক দেশাত্মবোধক পালা রচনা করেন। ফলে শাসক সম্প্রদায়ের হাতে তিনি নানান সময়ে হেনস্থা হন। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়:

> শ্রীমৎ প্রণীত 'ভাণ্ডারী অপেরা' অভিনীত 'মুক্তি' নাটক, যা অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে বাজারে 'কুশধ্বজ' নামে প্রকাশিত, সেখানি গেজেট করে বন্ধ হবার পর আমাকেও ওই 'মুক্তি' নাটকের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লালবাজারের থানায় প্রেস অফিসে মুচলেকা লিখে দিতে হয়েছে এবং এই জন্য উপর্যুপরি চার-পাঁচদিন ধানবাদ ও কলকাতা ছুটোছুটি করতে হয়েছে। রাত্রে ধানবাদে অভিনয় করেছি, দিনে লালবাজার থানায় এসে সেখানকার গোলযোগ মিটিয়েছি।[৩৩৩]

দেশাত্মবোধ সঞ্চার, নৈতিক চরিত্র গঠন, ভালোমন্দ বোধ –– এসব বিষয়ে সতর্ক মনোভাব নিয়েই তিনি পালা রচনা করতেন। *চন্দ্রহাস*, *রামানুজ*, *বাসুদেব*, *রূপসাধনা*, *জনকনন্দিনী*, *স্রোতের যাত্রী*, *একলব্য*, *পূর্ণিমা মিলন*, *সাধু তুকারাম*, *মহাকবি কালিদাস*, *মুচির ছেলে* প্রভৃতি পালার মূল উৎস পুরাণ ও ইতিহাস হলেও চরিত্র গঠনে, সংলাপ রচনায়, কাহিনির বিন্যাসে তিনি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দেন। পাশাপাশি ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ যাত্রার অভিনয় শৈলিতে কৃত্রিমতার বদলে জীবনমুখিতা আনয়ন করেন। পঞ্চাশের দশকে তিনি যাত্রাপালার নতুন সম্ভাবনাকে স্বাগত জানান। তাঁর দিনপঞ্জির পাতায় *সোনাই দীঘি* পালা সম্পর্কে অভিনন্দন বাক্য উচ্চারণের পাশাপাশি যাত্রার পালাবদলের সূত্র নির্দেশিত হয়েছে :

> ব্রজেন্দ্রবাবুর সোনাই দীঘি দেখিলাম। দেখিয়া যৎপরনাস্তি প্রীত হইয়াছি। ময়মনসিংহ গীতিকার একটি কাহিনী অংশ লইয়া পালা বাঁধিয়াছেন। বাঁধুনি চমৎকার। সামাজিক মিলন আর ঐতিহাসিক এই দুইটি কাহিনীর অত্যাশ্চর্য মিলন ঘটিয়াছে। পুরাণে অবশ্য নিপীড়িতের অনন্ত বেদনার কথা রহিয়াছে এবং আমরা তাহা বলিয়াছিও। কিন্তু তাহাতে দেবমাহাত্মের প্রচারই অধিক। সত্যম্বর অপেরার পালাটি দেখিয়া মনে হইতেছে যাত্রার যুগ আসিল বলিয়া। যাত্রাশিল্প আর স্বর্গ ধরিয়া বসিয়া থাকিলে ভুল করিবে। জনতার মধ্য হইতে তাহাতে নর-নারায়ণ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। অদ্য মানসচক্ষে স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করিতেছি আমরা এক মহাজীবনের দুয়ারে সমাগত। দরজা খুলিয়া পারিজাত আর দেখা যাইবে না, আমরা

[৩৩৩] উদ্ধৃত.প্রভাত কুমার দাস, যাত্রার সঙ্গে বেড়ে ওঠা, *কারিগর*, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানু ২০১৪,পৃ.৭৩

> দেখিতে পাইব বাংলার মাতৃমূর্তি, তাহার অগনন সন্তান এবং স্বর্ণমৃত্তিকা। কি আনন্দ যাত্রা প্রকৃত গণদেবতার সন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছে। ইহার তুলনায় আনন্দের কী থাকিতে পারে। মাভৈঃ চিৎপুর, মাভৈঃ যাত্রাগান।[৩৩৪]

তিনি যথার্থই অনুভব করেছিলেন নিছক পুরাণের আবরণে আবিষ্ট যাত্রা কেবল দর্শক-শ্রোতাকে ক্লান্ত করবে। তাই বাংলা যাত্রাকে বাস্তবসম্মত কাহিনির আধারে পরিবেশন করতে হবে। বিষয় ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করে পরিবেশন কৌশলের প্রতি সমর্থন তাঁর প্রগতিশীল চিন্তারই প্রকাশক। জীবন আর আসর তাঁর কাছে ছিল অভিন্ন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর শনিবার রাত্রি সাড়ে এগারোটায়, কলকাতার নারকেলডাঙার মোগলবাগান পার্কে অনুষ্ঠিত এক যাত্রা আসরে *বাঁশের কেল্লা* পালায় অভিনয় করতে করতেই তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

৩.৩.৭ সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৯০০-১৯৯৮)

সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণ রামনগর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস নদিয়া জেলার কামালপুর। কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। *কল্লোল*, *সারথি*, *কালি কলম*, *ধূপছায়া*, *সচিত্র শিশির*, *প্রগতি* ও *নবশক্তির* মত বিভিন্ন সাময়িকীতে গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ লিখেন সৌরীন্দ্রমোহন। ১৯৩৩ সালে ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত হয় তাঁর প্রথম পালা *ধর্মবল*। পরবর্তী প্রায় ছেচল্লিশ বছর পেশাদার যাত্রার সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি প্রায় চল্লিশটি পালা রচনা করেন।[৩৩৫] তিনি যাত্রাপালার কাহিনি নির্বাচনে বৈচিত্র্য আনেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বহুশ্রুত কথাসাহিত্যের যাত্রারূপ প্রদর্শন তাঁর অনন্যকীর্তি। তাঁর *রাজসিংহ* উপন্যাসটি অভিনীত হয় রঞ্জন অপেরায় *রূপনগরের মেয়ে* নামে, তারপর *চন্দ্রশেখর* ও *কৃষ্ণকান্তের উইল* তাঁরই রূপান্তরে যথাক্রমে প্রভাস অপেরা ও তরুন অপেরা-য় অভিনীত হয়। এছাড়া *শাপমুক্তি*, *মহিষাসুর*, *চক্রছায়া*, *মাটির মা*, *নাগকন্যা*, *হিরন্যকশিপু*, *ভক্ত হরিদাস*, *রক্তবীজ* তাঁর উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক পালা। পুরাণের মহিষাসুর ব্রহ্মার বর লাভ করে, কিন্তু তাঁর *মহিষাসুর* পালায় মহিষাসুর আদ্যাশক্তির কাছে নারী-হস্তে নিধনের বর লাভ করে। তাই ক্রুদ্ধ দৈত্যরাজ স্বর্গ অবরোধ করে নারীদের বন্দি করে। বৃহস্পতির পরামর্শে সব দেবতার পূর্ণ তেজে সৃষ্ট নারী মহালক্ষ্মীর কাছে পরাজিত হয় মহিষাসুর। দেশের সমকালীন অবস্থা স্পষ্টরূপ পায় বৃহস্পতির সংলাপে:

> বৃহস্পতি।। দেবতা, দানব, কিম্বা গন্ধর্ব, মানব,
> অন্যায় যে করে,
> দণ্ড তার তোলা থাকে কালের ভাণ্ডারে।[৩৩৬]

---

[৩৩৪] উদ্ধৃত.প্রভাত কুমার দাস, *যাত্রার সঙ্গে বেড়ে ওঠা*, কারিগর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানু ২০১৪,পৃ.৭৪

[৩৩৫] উদ্ধৃত.প্রভাত কুমার দাস, *যাত্রার সঙ্গে বেড়ে ওঠা*, কারিগর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানু ২০১৪,পৃ.১১৬

[৩৩৬] উদ্ধৃত. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৭২, পৃ.৪৯২

মহিষাসুর বৈরী ভাবের অন্তরালে প্রবাহিত সাধকের তপস্যা। দৈত্যরাজ শত্রুভাবে মায়ের আরাধনা করেছে। তাই বিবেকরূপী মেধসের গানে প্রচারিত হয়েছে ভক্তিসাধনা:

কবে মা তোর চরণ তলে সদ্য ফোটা জবার মত
ব্যথায় রাঙা হৃদয় আমার লুটিয়ে রবে অবিরত।
তোমার চেয়ে শবাসনা প্রদীপ হয়ে মোর কামনা
জ্বলবে দেহের দেউল তলে কবে মাগো নিমেষ হত
ও তোর রূপের আলোর বানে বাঁধ ভেঙ্গে মা আমার প্রাণে
এবার যেন যায় গো ভেসে আমার চাওয়া-পাওয়া যত।[৩৩৭]

রক্তবীজ পালায় দেবী চণ্ডীর কাহিনি অবলম্বনে শাসক শোষকের সম্পর্কটি নিপুণভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের আখ্যান নির্ভর *আত্মাহুতি* বা *পদ্মপুরাণের* অধ্যায় অবলম্বনে *ব্যথার পূজা* পালা রচনার পাশাপাশি স্বদেশ-চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে সৌরীন্দ্রমোহন লিখেন *পলাশীর পরে*। রঞ্জন অপেরায় অভিনীত এই ঐতিহাসিক পালায় ব্যবহার হয় যাত্রা-ব্যালে। বাংলার নবাব মীরকাসিমের সঙ্গে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির লড়াই, দেশীয় বেঈমানদের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁর পরাজয় এবং দেওয়ান নন্দকুমারের অন্যায় ও বেআইনি ফাঁসির কাহিনি এ পালার উপজীব্য। সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ বারবার স্থান পায় এ পালায়। তরুন অপেরায় তাঁর রাজা রামমোহন পালা ব্যাপক সমাদৃত হয়। পালাসংগীত রচনায় ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্যে তাঁর কৃতিত্ব অনন্য সাধারণ। এ প্রসঙ্গে যাত্রা গবেষক প্রভাত কুমার দাস জানিয়েছেন:'...বাংলার যাত্রাগানে তাঁর একটি বিশেষ দান যাত্রার গীতরচনা, ভোলানাথ রায় কাব্যশাস্ত্রীর পরে তিনিই শ্রেষ্ঠতম গীতিকার।'[৩৩৮] পালা রচনার পাশাপাশি অভিনয়েও তিনি পারদর্শী ছিলেন। ১৯৯৮ সালের ১ অক্টোবর ভোর সাড়ে পাঁচটায় বারুইপুরের বাড়িতে তিনি প্রয়াত হন।

৩.৩.৮ কানাইলাল শীল (১৮৯১-১৯৬৩)

কলকাতা নিবাসী কানাইলাল শীল বইয়ের ব্যবসার পাশাপাশি যাত্রা সাহিত্যের চর্চা করেন। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পালার সঙ্গে তিনি অসামান্য দক্ষতায় সামাজিক পালাও রচনা করেন। *ভাগবত*-এর আখ্যান অবলম্বন করে তাঁর প্রথম পালা *নিয়তি* (১৯৩৩) রচিত হয়। রয়েল বীণাপাণি অপেরা ও বিলগাঁও নট্ট কোম্পানি অভিনয় করে এ পালা। এ পালায় প্রত্যেক অঙ্কের শেষে ঐকতান বাদনের নির্দেশ আছে। যাত্রা-ব্যালে আর গণের গানসহ পালায় ছত্রিশটি সংগীত স্থান পায়। পালার প্রথমেই নিয়তি তার ক্ষমতার কথা ঘোষণা করে। নিয়তির এই ক্ষমতার কাছে আপন শক্তিতে উদ্বুদ্ধ দুর্বাসাকে হার মানতে হয়। অভিশাপের প্রকৃতি ফুটেছে পালাকারের কণ্ঠে:

---

[৩৩৭] উদ্ধৃত. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৭২, পৃ.৪৯২

[৩৩৮] উদ্ধৃত.প্রভাত কুমার দাস, *যাত্রার সঙ্গে বেড়ে ওঠা*, কারিগর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানু-২০১৪,পৃ.১১৬

বাজ পড়েছে শান্তির ঘরে জ্বলে শুধু হল ছাই
চৌদিকে তার পাথরের বেড়া পথ নাই পথ নাই।।
আমি সর্পের বিষ, আগুনের জ্বালা মরুভূমি খরতাপ
বজ্রের ঘা, সিংহের থাবা দুর্বাসা-অভিশাপ।
আমি ললাট-বহ্নি ধূর্জটীর, ধূমের পাহাড় কুজ্ঝটির
নন্দন বনে কুসুম বিতানে ঝটিকা বহায়ে যাই।।[৩৩৯]

মহর্ষি বশিষ্ঠের জীবন কাহিনিকে অবলম্বন করে কানাইলালের পরবর্তী পালা *ব্রহ্মতেজ* রচিত হয়। ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের সঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্রের দ্বন্দ্ব নিয়ে এ পালা রচিত। বশিষ্ঠের সংলাপে মেলে তারই ইঙ্গিত:

উপলক্ষ আমি সুবদনী!
তাই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে বাদ,
তাই ব্রহ্মতেজে অনল জ্বলিল–
পুড়াইল শত পুত্র তার,
পুড়াইল অন্তরের কলুষ-কালিমা
বিশ্বামিত্রে সাজাইল
তপাচারী সন্ন্যাসী সাধক।[৩৪০]

বশিষ্ঠের ব্রহ্মতেজের পরিচয় পেয়ে বিশ্বামিত্র সে তেজ ধারণের সাধনায় ব্রতী হন। উগ্রসাধক বিশ্বামিত্রও সিদ্ধিলাভ করে ব্রহ্মতেজ অর্জন করেন। সাধনায় নিষ্ঠা থাকলে সিদ্ধিলাভ হবেই –– এটাই এ পালার প্রধান বক্তব্য। পালার গানেও ধর্ম-কর্মের ব্যাখ্যা প্রকাশিত:

অন্তরে যার আলোর রেখা, সে কি থাকে অন্ধকারে।
ধর্ম রাখা কর্ম সে তার পথের আলো দেখায় তারে।।
নীতির খনি তোমার কাছে,
দীপের মণি উজল আছে,
সাধন তোমার জয় দিয়েছে কর্মভূমির মধুর সুরে।।[৩৪১]

---

[৩৩৯] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.২৯

[৩৪০] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.২৯

[৩৪১] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.২৬

এছাড়া *বীরপূজা*, *দলমাদল*, *দেশের দাবী*, *মুক্তিরমন্ত্র*, *মুক্তি তীর্থ*, *অমরাবতী*, *রামরাজ্য*, *চক্রী*, *ধাত্রী-পান্না* কানাইলাল রচিত উল্লেখযোগ্য পালা।

৩.৩.৯ বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৯০২-১৯৬৬)

হুগলি জেলার পাকড়ি গ্রামের বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পালায় পুরাণের পাশাপাশি দেশপ্রেম, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, কালোবাজারি-চোরাকারবারি ইত্যাদি সমকালীন সমাজ সমস্যা স্থান পায়। হরিবংশের কিছু খণ্ডিত কাহিনি অবলম্বনে তিনি পৌরাণিক পালা *রক্তকমল* রচনা করেন। যাত্রা-ব্যালের সঙ্গে আদিরসাত্মক দ্বৈতগীতির ব্যবহার এ পালায় পরিলক্ষিত হয়। উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের রূপে মুগ্ধ হয়ে লক্ষ্মী নারায়ণের প্রশ্নের জবাব দিতে ব্যর্থ হয়। অসন্তুষ্ট নারায়ণ লক্ষ্মীকে অভিশাপ দেয় এবং নারায়ণের শাপে লক্ষ্মী মর্তে অশ্বিনী হয়ে জন্ম লাভ করে। কিন্তু একবীর পুত্রের জন্মের পরে শাপমুক্ত হয়। হস্তিনায় যযাতির পুত্র রাজা তুর্বসু অপুত্রক ছিল। বনদেশে অনাথ একবীরকে পেয়ে যযাতি তাকে পুত্ররূপে লালন করতে থাকে। তুর্বসুর মৃত্যুর পরে একবীর হস্তিনার সিংহাসনে বসে। এদিকে সভ্যরাজ সুবাহুর কন্যা একাবলীকে দানবসম্রাট কালকেতু চুরি করতে গেলে আশ্রয় দেয় একবীর। ফলে দৈত্যরাজ ও হস্তিনারাজের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে। দ্বন্দ্বে কালকেতুর মৃত্যু হলে একাবলীর সঙ্গে একবীরের মিলন ঘটে। কালকেতুর মৃত্যুতে নারী-নির্যাতনের নেতিবাচক দিক উপস্থাপিত হয়। একবীরের সংলাপে আশ্রিত-রক্ষণের মহিমা বর্ণিত:

> প্রাণ যদি যায় আশ্রিত রক্ষায়,
> কিবা ক্ষতি তায়
> হবে তাহা জীবনের গরিষ্ঠ সাধনা।
> সে সাধনা ধরণীর স্মৃতির মন্দিরে
> আপ্রলয় পাইবে অর্চনা।[৩৪২]

শ্রীমদ্‌ভাগবতের অন্য অধ্যায় অবলম্বনে *সংগ্রাম* (১৯৪৫) পালা লিখেন বিনয়কৃষ্ণ। *মাটির প্রেম* (প্র.১৯৪৮)পালায় স্থান পায় বল্লভীপুরের রাজা শিলাদিত্য আর হূন-রাজার দ্বন্দ্ব। শিলাদিত্য নিজের মন্ত্রীর চক্রান্তে হেরে যায় হূন-রাজের কাছে। তাঁর *বেঈমান* পালায় বিদেশিরা স্বার্থপর বেঈমানের দল তৈরি করে কিভাবে তাদের মাধ্যমে রাজত্ব প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা চালায় তাই বর্ণিত হয়। কৃত্রিম খাদ্যাভাব, প্রজাপীড়ন, কালোবাজারি আর সরকারি-মদতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষিত হয়েছে এ পালায়। তাঁর *ভুলের কাজলে* (প্র. ১৯৬৩) পালাতেও চোরাকারবারি, মহাজন আর অর্থ-পিশাচদের সম্পদ লুট করে শোষিতদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় দস্যু-সর্দার আদম খাঁ। তারই মধ্যস্থতায়

---

[৩৪২] উদ্ধৃত. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৭২, পৃ.৫০৭

রূপনগরের রাজা দেবরায়ের পুত্র ও পুত্রবধূর মিলন ঘটে। ভুলের কাজল মুছে যায় দেবরায়ের। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির কথাও ধ্বনিত হয় এ পালায়। পালার মূল কথা মূর্ত হয়ে ওঠে দেবরায়ের সংলাপে:

কর্মই মানুষকে বড় আসন দেয়,
জন্ম দেয় না।[৩৪৩]

পালাকারের গানে আভাসিত হয় স্বদেশভূমির প্রকৃত বন্ধু চাষির কথা:

ভাই, অসভ্য নয় চাষা।
ওরাই ফলায় মাটির বুকে সোনার ফসল খাসা।
চাষা যদি থাকত না ভাই, থাকত কোথায় বাবুর দল,
কে জোগাত তাদের ঘরে দুটিবেলা অন্নজল,
চাষার গায়ের রক্তেতে ভাই মা লক্ষ্মী পাতে বাসা।
তারা নয়কোরে দীন, নয়কোরে হীন
তারাই যে হয় বন্ধু দেশের, তারাই দেশের আশা।[৩৪৪]

আদি, করুণ, হাস্য ও বীভৎস রসের সমন্বয়ে এ পালাটি গড়ে উঠেছে। *রক্তপূজা*, *মায়ের ছেলে*, *পণমুক্তি*, *ত্রিধারা*, *হিন্দুমুসলমান*, *রক্ততর্পণ*, *ভারতনারী*, *দর্পহারী*, *মারাঠা-মোগল* প্রভৃতি বিনয়কৃষ্ণের উল্লেখযোগ্য যাত্রাপালা।

৩.৩.১০ বিবিধ

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের (১৮৯২-১৯৬১) *নবাব সিরাজদ্দৌলা* নাটক থিয়েটারের জন্য রচিত হলেও যাত্রাপালা হিসেবে এটি সর্বাধিক স্বীকৃত। এছাড়া তাঁর *পানিপথ* যাত্রাপালাটিও উল্লেখযোগ্য। মহেন্দ্র গুপ্ত (১৯১০-১৯৮৪) এর *টিপু সুলতান*, *মহারাজ নন্দকুমার*, *রক্তস্নাত দিল্লি*, *সিংহগড়* প্রভৃতি ঐতিহাসিক পালা আমাদের যাত্রাজগতে বিশেষ সংযোজন। কানাইলাল শীলের *বীর হাম্বির*, *চাষার মেয়ে*, *ধাত্রী পান্না*, *বীরপূজা*, *দলমাদল*, শান্তিরঞ্জন দে-র *গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গা*, *সূর্যসাক্ষী*, নন্দগোপাল রায়চৌধুরীর *রমযানের চাঁদ* এবং আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২১-১৯৯১) *ফাঁসির মঞ্চে*, *পৃথ্বীরাজ* প্রভৃতি পালা অত্যন্ত দর্শকপ্রিয়তা অর্জন করে।

৩.৪ কাল্পনিক পালা

যে পালা সাহিত্যে কল্পনা নির্ভরতা বেশি এবং সে পালাগুলো ঠিক ইতিহাসের চরিত্র নয়, কিন্তু ইতিহাসে ঘটে থাকে – এমন কাহিনি নির্ভর পালাগুলোকেই পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে 'কাল্পনিক পালা' বলে অভিহিত করেছেন।

---

[৩৪৩] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৩১

[৩৪৪] উদ্ধৃত. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৭২, পৃ.৫১৬

পুরাণ ও ইতিহাসকে সামনে রেখে স্বকপোলকল্পিত কাহিনির প্রচারই এই ধরণের পালার বৈশিষ্ট্য।[৩৪৫] পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পালার একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দিয়ে ব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রথম কাল্পনিক পালা *রাজনন্দিনী* রচনা করেন। গৌরচন্দ্র ভড়ের *গরিবের মেয়ে*, *সাহেব বিবি গোলাম*, নির্মল মুখোপাধ্যায় এর *রক্ত দিল যারা*, রঞ্জন দেবনাথের *জীবন্ত শয়তান* প্রভৃতি এ শ্রেণির পালা।

৩.৫ ব্রজেন্দ্রকুমার দে (১৯০৭-১৯৭৬)

ব্রজেন্দ্রকুমার দে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের মাদারিপুর মহকুমার গয়ঘর-গঙ্গানগর গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হরকিশোর ও মাতা ক্ষীরদাসুন্দরীর তিনি সপ্তম সন্তান। স্বগ্রামের পাঠশালায় তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। পরবর্তী কালে কলকাতার ওরিয়েন্টাল ট্রেনিং একাডেমি থেকে ১৯২৩ সালে তিনি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। এরপর সিটি কলেজ থেকে আই.এস.সি এবং বি.এ. পাশ করেন। ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ.পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৭ সালে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ থেকে বি.টি. পাশ করেন। তাঁর দীর্ঘ শিক্ষকতার (১৯২৯-১৯৬৯) সুবাদে যাত্রাজগতেও তিনি 'মাস্টারমশাই' নামেই সম্বোধিত হতেন। যাত্রাপালা রচনার মধ্য দিয়ে তিনি মূলত দেশের সাধারণ মানুষকে বিনোদনের মাধ্যমে সচেতন করতে চান। ব্রজেন্দ্রকুমার দে পুরাণ ও ইতিহাসকে কাল্পনিক কাহিনির মাধ্যমে তাঁর যাত্রাপালায় উপস্থাপন করেন। যাত্রায় সামাজিক পালা পরিবেশনের মধ্য দিয়ে তিনি একটি আধুনিক ধারা তৈরি করলেন। ভোলানাথ রায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই ব্রজেন্দ্রকুমার দে সফল যাত্রাকার হতে পেরেছিলেন। পরিণত বয়সে কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি স্মরণ করেন সেই কথা : 'আমার গুণগ্রাহীরা আমাকে যে বিশ্লেষণেই ভূষিত করুন, আমি নিজে মানি, আমি ভোলানাথ বাবুর উত্তর সাধক মাত্র।'[৩৪৬]ভোলানাথ রায়ও ব্রজেন্দ্রকুমারকে অভিনন্দন জানিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেন: ' দেখো, একদিন এই ছোকরা যাত্রায় নবযুগ আনবে।' ব্রজেন্দ্রকুমার প্রায় পঞ্চাশ বছরের পালাকার জীবনে একশত ত্রিশটি পালা রচনা করেন।[৩৪৭] মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি *স্বর্ণলঙ্কা* নামে প্রথম যাত্রা লেখেন – যা ১৯২৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। শিশির-যুগের বিশিষ্ট নট ও নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ব্রজেন্দ্রকুমারের রচনায় সবসময় মুগ্ধ হতেন। মূলত তাঁরই অনুপ্রেরণায় তিনি নাট্যরচনায় উৎসাহী হয়ে উঠেন। *ধরার দেবতা* এর উৎসর্গপত্রে ব্রজেন্দ্রকুমারের স্বীকারোক্তি:

---

[৩৪৫] প্রভাত কুমার দাস, *যাত্রার সঙ্গে বেড়ে ওঠা, কারিগর*, কলকাতা, প্র. প্র. জানু-২০১৪, পৃ.২৪

[৩৪৬] ব্রজেন্দ্রকুমার দে,(সাক্ষাৎকার) অভিনয় পত্রিকা, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৫, উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৩১

[৩৪৭] দেবযানী মুখোপাধ্যায়, *পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে ও বাংলা যাত্রা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্র.প্র.১৪১৩, পৃ.২৬

> যাঁহার আদেশ মাথায় লইয়া বিশ বছর আগে আমার অক্ষম লেখনী যাত্রার নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পদ যাত্রাভিনয় আমার হাতে আবর্জনামুক্ত হোক – এই ছিল যাঁহার একান্ত কামনা, আমার সেই পরমারাধ্য শিক্ষক স্বর্গীয় নট-নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর নাম স্মরণে ধরার দেবতা উৎসর্গ করিলাম।[৩৪৮]

অবশ্য কানাইলাল শীলই পেশাদার দলের সঙ্গে ব্রজেনবাবুকে যোগাযোগ করিয়ে দেন। এ প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রকুমারের রচনা সাক্ষ্য : 'এই সময় কানাইবাবু আমাকে প্রায় হাত ধরে পেশাদার যাত্রায় পালা লেখার কায়দা রপ্ত করিয়ে দেন।'[৩৪৯] তিনি ক্রমাগত এই মাধ্যমটির ঊর্ধ্বমুখী সম্ভবনা ও পরিণত বিস্তারের কথাই ভাবেন। পুরাণ, ইতিহাস, লোকজ রচনা, জনশ্রুতি এমনকি কিংবদন্তির বহু বিচিত্র সম্ভার থেকে কাহিনি আহরণ করে তিনি তাঁর পালায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন। প্রচার করে যান মানব কল্যাণের বাণী:

> যাত্রাপালা রচনার সময় আমি সবসময় মনে রাখি কয়েকটি কথা, আমি সহজ করে, সুন্দর করে, মর্মস্পর্শী করে মানুষের মঙ্গলের কথা বলব, মানব কল্যাণকে সবসময় চোখের সামনে রাখব আর যেখানে ছাই পাব তাই উড়িয়ে দেখব কোনো অমূল্য রত্ন মেলে কিনা।[৩৫০]

তাই তাঁর যাত্রায় নারীমুক্তি, যুদ্ধ বিরোধিতা, বিশ্বসম্প্রীতি, সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর প্রসঙ্গ উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হয়। এ সমস্ত যাত্রাপালার মাধ্যমে তিনি যে শুধু নতুন যাত্রার পথ প্রশস্ত করেছিলেন তাই নয়, সমাজের যাবতীয় কুসংস্কার, নির্যাতন, পীড়ন, শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই করেন অবিরাম।

১৯৩১ এ গণেশ অপেরায় অভিনীত *বজ্রনাভ* যাত্রার সাফল্যে তাঁকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। এই দলে পরপর অভিনীত হয় *প্রবীরার্জুন* (১৯৩২), *লীলাবসান* (১৯৩৪), *বঙ্গবীর* (১৯৩৬)। গণেশ অপেরা পার্টিতে *বজ্রনাভ* (১৯৩১) পালাটি যুদ্ধবিরোধী বক্তব্য নিয়ে উপস্থাপিত হয়। মহাভারতের মুষলপর্বের আত্তীকৃত কাহিনির উপস্থাপনায় ও ব্যাখ্যায় তিনি বলেন:

> কৃষ্ণ প্রেমময়, কৃষ্ণ রাজনীতিক, কৃষ্ণ অনন্ত লীলার প্রস্রবন। যাঁর বাঁশীর সুরে যমুনা উজান বহিত, গোপীরা পাগল হইয়া ছুটিত, যে ''মুকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম''- তাঁর লীলা প্রসঙ্গ ছাড়িয়া অবসানের অবতারণা কেন? জানি, কোন কোন বৈষ্ণবের মন্দির প্রাঙ্গণে লীলাবসানের অভিনয় ''অবসান'' বলিয়াই নিষিদ্ধ ছিল।[৩৫১]

ঐ পালাতে *চির-উপবাসী*, *অভাগা অনাম্য* – সর্দার জরাকে নির্যাতিতের প্রতিনিধি, অভিজাত তথা বণিক শ্রেণির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হিসেবে চিত্রিত করে বাংলা যাত্রায় তিনি নতুনত্ব আনেন। আমৃত্যু পাঁচ দশক জুড়ে ব্রজেন্দ্রকুমার

---

[৩৪৮] গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৭২, পৃ.৪৪৭

[৩৪৯] দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়(সংকলন ও সম্পাদনা), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা* ৩, প্রাগুক্ত, পৃ.৩২

[৩৫০] উদ্ধৃত.প্রভাত কুমার দাস, *যাত্রার সঙ্গে বেড়ে ওঠা*, কারিগর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানু-২০১৪, পৃ.৮১

[৩৫১] মুদ্রিত পালার ভূমিকা, উদ্ধৃত.প্রভাত কুমার দাস, *যাত্রার সঙ্গে বেড়ে ওঠা*, কারিগর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানু-২০১৪, পৃ.৮১

মূলত পালা রচনাতেই ব্রতী হন। যাত্রার প্রতি ভালোবাসায় শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য :

> আমি গাঁয়ের ছেলে। খুব ছোটবেলা থেকেই আমি যাত্রা দেখতাম। ... যাত্রা পল্লীর চত্বরে, গঞ্জের বাজারে, মফঃস্বল টাউনে অত্যন্ত জনপ্রিয়। মাটি আরা মানুষের কাছাকাছি যাবার এই যে ক্ষমতা – এটাই আমার সবচেয়ে ভাল লাগত, এখনও লাগে ... এছাড়া আরও একটা কারণ আছে। আমি লক্ষ্য করেছিলাম যাত্রার মধ্যে দিয়ে নিজের বক্তব্য অনেক বেশি লোককে শোনানো যায়। এই সুযোগটুকুই গ্রহণ করার ইচ্ছেও আমার ছিল।[৩৫২]

শুধু তাই নয় *চাঁদের মেয়ে* (১৯৩৯) পালায় তিনি 'দীর্ঘ বক্তৃতার বিরক্তিকর বাহুল্য' বর্জন করে ছোট ছোট সংলাপের সৃষ্টি করেন :

> জগদম্বা ।। কী বলছ?
>
> কেশরী ।। আমি কি সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকব?
>
> দেবল ।। না-না তামাক খাও।
>
> জগদম্বা ।। বসো।
>
> কেশরী ।। আরে শিগ্‌গির রাজবাড়ি চল।
>
> দেবল ।। বাবা কেশরীচাঁদ! আমার বদলে গিন্নী যদি যায়?
>
> কেশরী ।। না-না, তোমাকে যেতে হবে।
>
> দেবল ।। তবে দাও গিন্নী, হুঁকোটা দাও।
>
> জগদম্বা ।। হুঁকো নিয়ে যাবি কিরে মিনসে? এমনি যা।
>
> দেবল ।। আচ্ছা, চলো–[৩৫৩]

চাঁদের মেয়ে পালার পর বাংলা যাত্রাপালায় যে আধুনিকতা প্রবর্তিত হল, তারই ধারাবাহিকতায় একের পর এক ছোট সংলাপের পালা লিখিত হতে লাগল। এ সম্পর্কে পালাকারের বক্তব্য:

> ১৯৩৯ সালে 'চাঁদের মেয়ে' নাটকে আমি প্রথম এই short dialogue যাত্রায় পরিবেশন করি। অভিনেতা হিসেবে আমার সহায় ছিলেন পঞ্চু সেন। আমাদের দু'জনের সম্মিলিত চেষ্টায় যাত্রায় এ পরিবর্তন যে কত সফল হয়েছে, যাত্রারসিক মাত্রই তা জানেন। আজ দীর্ঘ বক্তৃতা বিদায় নিয়েছে; যাত্রার নাটক বাহুল্য বর্জন করে যেমন করেছে সময় সংক্ষেপ, তেমনি পেয়েছে সর্বস্তরের শ্রোতার সমাদর।[৩৫৪]

---

[৩৫২] দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়(সংকলন ও সম্পাদনা), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা* ৩ , প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

[৩৫৩] বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, নির্বাসিত সম্রাট, অরূপ দাস (সম্পাদিত), *পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে বিশেষ সংখ্যা*, ২০০৮, তাঁতঘর, একুশ শতক, কলকাতা, পৃ.৫৭

[৩৫৪] ব্রজেন্দ্রকুমার দে, বাংলায় যাত্রানাটক রচনার বিবর্তন, অরূপ দাস (সম্পাদিত), *পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে বিশেষ সংখ্যা*, ২০০৮, তাঁতঘর, একুশ শতক, কলকাতা, পৃ.১৯০

অবশ্য সেই সময় গণেশ অপেরা, ভোলানাথ অপেরা, আর্য অপেরা প্রভৃতি যাত্রাদল *চাঁদের মেয়ে* পালাটি প্রযোজনা করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। কিন্তু নট্ট কোম্পানির কর্ণধার সূর্যকুমার দত্ত এই পালা সগৌরবে প্রযোজনা করেন। সূর্যকুমার দত্তের মত অনুযায়ী বলা যায়, সেদিনই যাত্রা যথার্থ আধুনিকতার দিকে পা বাড়াল।[৩৫৫] নট্টকোম্পানিতে *চাঁদের মেয়ে* পালার অভিনয়ে ব্রজেন্দ্রকুমার অচিরেই খ্যাতিমান হয়ে উঠেন। এ দলে পরবর্তী সাঁইত্রিশ বছরে তাঁর বত্রিশটির মতো পালা অভিনীত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : *আকালের দেশ* (১৯৪৩); *পরশমনি* (১৯৪৫); *প্রতিশোধ* (১৯৪৮); *লোহার জাল* (১৯৬০); *করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর* (১৯৬৮); *কৃষ্ণশকুনি* (১৯৭২); *নটী বিনোদিনী* (১৯৭৩) – একই সঙ্গে বাণিজ্যিক সাফল্য ও বাংলা যাত্রার পালাবদলের এক-একটি মাইলফলক হয়ে আছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) ফলে সমগ্র বিশ্বে ফ্যাসিস্ট শক্তিকে দমন করার জন্য কমিউনিজমের যে প্রসার ঘটে, তার ঢেউ এসে লাগে ভারতবর্ষের মাটিতে। সেই ফ্যাসিস্ট বিরোধী মঞ্চ থেকে গড়ে উঠলো ভারতীয় গণনাট্য সংঘ 'ইন্টারন্যাশনাল পিপলস্ থিয়েটার এসোসিয়েশন' যা সংক্ষেপে (I.P.T.A)। বাংলার মাটিতে বিজন ভট্টাচার্যের *নবান্ন* (প্রথম অভিনয় ২৮.১০.১৯৪৪) নাটক দিয়ে গণনাট্য আন্দোলনের উদ্বোধন হয়। চল্লিশের দশকে আই.পি.টি.এ প্রযোজনায় *নবান্ন*, *ছেঁড়া তার* যাত্রার পালাবদলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশবিভাগ – পরপর এসে বাংলার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিল। ঔপনিবেশিক বাংলার সবচেয়ে আলোচিত প্রসঙ্গ ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর – যা 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) বা 'The Great Bengal Famine'[৩৫৬] নামে অভিহিত। 'দুর্ভিক্ষ' বা 'মন্বন্তর' এর স্বরূপ চিহ্নিত করতে গিয়ে গবেষকগণ জানিয়েছেন:

(1) An extreme and protracted shortage of food resulting in widespread and persistent hunger, evidenced by loss of body weight and emaciation and increase in the death rate caused either by starvation or diseasis resulting from the population.[৩৫৭]

(2) Famine is an economic and social phenomenon lock of food resources which, in the absence of outside aid, leads to death of those affected.[৩৫৮]

---

[৩৫৫] অরূপ দাস (সম্পাদিত), *পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে বিশেষ সংখ্যা*, শুভ্রব্রত সিংহরায়, যাত্রার গোত্রান্তর : ব্রজেন্দ্রকুমারের অবদান, ২০০৮, তাঁতঘর, একুশ শতক, কলকাতা, পৃ.৬৪

[৩৫৬] Amartya Sen; Poverty and Famines , EBLS Edition 1987

[৩৫৭] Jean mayer; Management of Famine relief : science, 5,9. May,; Quoted from Amarta Sen (1987)

[৩৫৮] Unrised (1975), Famine Risk in the modern world, mimeographed, United Nations, Geneva; Quoted from Amarta Sen (1987)

এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রতিক্রিয়ায় বাংলার গ্রামীণ সমাজ জীবন এবং শাহরিক জীবন হয়েছে বিপর্যস্ত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ-ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বন্যার ফলে সৃষ্ট শস্যাভাব, যুদ্ধের রসদ সংগ্রহের প্রয়োজনে খাদ্য মজুদকরণ, মজুতদারি ও কালোবাজারির উত্থান এবং সরবরাহ ব্যবস্থার বিপর্যয়ের ফলে অসহনীয় হয়ে ওঠে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বর্ণনায় :

> পঞ্চাশের মন্বন্তরে পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ বাঙালীর প্রাণ গেল, হাহাকারে চারিদিক ছেয়ে গেল, কারা যেন খুলে দিয়েছিল যন্ত্রণার অন্নসত্র, গ্রাম থেকে দলে দলে এল দুঃখীজন, এল শুধু একটু অন্নের প্রত্যাশায়, মুমূর্ষু আর মৃতের মেলা বসে গেল কলকাতার মমতাহীন পথে ঘাটে।[৩৫৯]

মন্বন্তরের এই মারণান্তিক স্বরূপ সমকালীন শিল্পীদের মতো যাত্রায় ও বিষয় হিসেবে স্থান পায়। এসময় শহর কলকাতার নাট্যজীবন ভীতচকিত বিমূঢ় থাকলেও সামাজিক জীবনের সংকটকালে যাত্রাগান থেমে থাকে নি। সময় ও কাল সচেতন ব্রজেন্দ্রকুমার এই আকালের সময় লিখেন *আকালের দেশ* (১৯৪৩)। ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষের সময় বর্তমান শরীয়তপুর জেলার কার্তিকপুর গ্রামের এক মহাজন মজুমদার খাদ্য গুদামজাত করে রাখে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়। ব্রিটিশ সরকারের তাবেদারকে উৎখাত করতে ঐক্যবদ্ধ হয় বাংলার যুবসমাজ। এই ঘটনার আলোকে যাত্রাপালা 'আকালের দেশ' ঐ কার্তিকপুরেই মঞ্চস্থ হয়। বিজন ভট্টাচার্যের *নবান্ন* নাটকের সমসাময়িককালে রচিত এ পালার ভূমিকায় ব্রজেনদের উচ্চারণ:

> ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষে চোখের উপর যে শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াছি, নিরন্ন জনসাধারণের হাহাকারে শাসকের উদাসীন্য ৩৫ লক্ষ বাঙ্গালীর মৃত্যু ডাকিয়া আনিয়াছে, তাহারই একটু প্রকাশ আকালের দেশ।[৩৬০]

এই পালাটিতে সামাজিক পালার দিক অঙ্কুরিত হয়। জমকালো সাজ আর কোনোরকম যুদ্ধ ছাড়াই এ পালা দর্শক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। এ পালায় তিনি চলমান রাজনৈতিক জীবনকে উপস্থাপন করেন। এই ধারাতেই নট্টকোম্পানি, নব রঞ্জন অপেরা ও তরুণ অপেরায় অভিনীত হয় যথাক্রমে *প্লাবন* (১৯৬২), *যাদের দেখে না কেউ* (১৯৬২), *মেঘে ঢাকা রবি* (১৯৬৬)। এ সময় বিষয়বস্তু, আঙ্গিক ও ঐতিহ্যকে স্বীকার করে বাংলা যাত্রা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চেহারা পাল্টাতে থাকে। পাশাপাশি পাশ্চাত্য নাট্য আঙ্গিক যুক্ত হয়ে মানুষের মনোজগতের রহস্য উন্মোচনে তথা আত্মবিশ্লেষণে যাত্রা দারুণ ভূমিকা রাখতে শুরু করে।

বাঙালি জীবনের আর এক কলঙ্কিত অধ্যায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। কলকাতা মহানগর ও নোয়াখালির জনপদ পেরিয়ে নারকীয় এই যজ্ঞ সম্প্রসারিত হলো বাংলার বাইরের বিভিন্ন শহরে ও নগরে। ধর্ষণ, ধর্মান্তরকরণ, হত্যা,

---

[৩৫৯] হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *তরী হতে তীর*, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৮৬, পৃ ৩৬১

[৩৬০] উদ্ধৃত.প্রভাত কুমার দাস, *যাত্রার সঙ্গে বেড়ে ওঠা*, কারিগর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানু-২০১৪, পৃ.৮৩

অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ইত্যাদি বর্বরোচিত ঘটনায় দেশবিভাগ-পূর্ব সময়ের সর্বাপেক্ষা কলঙ্কজনক অধ্যায় হয়ে ওঠে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। 'অহিংসা তত্ত্বের' প্রবক্তা গান্ধীর সংবেদনশীল হৃদয়কে বেদনা ভারাতুর করে এই মর্মন্তুদ দাঙ্গাকাহিনি। ১৯৪৫-৪৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ-এর দ্বন্দ্ব ব্রিটিশ রাজশক্তিকে কূটকৌশলী হতে সাহায্য করে। মুহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র (১৮৭৬-১৯৪৮) পাকিস্তান প্রস্তাব, বাংলা-পাঞ্জাব-আসামের বিভক্তি প্রশ্নে মতবিরোধ প্রভৃতি প্রসঙ্গে ভারত ভাগ অনিবার্য করে তোলে। বড়লাট মাউন্টব্যাটেন (১৯০০-১৯৭৯) 'দ্বিজাতি-তত্ত্বে'র প্রস্তাবনাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন। ফলে রাজা ষষ্ঠ জর্জের স্বাক্ষরদানের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই 'ভারতের স্বাধীনতা বিল' আইনি মর্যাদা পায়। 'পাকিস্তান ও ইন্ডিয়া'- এ দুই প্রজাতন্ত্রে বিভক্ত হয়ে দ্বিখণ্ডিত ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ভারতীয় জনগণ ১৯০ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পায়। ব্রজেন্দ্রকুমার দে তাঁর *শেষ নমাজ* বা *বাঙালি (১৯৪৬)* পালায় ভারত-বিভাগ কালীন উল্লিখিত মারণান্তিক হিন্দু-মুসলিম বিরোধ পরিহার করে মিলনের আহ্বান জানান। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সদা লড়াকু ব্রজেন্দ্র কুমার-দে আপন বিশ্বাসে সর্বদা অচল থাকেন। প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে রচিত তাঁর পালাগুলি হল : *ধরার দেবতা (১৯৪৮)*, *কোহিনূর (১৯৫০)*, *ধর্মের বলি (১৯৫১)*, *গাঁয়ের মেয়ে (১৯৫১)*, *সবার দেবতা (১৯৫৫)*, *রাজা দেবিদাস (১৯৫৯)*, *কবি চন্দ্রাবতী (১৯৬১)*, *রাখীভাই (১৯৬৪)*, *চাঁদবিবি (১৯৬৪)*। বাঙালির সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও স্বাজাত্যবোধ তাঁর এ সমস্ত রচনার মুখ্য বিষয়। *বাঙালি* পালার বিষয় ঐতিহাসিক হলেও পালাকারের কল্পনায় তা হয়ে ওঠে অন্য এক নির্মাণ। এ সম্পর্কে পালাকারের বক্তব্য : 'ইতিহাস পড়াতে পড়াতে হঠাৎ একটা লাইন চোখে লেগে গেল। লাইনটিতে একটি নাম ছিল – বাংলার নবাব দায়ুদ খাঁ। আর কিছু ছিল না। ব্যস, আমার বাঙালি পালার ছক শেষ।'[৩৬১] পালাটিতে নবাব দায়ুদ খাঁ সুশাসক। সত্যপীর নতুন এক ধর্মের দ্রষ্টা। সে ধর্ম হিন্দুরও নয় মুসলমানেরও নয় – সে ধর্ম মানুষের। তাই সত্যপীর হিন্দু-ইসলামের যূথ ধর্মাবলম্বী 'হিন্দুলাম', খোদা-ভগবানের একমত বিশ্বাসী 'খোদাবান' এবং পূজা-নামাজের একত্র ধর্মকাজ 'পূমাজ'। নাটকের মূল বক্তব্য দায়ুদ ও সত্যপীরের একান্ত সংলাপে স্পষ্ট :

সত্যপীর	কী করে বাঁচব? আমি হিন্দু না মুসলমান?
দায়ুদ	তুমি বাঙালি।
সত্যপীর	আমার ধর্মটা কী?
দায়ুদ	মানুষের ধর্ম।
সত্যপীর	মানুষের ধর্ম!

[৩৬১] দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলন ও সম্পাদনা), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা ৩*, দ্বিতীয় খণ্ড: প্রথম অংশ বিশ শতক, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ পৃ. ৩৩

দায়ুদ হ্যাঁ সত্যপীর । তুমি হিন্দু বা মুসলমান হতে যেয়ো না। তুমি হবে মানুষ। তোমার দেবতাকে তুমি আরাধনা করেই পেয়েছ।

সত্যপীর কে? কে সে দেবতা, যাকে চাওয়ার আগেই পাওয়া যায়?

দায়ুদ তোমার জন্মভূমি। ... এই সুজলা সুফলা বঙ্গজননী তোমার সে আরাধনার ধন। এর মধ্যে খোদাও আছেন, ভগবানও আছেন। তোমায় নামাজও পড়তে হবেনা, পুজোও করতে হবে না। তুমি বাংলা মায়ের সেবা কর।

গীতকণ্ঠে ফকিরের প্রবেশ

গীত

ফকির পাগল ছেলে আয়

ডুব দিয়ে যা বাংলা মায়ের রূপের দরিয়ায়।।

ফলে ফুলে গন্ধে ভরা,

রূপটি মায়ের পাগল করা,

স্বর্গটা তোর আকাশে নয়, ঘরের আঙিনায়।।

আমার খোদা তোর নারায়ণ,

এ মাটিতেই পাতল আসন,

একের মাঝেই দুজন আছে, যে যারে চায়,– পায়।[৩৬২]

রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে রচিত *বাঙালি* আর্য অপেরায় জনপ্রিয়তার সাথে অভিনীত হয়। ১৯৬৬ সালে জনপ্রিয়তার কারণে এই যাত্রাপালা গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রকাশ পায় (N 83188-N83193, HMV Records)।[৩৬৩] পুরাণের গতানুগতিক কাহিনি নিয়ে ব্রজেন্দ্রকুমার পালা রচনা করলেও সেসব পালাগুলি তাঁর লেখনি স্পর্শে নতুনত্ব লাভ করে। *মহীয়সী কৈকেয়ী*, *ভরত বিদায়*, *লীলাবসান*, *রাজলক্ষ্মী* (১৯৩৮) কিংবা *কৃষ্ণ-শকুনি* – এ সমস্ত পৌরাণিক পালার যথার্থ উদাহরণ। ঐতিহাসিক পালার ক্ষেত্রেও *দুর্গাদাস*, *সুলতানা রিজিয়া* অথবা *বারুদের মসনদের* নাম উল্লেখযোগ্য। পালাকার এ সমস্ত পালা নবমূল্যায়নের ক্ষেত্রে অনেক বেশি স্বাধীনতা নেন। ব্রজেন্দ্রকুমারই প্রথম শ্রোতার বোধগম্য ভাষা ও চরিত্রানুগ সংলাপ সৃষ্টি শুরু করেন। ফলে শ্রোতা-দর্শক আরো সহজেই পালার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে এবং পালা শেষ না হওয়া পর্যন্ত একমনে বসে থাকে। তাঁর বিখ্যাত

---

[৩৬২] ব্রজেন্দ্রকুমার দে, *বাঙালি*, দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলন ও সম্পাদনা), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা ৪*, দ্বিতীয় খণ্ড: দ্বিতীয় অংশ বিশ শতক, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ. ১৩০০-১৩০১

[৩৬৩] দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলন ও সম্পাদনা), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা* ৩, দ্বিতীয় খণ্ড: প্রথম অংশ বিশ শতক, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ. ৩৪

দেশাত্মবোধক পালা *বর্গী এলো দেশে* (১৯৬০) নবরঞ্জন অপেরায়, চীন-ভারত সমস্যা নিয়ে লেখা *রক্তের খেলা* (১৯৬৪) পালা তরুণ অপেরায় অভিনীত হয়ে প্রচুর যশ অর্জন করে। যাত্রার পরিবেশনায় গণচেতনা জাগ্রত করার অভিপ্রায় তাঁর মধ্যে সর্বদাই জাগরুক ছিল। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করেন তিনি *রাজনন্দিনী* পালায়। আবার নট্ট কোম্পানিতে অভিনীত *সমাজের বলি* (১৯৪৪) পালাটি কার্তিকপুরের দাঙ্গা থামাবার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি লিখেন। তাঁর চিন্তায়:

> সমাজের শাশ্বত বলি যারা, তাদের চিরকালের কান্না লইয়াই এই নাটক। অস্পৃশ্যতার বিষে জর্জরিত হিন্দুসমাজকে মুক্ত করিতে অসংখ্য মনীষীর যে অশ্রান্ত অভিযান চলিয়াছে, 'সমাজের বলি'-ও ক্ষুদ্র শক্তি তাহারই সঙ্গে মিলিত হউক।

পুরাণ ইতিহাসের কাহিনির বাইরে সত্যনারায়ণের পাঁচালি থেকে তিনি লিখেন *সবার দেবতা* (১৯৫৫)। *কালকেতু* আখ্যায়িকাকে *চণ্ডীমঙ্গল* (১৯৫৯) নামে নব রঞ্জন অপেরায় মঞ্চস্থ করেন। শুধু তাই নয় মি.টর্নবুল রচিত *গোল্ডেন ডিড্‌স অব ইন্ডিয়া* গ্রন্থ থেকে আখ্যান ভাগ অবলম্বন করে তিনি লিখলেন *মানিকমালা বা চাষার ছেলে* (১৯৩৮)। লোকের মুখে মুখে প্রচারিত কিংবদন্তি শুনে, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি *পাহাড়ের চোখে জল* (১৯৭৩) রচনা করেন। আবার রবীন্দ্রকাব্য থেকেও তিনি খুঁজে পেলেন পালা রচনার উৎস। *মস্তকবিক্রয়* সামনে রেখে তিনি রচনা করলেন *প্রতিশোধ* (১৯৪৮)। নট্টকোম্পানি ও চণ্ডী অপেরায় এই পালা অভিনীত হয়। 'ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ প্রতিশোধ'–এই উপদেশ পালার মধ্য দিয়ে প্রচার করতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। নট্ট কোম্পানির জন্য *পূজারিনী*র প্রেরণায় লিখলেন *শেষ আরতি* (১৯৫০)। এছাড়াও তরুণ অপেরায় *কথা ও কাহিনী* কাব্যগ্রন্থের 'কথা' অংশের 'বিবাহ' কবিতার অনুসরণে অভিনীত হয়েছে *শেষ অঞ্জলি* (১৯৬৬)। রবীন্দ্রনাথের 'সামান্য ক্ষতি' অবলম্বনে গড়ে তুললেন *সতী করুণাময়ী* (১৯৭২) পালা।

১৯০০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়পর্বে তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলা যাত্রাপালায় নিম্নোক্ত রূপান্তর ঘটে:

১. পেশাদার যাত্রায় পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পালাকে নতুন চিন্তায় বিন্যস্ত করলেন ব্রজেন্দ্রকুমার দে। বাংলা যাত্রায় তাঁর হাত ধরেই কাল্পনিক পালার সূচনা ঘটে। তিনি পুরাণের স্থলে সমকালকে রচনায় গুরুত্ব দিলেন।

২. অহিভূষণ-সৃষ্ট অশরীরী বিবেকের স্থলে ব্রজেন্দ্রকুমার মানবচরিত্রকে প্রাধান্য দেন।

৩. ১৯৩৭ সালে *রাজর্ষি* পালায় তিন ঘণ্টায় তিনি আসর জমান। অর্থাৎ পূর্বের ছয়-সাত ঘণ্টার যাত্রার পরিবেশনায় নতুনত্ব সৃষ্টি করেন।

৪. *চাঁদের মেয়ে* পালার মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত সংলাপের প্রবর্তন করেন।

৫. ১৯৪৫ সালে *দেবতার গ্রাস* পৌরাণিক পালায় সংলাপে অমিত্রাক্ষর ছন্দের বদলে সাধারণের কথ্যভাষা ব্যবহার করেন। তিনি ভাষাকে জণগণের বোধগম্য পর্যায়ে নিয়ে যান। এ ব্যাপারে তাঁর ভাষ্য:

> নাটকীয় ভাষাকে আরও প্রাঞ্জল করে নিরক্ষর নরনারী এমন কি শিশুরও বোধগম্য করে পরিবেশন করা হল। (ভোলানাথবাবু এ কাজটি বেশ খানিকদূর এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।) তার উপর সব চরিত্রগুলোর মুখে আর একই গুরুগম্ভীর ভাষা দেওয়া হলো না; ফলে নাটকের কৃত্রিমতা অনেকটা স্বাভাবিক পর্যায়ে নেমে এসে আগের তুলনায় বেশি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠলো। এ ব্যাপারে আমার প্রধান সহযোগী ছিলেন সৌরিনবাবু।[৩৬৪]

৬. ব্রজেন্দ্রকুমারের পূর্বে যাত্রাপালায় গড়ে চল্লিশটি গান পরিবেশিত হত। যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পালার সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং পালার গতিকে শ্লথ করে দেয়। প্রথম পর্যায়ে ব্রজেন্দ্রকুমারও তাঁর পালায় অনেক গান ব্যবহার করেন, কিন্তু তার সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে যায়। এছাড়া ব্রজেন্দ্রকুমার যাত্রায় 'সখীর গান' ও 'দ্বৈত সংগীতে'র বিলোপ ঘটান। এ বিষয়ে পালাকারের মন্তব্য:

> যাত্রাভিনয়কে বাহুল্যবর্জিত করার জন্যে সখীর গান, কোরাস ও দ্বৈতসঙ্গীতগুলোকে একেবারেই বিদেয় করা হল। এতে অধিকারীর খরচও যেমন কমলো, নাটকের দৈর্ঘ্যও তেমনি হ্রাস পেল; অথচ নাটকীয় বিষয়বস্তুও তাতে কোন অঙ্গহানি হল না। বক্তৃতাগুলোকে খানিকটা সংক্ষিপ্ত করে, যুদ্ধের বিরক্তিকর অধ্যায় একটিমাত্র দৃশ্যে সীমাবদ্ধ করে এবং গানের সংখ্যা কমিয়ে দেখা গেল, অভিনয়ের রস বেড়েই যায়, কমে না।[৩৬৫]

বলা যায়, ব্রজেন্দ্রকুমার দের একক প্রচেষ্টায় বাংলা যাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে।

বিশ শতকের স্মৃতিকথা ও সাহিত্যে যাত্রার বিবর্তন চিত্র

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও যাত্রার সমাদর কী রকম ছিল অহীন্দ্র চৌধুরীর *নিজেরে হারায়ে খুঁজি* গ্রন্থে তার একটা আভাস পাওয়া যায়। সেকালের যাত্রা কী রকম ছিল, পুরনো কালের যাত্রার বর্তমান সময়ের পরিবর্তনও তাঁর স্মৃতিচারণে উঠে এসেছে। তিনি লিখেছেন :

> পুজোর প্রধান প্রমোদ ছিল তখন যাত্রার পালাগান। থিয়েটারও যে হতো না তা নয়। পাবলিক থিয়েটার হতো কলকাতায়। বড়োরা দেখতে যেতেন মাঝে-মাঝে। কিন্তু পুজোর সময় পুজোবাড়ির প্রাঙ্গণে কখনও-সখনও থিয়েটার হলেও যাত্রারই সমাদার ছিল সর্বাধিক।
>
> ... তখনকার পুজোর সময় এই যাত্রার ধুম ছিল খুব। বাড়ির কর্তারা পুজোর উৎসবে থিয়েটারের আয়োজনের থেকে যাত্রার আসর গড়ে তোলবার দিকেই মনোযোগ দিতেন বেশী। বাঙালীর সাধারণ জীবনে প্রমোদ হিসাবে এই যাত্রার স্থান যে তখন কোথায় ছিল, তা আজকের দিনে ঠিক বোঝা যাবে না।

---

[৩৬৪] ব্রজেন্দ্রকুমার দে, বাংলায় যাত্রানাটক রচনার বিবর্তন, অরূপ দাস (সম্পাদিত), *পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে বিশেষ সংখ্যা*, ২০০৮, তাঁতঘর, একুশ শতক, কলকাতা, পৃ.১৮৮

[365] ব্রজেন্দ্রকুমার দে, বাংলায় যাত্রানাটক রচনার বিবর্তন, অরূপ দাস (সম্পাদিত), *পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে বিশেষ সংখ্যা*, ২০০৮, তাঁতঘর, একুশ শতক, কলকাতা, পৃ.১৮৮

> ...যাত্রার দর্শকবৃন্দের মাঝখানে হয় আসর, তার চারপাশে শতরঞ্জি বিছানো থাকত ঢালাও করে –– দরজা থাকত খোলা, সবারই জন্য অবারিত দ্বার। যার খুশী এসো। স্থান থাকে বসো, শুনে যাও যাত্রার পালা গান। টিকিটের কোনো প্রয়োজন নেই।[৩৬৬]

শৈশবে দেখা দু-রকম যাত্রার কথা বলেছেন অহীন্দ্র, পেশাদার যাত্রা শুরু হত রাত নটা-দশটা থেকে, ভোর পর্যন্ত চলত। আবার পালা বড়ো হলে কখনো-কখনো সকালেও তার জের চলত। শখের দলেরা ভোর থেকে শুরু করে একেবারে বেলা একটা-দুটো এমনকি তিনটে পর্যন্ত চলত। দর্শকরা অবশ্য সমান আগ্রহ নিয়ে এই যাত্রা দেখেছেন, কোনো শোরগোল হতো না, অভিনয়ের পক্ষে কোনো বাধাও ঘটত না। তখনকার দিনে যাঁরা যাত্রাদলকে বায়না করাতেন, সেই একক গৃহস্বামী অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে এই আয়োজন করতেন : 'আমার বাড়িতে যে উৎসব, তাতে পাড়াপড়শি, অতিথি অভ্যাগত – সবারই অংশ থাক, সবাই মিলে আনন্দ করুক এসে আমার আঙিনায় – এই রকম একটা উদার মনোভাব প্রকাশ পেতো তাদের আচরণে।' যাত্রার আসর সজ্জার মধ্যেও সেই নিবিড় আন্তরিকতার স্পর্শ থাকত, অহীন্দ্র চৌধুরী দেখেছেন :

> চারপাশে মান্যগণ্য ব্যক্তিরা বসেছেন আসরটাকে ঘিরে গোলাকারে। চাকর-বাকর আর বেয়ারারা বাঁধানো হুঁকো আর গড়গড়ায় তামাক দিয়ে যাচ্ছে, মাঝে-মাঝে বদল করে দিচ্ছে তামাক, কখনো বা থালায় করে নিয়ে যাচ্ছে তবক-দেওয়া পান। যাত্রাও চলেছে, বেয়ারা-চাকরদেরও আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। কিন্তু, তাতেও কোন সোরগোল নেই, অভিনয়ের কোনো ব্যাঘাতও নেই। বাড়ির বৃদ্ধকর্তা ঠিক আসরে এসে বসতেন না, হয়তো বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে দু-তিন ঘণ্টা পালা শুনতেন, তারপর চলে যেতেন ভিতরে। ঐ দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে পালা শোনাও বটে, অভ্যাগত দর্শকদের বসবার কোনো ত্রুটি হচ্ছে কি-না, কিংবা আরও যে সব দর্শক বাইরে ভিড় করছে, তাদের কোনো প্রকারে ভিতরে এনে কোথাও বসানো যায় কি না, – এসব তদারকি করতে ভুলতেন না কখনো।[৩৬৭]

বোঝা যাচ্ছে যাত্রা আর যাত্রার আসরের প্রতি শৈশবেই আকৃষ্ট ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। পরিণত বয়সে লেখা এই স্মৃতি চারণায় তিনি অল্প বয়সের দেখা যাত্রার ছবিটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

কলকাতার নগরের পরিবেশেও কোনো কোনো এলাকায় কীভাবে সে সময় যাত্রাগানের চাহিদা ছিল, সে বিষয়ে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর *তরী হতে তীর* গ্রন্থে, বালক বয়সে দেখা যাত্রাগানের কথা বলেছেন :

> আমাদের পাড়ায় চালের অনেক আড়তদার থাকায় তাদের বারোয়ারী উৎসব বেশ জাঁকজমক নিয়ে হত প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার মাস খানেক আগে। এজন্য আমরা উৎসুক হয়ে থাকতাম কারণ আমাদের প্রতিবেশী ধনীগৃহে পুজোর দালানের সামনে প্রকাণ্ড উঠোনের উপর ম্যারাপ বেঁধে যাত্রার আসর বসত। আমরা বাড়ির দোতলা-বারান্দায় বসে যাত্রা শুনতে এবং দেখতে পেতাম, এবং যদিও সারা রাত জেগে পালা শেষ পর্যন্ত থাকার অনুমতি কখনো পাইনি, বেশ খানিকটা উপভোগ যে

[৩৬৬] অহীন্দ্র চৌধুরী, *নিজেরে হারায়ে খুঁজি* (প্রথম পর্ব), সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, প্র.প্র ২০১১,পৃ.১৯-২০
[৩৬৭] অহীন্দ্র চৌধুরী, *নিজেরে হারায়ে খুঁজি* (প্রথম পর্ব), সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, প্র.প্র ২০১১,পৃ.২০-২১

> আমাদের মিলত তাতে সন্দেহ নেই। মনে পড়ে যখন 'জগঝম্প' বেজে উঠবে যাত্রা আরম্ভের সঙ্কেত হিসাবে, সেদিকে কান পেতে থাকতাম এবং একটু ইঙ্গিত পেলেই ছুটে পৌঁছানো যেত।[৩৬৮]

হীরেন্দ্রনাথ, তাঁর দিদির শ্বশুর পরিবারের নিজগৃহ নাটাগড়ের দুর্গাপূজায় দেখা যাত্রার প্রসঙ্গে বলেছেন, তখনকার দিনে রেওয়াজ ছিল যাত্রাদলের বাছাই করা গাইয়েরা জমিদার বাড়িতে পরের দিন সকালে আমন্ত্রিত হতেন, হারমোনিয়াম আর ডিগি তবলা সহযোগে গান করতেন। উপস্থিত সমঝদারেরা সে গান শুনে অঙ্গ সঞ্চালন করতেন, বাহবা দিতেন।[৩৬৯]

বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যেও যাত্রা-কথার বিবর্তন ঠাঁই পেয়েছে। 'ষষ্ঠী টু জষ্ঠি' কালসীমায় মূলত বিশ শতকের যাত্রার পরিবেশনা সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ খোলা মঞ্চের অভিনয়- ঘেরা যাত্রার মরসুমের শুরু দুর্গা-ষষ্ঠীতে আর শেষ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে। যাত্রা সদাগরের বাণিজ্য-তরণী এ সময়েই বয়ে চলে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৯-১৯৭১) *মঞ্জুরী অপেরায়* তারই চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

> পূজোর সময় থেকে মফস্বলে বের হয়ে এখান ওখান, শহর, গ্রাম ফিরে গাওনা করে একবার ফেরে অগ্রহায়ণের শেষ। পৌষ মাসটা বিশ্রাম, তারপর মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা থেকে একনাগাড়ে কলকাতা থেকে সারা বাংলাদেশ পুবদিকে আসাম সে গৌহাটি থেকে ডিগবয় ওদিকে শ্রীহট্ট, শিলচর আবার বেহারে কাটিহার পূর্নিয়া কিষাণগঞ্জ পর্যন্ত। উত্তরে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, শিলিগুড়ির চা বাগান। বেহারে আর একটা এলাকা যাত্রা দলের মস্ত আয়ের এলাকা, তবে সেটাকে বাংলাদেশের বাইরে বলে মনে হয় না কারুর, সেটা হল বরাকর নদী পার হয়ে কয়লাকুঠির এলাকা। ওখানে যত টাকা তত খাতির ভাল দলের। গাওনা করেও সুখ।[৩৭০]

চিৎপুরের পেশাদার যাত্রাদলের বাণিজ্যক-ভ্রমণ, যাত্রা পরিবেশনার নিয়মকানুন ও বিধিনিষেধ এবং প্রবাদ-প্রবচন সবই এ উপন্যাসটিতে আলোচিত হয়েছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *পথের পাঁচালি* (১৯২৯)তে নীলমনি হাজরার দলের তিনরাত্রি যাত্রা-গাওনার জন-প্রভাবের বর্ণনা দিয়েছেন: 'গ্রামসুদ্ধ লোকের মুখে যাত্রা ছাড়া আর কথা নাই। পথে ঘাটে মাঠে গাঁয়ের মাঝি নৌকা বাহিতে বাহিতে, রাখাল গরু চরাইতে চরাইতে যাত্রার পালার নতুন শেখা গান গায়।'[৩৭১] যাত্রার সজ্জা কিশোর অপুর মনে প্রভাব ফেলে। অপুর ভবিষ্যত কল্পনায় ঠাঁই নেয়: 'জরির মুকুট মাথায় সে সেনাপতি সাজিয়া তলোয়ার ঝুলাইবে, যুদ্ধ করিবে। বড় হইলে সে যাত্রার দলে যাইবেই, ইহাই তাহার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য।'[৩৭২]

---

[৩৬৮] উদ্ধৃত.প্রভাতকুমার দাস, *যাত্রার সঙ্গে বেড়ে ওঠা*, কারিগর, কলকাতা, প্র.প্র.২০১৪, পৃ. ২০৭

[৩৬৯] প্রভাতকুমার দাস, যাত্রার সঙ্গে বেড়ে ওঠা, কারিগর, কলকাতা, প্র.প্র.২০১৪, পৃ. ২০৭

[৩৭০] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *মঞ্জুরী অপেরা* ১ম খণ্ড, *তারাশঙ্কর রচনাবলী* ১৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ-১৪১৮,পৃ.২৩১

[৩৭১] বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পথের পাঁচালী*, (২৩ পরিচ্ছেদ),

[৩৭২] বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পথের পাঁচালী*,

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) উপন্যাস *পুতুলনাচের ইতিকথায়* (১৯৩৬)ও যাত্রার অন্দরমহল প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে :

> এবার কার্তিক মাসে পূজা। সেনদিদির সর্বাঙ্গে ব্রণগুলি পাকিয়া উঠিতে উঠিতে গ্রামে পূজার উৎসব শুরু হইয়া গেল। উৎসব সহজ নয়, গ্রামের জমিদার শীতলবাবুর তিনদিন যাত্রা, পুতুলনাচ, বাজি পোড়ানো, সাতগাঁর মেলা– পূজা তো আছেই। গ্রামবাসীর ঝিমানো জীবন-প্রবাহে হঠাৎ প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে, কেবল শশী এবার সেনদিদিকে লইয়া বড় ব্যস্ত। যাত্রা আরম্ভ হয় সপ্তমীর রাত্রে। যাত্রার দল তার আগেই গ্রামে হাজির হইয়া যায়। বায়না দিবার সময় শীতলবাবু অধিকারীকে বলিয়া দেন, দল নিয়ে দু-একদিন আগেই আসবে বাপু, এক রাত্রি বেশ করে ঘুমিয়ে রাস্তার কষ্ট দূর করে অভিনয় করবে।
>
> এবার যে দলকে বায়না দেওয়া হইয়াছিল সে দল এ অঞ্চলের নয়। বিনোদিনী অপেরা-পার্টির আদি আস্তানা খাস কলিকাতায়। বাজিতপুরের মথুরা সাহার ব্যবসা উপলক্ষে কলিকাতা যাওয়া-আসা আছে। কিছুদিন আগে ছেলের বিবাহে এই দলটি সে কলিকাতা হইতে ভাড়া করিয়া আনিয়াছিল। লোকমুখে দলের প্রশংসা শুনিয়া শীতলবাবু সেই সময় বায়না দিয়া রাখিয়াছিলেন।
>
> কাল বিকালে বিনোদিনী অপেরা পার্টি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মস্ত দল, সঙ্গে অনেকগুলি বড় বড় কাঠের বাক্স। দেখিয়া গ্রামের লোক খুশী হইয়াছে। দলের অধিকারী বি-এ ফেল; তবে দলে তাহার দু'জন বি-এ পাশ অভিনেতা আছে শোনা অবধি সকলে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে।[৩৭৩]

বিশ শতকের তিরিশের দশকের প্রায় মধ্যবর্তী সময়ে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। সেসময় কলকাতার যাত্রা নতুন করে থিয়েটারের দ্বারা প্রভাবিত হলেও, আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতিতে যাত্রাই তখনও লোকপ্রিয় মাধ্যম হিসেবে প্রভাব বিস্তার করে।

৩.৬ পর্যালোচনা

বিশ শতকের প্রথম অর্ধে ভারতবর্ষ তথা বাংলার জীবনে রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে বহু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বঙ্গভঙ্গ থেকে বঙ্গভঙ্গরদ্, স্বদেশি আন্দোলন, অসহযোগ, খেলাফত, ভারতছাড়ো আন্দোলন তথা ভারতের স্বাধীনতা অর্জন এই পর্বের ঘটনা। এই পর্বের যাত্রাপালার বিকাশে পূর্বদৃষ্টান্তহীন রূপান্তর ঘটে। সামগ্রিক পর্যালোচনায় বলা যায়, বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা যাত্রা নানান পরিবর্তনকে ধারণ করে অগ্রসর হয়। এই পরিবর্তন প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন কালীশ মুখোপাধ্যায়। পবিত্র সরকার তাঁর গ্রন্থে প্রায় একই পরিবর্তনের কথা আলোচনা করেছেন।[৩৭৪] এই সময়পর্বে যাত্রার বিকাশে যেসব বৈশিষ্ট্যের উদগম হয়েছিল তা এভাবে উপস্থাপন করা যায়:

---

[৩৭৩] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *পুতুলনাচের ইতিকথা*, *মানিক গ্রন্থাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্র. প্র. ১৯৭০, পৃ. ৩৬-৩৭

[৩৭৪] পবিত্র সরকার, *নাটমঞ্চ নাটরূপ*, যাত্রা প্রিয় পরম্পরা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্র.প্র.২০০৮, পৃ.৩৯২

১. বিষয়বস্তুগত জায়গায় বিংশ শতাব্দী বা তার আগে থেকেই যাত্রায় ধর্মনিরপেক্ষ কাহিনিকে গ্রহণ করবার প্রবণতা লক্ষণীয়। তবে এ শতকে মুকুন্দদাসের হাতে স্বদেশি যাত্রার আরম্ভ এক অভিনব ব্যাপার। মুকুন্দদাসের স্বদেশি প্রচারের মধ্যে যাত্রা বিংশ শতকে এসে নতুন চরিত্র খুঁজে পায়। পাশাপাশি ব্রজেন্দ্রকুমার দের ঐতিহাসিক, কাল্পনিক, সামাজিক পালা রচনার ফলে বাংলা যাত্রা নতুন বিষয়ের সন্ধান পায়।

২. ঐতিহাসিক পালার সূত্র ধরেই বিশ শতকের যাত্রায় মুসলিম ঐতিহ্য সফলভাবে প্রতিফলিত হয়। হরিপদ চট্টোপধ্যায়ের (১৮৭২-১৯২৭) *পদ্মিনী* (১৯০৫) পালা এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। দিল্লির বাদশা আলাউদ্দিন শাহের চিতোর আক্রমণের কাহিনিকে নিয়ে এ যাত্রাপালা গড়ে উঠেছে। ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর (১৮৯১-১৯৩৩) *পঞ্চনদ* (১৯১৯) পালায় গজনীর সুলতান মামুদের (৯৯৭-১০৩০) ভারত আক্রমণের কাহিনি বর্ণিত হয়। মহম্মদ গিয়াসউদ্দিনের পুত্র মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বে (১৩২৫-১৩৫১) দক্ষিণাত্যের বিজয়নগর (১৩৩৬) ও বাহমনিরাজ্য (১৩৪৭) প্রতিষ্ঠার কাহিনি নিয়ে *দক্ষিনাত্য* পালাটি লিখিত। ব্রজেন্দ্রকুমার *দে বাঙালী* পালায় নবাব দায়ুদ খাঁর কাহিনি, *দেশের ডাক* (১৯৬৫) পালায় গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের মিথিলা আক্রমণের কাহিনি, *সম্রাট জাহান্দার* (১৯৬৯) পালায় বাহাদুর শাহের পুত্র জাহান্দার শাহের এগারো মাসের রাজ্যশাসন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের হাতে খুন ও রাজ্যচ্যুত হবার কাহিনি সার্থকভাবে রূপায়িত হয়। অর্থাৎ মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য এসময়-পর্বে নানা ভাবে পালারূপ পায়।

বিষয়ের পাশাপাশি আঙ্গিকগত বৈচিত্র্যও বাংলা যাত্রাকে সমৃদ্ধ করেছে। কৃষিজীবী সমাজের অবসরের প্যাটার্ন থেকে সরে এসে, আগেকার বারো ঘণ্টা যাত্রাকে এখন দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পরিবর্তে নাগরিক দর্শকের বিনোদন যোগাতে এই অভিযোজন ঘটে। কেননা শহর, আধা-শহরাঞ্চলের মানুষের সময় বাঁধা। পাশাপাশি পশ্চিমি নাটকীয়তার ধরণ ক্রমশ আত্মীকরণের ফলেও এই সময় সংক্ষেপ যাত্রায় কার্যকর হতে থাকে। যাত্রার এই সময় সংক্ষেপ তার প্রকরণের পুনর্বিন্যাস সূচক।[৩৭৫] যাত্রায় আগে শুধু দৃশ্য বিভাজন ছিল। অতঃপর অঙ্ক বিভাগ করে ব্রুনেতিয়ের ত্রিভুজের মতো সংগঠনের আদি-মধ্য-অন্ত অর্থাৎ ক্লাইম্যাক্সধর্মী গল্পের দিকে যাত্রা এগিয়ে চলে।

[৩৭৫] পবিত্র সরকার, *নাটমঞ্চ নাটরূপ*, যাত্রা প্রিয় পরম্পরা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্র.প্র.২০০৮, পৃ. ৩৮৮

৩. আবার বাংলা নাটক থেকে প্রকরণ ধার করে যাত্রা হয়ে ওঠে থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা। ১৯১৩-১৮ এর মধ্যেই যাত্রায় থিয়েটারের প্রভাব সবচেয়ে বেশি চলে আসে।[৩৭৬]

৪. বিশ শতকের যাত্রায় গানের সংখ্যা কমে গিয়ে সংলাপের অংশ বৃদ্ধি পায়। গান কমে যাওয়া মানেই জুড়ির বিলোপ হওয়া। মতিলাল রায়ের যাত্রাতেও আটটি-দশটি করে জুড়ি চারটি দলে ভাগ হয়ে চারিদিকে দর্শকদের দিকে মুখ করে নানারকম রাগরাগিনীতে গান গাইত। জুড়িদের সঙ্গে অধিকারীরা কখনো কখনো বেহালা বাজাতেন। যেমন: শশিভূষণ অধিকারী অজস্র মেডেল ঝোলানো জামা গায়ে দিয়ে বেহালা বাজাতেন। তবে মতিলাল রায়ের মধ্যমপুত্র ভূপেন্দ্রনারায়ণ রায় (১৮৪৮-?) যখন মতিলালের দল চালাতেন তখন (১৯২৫) নাকি একবার দর্শকরা জুড়িদের গানে আপত্তি জানায়, তাদের মধ্য থেকে উঠে অনেকে জুড়িদের হাত ধরে টেনে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করে।[৩৭৭] ভূপেন্দ্র নারায়ণ রায় তখন থেকে জুড়ি ও ছেলের দল একেবারে কমিয়ে দিলেন। তবে জুড়ি গায়কদের অবলুপ্তির পরই বিবেক চরিত্র প্রধান হয়ে ওঠে।

৫. ১৮৯৪ সালে যাত্রার আসরে প্রথম আগমন ঘটে বিবেকের। *সুরথ উদ্ধার* পালায় 'আপন বুঝে চল এই বেলা/ ঐ বাস্তশকুন উড়ছে মাথায় গো বসে যুক্তি দিচ্ছেন হাড়গোলা।'– এই গানটি দিবোদাস নামে অশরীরী বিবেকের কণ্ঠে শোনা যায়। অশরীরী হওয়ায় রাজসভা থেকে অন্দরমহল সর্বত্রই তার গতি ছিল ব্যাপ্ত। পালাকার অহিভূষণ ভট্টাচার্য তার *সুরথ উদ্ধার* পালায় এ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রের অবতারণা করেন। শতবর্ষের যাত্রাপালার নানামাত্রিক বিবর্তনের মধ্যে বিবেকের রূপায়ণেও এসেছে নানাবিধ পরিবর্তন। বিশ শতকের প্রথমার্ধে চারণকবি মুকুন্দদাস স্বদেশি যাত্রায় গান ও বক্তৃতার মাধ্যমে বিবেককে নতুনরূপে উপস্থাপন করেন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মুকুন্দদাসের বলিষ্ঠ উচ্চারণ : 'ভয় কি মরনে / রাখিতে সন্তানে/মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে।' বিশ শতকের ত্রিশের দশকে অশরীরী বিবেক শরীরী রূপ পায়। বিবেক রূপান্তরিত হয় দাড়ি, মাঝি, ভিক্ষুক, চাষী, মজুর, বাউল ইত্যাদি চরিত্রে। ব্রজেন্দ্র কুমার দের হাতে বিবেকের এই বিবর্তনের সূচনা। ১৯৩৭ সালে *বঙ্গবীর* যাত্রাপালায় ব্রজেন্দ্রকুমার দে-ই প্রথম বিবেককে নাটকীয় কৌশলে পালাকাহিনির একটি অন্যতম চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেন। *বঙ্গবীর*

---

[৩৭৬] শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পালাগানের পালাবদল*, স্মারক পুস্তিকা, পৃ. ৩২, উদ্ধৃত. পবিত্র সরকার, *নাটমঞ্চ নাটরূপ*, যাত্রা প্রিয় পরম্পরা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্র.প্র.২০০৮, পৃ.৩৮৭

[৩৭৭] অরুণকুমার নন্দী, 'যাত্রার রূপান্তর' স্মারক পুস্তিকা, পৃ. ৩৬ উদ্ধৃত. পবিত্র সরকার, *নাটমঞ্চ নাটরূপ*, যাত্রা প্রিয় পরম্পরা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্র.প্র.২০০৮, পৃ.৩৮৮

পালায় সুধাকণ্ঠ বৈতালিকে এর সূচনা। পরে চল্লিশের দশকের *সমাজের বলির* পরাশর, ধনাই মাঝি, *বাঙালীর* ফকির এবং *মায়ের ডাক*-এর আকালে এই বিবেক চরিত্রের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

৬. বিশ শতকে যাত্রা তার প্রথাগত পদ্ধতি কৌশল থেকে অনেকটাই সরে আসে। এসময় থেকে যাত্রায় অভিনেতার মঞ্চের চারদিকে ঘুরে অভিনয় করার দরকার হয় না, অভিনয় হয় অনেকটাই মুখোমুখি। যেহেতু দর্শক এখন একদিকেই বসে থাকে, সেহেতু অভিনেতার গতিবিধিও সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ধীরে ধীরে আলোক নিয়ন্ত্রণে নানা আধুনিকতার সমাবেশ ঘটে। ছোট মঞ্চে কম দর্শকের সামনে অভিনয়ের ফলে মুখের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অভিব্যক্তিগুলো প্রকাশ পেতে থাকে। মাইক্রোফোন ব্যবহারের ফলে প্রলম্বিত সংলাপ প্রক্ষেপণের প্রয়োজন হ্রাস পায়। মুখাভিব্যক্তি ও কণ্ঠস্বরের ব্যাপ্তি কমে যাওয়ার দরুণ যাত্রার অভিনয়ে আন্ডার-অ্যাকটিং এর সূচনাও দেখা দেয়। কণ্ঠস্বরের প্রলম্বন ও দৈহিক নানান অভিব্যক্তির ফলে যাত্রায় যে বীররসের সঞ্চার হত, তা ক্রমশ অর্ন্তহিত হতে থাকে।

৭. এই মূল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী চরিত্রে অভিনেতার স্থলে অভিনেত্রীর নিয়োগ, যন্ত্র ও কণ্ঠ সংগীতের নবরীতি যাত্রাকে আধুনিক মাত্রায় উন্নীত করে। অবশ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই যাত্রায় মেয়েদের অশোভন নাচ প্রদর্শিত হয়।

৮. মাইক্রোফোনের ব্যবহারের ফলে যাত্রার অভিনয়ে অচিন্তিত পরিবর্তন ঘটে – বিশেষ করে মেয়েদের এ শিল্পে আগমনের পথ প্রশস্ত করে। বাঁশি বা হারমোনিয়াম ইত্যাদি দু-একটা বিদেশি বাদ্যযন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটলেও লৌকিক বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যেই মূলত যাত্রা পরিবেশিত হয়।

৯. এককালে প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা শ্রীদাম-সুবলের সঙ্গে আত্মীয়তা খুব সম্মানের হিসেবে গণ্য ছিল। কৃষ্ণকমল গোস্বামী, মতিলাল রায়, মুকুন্দ দাসও প্রচুর সম্মান ও সমাদর পান। কিন্তু সময়ের প্রবহমানতায় এই সম্মান ক্রমশ নিম্নগামী হয়।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাবে যাত্রা বিশ শতকে বাস্তবের মাটিতে পদার্পণ করে। এ সময়ে পৌরাণিক, ধর্মীয় বিষয়বস্তুর স্থান নেয় জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ পালাসমূহ। সমগ্র ভারতজুড়ে যে স্বাজাত্যবোধ, স্বাদেশিকতা, উপনিবেশ বিরোধিতার আহ্বান – যাত্রাও ঐ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসে। কোনো রাজনৈতিক সভা, সমাবেশ, পদযাত্রার চেয়ে যাত্রার দর্শকের নিকট বাণী পৌঁছানোর ক্ষমতা কম নয়। তাই সহজেই দেশ মাতৃকার মুক্তির বাণী যাত্রার আসর থেকে আসরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। অতীত চারণার পরিবর্তে যাত্রা সমকালীন কর্তব্যে নিজেকে জড়িত করে। প্রথমত স্বদেশি যাত্রা নামে, দ্বিতীয়ত পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির বাসনায় ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পালা শিরোনামে, তৃতীয়ত সমাজের সমস্যা চিহ্নিত সামাজিক পালা অভিধায়। এই

পর্বে রচিত, পরিবেশিত সমস্ত পালার পর্যবেক্ষণে এই সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এককথায় জাতীয়তাবাদী প্রয়োজন সাধনে যাত্রার এই রূপান্তর বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। দেশবিভাগ পরবর্তী পর্যায়ে নানান পরিবর্তনকে অঙ্গীকার ও স্বীকরণ করে বিকশিত হতে থাকে বাংলা যাত্রা।

চতুর্থ অধ্যায়
দেশবিভাগ : যাত্রায় পূর্ব-বাংলার পথচলা (১৯৪৭-১৯৭০)

৪.১ ভূমিকা

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ থেকে রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তান নামক একটি নতুন দেশের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ হিসেবে বাংলাদেশ তার অস্তিত্বকে প্রথম প্রকাশ করে। এদেশের বিপুল জনগোষ্ঠী পাকিস্তানকে তখন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই কল্পনা করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই স্বপ্ন-কল্পনা অল্পদিনের মধ্যেই হতাশার গ্লানিতে আচ্ছন্ন হয়। ফলে মাত্র তেইশ বছরের মাথায় রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নতুন একটি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়। ১৯৪৭-৭০ সময়-পর্বে পূর্ব-বাংলা পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ ছিল। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণীত হলে তাতে পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলীয় চারটি প্রদেশকে (পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান) বিলুপ্ত করে 'পশ্চিম পাকিস্তান' নামে এক-ইউনিট গঠন এবং পূর্বাঞ্চলীয় খণ্ডকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'পূর্ব-পাকিস্তান' নামকরণ করা হয়। এর পূর্বে বিভাগপূর্ব কাল থেকেই এটি পূর্ব-বাংলা বা পূর্ব-বঙ্গ (ইংরেজিতে East Bengal) নামে পরিচিত হয়।[৩৭৮] নতুন রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে এই বিকাশ-উন্মুখ জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, নৈরাশ্য ও ক্ষোভই বর্তমান কালপর্বের যাত্রার কলেবরে সন্ধান করা হয়েছে। বিশেষত ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ঘটনার অভিঘাত, আঞ্চলিক বৈষম্য-বঞ্চনা, অর্থনৈতিক শোষণ ও সাংস্কৃতিক নিপীড়নকে পূর্ব-বঙ্গের পালাকারদের চিন্তা-চেতনা ও উপলব্ধিতে সন্ধান করা হয়েছে। নিজস্ব পালাকারেরর অনুপস্থিতির দরুণ এই পর্বের যাত্রায় বিভাগ-পূর্ব যাত্রার প্রবহমানতা অক্ষুণ্ন রাখা ছাড়া স্বতন্ত্র কোনো চারিত্র্য গড়ে ওঠেনি।

৪.২ পূর্ব বাংলার যাত্রা : উত্তরাধিকার

দেশবিভাগের পর দাঙ্গা ও অন্যান্য কারণে যে বিপুলসংখ্যক হিন্দু দেশত্যাগ করে চলে যান তাদের মধ্যে যাত্রাশিল্পীর সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। দেশান্তরী হয়েছিল মূলত নগরবাসী পেশাজীবী ও বণিক সম্প্রদায়। গ্রামীণ যাত্রা-শিল্পীরা এর বাইরে অবস্থান করে। ফলে পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে যাত্রাভিনয়ের যে ধারা গড়ে উঠেছিল তা দেশবিভাগের কারণে কোনো বড় রকমের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়নি। একমাত্র বরিশালের নট্টকোম্পানী যাত্রা পার্টি ছাড়া কোন যাত্রাদল শিল্পীর অভাবে ভেঙেও যায়নি। তবে দেশবিভাগের কারণে দেশত্যাগীদের মধ্যে ছিলেন পূর্ববঙ্গের অগ্রণী পালাকার যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে গিয়েও বিশেষ সিদ্ধি অর্জন করেন। এদের মধ্যে ছিলেন শরীয়তপুরের ব্রজেন্দ্র কুমার দে, সাতক্ষীরার সত্যপ্রকাশ দত্ত, জামালপুরের জীতেন বসাক প্রমুখ।

---

[৩৭৮] মোরশেদ শফিউল হাসান, *পূর্ব বাংলায় চিন্তাচর্চা (১৯৪৭-১৯৭০) দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, আগস্ট ২০১২, পৃ. ২৯

কলকাতাকেন্দ্রিক পূর্বাপর যাত্রা আন্দোলনের জোয়ার তৎকালীন পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের সংস্কৃতিতে এসে লাগে। ভারত ভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির পরে, যাত্রাকে প্রতিকূল সময়ের মধ্যে পড়তে হয়। গ্রামীণ লোকনাট্য ভিত্তিক পরিবেশনার আগেকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হিন্দু জমিদারেরা এবং যাত্রা দলগুলোর মালিকও ছিলেন হিন্দু; একই সঙ্গে অধিকাংশ যাত্রাশিল্পীই ছিল হিন্দু; পূর্ব-বাংলায় তখনকার সময়ে কোনো নারী শিল্পীও ছিল না। ভারত-ভাগের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই ভারতে চলে যাওয়ায় যাত্রায় এক শূন্যতা সৃষ্টি হয়। মাসুদা এম রশিদ চৌধুরীর ভাষ্য মতে, 'With the partition of India, the majority of Jatra owners opted for India and a severe vaccum resulted, creating decay of Jatra.'[379] তবে অচিরেই তা কেটে যায়।

পূর্ব বাংলার যাত্রাপালার নির্বাচন, মঞ্চায়ন, অভিনয়ের ক্ষেত্রে ৪৭-পরবর্তী কলকাতাকেন্দ্রিক যাত্রাপালা, পালাকার ও প্রবণতাসমূহ ক্রিয়াশীল ছিল। এই সময়ে নবগঠিত পূর্ব-পাকিস্তান রাজনৈতিকভাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হলেও পশ্চিমবঙ্গের যাত্রার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। সেখানে সমসময়ে যাত্রার ক্ষেত্রে প্রবলভাবে বিরাজ করেছেন ও বিভিন্ন নিরীক্ষা করেছেন – উৎপল দত্ত, শম্ভুনাথ বাগ, ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এসময় পশ্চিমবঙ্গে চিৎপুরকেন্দ্রিক যাত্রাদলগুলো ''ইন্ডাস্ট্রি"তুল্য যাত্রাশিল্পের চর্চা গড়ে তোলে। এসবই পূর্ব-বাংলার যাত্রার চর্চায় অনুসৃত হয়।

দেশভাগের আকস্মিকতা এই দেশের যাত্রাকে আলাদা করে পথ চলার জন্য প্রস্তুত করেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতীয় গণনাট্য সংঘের চেতনা পূর্ব-বাংলার যাত্রাপালাকেও প্রভাবিত করে। এসময় মেহনতি মানুষের জীবন কথা, তাদের দুঃখ দৈন্যের যন্ত্রণা নিয়ে রচিত হয় একের পর এক গণজাগরণমূলক পালা। যেমন – *আকালের দেশ*, *যুগের দাবি*, *সত্যের জয়*। নতুন পরিবেশে ভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্রজেন্দ্রকুমার, উৎপল দত্ত, শম্ভুনাথ বাগ, ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পালাগুলো মঞ্চায়িত করেন। তাঁদের রচিত পালাই পূর্ব-বাংলার মানুষের বক্তব্য সফলভাবে ধারণ করে এবং এতটাই স্বচ্ছন্দ ভাবে তুলে ধরে যে নিজস্ব পালাকারের অনুপস্থিতি অনুভূত হয়নি। প্রখ্যাত অভিনেতা নির্দেশক অমলেন্দু বিশ্বাসের লেখায় এর সমর্থন মেলে:

> ষাট দশকে ব্রজেন্দ্র বাবুর উত্তরসূরী ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রাজনৈতিক উপাদান সম্বলিত যাত্রার সূচনা করলেন। এই পালাকারই যাত্রার প্রথম শ্রেণী সংগ্রামের পটভূমি রচনা করেন। যদিও তাঁর পালা রূপকাশ্রয়ী ছিল। 'একটি পয়সা' 'রক্তে রোয়া ধান' 'পাঁচ পয়সার পৃথিবী' 'কান্না ঘাম রক্ত' 'মা মাটি মানুষ' 'অচল পয়সা' পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের যাত্রা দর্শকরা এখনও দেখছেন। নব্যনাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ উৎপল দত্ত 'রাইফেল' 'সন্ন্যাসীর তরবারী' 'অশান্ত চিলি' 'অজেয় ভিয়েতনাম' এই সব পালা লিখে রাজনৈতিক বক্তব্যকে সরাসরি নিয়ে এলেন যাত্রায়।

[379] S. M. Mohsin (edited), *Jatra Our Heritage*, Masuda M. Rashid Chowdhury, Jatra as a Cultural Identity, 2000,Bangladesh Shilpakala Academy pg. 21

> এদেরই অনুসারী কয়েকজন পালাকার, নির্মল গঙ্গোপাধ্যায়, রমেন লাহিড়ী, রঞ্জন দেবনাথ, শম্ভুনাথ বাগ প্রমুখ যাত্রাকে গণমুখী করেছেন। এই সঙ্গে আরেকজন ব্যতিক্রমধর্মী পালাকার জ্ঞানেশ মুখার্জী 'কার্ল মার্কস' 'লেনিন হিটলার' ' মহেঞ্জোদারো' 'মাও সেতুং' লিখে আমাদের আশ্চর্য করেছেন। যাত্রায় এত স্ট্রেইট ও মৌলিক রচনা খুব কম আছে।[৩৮০]

পূর্ব পাকিস্তানের তখনকার পরিস্থিতির অস্থিরতায় এসব রাজনৈতিক সচেতনতা সমৃদ্ধ পালা প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে; বিশেষ করে ভৈরবনাথ ও উৎপল দত্তের শ্রেণি সংগ্রামের উপরে ভিত্তি করে রচিত পালা সমাদৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গের এই সব পালাকার, তাদের প্রযোজনারীতি ও অভিনয় কৌশল তথা যাত্রার ধ্যানধারণার বিকাশ থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের যাত্রা অকৃপণভাবে ঋণ গ্রহণ করে এবং নির্বিচারে পশ্চিমবঙ্গ থেকে নেয়া যাত্রাপালার অভিনয় হতে দেখা যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে উৎপল দত্ত, শম্ভুনাথ বাগ, ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যপ্রকাশ দত্ত, প্রসাদকৃষ্ণ ঘোষ ও জিতেন বসাক প্রমুখ রচিত পালা ও অভিনয় প্রযোজনা রীতি পর্যালোচনার দাবি রাখে।

৪.৩ উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৩)

যাত্রা অভিনেতা পঞ্চু সেনের উদ্যোগে উৎপল দত্ত যাত্রা জগতের সঙ্গে যুক্ত হন। বিশ শতকের ষাটের দশকে কলকাতার পেশাদার যাত্রার বিষয় ভাবনা ও আসর উপস্থাপনার ক্ষেত্রে নতুনত্ব আনবার ব্যাপক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক উপকরণের সহযোগে যাত্রায় চমক আসার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা যেভাবে ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে; তাতে কীভাবে স্বাভাবিক পথে যাত্রার আসরের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা যায় সেই পথ খোঁজা হয়। চিৎপুরের পেশাদার যাত্রায় উৎপল দত্তের আগমন ঘটে ১৯৬৮ সালে। ততদিনে থিয়েটারে তিনি পরিচিত-প্রতিষ্ঠিত। বাংলা যাত্রার ক্ষেত্রে উৎপল দত্তের আগমন যেমন অভাবিতপূর্ব তেমনি তাঁর অবদানও যাত্রা পালার প্রযোজনা রীতিতে নতুন প্রাণসঞ্চার করেছিল। আবাল্য শেকস্‌পীয়র অনুরাগী উৎপল দত্ত ছাত্রাবস্থাতেই 'দি শেক্সপিরিয়ান' নাট্যদলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত নাট্যপরিচালক অভিনেতা জেফ্রি ক্যান্ডালের সান্নিধ্যে অভিনয় শিক্ষার্জন করেন। রাজনীতি সচেতন নাটক *তীর* (১৯৬৭) ও *মানুষের অধিকারে*তে (১৯৬৮) তিনি নিরাভরণ মঞ্চপ্রয়োগের চেষ্টা করেন। থিয়েটারের মানুষদের সঙ্গে যাত্রার যোগাযোগ নতুন না হলেও উৎপল দত্তের মত ব্যাপক অভিজ্ঞতা নিয়ে যাত্রায় অল্প লোক এসেছিল। তিনি যাত্রায় সাময়িক অতিথি হয়ে নয়; ১৯৬৮ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত মোট কুঁড়ি বছর যাত্রার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। *রাইফেল* থেকে *দামামা ঐ বাজে* পর্যন্ত চিৎপুরে পেশাদার যাত্রার জন্য তিনি বিশটি পালা রচনা করেন। যাত্রা গবেষক প্রভাতকুমার দাসের সাহায্য নিয়ে পালাগুলির রচনার সময় ও নাম এবং পরিবেশনকারী অপেরার তালিকা নিম্নে দেয়া হল:

---

[৩৮০] অমলেন্দু বিশ্বাস, *বাংলাদেশের যাত্রাশিল্প*, শ্রাবণ, ঢাকা, প্র. প্র. মার্চ ২০০৩, পৃ. ১৫

১.	১৯৬৮	রাইফেল	নিউ আর্য অপেরা
২.	১৯৬৯	জালিয়ানওয়ালাবাগ	সত্যম্বর অপেরা
৩.	১৯৭০	দিল্লী চলো	লোকনাট্য
৪.	১৯৭০	সমুদ্র শাসন	লোকনাট্য
৫.	১৯৭০	নীলরক্ত	ভারতী অপেরা
৬.	১৯৭০	ভুলি নাই প্রিয়া	শ্রীমা অপেরা
৭.	১৯৭১	জয় বাংলা	লোকনাট্য
৮.	১৯৭২	সন্ন্যাসীর তরবারি	লোকনাট্য
৯.	১৯৭৩	ঝড়	লোকনাট্য
১০.	১৯৭৪	মাও-সে-তুঙ	তরুণ অপেরা
১১.	১৯৭৪	বৈশাখী মেঘ	লোকনাট্য
১২.	১৯৭৫	সীমান্ত	লোকনাট্য
১৩.	১৯৭৬	তুরুপের তাস	লোকনাট্য
১৪.	১৯৭৭	মুক্তিদীক্ষা	লোকনাট্য
১৫.	১৯৭৮	অরণ্যের ঘুম ভাঙছে	গণবাণী
১৬.	১৯৭৯	সাদা পোষাক	গণবাণী
১৭.	১৯৮০	কুঠার	গণবাণী
১৮.	১৯৮১	স্বাধীনতার ফাঁকি	ভারতী অপেরা
১৯.	১৯৮২	বিবিঘর	নব রঞ্জন অপেরা
২০.	১৯৮৮	দামামা ঐ বাজে	আর্য অপেরা

যাত্রার উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে তিনি এ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই মানসিকতা তাঁর *জপেন দা জপেন যা* গ্রন্থে জপেনদার ভাষ্যে প্রকাশিত, যাবতীয় উন্নাসিকতা নস্যাৎ করে দিয়ে যাত্রার কাছে থিয়েটারের মানুষদের কী কী বিষয়ে শিক্ষালাভ করা দরকার তা উল্লেখ করেছেন:

> শিখবেন নাট্যরচনার কৌশল, লক্ষ নিরক্ষর মানুষকে শিক্ষাদানের কলা, উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা সাজাবার পদ্ধতি। শিখবেন মধ্যবিত্ত দর্শকদের ছেড়ে অন্যান্য শ্রেণীর কাছে যাওয়া। শিখবেন দুর্বোধ্য সব বিচ্ছিন্নতাবাদী কিমিতিবাদী নাটককে

> জলাঞ্জলি দেওয়া। ও-নাটক নিয়ে প্রকৃত জনতার সামনে গেলে মারধোর খেয়ে যাবেন জানেনই তো। কোমর বেঁধে যাত্রার কাছ থেকে শিখতে শুরু করুন। সহজবোধ্য ভাষায় সহজগ্রাহ্য গল্পের কাঠামোয় কী করে মহত্তম চিন্তা যোজনা করা যায়। চেষ্টাকৃত জটিলতা হচ্ছে দেউলিয়া মানসের বিকার। যার সত্যিই কিছু বলার আছে তাকে কসরৎ করতে হয় না। সেই ইবসেন, চেকভ, গোর্কি, ব্রেখট বা হোকটু-এর মতন সরল ও অনাড়ম্বর। এই সারল্য শিখুন এসে যাত্রার কাছে। কলকাতার নগ্ননরনারীর বস্ত্রবিপ্লব আর একক নায়কের হতাশা শিকেয় তুলে যাত্রার কাছে শিখুন গল্পের গুরুত্ব ঘটনার মূল্য, সংঘাত-প্রতিঘাতের বিন্যাস। শিখুন বাংলার সত্যিকারের মানুষের জাতীয় নাট্য বৈশিষ্ট্যটা কী, কী সে শুনতে ও দেখতে চায়। সেই প্যাটার্নটাকে প্রথমেই অবজ্ঞাভরে বাদ না দিয়ে, সেই প্যাটার্নে যদি আরোপ করতে পারেন দর্শন ও মহৎ চিন্তা, তবে বুঝি বাহাদুর। নাক সেটকানো ইনটেলেকচুয়াল সেজে যাত্রার পালাকারদের গায়ে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করলে সেটা হবে আপনাদেরই সজ্ঞান আত্মহত্যা, যাত্রার কিছু এসে যাবে না।[৩৮১]

এই শতাব্দির ষাটের দশকে যাত্রার বিষয়-ভাবনায় ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। একদিকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের উত্থান-পত্তন, পাশাপাশি ১৯৬৭ সালের নকশালবাড়ি আন্দোলন দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে নাড়া দেয়। মিনার্ভা থিয়েটারে রাজনীতির সেই ঢেউ-এ পাল তুললেন নাট্যকার-পরিচালক উৎপল দত্ত। তিনি বামফ্রন্ট রাজনীতিকে যাত্রায় উপজীব্য করেন। *তীর* এবং *মানুষের অধিকারে* সেই রকম পালা, যা নতুন জীবনের আদর্শকে প্রচার করে। এছাড়া *রাইফেল* পালার মাধ্যমে পেশাদারি যাত্রার অনাড়ম্বর বহিঃপ্রকাশ ঘটান। মঞ্চের *মানুষের অধিকারে* আর যাত্রার *রাইফেল* এর পরিবেশনায় কয়েক মাসের ব্যবধান। *মানুষের অধিকারেতে* হেইড পেটারসনের সংলাপ: 'যেদিন আমার সাথীদের প্রত্যেকের হাতে উঠবে রাইফেল, সেদিন যে আবার বেঁচে উঠব আমি।'[৩৮২] *রাইফেল* পালার শেষ দৃশ্যে একই আত্মবিশ্বাসে উচ্চারিত হয়েছে নায়ক কল্যাণের সংলাপ : 'রহমত কাকা – তোমারই তো রাইফেল। আমরা ভুল করেছিলাম লক্ষ লক্ষ রাইফেল এমনিতেই ছিল আমাদের।'[৩৮৩]

ত্রিশের দশকের ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের রক্তঝরানো সময়কে ঘিরে তিনি এই যাত্রাপালা লেখেন। *রাইফেল* পালাটি তাঁর নাট্য-জীবনের মঞ্চ ও যাত্রার যোগসূত্র। এছাড়া উৎপল দত্ত পরিচালিত *বিবেক নাট্য সমাজ* (১৯৬৯-৭০) দলেরও অন্যতম হাতিয়ার ছিল *রাইফেল*। যাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা কিংবা ধীরে ধীরে সখ্য গড়ে ওঠা প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে উৎপল দত্ত জানিয়েছেন :

> আমি যাত্রা দেখছি-টেখছি এবং স্টাডি করছি সেই একান্ন সাল থেকে। এ যে একেবারে আচমকা গিয়ে পড়লাম তাও না। রেগুলার যাত্রা দেখতাম এবং পড়াশোনাও করেছি, বোঝবার চেষ্টা করেছি। এও বুঝতে পেরেছি যে যাত্রা ফর্মটাকে কিভাবে বিকৃত করা হয়েছে এবং এও বুঝেছি যে বিকৃত করেছে বলেই বেঁচে গেছে। নইলে যাত্রা এতদিনে উঠে যেত। এবং একটা

---

[৩৮১] উৎপল দত্ত, *গদ্য সংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, নাট্যচিন্তা, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কে পি বাগচী, কলকাতা, প্র. প্র. ১৯৯৮, পৃ.৩৯৭-৩৯৮

[৩৮২] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.

[৩৮৩] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.

> এক্সটিংকট ফর্ম নিয়ে কিছু পণ্ডিত রিসার্চ করতেন ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বসে। ওই, সেই যে যাত্রা নামে একটা জিনিস ছিল। পরিবর্তিত হয়েছে বলেই বেঁচে গেছে সময়ের সঙ্গে Move করে।[৩৮৪]

সময় ও সমাজের দাবিই প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর রচনায়। ইতিহাসের ছেঁড়া পাতাকে মিলিয়ে সমকালীন সমাজকে উপস্থাপন করেন তিনি।

> I keep writing and producing for the Yatra and the theatre and hope some day in my play to strike the dialectical balance between the individual and society, between the decay of the old in society and the rise of the new, between the finiteness of the new, between the finiteness of each of my characters and the infinity of a re-created Myth.[৩৮৫]

সমকালীন যাত্রাশিল্পীরা উৎপল দত্তের অভিজ্ঞতাকে আপন আলোয় গ্রহণ করেন। নতুনত্বের দাবিতে যাত্রামোদী দর্শকও উৎপল দত্তের মেধা ও সৃষ্টিশীলতাকে নতুন মাত্রায় বিকশিত করেন। উৎপল দত্তের অকপট স্বীকার তাই বিচার্য :

> যাত্রার অভিনেতারা এত ভার্সাটাইল – যেহেতু ওরা পেশাদার এবং যেহেতু ওরা জনতার সঙ্গে গভীর বন্ধনে আবদ্ধ, সেহেতু ওদের, নতুন জিনিস গ্রহণ করতে – ওরা সিদ্ধহস্ত। মানে আমাদের যে নাট্য আন্দোলনের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যেমন নানারকম পাতিবুর্জোয়া পিছুটানে চিরদিন ভুগেছে, ওদের তো ওসব কিছু নেই। ওরা ছোটবেলা থেকেই পেশাদার। আর পেশাদার অভিনেতার একটা অসামান্য গুণ থাকে অ্যাডাপ্টিবিলিটি। সে অ্যাডপ্ট না করতে পারলে তো সে না খেয়ে মরত বহুদিন আগে এবং তাকে প্রতি সিজনে ভালো করতে হবে। নইলে সে আর খেতে পাবে না। এই যে চরম তাগিদ থেকে – ওদের যে আগ্রহ, যে প্রচণ্ড প্রতিজ্ঞার মধ্যে দিয়ে যায় – তাতে ওদের আমার পালা টালা তুলে নিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হোত না। বরং আমি তো বলব, আমিই বরং রাইফেল নাটকের শেষটা একটু চাপা অবস্থায় করেছিলাম – রাইফেল তুলে নিয়ে স্লোগান দিয়ে শেষ করতে চাইনি। শেষটা অন্যরকম ছিল। পঞ্চু সেন এবং যাত্রার অভিনেতারা বললেন – না না শেষটায় আরো ইয়ে চাই স্লোগান চাই। অথচ ওরা কেউই কমিউনিস্ট নন, কেউই বামপন্থী নন। কিন্তু এরা জনতার ভিতরে থাকেন এবং ওরা নাটক কিসে বেশী এফেকটিভ হয় এটা তো বোঝেন। এ নাটকের শেষটা যে ওভাবেই হতে হবে, এটা ওরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলে ছিল। আমি রাইফেল নাটক যেভাবে ছাপা হয়েছে, সেভাবেই শেষ করি। আর তাছাড়া পঞ্চুসেনের গাইডেন্স ছিল।... Actually উনিই তো আমাকে জোর করে নিয়ে গেলেন। ওই বছর আমার কোনো পালাই লেখার কথা ছিল না। সাত দিনে লিখেছিলাম প্রায়। ... অত বড় অভিনেতা এবং যাত্রার অত এক্সপিরিয়েন্সড লোক। উনি সাহায্য করেছিলেন। দু এক জায়গায় বলে-টলে দিয়েছিলেন। যেমন একবার একটা জায়গায় করেছিলাম – একদল পুলিশ বেরোল, তারপর নেক্সট সিনেই আবার ওরা ঢুকেছে। উনি শিখিয়ে দিলেন যাত্রায় ওরকমভাবে হয় না। যারা বেরিয়ে গেল

---

[৩৮৪] উৎপল দত্ত, দীর্ঘতম সাক্ষাৎতার, পর্বান্তর, জানুয়ারি ১৯৯৫, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), পৃ.৯০, উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৩৭

[৩৮৫] Utpal Dutt, In search of form, Towards A Revolutionary Theatre, p. 148. উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৩৭-৩৮

> তারা তক্ষুণি আবার ঢুকতে পারে না। ওরা বেরিয়ে যাবার পর কোন একটা কিছু ঘটবে, তারপর আবার ঢুকবে। এসব বিষয় শিখলাম – টেকনিক – যাত্রায় কিভাবে সিনের পর সিন সাজাতে হয়।[৩৮৬]

ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণকে নানাভাবে তিনি তাঁর যাত্রায় আনেন। মূলত পরাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাস তাঁর চৈতন্যে বিশেষ জায়গা নেয়। তাই জেনারেল ডায়ারের বর্বর হত্যাকাণ্ড ঘিরে লিখলেন *জালিয়ানওয়ালাবাগ* (১৯৬৯)। পালায় ডায়ারের নিষ্ঠুরতায় পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মাইলস্ আর্ভিং ধিক্কার দেয়: 'ওরা ব্রিটেনকে ক্রুশবিদ্ধ করছে ভারতের প্রান্তরে।'[৩৮৭] *অরণ্যের ঘুম ভেঙেছে* (১৯৭৮) পালায় আর একজন ভাগ্যহীন ইংরেজ ক্রিয়পিনের কাহিনি রচিত হয়। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা টেগার্ট মনে করে তাকে গুলি করে। প্রাণে বেঁচে গেলেও তাঁর মাথার মধ্যে গুলি থেকে যায়। মস্তিষ্ক রোগাক্রান্ত ক্রিয়পিন্ ঘরের মধ্যে তার মৃত শিশুপুত্রের সঙ্গে কাল্পনিক ক্রিকেট খেলায় ব্যস্ত থাকে। বিপ্লবী উধম সিং এর কাছে তার যন্ত্রণার্ত উচ্চারণ :

> ইণ্ডিয়ানরা – আমার মগজের মধ্যে গেঁথে দিয়েছে শিশের গুলি। ... মিস্টার ইণ্ডিয়ান, আপনার কাছে পিস্তল নেই? আমাকে গুলি করে প্রতিদিনের এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পারেন না? আকাশে মেঘ দেখা দিলে যন্ত্রণা, রোদ উঠলে যন্ত্রণা, পূর্ণিমার রাতে যন্ত্রণা – এভাবে বেঁচে থাকার কোন মানে হয়? অথচ আমি টেগার্ট নই। আমি রসায়নবিদ্ কেমিস্ট। সায়েন্টিস্ট।[৩৮৮]

তাঁর *সীমান্ত* পালায় এমনই দুঃখ ইসাবেল বার্নসের :

> ইংরেজ মানেই কি বদমাস? ইংলণ্ডকে লোকে শুধু ক্লাইভ আর হেস্টিংস, ম্যাকেনটন্ আর আলেকজাণ্ডার বার্মস ভাবে। আর একটা ইংলণ্ড আছে – গরীব মানুষের ইংলণ্ড, সাধারণ গৃহস্থের ইংলণ্ড। তারা চায় না প্রভুত্ব আর সাম্রাজ্য। তারা চায় না ভারত, চীন আর আফগানিস্তানের শিশুর মুখের গ্রাস কেড়ে এনে ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য বাড়ুক।[৩৮৯]

দেশীয় মানুষের মধ্যে ভালো-মন্দের দোলাচলে নির্মাণ করেছেন নানা রকমের খলচরিত্র। যেমন: *রাইফেলের* যুগল চৌধুরী, *সন্ন্যাসীর তরবারির* বাজপুর-জমিদার শশাঙ্ক দত্ত, *ঝড়*-এ নহুম শর্মা, *স্বাধীনতার ফাঁকির* ত্রিলোচন এবং *সাদা পোষাকের* সাব-ইন্সপেক্টর মহাদেব চাটুজ্যে। রাজনীতির নতুন হাওয়া তাঁর যাত্রাপালার গানেও এসে লাগে :

> অনেক দিন তো কাটিয়েছি মোরা চরকার সুতো কেটে
> অনেক রাত তো কাটিয়ে এসেছি শান্তির পথ হেঁটে।
> আমরাই মরি বুলেটের ঘায়ে আমরাই ভাই লড়ি

---

[৩৮৬] উৎপল দত্ত, দীর্ঘতম সাক্ষাৎতার, পর্বান্তর, জানুয়ারি ১৯৯৫, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), পৃ. ৮৯-৯০, উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৩৭-৩৮

[৩৮৭] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.

[৩৮৮] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৩৮-৩৯

[৩৮৯] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৩৯

বুলেটেতে মরি ভোট দিয়ে ফের – এ মন্ত্রীসভাই গড়ি।
প্রথমে লড়াই তারপরে ভোট, পরেতে আবার লড়ি
লড়াই ও ভোট, ভোট ও লড়াই – চাকা ঘোরে আহা মরি ।
আমরা যে ভাই কলুর বলদ গান্ধির হুকুমে লড়ি
চোখে ঠুলি পরা তাইতো বুঝিনা – কেন কেন লড়ে মরি।
পূবের হাওয়া খবর এনেছে সুভাষ দিয়েছে বল
দেশভাগ করা দেশদ্রোহীদের ঘুচে গেছে গ্যাঁড়াকল।[৩৯০]

সন্ন্যাসীর তরবারি পালায় ১১৭৬ এর (১৭৬৮-৬৯ ইং) মন্বন্তর-উত্তর সুবে বাংলার সন্ন্যাসী-বিদ্রোহকে ভাষারূপ দিলেন। সে পালায় কেউ একক নায়ক নয় – নায়ক যূথবদ্ধ গ্রামবাসী। তরবারি তাদের জনশক্তির প্রতীক। বিবেকরূপী মুসার গানে উঠে আসে তারই বাণী :

তোমরা অস্ত্র হও হও তরবারি
গুলি হয়ে বুকে বেঁধো জুলুমবাজদের
বসাও শানিত ছুরির ফলা বুকেতে তাদের
এভাবে কারো শেষ অশান্তির দিন
এ দেশ নয় স্বাধীন।।[৩৯১]

এ গানে *রাইফেলেরই* প্রতিধ্বনি। ফকির বিদ্রোহের নেতা মজনু শার নেপথ্যের সহায়ে সমুখ-সমরে নেতৃত্ব দেবেন কৃপানন্দ স্বামী ওরফে ভবানী পাঠকের। মন্বন্তর-পীড়িত বাজপুর গ্রামের বাসিন্দা মন্বন্তর পীড়িত সবাই। স্থানীয় জমিদার শশাঙ্ক দত্তের অত্যাচারে জর্জরিত হয় সর্বহারার দল – পরিচয় লাভ করে সন্ন্যাস দলের সন্তান হয়ে। পালাকার স্বাধীনতাকামী মানুষের এই বিদ্রোহকে মুক্তিযুদ্ধের স্বীকৃতি দেন।

> মজনু শাহ চকমকি ঠুকে আগুন জ্বেলে বুকের আঁধার দূর করে দিয়েছেন মনের মধ্যে সব এখন দিবাকরের মত স্পষ্ট। এখন জানা আমরা ক্ষুধায় মরি বলেই ওদের এত ধন, আমাদের অন্ন কেড়ে নিয়ে ওদের বিলাস। আরো জেনেছি শুধু জমিদার-মহাজন নয়, তার পেছনে দেখা যাচ্ছে ইংরেজদের লাল মুখ। ... শুধু মহাজন মেরে ক্ষুধা ঘুচবে না, ইংরেজের মসনদ ধরে টান মারতে হবে, দেশটাকে ফিরে পেতে হবে, স্বাধীনতা ফিরে কেড়ে নিতে হবে।[৩৯২]

সাম্রাজ্যবাদীরা তাই সচেতন হলেন – কেননা এই বিদ্রোহ দমন করতে হবে। রেনেল এবার সম্পূর্ণ অন্য ভূমিকায় হাজির হলেন। প্রথমেই তিনি বিদ্রোহীদের বৃহত্তর সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন। তাদের সেই আর্তের

---

[৩৯০] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৩৯

[৩৯১] উৎপল দত্ত, *সন্ন্যাসীর তরবারি*, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, পঞ্চম প্র. ভাদ্র ১৪০২, পৃ.৪৮

[৩৯২] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৪০

সেবার আড়াল মুছে দেন। এই পালায় সমকালীন নকশাল-দমনের সঙ্গে রেনেলিয় বিদ্রোহী-দমন রীতির একটা কৌশলী সাযুজ্য পাওয়া যায়।

সত্তরের দশকে উৎপল দত্তের নিরবিচ্ছিন্ন যাত্রা রচনা স্থিমিত হয়ে আসে। অনিয়মিত হলেও আশির দশক পর্যন্ত যাত্রার সঙ্গে যোগ ছিল তাঁর। *দামামা ঐ বাজে* (১৯৩৮) তাঁর রচিত সর্বশেষ পালা। এ সময় যাত্রার বণিক সমাজের কাছে তাঁর মুক্তিধর্মী পালার প্রয়োজন কমে আসতে থাকে। বণিকের মানদণ্ড রূপ নেয় রাজদণ্ডে। তাই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় সেই আক্ষেপ :

> যাত্রার প্রতিটি দিককে আজ বাণিজ্যিক মুখী করা হয়েছে। যাত্রাকে আজ বাণিজ্যিকভাবে কার্যত বেশ্যাবৃত্তি করতে হচ্ছে। প্রবল প্রাণশক্তি সম্পন্ন এই যাত্রাপালার আজ কিছুই অবশিষ্ট নেই।[৩৯৩]

উৎপল দত্ত বণিকবৃত্তির সঙ্গে শিল্পের আপোষের যাত্রায় আর সামিল হন নি। নিজের কাজের মূল্যায়ন করেছেন তিনি এভাবে :

> যাত্রায় একটা চেষ্টা করেছিলাম, যে রাজনৈতিক যাত্রা বলে একটা কিছু সৃষ্টি করা যায় কিনা। যাত্রা আন্দোলন হয় কিনা। গণনাট্য হয়েছে তা গণযাত্রা হবে না কেন? অবশ্য আমার আগেও অনেকে কাজ করেছিলেন, ...কিন্তু আমি যাওয়ার পর তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম যে, রাজনৈতিক পালা হবে না কেন? পয়সা তো দেবে। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালা হবে না তো আর কোথায় হবে? এবং পয়সা যতক্ষণ পাবে, মালিক ততক্ষণ খুব খুশি থাকবে। মালিক তো শুধু পয়সাই চায়। পালাতে কী দেখানো হচ্ছে সে তো আর সেটা দেখতে যাচ্ছে না। তো ওনারা বললেন যে এটা হবে না, শেষ পর্যন্ত মালিক ধরে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত বুঝবে এখন পয়সা দিচ্ছে বটে কিন্তু এ পালা শেষ পর্যন্ত আমার গলা কাটবে।... অবশ্য একটা জিনিস করতে হবে প্রথমেই ... মালিককে হুকুমের ডগায়, লাঠির ডগায় রাখতে হবে ... একটু ছেড়েছেন কী পেয়ে বসবে। ... পালার পরে পালা নেমে যাচ্ছে সে কিছুই বলে না।...কিন্তু অবশেষে সে বুঝল, ঠিক বুঝল। অন্য মালিকরা গিয়ে তাকে বোঝাল এসব করছ কী? এ ত লালঝান্ডা উড়ছে।... মালিক বুঝল এবং বোঝার পর সে এমন অবস্থার সৃষ্টি করল যে আর সেখানে থাকা সম্ভব নয়।...আমি লড়াইটা একটু বেশি করতে পেরেছি দাপটে কাজ করেছিলাম বলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ কেন না এটা ওই সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত।[৩৯৪]

প্রকৃত অর্থে উৎপল দত্ত ব্যর্থ হননি। তারই উত্তরসুরি অভিনেতা পরিচালক অসিত বসুর মূল্যায়নে তা স্বীকৃত:

> উৎপল দত্তের হাতে যাত্রা আঙ্গিকের দিক থেকে যা শিখল – তা হল একেবারে সঠিক ঐতিহাসিক পোশাক-পরিচ্ছদ, 'প্রপ'(অভিনয়ের চরিত্রের জন্য ব্যবহৃত ছোটো-বড়ো সরঞ্জামাদি), এবং রূপ-সজ্জা। এছাড়াও যাত্রাভিনয়ের বাচিক অভিনয়ের সৌকর্য – যা কিনা যাত্রার প্রাণ-ভোমরা বজায় রেখে তার সাথে একেবারে সঠিক আঙ্গিক অভিনয়ের মেলবন্ধন! ... উৎপল দত্তের আগমনে যাত্রায় প্রম্পট্-নির্ভর অভিনয় বন্ধ করে সুনির্দিষ্ট ব্লকিং-নির্ভর আধুনিক অভিনয়ের চলন এল।

---

[৩৯৩] উৎপল দত্ত, গণশক্তি, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০, উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৪০

[৩৯৪] বিভাস চক্রবর্তীকে দেওয়া সাক্ষাৎকার, প্রভাতকুমার দাস (সম্পাদিত) *বহুরূপী*, বিশেষ বাংলা যাত্রা সংখ্যা, ১২৩ নং সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৫, পৃ ৩০

> এল মহলার বা অভিনয়ের কঠিন নিয়মানুবর্তিতা।... উৎপল দত্তের প্রভাবে আর যেটি সূচনা হল – যাত্রাদলের শিল্পী কলাকুশলীদের খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরার ব্যাপারে পদ-মর্যাদার নিরিখে সাবেকি অসাম্যের অবসান! 'টপ্'(যাত্রার তারকা অভিনেতা) বা উপর তলার অভিনেতাদের মাছের-মুড়ো কিংবা বিশেষ পৃথক আহারের ব্যবস্থার বৈষম্যের অবসান। প্রতিদিনের চলাফেরার ব্যবস্থার মধ্যেও আসতে শুরু করল একটি সাধারণী সমীকরণ।[৩৯৫]

উৎপল দত্তের হাতে পেশাদার যাত্রায় এসব তাৎপর্যপূর্ণ বদল ঘটে। কেউ কেউ একে থিয়েট্রিকাল যাত্রা বা সিনেমাটিক যাত্রা অভিধা দিতে চেয়েছেন।[৩৯৬] আঙ্গিকের দিক থেকে যখন চিৎপুর যাত্রায় আলো-টেপ-মাইকের ব্যবহার নিত্যনতুন চমক সৃষ্টি করে চলেছে, তখন একমাত্র উৎপল দত্ত তাঁর পালায় দেশজ অভিনয় ধারার ঐতিহ্যকে মনে রেখে বাচনিক অভিনয়ের চমকপ্রদ শক্তিকে পুনরাবিষ্কারের চেষ্টা করেন। *যাত্রা হল শুরু* গ্রন্থের লেখক দেবদাস ভট্টাচার্য জানিয়েছেন :'উৎপল দত্ত সামাজিক নাটকের ভোল পাল্টে দিলেন, এনে ফেললেন একেবারে জ্বলন্ত জীবন্ত সমস্যা। সাধারণ মানুষ যাতে প্রতিনিয়ত জর্জরিত হচ্ছে, মুক্তি চাইছে বেরিয়ে আসতে। চলতে লাগল যাত্রার নতুন নতুন যাত্রা।'[৩৯৭]

৪.৪ সামাজিক পালা

চলমান সমাজজীবনের কাহিনি ও চরিত্র নিয়ে রচিত পালাকেই সামাজিক পালা বলা হয়। সৈয়দ জামিল আহমেদ জানিয়েছেন, 'In which the characters are drawn from contemporary society and are set in conflict on issues arising from values, principles and ideals of family and social life…'[398] সমাজের ন্যায়-অন্যায়, সঙ্গতি-অসঙ্গতি, সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ, সব কিছুই সামাজিক পালায় ফুটে ওঠে।

যাত্রায় সামাজিক পালা প্রথম আনয়ন করেন ব্রজেন্দ্রকুমার দে। চিরন্তন বাঙালির সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনের কাহিনিকে যাত্রায় উপস্থাপনা তাঁর কৃতিত্ব। ব্রজেনদের পর সামাজিক পালা রচনায় সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন রঞ্জন দেবনাথ। তাঁর *গলি থেকে রাজপথ*, *নীচু তলার মানুষ*, *এরই নাম সংসার*, *পৃথিবী আমারে চায়*, *আজকের সমাজ*, *বধূ এলো ঘরে*, *সংসার কেন ভাঙে*, *আমরাও মানুষ*, *শশীবাবুর সংসার*, *একমুঠো অন্ন চাই*, *একটি গোলাপের মৃত্যু*, *স্বামী-সংসার সন্তান*, *বন্দী বিধাতা*, *বিদূষী ভার্যা বা মেঘে ঢাকা তারা*, *কন্যাদায়*, *প্রিয়ার চোখে জল*, *সন্ধ্যা প্রদীপ শিখা*, *যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ*, *কলঙ্কিনী বধূ বা জীবন নদীর তীরে*, *মায়ের চোখে জল*, *অনুসন্ধান*, *জেল থেকে বলছি*, *সংসার আদালত*, *বিবেকের চাবুক*, *এ পৃথিবী টাকার গোলাম*, *জোড়াদিঘির চৌধুরী*

---

[৩৯৫] অসিত বসু, আমার 'যাত্রা'-পথ, প্রভাতকুমার দাস (সম্পাদিত) *বহুরূপী*, বিশেষ বাংলা যাত্রা সংখ্যা, ১২৪ নং সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৫, পৃ. ৩৪-৩৫

[৩৯৬] দেবদাস ভট্টাচার্য, *যাত্রা হল শুরু*, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ২২২

[৩৯৭] দেবদাস ভট্টাচার্য, *যাত্রা হল শুরু*, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ২২৩

[৩৯৮] Syed Jamil Ahmed, *Acinpakhi Infinity : Indigenious Theatre of Bangladesh*, University Press Limited, Bangladesh, First publised 2000, P.247

পরিবার, *সাত পাকে বাঁধা*, *নন্দরানীর সংসার*, *সংসার*, *চরিত্রহীন*, *কোন এক গাঁয়ের বধূ*, *মায়ের চোখে জল* প্রভৃতি পালা উল্লেখযোগ্য।

চণ্ডীচরণ ব্যানার্জির *হকার*, *সিঁদূর পরিয়ে দাও*, *গফুর ডাকাত*, *নয়নতারা*, *প্রতিমা*; নন্দগোপাল রায় চৌধুরীর *জনতার রায়*; মহাদেব হালদারের *সন্তান হারা মা*, *লক্ষ টাকার লক্ষ্মী*, *স্বামী ভিক্ষা দাও*; রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আগুন*, *অমানুষ*, *লাল সেলাম*; শম্ভুনাথ বাগের *পৃথিবী তোমায় সেলাম*, *অসুস্থ পৃথিবী*; কানাইলাল নাথের *গাঁয়ের মেয়ে*, *আমি মা হতে চাই*, *মা ও ছেলে* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য সামাজিক পালা। শিবাজী রায়ের *সিঁদুর পেলাম না*; সঞ্জীবন দাসের *শূন্য বাসরে বধূ*, *হতভাগিনী মা* এবং স্বপনকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *শ্মশানে হলো ফুলশয্যা*, *অভাগীর কান্না* দুই বাংলার যাত্রামঞ্চে সফলভাবে অভিনীত হয়েছে। পূর্ণেন্দু রায়ের *দস্যুরানী ফুলনদেবী* ও *ওগো বধূ সুন্দরী*, *দুটি পয়সা*, *ফুলশয্যার রাতে* প্রভৃতি পালা যাত্রামোদী দর্শকদের কাছে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। *দস্যুরানী ফুলনদেবী* পালাটি সামাজিক পালা হলেও এতে ভারতে দস্যুরানী হিসেবে আলোচিত ও পরবর্তী কালে লোকসভার সদস্য ফুলনদেবীর জীবনকাহিনি বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশের পরিতোষ ব্রহ্মচারীও এ কাহিনি নিয়ে যাত্রাপালা তৈরি করেছেন। এছাড়া অরুণ দাসের *জারজসন্তান*; ননী চক্রবর্তীর *প্রণয় পিপাসা*, *কলিকালের মেয়ে*, *যৌতুক* প্রভৃতি দেশীয় পটভূমিতে রচিত উল্লেখযোগ্য যাত্রাপালা। নাট্যকার নাজমুল আলম যাত্রাশিল্পীদের জীবন নিয়ে রচনা করেছেন সামাজিক পালা *ফুল্লরা অপেরা*।

৪.৪.১ ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-১৯৯৮)

১৯৩৪ সালের ২৫ নভেম্বর বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার মূলগ্রামে ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম অমৃতলাল এবং মাতার নাম ইন্দুমতী। শৈশব থেকেই পুরাণ, ইতিহাস ও কথাসাহিত্য পাঠে তাঁর আগ্রহ দেখা যায়। পুরাণ ও ইতিহাসের পাশাপাশি আধুনিক সমাজ জীবনের নানা বাস্তবচিত্র তাঁর পালায় প্রতিফলিত হয়। *গণদেবতা*, *উল্কা*, *হাসুলি বাঁকের উপকথা*, *অগ্রদানী* প্রভৃতি ধ্রুপদী কথাসাহিত্যের পালা রূপদান ভৈরবনাথের উল্লেখযোগ্য কীর্তি। ঐতিহাসিক পালা রচনা করলেও সামাজিক পালা রচনায়ই বেশি খ্যাতিমান হয়ে উঠেন ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। *একটি পয়সা* রাতারাতি তাঁর পালাকার খ্যাতিকে বাড়িয়ে দেয়। এই পালার কাহিনি ঘিরে আছে কারখানার শ্রমিক, মিল-মালিক, জমিদার, উচ্চ-নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার। নতুন পটভূমিতে নতুন এই পালার নায়ক শিক্ষিত বেকার যুবক দিবাকর। পালার শুরুতেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *বামুনের মেয়ে* পালার ছায়া দৃশ্যমান হয়। দিবাকরের বোন শবরীর বিয়েতে তার কলঙ্কের প্রসঙ্গ তুলে বরপক্ষের অর্থ-দাবিতে পালার সূচনা হয়। শবরীর অতীত প্রেমের কাহিনিই সেই কলঙ্কের প্রতিবিম্ব। পালায় দুটি দল প্রত্যক্ষ করা যায় –– একদল শাসক, অপরদল শোষিত। একদলে ভুজঙ্গ নারায়ণ ঘোষাল, বদ্রিপ্রসাদ, দীপনারায়ণের মত অসৎলোকের

সমাহার, অন্যদলে শুভঙ্কর-অশোকের মত সজ্জন। শ্বশুরবাড়ির চৌকাঠ ডিঙোতে পারে নি শবরী। শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নীতিভ্রষ্ট হয় অশোক। বাড়িতে সন্দেহ করে বউকে। অশোকের ভাই অলোক কঙ্কালের মিছিল দেখে পথে দুর্ঘটনায় মারা যায়। খলনায়ক ঘোষালকে মরতে হয় অত্যাচারিতদের হাতে। নিশাচরের ছদ্মবেশের আড়ালে দিবাকর গুলি করে মারে বদ্রি-প্রসাদকে। পালা শেষে নানান ঘাত-প্রতিঘাতে অশুভের পরাজয় আর শুভর জয় হয়। ভৈরবনাথের সংলাপে স্থান পায় সেক্সপিয়র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এমনকি সুকান্তের কাব্য। তাঁর রচনায় গৈরিশী অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগরীতির অবসান ঘটে। রেশন-ডিলার, ড্রাইভার, ফেরিওয়ালা, বুট-পালিশওয়ালা, জাল-সন্ন্যাসীর পাশাপাশি জমিদার, শিল্পপতি, খলনায়ক আর বড়লোকের নন্দগোপাল জাতীয় চরিত্রগুলো তাঁর যাত্রাপালায় বৈচিত্র্য আনে।

মা মাটি মানুষ পালায় ভৈরবনাথ দেশমাতৃকার আদর্শকে উপজীব্য করেন। তাই উৎসর্গপত্রে পালাকারের উচ্চারণ:

> যে গ্রামের মাটিতে আমার মা আমাকে প্রসব করেছিলেন-
> যে গ্রামের মাটি আমার কাছে মায়ের মতই মমতাময়ী-
> যে গ্রামের মানুষেরা আজও আমার কাছে দেবতার মতই পূজনীয়
> সেই ধূলিতীর্থ মূলগ্রামের সব কটি মানুষের হাতে
> তুলে দিলাম আমার
> মা মাটি মানুষ।[৩৯৯]

পালার প্রসঙ্গ কথায় লেখক জানিয়েছেন:

> আমার জীবনের প্রভাবকালের তিনটি বছর বাইরে কেটেছিল। অর্থাৎ আমি গ্রাম ছেড়েছিলাম – জীবিকার প্রয়োজনে। প্রাচীন বাদশাহী সড়ক – অধুনা গ্রান্ড ট্যাঙ্ক রোডের ধারে খোলা একটা জানালায় বসে বসে ভাবতাম:-''বর্ধমান-বালী'' খালের বাস তো বর্ধমানের মাটি ছুঁয়ে আসছে, কতদিন গ্রামের মাটিতে পা দিইনি – যাই বাসের চাকায় ধুলো ছুঁয়ে আসি। বুকটা কনকন করে উঠতো – মায়ের কথা ভেবে। গ্রামের মাটি যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতো – গ্রামের মানুষগুলো যেন বলতো, ফিরে আয় – ফিরে আয়। এমন এক অসহনীয় বোবা বেদনা সেদিন আমাকে পাগল করেছিল...বাউল মা তাই গেয়ে উঠেছিল মা মাটি মানুষের গান। নাটক লিখতে শুরু করলাম – নট্ট কোম্পানীর কর্ণধার অগ্রজ-প্রতিম মাখনলাল নট্ট মহাশয় ও আমার সুহৃদ-প্রতিম অরুণ দাশগুপ্ত শুনলেন সেই নাটক...শুনে দুজনেই বোবা হয়ে গেলেন। তারপর পাদ-প্রদীপের আলোয় মূর্ত হলো আমার কাহিনীর চরিত্ররা। অসংখ্য মানুষ হাততালি দিলেন, অভিনয়ের শেষে নিজের কাছে নিজেই আমি

---

৩৯৯ উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ২০০৮, পৃ.৪১

> ধরা পড়ে গেলাম। বুঝলাম আমি ক্ষ্যাপা বাউলের মত পাগল – মা মাটি মানুষের ভালোবাসায়। কি জানি কতখানি আমি ওদের ভালোবাসতে পেরেছি।[৪০০]

নিরক্ষর চাষিরা প্রথম নায়কের মর্যাদা পায় এই পালায়। রূপান্তরিত পল্লীসমাজে অশিক্ষিত, দরিদ্র, শোষিত, নির্যাতিত মানুষগুলো নতুন করে জেগে উঠেছে, সংঘবদ্ধ হয়েছে –– বাস্তবে এই খবরই যেন পালাকার পরিবেশন করেছেন। পালাকারের রচনা আরও সার্থক হয়ে ওঠে ব্রাত্যজনের জাগরণী গানে। অঙ্কবিহীন ষোলো দৃশ্যের এই পালায় নয়টি গান আছে। বিবেকরূপী অন্ধ-ভিখারি ছাড়াও গান গেয়েছে মুখ্য চরিত্ররা। কখনো কখনো সিনেমার ছায়াও গানের ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে:

> এবার মরে সোনা হব, স্যাকরা ভাইয়ের কাছে যাব
> আংটি চুড়ি কাঁকন হয়ে রইব তোমার হাতে গো।[৪০১]

প্রখ্যাত গায়ক সুরকার মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই পালার সংগীত পরিচালনা করেন। জনপ্রিয়তার দাবিতে এ পালাও রেকর্ড-বন্দি হয়। *অচল পয়সা* (১৯৭৭) পালায়ও ভৈরবনাথ গ্রাম-জীবনের চিত্রই অঙ্কন করেন। তাই ভূমিকায় পালাকারের উচ্চারণ:

> বাংলাদেশ বলতে গ্রাম বুঝি, তাই গ্রামের পাঁচালী অচল পয়সার দয়াল বাঁড়ুজ্যে সব গ্রামেই আছে আমার বিশ্বাস। ঝিনুক, বাউরী, চাঁদ্‌মাস্টার এবং হৈমন্তী চরিত্ররাই সব গ্রামে আছে। এ কাহিনী তাই আপনার নিজের কাহিনী। ... অচল পয়সায় রাজার কাহিনী নেই, তাই এ নাটকে রাজনীতিও নেই। সমাজ আছে, মানুষ আছে, তাই এতে আছে সমাজের কথা – মানুষের কাহিনী।[৪০২]

পালাকার মনে করেন:

> আমি এই নাটকে দীর্ঘকালের যাত্রা-গণ্ডিকে ভেঙেছি – আসর থেকে বেরিয়ে দর্শককে চরিত্র করে রাস্তায় নিয়ে এসেছি কাহিনীকে। শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার করে যারা দেশের অনেক মানুষকে অচল পয়সার মত অচল করে রেখেছিলেন – মানুষ সেই চির-স্থায়ী সুখ-সম্পদ ভোগী মহাজনদের বানিয়েছেন আজ অচল পয়সা। ... এ নাটকে আমি সংগ্রাম করিনি – সংগ্রাম দেখিয়েছি।[৪০৩]

১৯৯৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর ভৈরবনাথ বরানগরের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

---

[৪০০] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৪২

[৪০১] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৪২

[৪০২] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৪৩

[৪০৩] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৪৩

৪.৫ জীবনীভিত্তিক পালা

বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সামাজিক পালার সঙ্গে নতুন আর এক পালা রচনার হিড়িক পড়ে যা জীবনীপালা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। যে পালায় কোনো মহান ব্যক্তির কর্মময় জীবন ও আদর্শকে অনুপ্রেরণার জন্য সাধারণ মানুষের সামনে হাজির করা হয়, সে ধরনের পালাকেই জীবনী পালা বলা হয়। পরস্পর দলগুলির মধ্যে নাটক রচনার প্রতিযোগিতা গড়ে ওঠে। আর এই প্রতিযোগিতায় নতুন অনুসন্ধানের সূত্রে পাশ্চাত্য রাজনৈতিক মনীষীদের জীবনীর সঙ্গে পরিবেশিত হয় ভারতীয় রাজনৈতিক-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের জীবনগাঁথা। স্থান পায় বিশ্ব-ইতিহাসের কয়েকটি যুদ্ধঘটনা। সামাজিক পালার পাশাপাশি জীবনীমূলক পালারও একটি দর্শকশ্রেণি গড়ে ওঠে। পুরাণের মাহাত্ম্য প্রচারের মতোই মহামানবের জীবনের ভেতর দিয়েই আদর্শ উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস দেখা যায় জীবনীমূলক যাত্রাগানে।

পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর (১৮৯৭-১৯৪৫) জীবনকাহিনি নিয়ে *মায়ের ডাক* (১৯৪৬) এবং মহাত্মা গান্ধীর জীবন নিয়ে *ধরার দেবতা* –– পালা রচনা করেন। পালা দুটিতে কিছুটা রূপকের মাধ্যমে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ও মহাত্মা গান্ধীর জীবন চিত্রিত হয়। এভাবেই জীবনী পালার অভিযাত্রা শুরু। এরপর পালাকার পূর্ণচন্দ্র বসু (১৯০৩-১৯৬৩) নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনকে অনেকটা স্পষ্ট রূপ দিলেন *স্বপ্ন সাধনা* পালায়। রঞ্জন অপেরা ১৯৫১ সালে পালাটি মঞ্চস্থ করে। জীবনীপালার এই পর্ব সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রকুমার দের উচ্চারণে প্রকৃত তথ্য জানা যেতে পারে –

> এই সব জীবনী-পালা ছিল রূপক আকারের। সুভাষচন্দ্র, গান্ধীজী, জওহরলাল, শরৎ বসু – ইত্যাদি চরিত্র রূপক আকারে পরিবেশিত হয়েছিল এইসব পালায়। সামাজিক পালার প্রসার হবার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৬৭ সালে নবরঞ্জন অপেরার স্বপনকুমার অভিনয় করলেন বিধায়কবাবুর 'মাইকেল মধুসূদন'। বছরখানেক পরে অভিনীত হলো নট্ট কোম্পানির 'করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর'। অতঃপর জীবনীপালার দরোজা খুলে গেল। সঙ্গে-সঙ্গেই আসরে চলে এল সম্পূর্ণ শ্বেতাঙ্গের কাহিনী–হিটলার, লেলিন, নেপোলিয়ান ইত্যাদি।[৪০৪]

শম্ভুনাথ বাগের রচনায় *হিটলার*, *লেলিন*, *নেপোলিয়ান* পালাগুলোর নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন শান্তিগোপাল দে এবং নির্দেশনা দেন অমর ঘোষ।

বাংলাদেশের মঞ্চে সফল জীবনীপালা হলো *মাইকেল*। বিধায়ক ভট্টাচার্যের রচনা ও চারণিক নাট্যগোষ্ঠীর পরিবেশনায় এ পালা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। এ পালার নাম ভূমিকায় অভিনয় করে নটসম্রাট অমলেন্দু বিশ্বাস। মধুসূদনের জীবন ও আদর্শ প্রচার করে তিনি খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছান।

---

[৪০৪] ব্রজেন্দ্রকুমার দে, পৃষ্ঠা ৪৮, উদ্ধৃত. তপন বাগচী, *বাংলাদেশের যাত্রাগান জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ.৭১

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় *হিটলার* (১৯৬৮) পালা রচনা করলেন পালাকার শম্ভুনাথ বাগ। এই পালার মাধ্যেমে যাত্রায় নতুন দিনের আভাস পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের তরুণ অপেরা এবং বাংলাদেশের চারণিক নাট্যগোষ্ঠী এই পালাকে দর্শকপ্রিয় করে। একই বছরে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের শ্রেষ্ঠপুরুষ রাশিয়ার বিপ্লবের মহানায়ক মহামতি লেলিনের জীবনকাহিনি নিয়ে শম্ভুনাথ বাগ রচনা করেন *লেলিন* (১৯৬৮)। এ পালাটিও ঐ দুটি দলের মাধ্যমে দুই ভূখণ্ডে পরিবেশিত হয়। এই পালার জন্যে তরুণ অপেরা আন্তর্জাতিক সোভিয়েত ল্যান্ড নেহেরু পুরস্কার (১৯৭০) লাভ করে। অমলেন্দু বিশ্বাস এই তিনটি পালায় অভিনয়ের মাধ্যমে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। জীবনী-পালার মধ্যে সত্যম্বর অপেরার *তানসেন*, নট্ট কোম্পানির *করুনাসিন্ধু বিদ্যাসাগর*, নিউ প্রভাস অপেরার *হো চি মিন*, রয়েল বীণা কোম্পানির *নটী বিনোদিনী*, ভারতী অপেরার *কবি জয়দেব*, অম্বিকা নাট্য কোম্পানির *বিদ্রোহী নজরুল*, রঙ্গলোকের *চে গুয়েভারা*, চন্দ্রালোক অপেরার *ফকির মজনু শাহ* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ পালাগুলো পশ্চিমবঙ্গের অনুপ্রেরণায় বাংলাদেশের যাত্রাদলগুলোতেও অভিনীত হয়।

চারুবিকাশ দত্তের *বিদ্রোহী চট্টগ্রাম* পালাটি থিয়েটার ও যাত্রা উভয় মাধ্যমেই অভিনয়ের উপযোগী ছিল। এর কাহিনি আবর্তিত হয়েছে চট্টগ্রাম বিদ্রোহের নায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনকে নিয়ে। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার আগে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের অগ্নিপুরুষ সূর্য সেনের শেষ উক্তি :

> তোমাদের জন্যে আমার একটি মাত্র কথা- 'এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও'। তোমাদের শেষ ব্যক্তির শেষ রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত যেন এ-দেশের মুক্তির জন্যে নিঃশেষিত হয়। আমরা যারা জন্মের মত চললাম, তাদের শুভেচ্ছা তোমাদের বর্মের মতো ঘিরে থাকবে। আমরা কেহই মরবো না, জাতির সেবকের বুকে আমরা চিরন্তন হয়ে বেঁচে থাকবো। বল ভাই সব - বন্দেমাতরম্।[৪০৫]

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের ফাঁসির মঞ্চে অবস্থান করে দীনেশ এবং সূর্য সেনের আহ্বান একই সূত্রে গাঁথা। বাঙালির বীরত্বগাঁথা উপস্থাপনের মাধ্যমে জনগণকে ইতিহাসের পাঠদান করাই ছিল এ সমস্ত পালার লক্ষ্য।

৪.৫.১ শম্ভুনাথ বাগ (১৯৩৬-২০০২)

বাঁকুড়া জেলার কারকাবেড়িয়া গ্রামে জন্ম হলেও শম্ভুনাথ বাগ মূলত বর্ধমানের বাসিন্দা ছিলেন। *দুঃখে যাদের জীবন গড়া* তাঁর প্রথম রচিত পালা। অভিনেতা হবার স্বপ্ন থাকলেও *ঘুম ভাঙার গান* (১৯৬৭) পালার মাধ্যমে পালাকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। 'জেগে যারা ঘুমুচ্ছে'– এ পালায় তাদের ঘুম ভাঙার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। পালাকার সমাজের শোষিত মানুষের ঘুম ভাঙাতে চেয়েছেন। বিরাজের সংলাপে উচ্চারিত হয়েছে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা দেয়ার প্রসঙ্গ :

---

[৪০৫] চারুবিকাশ দত্ত, *বিদ্রোহী চট্টগ্রাম*, শ্রীগুরু লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৯৫০, পৃষ্ঠা ৯৫।

> সমাজের বুকে যারা সাম্যের প্লাবন এনেছে, তারাই বিপ্লবী। যারা সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে, তারাই বিপ্লবী। যারা সুন্দর সুস্থ রাষ্ট্রের চিন্তায় দেহ-মন বিসর্জন দেয়, তারাই বিপ্লবী।[৪০৬]

পালার গানেও উচ্চারিত হয়েছে নবীনের প্রতি আহ্বান :

> বুঝাবুঝি শেষ হয়েছে, হিসাব-নিকাশ হল শেষ,
> মন হাটুরে চলরে ফিরে, চল ফিরে তোর আপন দেশ।
> (তোর ওই) পুরোনো মাল নতুন হাটে আর বুঝিবা বিকোয় না,
> নতুন দিনের নতুন আলোয় মনের খোরাক মিটোয় না;
> পুরাতনের দিন ফুরলো, (দেশ) পরবে এবার নতুন বেশ।[৪০৭]

তাঁর পালায় উচ্চারিত হয়েছে সমাজের ক্লেদাক্ত মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ। ধনদৌলতের আকাঙ্ক্ষায় যারা প্রকাশ্য পথ ছেড়ে চোরাগলিতে বিচরণ করে –– তাদেরকে সমাজের চোখের সামনে তুলে ধরাই পালাকারের উদ্দেশ্য। পালাকার নানা বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতে চেয়েছেন –– চেয়েছেন তাদের নৈতিক মান উন্নত করতে আর ধনী শোষকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। সেই বাসনাই প্রতিবিম্বিত হয়েছে ধীরাজের সংলাপে :

> ওই অনাচারী শোষণবাদী দাম্ভিক ধনীদের মুখের উপর পাল্টা জবাব দিতে দেশে দেশে গড়ে তুলবে এমনি নতুন বিপ্লবীর দল – যারা রক্ত নেবে, কিন্তু রক্ত দিতেও পিছিয়ে যাবে না, যারা ধন আহরণ করবে কিন্তু সর্বস্ব দান করতেও বিলম্ব করবে না, যারা শাস্তি দেবে কিন্তু ক্ষমার মর্যাদা দিতেও কুণ্ঠা করবে না।[৪০৮]

পৌরাণিক পালা *গণদেবতা*'য় শম্ভুনাথ নতুন ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন। এ পালায় আর্যদের ক্ষমতালিপ্সা, ছলে-বলে-কৌশলে অনার্যদের দাবিয়ে রাখার চিন্তা-ভাবনা সমকালীন স্বদেশকেই চিহ্নিত করে। দেশ-বিদেশের লড়াকু নেতার জীবনী, দাসত্ব-মোচনের সংগ্রামী কাহিনি প্রচারে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ পালাকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরম মুহূর্তে রুশ-জার্মান লড়াই *হিটলার* (১৯৬৮) পালার প্রেক্ষাপট। *হিটলার* প্রযোজনায় ঐতিহাসিক পালা নতুন রূপ পায়। হিটলারের নৃশংস-বর্বরতা বা ইহুদি বিদ্বেষী ভূমিকা পালাকার সুকৌশলে এড়িয়ে যান। পালাশেষে মমতাহীন হিটলারের পরিবর্তে নির্বান্ধব-নির্জনতায় বন্দি মহানেতার আর্তি শোনা যায়:

> অনেকদিন ... অনেকদিন এই মাটির নীচের বুঙ্কারে আবদ্ধ আছি আমরা। এবার মুক্তি পাবো। বুঙ্কারের চিমনী দিয়ে আমাদের ভস্মীভূত দেহ, ধোঁয়ার কুণ্ডুলী হয়ে উঠে যাবে ঊর্দ্ধে – মুক্ত আকাশের বুকে। পৃথিবী হয়তো আরামের নিশ্বাস ফেলবে।[৪০৯]

---

[৪০৬] শম্ভুনাথ বাগ, *ঘুম ভাঙার গান*, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ.১৩৮

[৪০৭] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৪৪

[৪০৮] শম্ভুনাথ বাগ, *ঘুম ভাঙার গান*, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ.১৭২

[৪০৯] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৪৫

ফ্যাসিস্ট হিটলারের পরিচয় যেন পালাকার চিত্তে বিস্মৃত। পালাকারের নায়ক হয়ে উঠেছে দুঃখ-দারিদ্রে বেড়ে ওঠা চর্মকার-সন্তান, বিশ্ব জয়ের স্বপ্নে বিভোর রোমান্টিক হিটলার:

> হিটলার ॥ আমি সাধারণ দরিদ্র পিতার সন্তান। তাই বিলাস ছিল আমার শত্রু। ঠিক এই কারণেই যৌবনের প্রেমময় দিনগুলি আমার কেটেছে রণাঙ্গনে। প্রৌঢ়ত্বের দ্বারে এসেও তোমার প্রতি আমি করেছি অবিচার।
>
> ঈভা ॥ একি হের! তোমার চোখে জল, তুমি না শতাব্দীর আতঙ্ক হিটলার! তুমি না বিশ্বত্রাস হিটলার!
>
> হিটলার ॥ কিন্তু আমি তো মানুষ, সমগ্র জীবন ধরে যে কথা আমার কল্পনার বাইরে ছিল; আজ সে বাস্তব হয়ে আমার সামনে প্রতিভাত হয়েছে। জীবন আর মৃত্যু, প্রেম আর প্রত্যাখ্যান, সংযম আর উন্মাদনা আজ একাকার হয়ে গেছে।[৪১০]

শম্ভুনাথ বাগ প্রতিনিয়তই যাত্রার প্রথাগত ধারণাকে ভেঙেছেন। তার বিরুদ্ধে যাত্রার ঐতিহ্য-হানির অভিযোগ উঠেছে। এমনকি অধিক পট-দীপ-ধ্বনির প্রয়োগের নিন্দা আছে। *মহেঞ্জোদড়ো* পালার ভূমিকায় এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য : 'একটি সংস্কৃতিকে তার প্রাচীন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখলে তার অপমৃত্যুই ঘটবে।'[৪১১] তিনি কখনো অতীতের ইতিহাস ঘেঁটে লিখেছেন *মহেঞ্জোদড়ো* আবার কখনো বিপ্লবী জীবন-গাঁথা *লেনিন*। ভূমি-অধিকারের সংগ্রাম নিয়ে রচিত পালা *রক্তাক্ত তেলেঙ্গানা*।

৪.৬ লোককাহিনিভিত্তিক পালা

গ্রাম বাংলার জনপ্রিয় লোককথা, লোকপুরাণ বা লোককাহিনিকে ভিত্তি করে যেসব পালা গড়ে ওঠে – সে সমস্ত পালাকে লোককাহিনিভিত্তিক পালা বলা যায়। *মৈমনসিংহ গীতিকায়* যাত্রা সম্পর্কে বলতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন জানিয়েছেন: 'উহা হোটেলের মসলা দেওয়া মুখরোচক বিলাস খাদ্য নহে, উহা আমাদের পল্লী অন্নপূর্ণার শ্রী করকমলের দান – জীবন দায়ী অন্ন ব্যাঞ্জন'[৪১২]। *পূর্ববঙ্গ গীতিকার* ভূমিকায় তিনি আরও বলেছেন, 'নানা দিক্ দিয়া এই সকল পল্লীগাথায় খাঁটি বাঙ্গালী জীবনের অফুরন্ত সুধা, অচিন্তিতপূর্ব্ব মাধুর্য্য ঝরিয়া পড়িতেছে।'[৪১৩]

বিশেষ করে ময়মনসিংহ গীতিকা থেকে কাহিনি নিয়ে রচিত পালা যাত্রামঞ্চে বেশ জনপ্রিয়তা পায়। ননী গোপাল সরকারের স্বীকারোক্তিতে লোককাহিনিভিত্তিক পালা যাত্রায় রূপান্তরিত হবার তথ্য পাওয়া যায়:

> আমি স্মরণ করতে পারি এমন ছোট বেলার একটি যাত্রাপালা হচ্ছে 'গায়ের মেয়ে'। এটি ময়মনসিংহ গীতিকার প্রথম খণ্ডের ৭ নং পালা। ৪৯৩ ছত্রে রচিত পালা গানটির নাম 'রূপবতী'। এটিই যাত্রাপালা রূপে নেত্রকোণার গ্রামে গঞ্জে অভিনীত হয়েছে। আমার পিতা, নগেন্দ্র ডাক্তার ওই যাত্রাপালাটির পরিচালক, ও স্মারক ছিলেন বিধায় আমি তার পাশে বসে পালাটি উপভোগ করেছিলাম। জাঙ্গালিয়ার ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছিলেন সেই মনীন্দ্র সরকার আমার জ্যেঠামনি, সম্প্রতি ৯৪

---

[৪১০] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৪৫

[৪১১] উদ্ধৃত.দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ.৪৫

[৪১২] দীনেশচন্দ্র সেন, *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৭, পৃ. ৪

[৪১৩] দীনেশচন্দ্র সেন, *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা*, দে'জ পাবলিশিং. কলকাতা, প্র..প্র. ২০০৯, পৃ.১৭

> বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। পালাটির কিছু কিছু নাম পরিবর্তিত ছিল – যেমন রূপবতীর পিতার নাম রাজচন্দ্রের বদলে ছিল জয়চন্দ্র। তেমনি মহুয়ার পালাটি *বাঈদানী* নামে দেওয়ান ভাবনার পালাটি *সোনাই দীঘি* নামে, কমলা পালাটি কমলার বারমাসি নামে যাত্রায় রূপান্তরিত হয়েছে।[৪১৪]

ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত এ ধারার উল্লেখযোগ্য পালাগুলো হলো *মহুয়া*, *সোনাই দীঘি*, *মলুয়া*, *ভাগ্যের বলি* । বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোককাহিনি-কে উপজীব্য করে যাত্রাপালা পরিবেশিত হয়। যেমন: বরিশালের লোককাহিনি থেকে *গুনাইবিবি* ও *ওসমান সিংহ*; খুলনার লোককাহিনি নিয়ে রচিত *মানিকযাত্রা* ছাড়াও *ভাসানযাত্রা*, *জামালযাত্রা* প্রভৃতি পালা হিসেবে বাংলাদেশের মঞ্চে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সঙ্গীতপ্রধান এইসব পালাকে যাত্রদলের ভাষায় গীতিনাট্য বলা হয়। ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে এ ধরণের যাত্রার দল ছিল।

৪.৬.১ ব্রজেন্দ্রকুমার দে

ব্রজেন্দ্রকুমার দে বিশ শতকের প্রথমার্ধে ঐতিহাসিক, কাল্পনিক, সামাজিক পালা রচনায় ও পরিবেশনায় নানামাত্রার আধুনিকতা যুক্ত করেন। ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে তাঁর পালা রচনায় *মৈমনসিংহ গীতিকা*র নানান আখ্যান বিষয়বস্তু হিসেবে রূপলাভ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *সোনাইদিঘি* (১৯৫৯, দেওয়ান ভাবনা বা সুনাই সুন্দরী গীতিকা অনুসরণে), *লোহার জাল* (১৯৬০, কমলা গীতিকা অনুসারে), *সতীর ঘাট* (১৯৬১, মলুয়া গীতিকা অবলম্বনে), *মহুয়া* (১৯৬১, মহুয়া গীতিকা অবলম্বনে), *কবি চন্দ্রাবতী* (১৯৬১, চন্দ্রাবতী গীতিকা অবলম্বনে) প্রভৃতি। *মহুয়া* পালার বিষয়বস্তু মহুয়া-নদেরচাঁদের শাশ্বত প্রেমের কাহিনি। সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত হয় রেকর্ড সৃষ্টিকারী পালা *সোনাই দীঘি*। এ পালার অভিনবত্ব সম্পর্কে পালাকারের বক্তব্য:

> ছত্রিশ বছর ধরিয়া আমি যাত্রাজগতের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কখনও দেখি নাই কোন একটি বিশেষ নাটকের অভিনয় দেখার জন্য এমন দুর্ব্বার জনস্রোত, আর মুদ্রিত নাটকের জন্য এমন হাজার হাজার পত্রের তাগিদ। শুধু যাত্রার খোলা আসরেই নয়; বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চেও এ নাটক তিনদিন পরিবেশন করা হইয়াছে; সেখানেও দেখিয়াছি কল্পনাতীত ভীড়।[৪১৫]

সোনাই-এর আত্মত্যাগের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে *দেওয়ান ভাবনা* গীতিকায়। মায়ের হাত ধরে মামার বাড়ি দীঘলপ্রাসাদে এসে বেড়ে উঠতে থাকে পিতৃমাতৃহীন সোনাই। সুন্দরী সোনাই এর ওপর স্থানীয় দেওয়ান ভাবনার দৃষ্টি পড়ল। এদিকে স্থানীয় জমিদার-পুত্র মাধবকে সোনাই ভালোবাসে। মাধবও সোনাইকে পছন্দ করে বিয়ে করে। সোনাইকে হারানোর ব্যর্থতায় দেওয়ান ভাবনা কৌশলে প্রথমে মাধবের বাবা এবং পরে বাবাকে উদ্ধার

---

[৪১৪] স্বপনকুমার পাল (সম্পাদিত), *নেত্রকোণার লোকজগত*, ননী গোপাল সরকার, লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডারে নেত্রকোণার যাত্রাপালা, স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি, নেত্রকোণা, প্র.প্র. মার্চ ২০০২, পৃ. ৩২-৩৩

[৪১৫] উদ্ধৃত.প্রভাত কুমার দাস, *যাত্রার সঙ্গে বেড়ে ওঠা*, কারিগর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানু-২০১৪, পৃ.৮৪

করতে আসা মাধবকে কয়েদ করে। পতির উদ্ধারের জন্য দেওয়ানের ফাঁদে ধরা দেয় সোনাই। মাধব মুক্ত হল বটে, কিন্তু সোনাই বিষপান করে। দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন দেখানো যাত্রাপালার অন্যতম আদর্শ। তাই পালাকারের নির্মাণে সোনাই এর আত্মহত্যার পর ভাবনার মৃত্যুদণ্ড দেন নবাব হুসেন শা। ফলে মাধব ও নিশাচরের গুলিতে ভাবনারও মৃত্যু ঘটে। পালাশেষে বাঙালির আবেগকে স্বীকৃতি দিয়ে সোনাই-এর নামে সরোবর গড়েন জমিদার। পালাকারের বর্ণনায় :

> আমার প্রাণ দিয়ে যদি তাকে ফিরে পাওয়া যেত, তাতেও আমার আপত্তি ছিল না। সাতদিনের মধ্যে আমি এ প্রাসাদ ধুলোয় মিশিয়ে দেব আর এখানে খনন করিয়ে দেব এক বিরাট সরোবর। এই দেবীর নামানুসারে সেই সরোবরের নাম হবে সোনাই দীঘি।[৪১৬]

চরিত্র চিত্রণেও গীতিকাটিকে অনুসরণ করেন পালাসম্রাট। মূল গীতিকায় মামির ছায়া ছিল সামান্য : 'ঘরে নাই পুত্র কন্যা তার কেবল সুনাই-এর মামী'। এই কটুভাষী গ্রাম্য চরিত্রের রসনার খরতায় শুধু সোনাই কেন, কারুরই মুক্তি নেই। দুর্ধর্ষ ভাবনাকেও গালির জবাবে সে পালটা গাল দিয়ে বসে:

> ভাবনা ।। চোপরাও কসবি
>
> মুক্তকেশী ।। কসবি তোর মা। দাঁড়া বাঁদির ব্যাটা আঁশবটিটা নিয়ে আসছি। দেখি কেমন মরদ তুই, আর কেমন মহাপুরুষ তোর নবাব হুসেন শাহ।[৪১৭]

জ্যোৎস্না দত্ত এই পালায় অভিনয়ের সূত্রেই যাত্রা জগতের প্রধান অভিনেত্রী হিসেবে জনপ্রিয় হন। সোনাই চরিত্রের মাধ্যমে যাত্রায় প্রথম মহিলা শিল্পীর অংশগ্রহণ ঘটে। এই সময় থেকেই নারী চরিত্রে পুরুষ অভিনেতার দল বিদায় নেয়। ১৯৬৪ সালে এই পালাও জনপ্রিয়তার দাবিতে গ্রামোফোন রেকর্ডে ধৃত হয়েছে (N 83076-N83082), এবং (N 83096-N83102, HMV Records)।[৪১৮] এভাবেই ব্রজেন্দ্রকুমার দে লৌকিক-কাহিনিকে উপজীব্য করে অনেক পালা রচনা করেন।

বর্গী এলো দেশে যাত্রাপালায় মারাঠা দস্যুদের দমন করতে যাওয়ার প্রাক্কালে তরুণ সিরাজের (তখনো মসনদে বসেননি) ভাষণ ছিল এরকম : 'শস্য শ্যামলা বাংলা। রূপের তোমার অন্ত নাই, ঐশ্বর্যের তোমার সীমা নাই, আমি তোমায় ভালোবাসি সোনার বাংলা।' (প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য) একই দৃশ্যে নবাব আলীবর্দী খাঁ দৌহিত্র সিরাজকে বলেছেন :

---

[৪১৬] শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, *সোনাইদীঘি*, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই, পৃ. ১৫১

[৪১৭] শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, *সোনাইদীঘি*, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই, পৃ. ১৩০

[৪১৮] দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলন ও সম্পাদনা), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা* ৩, দ্বিতীয় খণ্ড: প্রথম অংশ বিশ শতক, সাহিত্য অকাদেমি, প্র. প্র.-২০০৮, পৃ. ৩৫

> শোন সিরাজ, বাংলার মধুচক্রের মোহে আফগান এসেছে, এসেছে মারাঠা, এসেছে কত লুণ্ঠনকারী দস্যু। তারা ধনরত্ন নিয়েছে। কিন্তু মাটি নেয়নি। এই ইংরেজ বেনিয়াদের বাংলার মাটিতে শিকড় গজিয়ে বসতে দিও না। তাহলে এরা বাংলার মাটিশুদ্ধ তুলে নিয়ে বিলেতে চালান দেবে।

ব্রজেন দের আরেকটি অভিনয় সমৃদ্ধ পালা *আঁধারের মুসাফির* (১৯৭৪)। প্রধান চরিত্র নির্যাতিত এক বিদেশি তরুণ ওসমান বাংলার হেতমপুর পরগণার অধিপতি হেতম খাঁকে করজোড়ে বলছে :

> জাঁহাপনা, দিগন্ত বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, বাংলার আকাশে বাতাসে অপরূপ ঢেউ খেলানো মায়া আমাকে মুগ্ধ করেছে। বহু দেশ পর্যটন করে ঘুরতে ঘুরতে এই বাংলায় এসেছি। এমন মহিমাময় সৌন্দর্য আমি আর কোথাও দেখিনি। এই দেশ ছেড়ে আমি যাব না জনাব। (প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)

১৯৬৮ সালের পরবর্তী সময়কে ব্রজেন্দ্রকুমার যাত্রার 'অন্ধকার যুগ' হিসেবে চিহ্নিত করেন। অনাবশ্যক চাকচিক্য ও মেকি আবেগে যাত্রার ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে থাকে। যাত্রা ক্রমশ 'খিস্তি খেউর আর নগ্ন নৃত্যের আখড়ায়' পরিণত হয়ে যাওয়ায় তিনি দুঃখ পেলেন। ষাটের দশকের সূচনায় শোভাবাজারে যাত্রার আনন্দ উৎসবের মাঝেও তাঁর আশঙ্কা ব্যক্ত হয়:

> এত আনন্দের মধ্যেও বুক অল্প অল্প কাঁপছে। এই বিপুল জনপ্রিয়তা আরও জনস্রোতকে যাত্রামুখী করবে। জনপ্রিয়তা নিয়ে আসবে প্রচুর অর্থ। অর্থ যেখানে মধুলোভা মৌমাছিও সেখানে। আর মৌমাছির হুলত কম যন্ত্রণাদায়ক নয়। সম্পূর্ণ পাটোয়ারী বুদ্ধি এসে হয়ত যাত্রার আসরে বাসা বাঁধবে। যারা যাত্রা কখনও দেখেনি, হৃদস্পন্দন শোনেনি, তারাও হবে শিল্পী, প্রযোজক, পালাকার, সুরস্রষ্টা। সেদিন যদি সত্যিই কখনও আসে তাহলে যাত্রা আর যাত্রা থাকবে না।[৪১৯]

তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা অচিরেই সত্যে পরিণত হয়। ভবিষ্যতে নিরাপত্তার আশঙ্কায় যাত্রায় মহিলাশিল্পীদের নিযুক্তিকে তিনি অত্যন্ত কঠিন ভাষায় সমালোচনা করেন। অশ্লীলতা ও অরুচিকর তৃতীয় শ্রেণির হিন্দি-বাংলা চলচ্চিত্রের নকল থেকে প্রতিকার চেয়ে প্রবন্ধ লিখেন পত্র-পত্রিকায়। একের পর এক পালা লিখে এই অন্ধকার যুগের অবসান করতে চেয়েছেন । উল্লেখ্য, আধুনিকতার নামে যাত্রায় যখন সঙ্গীতের সংখ্যা কমে গিয়ে কুরুচিকর নৃত্যের সংযোজন আবশ্যক হয়ে উঠল – তখন একমাত্র তিনিই *কলঙ্কিনি রাই* (১৯৭২) বা *নটী বিনোদিনী* (১৯৭৩) এর মতো ভক্তিরসাশ্রিত পালা লিখে নিজস্ব ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করেন। এই অন্ধকার যুগে তিনি একের পর এক জীবনীমূলক পালা লিখেন। যার প্রথম সাফল্য আসে নট্ট কোম্পানিতে অভিনীত *করুণাসিন্ধু বিদ্যাসাগর* (১৯৬৮) এর মাধ্যমে। এছাড়া *মৃত্যুঞ্জয়ী সূর্যসেন* (১৯৬৯), *মুজিবের ডাক* (১৯৭২), *ভারতপথিক রামমোহন* (১৯৭৪) ও *বিদ্রোহী নজরুল* (১৯৭৪) তাঁর জনপ্রিয় জীবনীপালা। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের কাহিনির ব্রজেন্দ্রকুমারকৃত পালারূপ *বিন্দুর ছেলে* (১৯৬৯) নট্ট কোম্পানিতে এবং *শুভদা* (১৯৭১) ভারতী অপেরায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত

---

[৪১৯] উদ্ধৃত.প্রভাত কুমার দাস, *যাত্রার সঙ্গে বেড়ে ওঠা*, *কারিগর*, কলকাতা, প্র. প্র. জানু-২০১৪, পৃ.৮৫

হয়। ব্রজেনবাবু ষাটের দশকের শুরুতে সামাজিক নাটক নিয়ে নতুন যুগের সূচনা করেন। শুধু রচনার বিষয়বস্তুতে অভিনবত্বই নয়, অভিনয় রীতিতেও পরিবর্তনের হাওয়া লাগে। সাধারণ ঘরোয়া পোশাক পরিচ্ছদ, কথ্যভঙ্গিতে স্বাভাবিক সরল সংলাপের ব্যবহার, এমনকি অনাড়ম্বর সেট নির্মাণ ও দৃশ্য উপস্থাপন প্রভৃতি নানা ঘটনা ঘটে যাত্রাপালায়। সামাজিক পালা সহজ মনে করে নতুন উদ্যমে পালা লিখতে বসেন পালাকাররা। যদিও বিষয় হিসেবে তারা নির্বাচন করেন সমাজের নিচুতলার মানুষের জীবন সংগ্রামের কথা। যা বিশেষত মঞ্চ ও সিনেমার তৃতীয় শ্রেণির কোনো কাহিনির অনুকরণ। প্রধানত হিন্দি ছবির চমকপ্রদ কিংবা সস্তারুচির কোনো কোনো গল্পই অবিকল পরিবেশিত হতে থাকে এ সমস্ত যাত্রায়।

যাত্রাশিল্পের পালাবদল ঘটাবার প্রবণতাই ব্রজেন্দ্র কুমার দে কে 'পালাসম্রাট' উপাধি এনে দেয়। ব্রজেন্দ্রকুমার মনে করেন যাত্রার মধ্য দিয়ে মানুষকে সমাজ সচেতন করে তোলা সম্ভব। তাই মানবিক চেতনা, শ্রেণি বৈষম্য বিরোধী ও মৌলবাদ বিরোধী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিষয় তাঁর পালায় পরিবেশিত হয়। তাঁর রচনা সম্পর্কে মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮) এর মন্তব্য :

> প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ধরে দেড় শতাধিক যাত্রার পালা নাটক রচনায় মাধ্যমে তিনি দেশের জনসাধারণকে যে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক নাটকের কাহিনী পরিবেশন করে গেছেন, সে ছিল আনন্দের মাধ্যমে জনশিক্ষা দানের এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। আনন্দের মাধ্যমে তিনি শিক্ষিত অশিক্ষিত দেশবাসীকে পরিবেশন করে গেছেন জাতির ধর্মচেতনা, নীতিবোধ, গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এবং ঐতিহ্য, জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন দেশাত্মবোধে এবং উদ্দীপ্ত করে গেছেন অধঃপতিত জীবন থেকে উন্নততর জীবনে উত্তরণের মহামন্ত্রে। ... আধুনিক যাত্রাপালার গোত্রান্তর ঘটাতে তিনি ছিলেন এক অপরাজেয় কারিগর।[৪২০]

১৯৪৭-১৯৭১ সময়পর্বে যাত্রায় ব্রজেন্দ্রকুমার দের বহুমাত্রিক অবদানকে নিম্নোক্ত সূত্রাকারে উপস্থাপন করা যেতে পারে:

১. ব্রজেন্দ্রকুমার ময়মনসিংহ গীতিকার অনেক প্রধান ও জনপ্রিয় কাহিনিকে যাত্রায় পরিবেশন করেন। তাছাড়া জীবনীমূলক পালা রচনায়ও তিনি অভিনবত্ব আনেন। যাত্রার সংস্কার সাধন করতে গিয়ে তিনি রুচিশীল কমিক চরিত্রদের অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে বিশুদ্ধ স্যাটায়ার ও হিউমার পালায় পরিবেশিত হয়। ব্রজেন দে জানিয়েছেন: ''আমার 'দেবতার গ্রাস' নাটক থেকে আজ পর্যন্ত আর একটি জিনিষ যাত্রাপালায় সন্নিবেশিত হয়ে আসছে, সেটি হলো humour;"[৪২১] এ পালার চন্দ্রচূর চরিত্রের মাধ্যমে এই রীতির আরম্ভ। উদাহরণ হিসেবে *বাঙালি*'র

---

[৪২০] মন্মথ রায়, জ্যেষ্ঠের শোক, দেবযানী মুখোপাধ্যায়, *পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে ও বাংলা যাত্রা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্র.প্র.১৪১৩, পৃ.২১৭

[৪২১] ব্রজেন্দ্রকুমার দে, বাংলায় যাত্রানাটক রচনার বিবর্তন, অরূপ দাস (সম্পাদিত), *তাঁতঘর*, *পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে বিশেষ সংখ্যা*, ২০০৮, একুশ শতক, কলকাতা, পৃ.১৮৮

সত্যপীর, *পুরুষোত্তম (১৯৫৪) এর* কুম্ভকর্ণ, *বর্গী এল দেশে (১৯৬০)* এর দিবাকর, *নটী বিনোদিনী* পালার গিরিশ, অমৃতলাল প্রভৃতি চরিত্ররা পালাগুলিকে পূর্ণতা দিয়েছে।

২. হাস্যরসকে ওতপ্রোতভাবে পালার সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া এবং আদিরসের প্রাবল্য হ্রাস –– পালারচনায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ দুটি অবদান। ব্রজেন্দ্রকুমারের পূর্ববর্তী পালাকারদের পালায় হাস্যরস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল পালার সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং সংলাপ ছিল ভাঁড়ামি ও অশ্লীলতাপূর্ণ। কিন্তু তিনি *নটী বিনোদিনী* পালায় অশ্লীলতা বাদ দিয়ে গণিকা পল্লির চিত্র আঁকেন।

৩. তিনি অনেক পালায় ছদ্মবেশী চরিত্র সৃষ্টি করেন। উদাহরণস্বরূপ: *সোনাই দীঘি* পালায় হোসেন শাহ, *সম্রাট জাহান্দার শাহ্* পালায় জাহান্দার, *বিচারক* পালায় বিক্রমাদিত্য, *বাঙালী* পালায় মোবারক, *যাদের দেখে না কেউ পালায়* গৌতম প্রমুখ।

যাত্রাপালার সাহিত্যমূল্য নিশ্চিত করেন পালাসম্রাট। ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর পেশাদার যাত্রার সংস্কার সাধনে অসম্পূর্ণ কাজগুলো ব্রজেন্দ্রকুমারই সম্পন্ন করেন। ফণীভূষণের সঙ্গে সমকণ্ঠে বলা যেতে পারে যে, 'যাত্রাশিল্পকে, যাত্রাসাহিত্যকে কেউ যদি শিক্ষিত মহলের গ্রহণযোগ্য করে থাকেন, তিনি ব্রজেন্দ্রবাবু।'[৪২২] GK K_vq বলা যায়, ব্রজেন্দ্রকুমার বাংলা যাত্রায় নবযুগের প্রবর্তক। ১৯৭৩ সালে নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলনে তিনি 'শ্রেষ্ঠ নাট্যকার' হিসেবে পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি 'লোকনাট্যগুরু' উপাধি অর্জন করেন। ১৯৭৬ সালের ১২ মার্চ তিনি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

৪.৬.২ জিতেন্দ্রনাথ বসাক (জন্ম ১৯১৭)

জিতেন্দ্রনাথ বসাক জামালপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। চাকরি ও পড়ালেখার পাশাপাশি তিনি সখের যাত্রাদলে অভিনয় করেন। তাঁর রচিত প্রথম পালা *মানুষ* (১৯৫৪)। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য পালাগুলো হলো : *বিদ্রোহী বাঙ্গালী (১৩৫৮)*, *কাজলগড় (১৩৬০)*, *জয়যাত্রা (১৩৬৪)*, *ফরিয়াদ*, *লালবাঈ (১৩৬৭)*, *কৃষ্ণকালিন্দী (১৩৬৮)*, *মীরাবাঈ*, *কংস*, *সূর্যলগ্ন*, *জীবন জিজ্ঞাসা*, *সোনার হরিণ*, *জানোয়ার*, *বাগদত্তা* প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *দুর্গেশনন্দিনী* ও *আনন্দমঠ* উপন্যাসের পালারূপ তাঁর কৃতিত্বের পরিচায়ক। জীতেন বসাক তাঁর পালাতে হিন্দু সমাজের কুসংস্কার ও বর্ণভেদ প্রথাকে কঠোর সমালোচনা করেন। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির বার্তা তাঁর ঐতিহাসিক পালাগুলোতে ধ্বনিত হয়েছে। ছন্দোময় সংলাপ ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি 'সাহিত্য সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত হন। বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি –– এসবই ছিল পালা রচনার প্রেরণা। বিষয়বস্তুর সঙ্গে ছন্দোময় সংলাপ রচনায় তিনি ছিলেন পারদর্শী।

---

[৪২২] সৌমিত্র কুমার চ্যাটার্জী (সম্পাদিত), *পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে স্মারক পুস্তিকা*, নাট্যকথা, কলকাতা, ২০১৫, পৃ.২২

বাগদত্তা পালার ভূমিকায় তাঁর উচ্চারণ : 'বাংলার সম্পদ, বাংলার উন্নতি, বাংলার গৌরব দিল্লি কোনোদিনই সহ্য করতে পারেনি। বুঝি আজো পারে না।' এটিই পালার মূল প্রেরণা। দিল্লির সম্রাট তখন গিয়াসুদ্দিন বলবন। তিনি কথায় কথায় বাংলা আক্রমণ করতে চান। শাহ্জাদা বাঘরা খাঁ পিতার চরিত্রের বিপরীত। তিনি বাংলাকে ভালবাসেন। সম্রাটের আদেশে পুত্র বাঘরা খাঁ অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেনাপতি দৌলত খাঁর বাংলা অভিযানে যোগ দেন। এক পর্যায়ে সেনাপতিকে লক্ষ করে বাঘরা খাঁর সংলাপ :

> রাজমহলের পথে বাংলায় প্রবেশ করে বাংলাদেশের যে কোমল স্নিগ্ধ শান্তরূপ আমি দেখেছি, তাতে আমার মনে হয় এদেশের মানুষগুলো বড় শান্তিপ্রিয়, তোমার মতো অসভ্য নয়। বড় মায়া-মমতায় ঘেরা বাংলাদেশের মানুষের মন। (তৃতীয় অংক, ২য় দৃশ্য)

৪.৬.৩ সত্যপ্রকাশ দত্ত (১৯২৭-২০১৩)

সত্যপ্রকাশ দত্তের জন্ম খুলনা জেলার মহকুমা শহরের সাতক্ষীরায়। তিনি পূর্ববঙ্গের পেশাদার দল আর্য অপেরায় প্রথম পালাকার ও অভিনেতা হিসেবে যোগ দেন। তাঁর প্রথম পালা *অগ্নিবাসর* (১৯৬৫)। এছাড়া তাঁর রচিত তরুণ অপেরায় অভিনীত *পঞ্চনদীর তীরে* (১৯৬৬) এবং জনতা অপেরায় প্রদর্শিত *তামসী* (১৯৬৬) ও *অঙ্গার* (১৯৬৭) পালাদুটি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও রাজনীতির উপর ভিত্তি করে তিনি *বঙ্গবন্ধু মুজিবুর* (১৯৭১) পালা রচনা করেন। *বঁধূ কেন কাঁদে*, *দুই টুকরো বৌমা* – প্রভৃতি সামাজিক পালা রচনায়ও তিনি ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। তাঁর লেখা অন্যান্য পালা *ন্যায়দণ্ড* (১৯৬৮), *লক্ষ্মণবর্জন* (১৯৭০), *মীরার বধূঁয়া* (১৯৮০), *কাগজের ফুল* (১৯৮১), *গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম* প্রভৃতি।

৪.৬.৪ নির্মল মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯৪২)

নির্মল মুখোপাধ্যায়ের জন্ম বাগেরহাট জেলার সন্তোষপুর গ্রামে। অভিনয়ের মাধ্যমে তার যাত্রাজীবন শুরু হয়। নির্মল মুখোপাধ্যায়ের *এক মুঠো অন্ন*, *সোনাডাঙ্গার বউ*, *নিশিপুরের বউ*, *প্রেমের সমাধি তীরে*, *পথের ছেলে*, *জীবন থেকে নেয়া*, *আজকের বাঙালি*, *মমতাময়ী মা*, *গরীব কেন মরে*, *জুয়ারি*, *সিঁদুর নিও না মুছে* (১৯৭৩), *মা যদি মন্দ হয়* (১৯৭৪), *ভাঙছে শুধু ভাঙছে*, *অমানুষ*, *কলঙ্কিনী কেন কঙ্কাবতী* (১৯৭৮), *মানবী দেবী*, *দ্বারকায় এলেন শ্রীকৃষ্ণ*, *রক্ত দিল কারা*, *রণভেরী*, *কবরের নীচে*, *মরমী বঁধূ* (১৯৮১) – প্রভৃতি পালা জনপ্রিয় হয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *কবি* (১৯৭২) এবং নীহাররঞ্জন গুপ্তের *লালুভুলুর* (১৯৭৭) পালারূপ দিয়ে তিনি যাত্রাজগতে ব্যাপক সাড়া ফেলেন। বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন ও সমাজ বাস্তবতা তাঁর যাত্রাপালার মূল উপজীব্য। সামাজিক পালায় কৃতিত্বের জন্য তিনি 'যাত্রার শরৎ' নামে অভিহিত হন।

৪.৬.৫ জসিমউদ্দিন আহমেদ (১৯৩৬-১৯৯৮)

১৯৩৬ সালে জসিমউদ্দিন আহমেদ ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। *গুনাইবিবি*, *রহিম বাদশা ও রূপবান কন্যা*, *আলোমতি ও প্রেমকুমার*, *অরুণ শান্তি*, *ভিখারীর ছেলে*, *সুজন*, *সাগর ভাসা*, *আপন দুলাল*, *কাজল-রেখা*, *গহর বাদশা বানেছাপরী*, *ছয়ফুলমুলক বদিউজ্জামান* প্রভৃতি লোককাহিনি তাঁর রচিত যাত্রাপালার অবলম্বন।

৪.৬.৬ কমলেশ ব্যানার্জি (১৯৩৮-২০০১)

কমলেশ ব্যানার্জি পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার ধামপোড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর *বাঈজীর মেয়ে*, *অভিশপ্ত ফুলশয্যা*, *আমার ছেলে ফিরিয়ে দাও*, *বিশ্বাসঘাতক* (২০১১), *মানুষ নিয়ে খেলা*, *লক্ষ্মীর হাতে ভিক্ষার ঝুলি*, *শাঁখা দিও না ভেঙ্গে*, *হাসির হাটে কান্না*, *জবাব দাও*, *কুল ভাঙা ঢেউ*, *হারানো সুর*, *সমাজ* প্রভৃতি পালা বিভিন্ন পেশাদার-অপেশাদার দলে অভিনীত হয়।

৪.৬.৭ প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (জন্ম ১৯৩০)

প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের জন্ম চব্বিশ পরগণা জেলার বারুইপুর থানার লালন গ্রামে। তিনি সত্যম্বর অপেরায় অভিনেতা হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬২ সালে তাঁর লেখা প্রথম পালা *মসনদ কার* প্রকাশিত হয়। সামাজিক পালা রচনায় প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্যও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। *পৃথিবীর পাঠশালা*, *মানুষ পেলাম না*, *একফোটা অশ্রু*, *পেটের জ্বালা*, *বাসরে বিধবা বধূ*, *আনারকলি*, *বিধবার গায়ে হলুদ*, *রিক্সাওয়ালা (১৯৬৬)*, *রিক্তা নদীর ধারে (১৩৭১)* তাঁর উল্লেখযোগ্য সামাজিক পালা।

৪.৬.৮ জালাল উদ্দিন (জন্ম ১৯৪২)

জালাল উদ্দিন নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার হাইমারা গ্রামে ১৯৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। *গায়ের বুঁকে* (১৯৬৪) তাঁর প্রথম প্রকাশিত যাত্রাপালা। এছাড়া *দুইভাই* (১৯৬৫), *কুসুম-তারা* (১৯৬৭), *ভিখারীর মেয়ে* (১৯৬৭), *ভিখারীর ছেলে* (১৯৬৭), *রাজ্যহারা* (১৯৬৮), *মালীর ছেলে* (১৯৬৮), *রক্তরাঙা বাংলাদেশ* (১৯৭২), *কিছু খেতে দাও* (১৯৯৫), *রঙিলা একটি মেয়ের নাম* (১৯৬৬), *মাঝির মেয়ে* (১৯৯৬) প্রভৃতি পালা প্রকাশিত হয়। সহজবোধ্য সংলাপ ও শব্দের গুণে জালাল উদ্দিনের *কিছু খেতে দাও*, *গাঁয়ের বুকে*, *ভিখারীর ছেলে*, *কুসুম তারা* – প্রভৃতি পালা মঞ্চ সাফল্য পায়।

৪.৬.৯ নফরউদ্দীন আহম্মদ (১৮৯৭-১৯৭২)

বর্তমান নওগাঁ জেলার ধামুরহাট থানার শ্যামপুর গ্রামে ১৮৯৭ সালে পালাকার নফরউদ্দীন আহম্মদের জন্ম হয়। বিখ্যাত *মধুমালা* (১৯৩৬) পালা তারই রচিত। *কাঞ্চনবতী*, *সাগরভাসা*, *বিন্দুমতি*, *পুষ্পমালা* প্রভৃতি লোকায়ত কাহিনিকে ঘিরে তিনি যাত্রাপালা লিখেন। এছাড়া তিনি মীর মশাররফ হোসেনের *বিষাদ সিন্ধু* অবলম্বনে *কারবালা*,

এজিদবধ; ঐতিহাসিক যাত্রা *রাজশ্রী*, *রাখিভাই বা কর্ণবতী* (১৯৩১) কিংবা পৌরাণিক *তারাশাহ* (১৯৩০), *ভাগ্যলিপি*, *ভাগ্যচক্র* প্রভৃতি যাত্রাপালা রচনা করেন। গবেষক মুহম্মদ মজিরউদ্দিনের নফর উদ্দীন আহমদের যাত্রাপালা সম্পর্কে মূল্যায়ন – 'দেশী যাত্রা-আদর্শ তাঁর নাটকে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে।' ১৯৭২ সালে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

৪.৬.১০ মাস্টার সেকেন্দার আলী (জন্ম ১৯২৩)

১৯২৩ সালে সেকেন্দার আলী সিকদারের জন্ম পটুয়াখালী জেলার দুধল গ্রামে। বরিশাল অঞ্চলে তাঁর পিতা মোজাহের আলী সিকদারের সৌখিন গীতিযাত্রার দল ছিল। *রূপবান*, *গুনাইবিবি*, *জরিনাসুন্দরী*, *সাগরভাসা* প্রভৃতি তাঁর দলের জনপ্রিয় পালা। মোতাহের মিয়ার দলটি ১৯৩০ সালে মুসলিম যাত্রা পার্টি নামে রূপান্তরিত হয়। অনেকটা নিজেদের দলের পালা লেখার প্রয়োজনেই পালাকার হিসেবে কলম ধরেন এবং একসময়ে মাস্টার সেকেন্দার আলী নামে বিখ্যাত হন। বিষাদ-সিন্ধু অবলম্বনে ইমাম যাত্রার প্রচলন করেন তিনি। কারবালার করুণ কাহিনিকে আত্মীকৃত করে তিনি রচনা করেন *হাসানের বিষপান*, *হোসেনের অন্তিম শয্যা*, *এজিদ বধ* বা *জয়নাল উদ্ধার* পালা। এছাড়া তাঁর *সাতভাই চম্পা*, *বেদকন্যা*, *গৌড় সুলতান*, *নৌকা বিলাস*, *শ্যামারূপ* পালাও জনপ্রিয় হয়।

৪.৬.১১ মতিউর রহমান (জন্ম ১৯২৪)

নরসিংদী শহরে ১৯২৪ সালে মতিউর রহমানের জন্ম হয়। তাঁর রচিত ১৪ টি পালার মধ্যে ৬ টি পালা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। *রাজসিংহাসন* (১৯৭৫), *গরীবের আর্তনাদ* (১৯৭৮), যৌতুক হলো অভিশাপ (১৯৮২) *মানুষ অমানুষ* (১৯৮৯), *ঘুমন্ত সমাজ* (১৯৯৩), *শাহী ফরমান* (১৯৯৬), *মধুমালতী রূপকুমার* (১৯৯৭) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য যাত্রাপালা। ঐতিহাসিক, বাস্তবিক নানান সমাজ জিজ্ঞাসা উঠে আসে তাঁর পালায়।

৪.৬.১২ আসিরউদ্দিন আহমদ (১৯২৫-২০০৬)

১৯২৫ সালে আসামের বিলাসীপাড়ায় আসিরউদ্দিন আহমদের জন্ম হয়। *দৈনিক আজাদ*, *দৈনিক ইত্তেফাক* প্রভৃতি পত্রিকার সাংবাদিক আসিরউদ্দিন ১৯৫৭ সালে 'মিনার্ভা থিয়েটার' গঠন করেন। যাত্রাশিল্পের উন্নয়নকল্পে 'যাত্রা শিল্পী কুশলী ইউনিয়ন' নামে তিনি একটি সংগঠন করেন। তাঁর প্রকাশিত চলচ্চিত্র বিষয়ক *ঝিনুক* পত্রিকায় যাত্রানুষ্ঠানের খবর গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হতো। *ঈশা খাঁ* তাঁর অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বহুল অভিনীত একটি পালা।

৪.৬.১৩ কফিলউদ্দিন আহম্মদ (জন্ম ১৯২৭)

ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইলে ১৯২৭ সালে পালাকার কফিলউদ্দিন আহম্মদের জন্ম। মোহাম্মাদ আলী চৌধুরীর 'সোনালী অপেরায়' দীর্ঘদিন যাবত যাত্রাশিল্পী (অভিনেত্রী ও সুরকার) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর রচিত

উল্লেখযোগ্য পালাগুলো হলো: *নিজাম খুনী*, *আপন দুলাল*, *সৎমা*, *পিতা-পুত্র*, *স্বামী-স্ত্রী*, *নদের নিমাই*, *লায়লা মজনু*, *শিরি ফরহাদ*, *সাত ভাই চম্পা* প্রভৃতি। ১৯৮৭ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

৪.৬.১৪ চিত্তরঞ্জন পাল (১৯৩২-২০০৩)

যাত্রানট, নাট্যকার ও নির্দেশক চিত্তরঞ্জন পালের জন্ম ১৯৩২ সালে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী থানার বাওয়ান গ্রামে। বাংলাদেশের জয়দূর্গা অপেরা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), ভোলানাথ অপেরা, মহাশক্তি অপেরা, ও ভাগ্যলক্ষ্মী অপেরায় তিনি নানা সময়ে কাজ করেন। স্বাধীনতার পরে তিনি চারণিক নাট্যগোষ্ঠী, গণেশ অপেরা, নবপ্রভাত অপেরা, প্রগতি অপেরা, বলাকা অপেরা প্রভৃতি যাত্রাদলে নট, নাট্যকার ও নির্দেশক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। *ফকির লালন সাঁই*, *ভাঙাগড়া*, *বিষের বাসর*, *শেখ পরিবার*, *দানবীর মহসিন* প্রভৃতি তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য পালা। ২০০৩ সালে মানিকগঞ্জ শহরে তিনি পরলোকগমন করেন।

৪.৬.১৫ এম আশরাফ আলী (জন্ম ১৯৩৫)

ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ থানার মামদীপুর গ্রামে ১৯৩৫ সালে এম আশরাফ আলীর জন্ম। বুলবুল অপেরায় নারীশিল্পী হিসেবে তাঁর পেশাদার অভিনয় জীবন আরম্ভ হলেও শেষজীবনে নেত্রকোণার শহীদ মিয়ার মনিহার অপেরার নির্দেশক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। *মীরাবাঈ* তাঁর বিখ্যাত পালা।

৪.৭ পূর্ব-বাংলার যাত্রাদলের ইতিহাস

প্রাচীনকাল থেকেই পূর্ব-বাংলায় যাত্রাভিনয় হয়ে আসছে। ষোড়শ শতকে চৈতন্য মহাপ্রভুর যাত্রাভিনয়ের প্রসঙ্গ প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। আঠারো শতকের প্রথম পাদ থেকেই যাত্রাভিনয়ের ধারাবাহিক তথ্য পাওয়া যায়। উনিশ শতকে যাত্রাওয়ালা কৃষ্ণকমল গোস্বামীর (১৮১০-১৮৮৮) *স্বপ্নবিলাস* (১৮৭২), *দিব্যোন্মাদ* (১৮৭৩) ও *বিচিত্র বিলাস* (১৮৭৪) তিনটি পালাই যাত্রা সাহিত্যের প্রথম মুদ্রিত দলিল। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর সমসময়েই পূর্ব-বাংলায় পেশাদার যাত্রাচর্চা শুরু হয় বলে ধারণা করা যায়। ১৮৬৪ সালে অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *শকুন্তলা গীতাভিনয়* রচিত ও পরিবেশিত হয়। *হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রিকার তথ্য মতে এটি প্রথম বাংলা গীতাভিনয়। ১৮৭০ সালের দিকে কুষ্টিয়া জেলার খোকসায় একটি যাত্রাদলের খবর পাওয়া যায়। এটি মহেশ ঠাকুরের দল নামে পরিচিত ছিল। মুকুন্দদাসের তত্ত্বাবধানে বরিশালেই প্রথম ১৯০৫ সালে যাত্রার দল গঠিত হয়। তারঁ এই দল 'স্বদেশী যাত্রাপার্টি' নামে খ্যাতি অর্জন করে। মুকুন্দদাসের যাত্রাপালার জনপ্রিয়তায় গড়ে উঠতে থাকে বিভিন্ন যাত্রাদল।

১৯০৬ সালে 'নাগ-দত্ত-সিংহ-রায় কোম্পানি' জন্ম লাভ করে। ঝালকাঠির কৃষ্ণকাঠি গ্রামের রজনীকান্ত নাগ, বাদলকাঠি গ্রামের মহেন্দ্রনাথ সিংহ এবং আরো দুই অধিকারীর কৌলিক পদবি অনুসারে এই দলের নামকরণ করা

হয়। ১৯০৭ সালে এই দল ভেঙে রজনীকান্ত নাগ ও মহেন্দ্র সিংহ মিলে গঠন করেন 'নাগ সিংহ কোম্পানি'। এ বছরই ফরিদপুর জেলার (বর্তমান শরিয়তপুর) নড়িয়ার মহেন্দ্রকুমার সেন 'আদি ভোলানাথ অপেরা' গঠন করেন। ১৯০৭ সালে 'নাগ-সিংহ কোম্পানি' ভেঙে যায়। ফলে রজনীকান্ত নাগের 'নাগ কোম্পানি' এবং মহেন্দ্রনাথ সিংহের 'সিংহ কোম্পানি' জন্মলাভ করে। ১৯০৯ সালে ঝালকাঠি জেলার নলছিটি নিবাসী রজনীকান্ত চক্রবর্তী গঠন করেন 'ঠাকুর কোম্পানি' নামের যাত্রাদল। সূর্যদত্তও এ দলে কাজ করতেন। সেকালের বিখ্যাত 'ড্যান্সমাস্টার' বসুড়ার রাইচরণ শীলও এই দলে ছিলেন। ১৯১০ সালে ঢাকায় অক্ষয়বাবু নামে এক ব্যক্তির যাত্রা দল খোলার খবর পাওয়া যায়। এই দল 'অক্ষয়বাবুর দল' নামে পরিচিতি পায়। এ সময় নোয়াখালীতে কৃষ্ণচন্দ্র সাহার দল খুব জনপ্রিয় হয়। 'কেস্ট সাহার দল' নামেই এটি সুপরিচিত হয়। যশোরের 'নীল মাধবের দল'ও অত্যন্ত সুনাম অর্জন করে।

১৯১৪ সালে ঝালকাঠির মাছরঙ গ্রামের বৈকুণ্ঠনাথ নট্ট 'মাছরঙ বৈকুণ্ঠ সঙ্গীত সমাজ' গঠন করেন। পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে এ সময়ের যাত্রাচর্চা সম্পর্কে আলোচনা করেন।[৪২৩] বাংলাদেশের কয়েকটি যাত্রাদলের নাম পাই আমরা সাত বছর বয়সী ব্রজেন দের বর্ণনায় :

> পেশাদার যাত্রার দল আমাদের ছেলেবেলায় কটাই বা ছিল ? কলকাতার প্রসন্ন নিয়োগী, মথুর সা, শশী অধিকারী, মতি রায়, শ্রীচরণ ভাণ্ডারী, আর পূর্ববঙ্গে বৈকুণ্ঠ নট্ট, ব্রজবাসী, উমানাথ ঘোষাল, ঠাকুর কোম্পানি ও গুহরায়। এছাড়া সারা বাংলায় সখের দলের অবশ্য সংখ্যা ছিল না।[৪২৪]

১৯১৫ সালে ঝালকাঠিতে নারী পরিচালিত প্রথম যাত্রাদল গঠিত হয়। শ্রীমতি বোঁচা নামের এক নারী এর অধিকারী ছিলেন। তাই 'বোঁচার দল' নামেই দলটি পরিচিত হয়। মূলত এই দলের মাধ্যমেই যাত্রায় নারীশিল্পীর অংশগ্রহণ আরম্ভ হয়। ১৯১৬ সালে বরিশালে ফতুল্লাবাদের স্বর্ণকুমার রায়, রমনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও বাদালকাঠির রজনীকান্ত গুহ 'পাষাণময়ী অপেরা' গঠন করেন। একই জেলায় ১৯১৮ সালে বিশ্বগ্রামের কালীচরণ নট্ট প্রতিষ্ঠা করেন 'বিশ্বগ্রাম নট্ট কোম্পানি'।

১৯২০ সালে নড়াইলে গৌড়চন্দ্র প্রামাণিকের যাত্রাদল 'গৌড় প্রামাণিকের দল' নামে পরিচিত হয়। ঝালকাঠির বৈকুণ্ঠনাথ নট্টের হাতে জন্ম নেয়া 'নট্ট কোম্পানি যাত্রাপার্টি' (১৯২৪) বর্তমান সময় পর্যন্ত দুই বাংলায় সুনামের সঙ্গে জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছে। ১৯২৮ সালে বরিশালের বানারিপাড়ায় কালিয়দমন গুহঠাকুরতা গঠন করেন 'রণজিৎ অপেরা'। পটুয়াখালীর মোজাহের আলী সিকদার পরিচালিত 'মুসলিম যাত্রাপার্টি' মুসলমান পরিচালিত

---

[৪২৩] ১৯৭৪ সালে 'ছেলেবেলায় দেখা যাত্রার স্মৃতি' প্রবন্ধে তিনি ষাট বছর আগের অর্থাৎ ১৯১৪ সালের স্মৃতি বর্ণনা করেছেন।

[৪২৪] ব্রজেন দে, *যাত্রার সেকাল একাল*, উদ্ধৃত, তপন বাগচী, *বাংলাদেশের যাত্রাগানের চালচিত্র*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় প্র. মে ২০১৪, পৃ ৩৯

প্রথম যাত্রাদল। বরিশালের কে এম বশিরউদ্দিন এই দলে সুরকার হিসেবে কাজ করেছেন। এ দলে মঞ্চায়িত বেশ কিছু পালার তিনি পালাকার। মোজাহার আলী সিকদার 'বাবুল যাত্রাপার্টি' (১৯৬৬) নামের আরেকটি যাত্রাদল গঠন করেন।[৪২৫]

১৯৩১ সালে ফরিদপুরের নবদ্বীপচন্দ্র সাহা 'শঙ্কর অপেরা পার্টি' এবং 'নবদ্বীপচন্দ্র সাহা যাত্রা পার্টি' নামে দুটি যাত্রাদল গঠন করেন। সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৩৬) এ দলের প্রখ্যাত অভিনেতা। ১৯৩৪ সালে তিনি 'জাতীয় আনন্দ প্রতিষ্ঠান' নামে একটি দল করেন। পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় এ দলে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থানার চন্দ্রনাথ ধামে শিবচতুর্দশী মেলায় ১৯৩৭-৩৮ সালে যাত্রা পরিবেশিত হয়। অমলেন্দু বিশ্বাসের বর্ণনায় ওঠে আসে সেই যাত্রা প্রত্যক্ষণের চিত্র :

> কলকাতার ভুটুয়া বালক সম্প্রদায়, রঞ্জন অপেরা, অর্ঘ্য অপেরা, ফরিদপুরের নড়িয়ার আদি ভোলানাথ, ঢাকার নারায়নগঞ্জের মথুর সাহ, নবদ্বীপ সাহার যাত্রাদল, বরিশালের নট্ট কোম্পানি প্রভৃতি পেশাদার যাত্রাদল আসর জমাত মেলায়। সেবারই প্রথম পেশাদার যাত্রাদলের পালা দেখার সুযোগ হয় আমার। পালা ছিল বাজীরাও, শিবাজী, রূপসাধনা, বাংলার ছেলে, মায়াশক্তি, মান্ধাতা শুক্রাচার্য ইত্যাদি। প্লেয়ার (তখন অভিনেতাদের প্লেয়ার বলা হত) ছিলেন কালীমদন, গুহ ঠাকুরতা, ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ, সুরেশ মুখার্জী, ফণী মতিলাল, ফণী গাঙ্গুলি, গনেশ গোস্বামী, নলিনী দাস, প্রভাত বোস, ক্ষেত্র চ্যাটার্জী, গুরুপদ ঘোষ, পঞ্চু সেন ও সুনীল মুখার্জী প্রমুখ। নারী চরিত্রে রূপদানকারীদের তখন রানী বলা হতো। সেই রানীদের মধ্যে রেবতী দেবী, হরিপদ বায়েন, নিতাই রানী, সুদর্শন রানী, সুধীর রানী, ছবি রানী প্রমুখ রানীর অভিনয় দেখার সুযোগ পাই।[৪২৬]

তাঁর এই স্মৃতিচারণ থেকে ঐ সময়ের দল এবং শিল্পীদের পরিচয় জানা যায়। ১৯৪৪ সালে মানিকগঞ্জের কার্তিকচন্দ্র সাহা 'অন্নপূর্ণা যাত্রাপার্টি' গঠন করেন। দৌলতপুর থানার বিনোদপুরের 'কানাই-বলাই অপেরা পার্টি' নামের একটি সখের দলের কথা শোনা যায়। সুধীররঞ্জন বসুরায়, গৌরগোপাল গোস্বামী, নীতিশচন্দ্র অধিকারী, আকালী হালদার প্রমুখ তখনকার যাত্রাশিল্পীদের মধ্যে খ্যাতিমান ছিলেন। নীতিশচন্দ্র অধিকারীর পুত্র বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী যাত্রার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

পূর্ববঙ্গ ছিল অনেকটাই কলকাতাকেন্দ্রিক বাবু কালচার প্রভাবের বাইরে। ফলে এ অঞ্চলের জমিদার, তালুকদার শ্রেণি বিত্তশালীদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল অপেশাদার সৌখিন যাত্রাদল। পূর্বপাকিস্তানে তথা পূর্ববঙ্গে সমকালে অপেশাদার যাত্রাশিল্পীরা নানান কর্মকাণ্ডে যাত্রা শিল্পকে ধরে রেখেছিলেন। সে সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জয়দূর্গা অপেরা, গোপালগঞ্জের রায় কোম্পানি, শাহজাদপুরের বাসন্তী অপেরা (১৯৫৪), চট্টগ্রামের বাবুল অপেরা (১৯৫৮), খুলনার রাজলক্ষ্মী অপেরা প্রভৃতি পেশাদার দল হিসেবে গড়ে উঠেছিল। মূলত অর্থলগ্নীর মাধ্যমে মুনাফা

---

[৪২৫] তপন বাগচী, *বাংলাদেশের যাত্রাগানের চালচিত্র*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় প্র. মে ২০১৪, পৃ ২৭০-২৮১

[৪২৬] অমলেন্দু বিশ্বাস, *বাংলাদেশের যাত্রাশিল্প*, শ্রাবণ, ঢাকা, প্র. প্র. মার্চ ২০০৩, পৃ.১৪

অর্জন এসব যাত্রাদলের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বলে, এ দলগুলোর পরিবেশনায় যাত্রার আঙ্গিকগত কোনো পরিবর্তন হয়নি। তবে যাত্রায় বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে। পাশ্চাত্য ধরনের কনসার্ট এবং ব্যালে নৃত্য যাত্রায় অনুপ্রবেশের ফলে যাত্রা তার বৈশিষ্ট্য থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। ১৯৪৭ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার 'জয়দুর্গা অপেরা' প্রতিষ্ঠিত হয়। যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এ দলটি খুবই আলোচিত হয়।

পূর্ব বাংলার যাত্রার প্রকৃত বিকাশ ঘটে মূলত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রে। অখণ্ড বাংলায় পূর্ব বাংলার অভিনেতার সংখ্যা কম ছিল। সেই প্রতিবন্ধকতার উত্তরণ ঘটে পাকিস্তান পর্বে। বিপুল সংখ্যক দেশীয় অভিনেতা-অভিনেত্রী নবগঠিত দল সমূহে যোগ দেয়। অমলেন্দু বিশ্বাসের বর্ণনায়:

> বিভাগপূর্ব যুক্ত বাংলার সাংস্কৃতিক পরিচর্যার কেন্দ্র কোলকাতার সিনেমা, নাটক ও যাত্রায় পূর্ব বাংলার বাঙালদের প্রবেশাধিকার ছিল না বললেই চলে। কারণ হিসেবে বলা হতো বাঙালদের ভাষায় গলদ আছে। পূর্ব বাংলার মানুষদেরও ধারণা ছিল যে, পশ্চিম বাংলার কলকাতা কেন্দ্রিক ভাষাই উৎকৃষ্ট। কিন্তু নাটকীয় ভাষা তৈরি করতে হলে যে কোনো অঞ্চলের শিল্পীকেই যে অনুশীলন করতে হয় – এ ধারণায় তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন না বলেই এই জাতীয় মানসিকতা পোষণ করতেন ।
>
> রেডক্লিফ রোয়েদাদে বিভাজিত '৪৭-এর পর পূর্ব পাকিস্তানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীই একমাত্র ব্যক্তি যিনি 'জয়দুর্গা' অপেরা নামে যাত্রাদলের মালিক ছিলেন। সেই অপেরার শিল্পীবৃন্দ কোলকাতা থেকে এদেশে অভিনয় করতে আসতেন এবং মরসুম শেষে দেশে ফিরে যেতেন। বলাই বাহুল্য সেই যাত্রায় অভিনীত পালাগুলি কোলকাতার পালাকারদের সচিত্র মুদ্রিত পালা। যাত্রা-ব্যবসার রমরমা অবস্থায় তিনি দ্বিতীয় দল 'ভোলানাথ অপেরা' খুলে বসলেন। ১৯৫০ সালের দিকে ঝালকাঠিতে 'নাথ কোম্পানি' নামে একটি দলেরও জন্ম হলো। যতীন চক্রবর্তীর দলে এবং ঝালকাঠির 'নাথ কোম্পানি'র দলে পশ্চিম বাংলা থেকে আগত যাত্রাশিল্পীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করে যশস্বী হয়েছিলেন অনেক বাঙাল শিল্পী। ঐসব প্রয়াত ও জীবিত শিল্পীদের নাম এখানে উল্লেখ না করলে তাঁদের প্রতি কৃতঘ্নতা প্রকাশ করা হবে। এঁরা হলেন – শ্যামাচরণ চক্রবর্তী, নয়ন মিয়া, আশরফ আলী, হরিপদ ভট্টাচার্য্য, নগেন নট্ট, গজেন দত্ত ও ওস্তাদ মোহনলাল গাইয়ে।[৪২৭]

১৯৪৯ সালে কমলাপুর ড্রামাটিক ক্লাবের উদ্যোগে মঞ্চস্থ হয় *টিপু সুলতান*। এর নাম ভূমিকায় মুজিবর রহমান খান ও অন্য একটি চরিত্রে আবদুল জব্বার খান (*মুখ ও মুখোশ* ছবির পরিচালক) অভিনয় করেন। এই স্মরণীয় ঘটনার পরের বছরই গোপালগঞ্জে বিধূভূষণ রায় গঠন করেন রায় কোম্পানি যাত্রা পার্টি। ষাটের দশকে অনেক বিখ্যাত যাত্রাশিল্পীর অভিনয়ের সূচনা এই দলেই। ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গার নকুল কর্মকার, নড়াইল-রূপগঞ্জের নন্দ দুলাল অধিকারী ওরফে নন্দরানী, ফরিদপুরের বোয়ালমারীর চিত্ত পাল এদের মধ্যে কয়েকজন। এরা সবাই ষাটের দশকের পরাক্রমশালী যাত্রানট অমলেন্দু বিশ্বাসের পূর্বসূরী ছিলেন।

---

[৪২৭] অমলেন্দু বিশ্বাস, *বাংলাদেশের যাত্রাশিল্প*, শ্রাবণ, ঢাকা, প্র. প্র. মার্চ ২০০৩, পৃ.৩৩

অমলেন্দু বিশ্বাসের কথায় জানা যায় ১৯৫৫ সালে ভোলানাথ অপেরা নামে তিনি আরেকটি দল গঠন করেন। ১৯৪৭ উত্তর সময়ে মেয়েরাও ধীরে ধীরে অভিনয়ে আসতে শুরু করে। পেশাদার বা সৌখিন কোনো দলেই ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের আগে মহিলা শিল্পী অভিনয় করতো না। পুরুষ শিল্পীদের নামের সাথে রানী শব্দ জুড়ে দিয়ে এসময় শিল্পীরা নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন। সর্বপ্রথম এদেশে বাবুল অপেরায় মহিলা শিল্পী হিসেবে যোগ দেন মঞ্জুশ্রী মুখার্জী, জাহানারা বেগম ও রাজলক্ষ্মী অপেরায় বনশ্রী রায়। সময়ের পালাবদলে যাত্রায় নারী চরিত্রে অভিনয় করতে মহিলাদের আগমন ঘটে। ১৯৬২ সালে যাত্রায় নারীদের অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খাঁন। এ আদেশের প্রতিবাদে কোর্টে মামলা হয়। বিক্ষোভে ফেটে পড়েন যাত্রার কলা-কুশলীরা। তাদের সাথে যোগ দেন দেশের সুধীজন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন।

যাত্রা সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষের একান্ত উপলব্ধি রয়েছে, আবার রয়েছে ভ্রান্তধারণাও। গ্রামের সাধারণ দর্শকের কাছে এর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও শিক্ষিত বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গি অনেক ক্ষেত্রে ইতিবাচক নয়। ইসলাম-বিরোধী বক্তব্য থাকার অভিযোগে মোনয়েম খান *রূপবান* যাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এই অভিযোগে খণ্ডাতে গিয়ে জসীমউদ্‌দীন জানিয়েছেন: 'পাঠক খুঁজিয়া বাহির করিবেন এই কাহিনির ভিতরে কোথায় ইসলাম-বিরোধী বক্তব্য আছে।' তিনি আক্ষেপ ও প্রত্যাশা ব্যক্ত করে বলেন:

> কোথায় তাহার (মোনায়েম খান) মত একজন বাঙালী গভর্নর রূপবান যাত্রার রচয়িতাকে খুঁজিয়া আনাইয়া জাতীয় সম্মান দিবেন, তা না করিয়া তিনি এই গানকে নিষিদ্ধ করিলেন। হয়ত দ্বায়িত্বহীন লোকের ভুল সংবাদে তিনি এই গানকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। সমস্ত জানিয়া শুনিয়া তিনি তাঁহার পূর্বমত পরিবর্তন করিবেন এই বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।[৪২৮]

তাঁর সহায়তায় মাস খানেকের মধ্যে সরকার মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

১৯৪৯ সালে গোপালগঞ্জে বিধুভূষণ রায় 'রায় কোম্পানি যাত্রাপার্টি' নামের একটি দল গঠন করেন। স্বাধীনতার কিছুসময় পরেও এরা যাত্রা পরিবেশনা করে। 'বাসন্তী মুক্তমঞ্চ নাট্যপ্রতিষ্ঠান' (১৯৫৪) বাংলাদেশের যাত্রাশিল্পে একটি উল্লেখযোগ্য দল হিসেবে অবস্থান অর্জন করে। সিরাজগঞ্জের নারায়ণচন্দ্র দত্ত ছিলেন এই দলের অধিকারী। অমলেন্দু বিশ্বাস এ দলের পরিচালক ছিলেন। নারীশিল্পী জোৎস্নাা বিশ্বাস ও জয়শ্রী প্রামাণিক ছাড়া তুষার দাশগুপ্ত, ঠাকুরদাস ঘোষ, কালীদত্ত, ফণীভূষণ, অমিয় সরকার প্রমুখ এ দলের পুরুষশিল্পী ছিলেন। চট্টগ্রামের আমিন শরীফ চৌধুরী 'বাবুল অপেরা' (১৯৫৮) গঠন করেন। বিখ্যাত অভিনেতা অমলেন্দু বিশ্বাস ছাড়াও এ দলে সাদেক আলী, নাজির আহমেদ, সাধনা চৌধুরী, মঞ্জুশ্রী মুখার্জী, বেণী চক্রবর্তী, ঊষা দাশ, মকবুল আহমেদ, এম এ হামিদ,

---

[৪২৮] জসীমউদ্‌দীন, আমাদের লোকনাট্য ও রূপবান যাত্রা, উদ্ধৃত. সৈকত আসগর (সম্পাদিত), *বাংলার লোকসংস্কৃতি : যাত্রাশিল্প*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, এপ্রিল ২০০২, পৃ. ৯১

জাহানারা বেগম, শান্তি দেবী প্রমুখ শিল্পী কাজ করেন। অমলেন্দু বিশ্বাস জানিয়েছেন : '...বাবুল অপেরা এদেশে নারী-পুরুষ সমন্বয়ে যাত্রাভিনয় প্রথার প্রবর্তন করে নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেয়।'[৪২৯]

যাত্রাভিনেতা, নির্দেশক ও গবেষক মিলন কান্তি দে বলেন যে, ১৯৫০-৫৫ সাল থেকেই স্কুল-কলেজের সাহায্যার্থে যাত্রানুষ্ঠান হতো। যশোরের ঝিকর গাছা কলেজ, নাভারন কলেজ, নওয়াপাড়া ইনস্টিটিউট, মাগুড়ার শক্রজিতপুর কে পি হাইস্কুল, মানিকগঞ্জ ও নরসিংদীর মহিলা কলেজ প্রাঙ্গনে প্রতিবছরই নিয়মিত যাত্রা হতো। দেশের বিখ্যাত যাত্রাদলের মধ্যে চট্টগ্রামের বাবুল অপেরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জয়দুর্গা অপেরা, সিরাজগঞ্জের বাসন্তী অপেরা, সাতক্ষীরার আর্য অপেরাসহ আরো অনেক যাত্রাপার্টিকে এসমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাত্রানুষ্ঠান করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হতো। ফলে স্কুল-কলেজ তথা গ্রামের বৃহৎ জনগোষ্ঠী যাত্রাশিল্প সম্পর্কে জানতে পারতো। নবাব সিরাজদ্দৌলা, ঈশা খাঁ, শহীদ তিতুমীর –– ইতিহাসের এমন সব জাতীয় বীরের সংগ্রামী জীবনকথা জানার মাধ্যমে তারা উপকৃত হতো।[৪৩০]

১৯২১ সালে জন্ম গোপালকৃষ্ণ পাণ্ডের আদিনিবাস উড়িষ্যায়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার 'জয়দুর্গা অপেরা'র ম্যানেজার গোপাল পাণ্ডে ১৯৬০ সালে 'ভাগ্যলক্ষ্মী অপেরা' এবং ১৯৬২ সালে 'রয়েল ভোলানাথ অপেরা' গঠন করেন। প্রখ্যাত যাত্রানট গোপাল উড়েও উড়িষ্যা থেকে এসেছিলেন। খ্যাতিমান যাত্রাশিল্পী চিত্তপাল, দিগম্বর মালাকার, দীনেশ মাল, নগেন নন্দী, ননী চক্রবর্তী, মায়া চক্রবর্তী, রেখা চক্রবর্তী প্রমুখের হাতেখড়ি এই গোপাল পাণ্ডের হাতে।[৪৩১] ১৯৬৬ সালে ময়মনসিংহের আবদুল হামিদ 'নবরঞ্জন অপেরা' গঠন করেন। ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রামের গোপালচন্দ্র রুদ্র 'গীতশ্রী যাত্রা ইউনিটের' অধিকারী হন। একই বছরে ময়মনসিংহের আবদুল খালেক ভূইয়া গঠন করেন– 'বুলবুল অপেরা'। ১৯৬৮ সালে ফরিদপুরের স্বপনকুমার সাহা 'নিউ বাসন্তী অপেরা'র সত্ত্বাধিকারী হন। ১৯৭০ সালে বাগেরহাটের পরিমল হালদার প্রতিষ্ঠা করেন 'জয়শ্রী অপেরা'। মানিকগঞ্জের গণেশচন্দ্র ঘোষ প্রতিষ্ঠা করেন 'নিউ গণেশ অপেরা' (১৯৭০)। একই বছরে হবিগঞ্জের লিপাই মিয়া 'কোহিনূর অপেরা' গঠন করেন।

সাতচল্লিশ-উত্তর সময়কালে, যাত্রাদলের পরিচালনা ও পরিবেশনা পদ্ধতিতে নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিল। যাত্রাদলের সংখ্যা ছিল বিশ থেকে পঁচিশটি, প্রত্যেক দলের ছয়-সাতটি করে পালা ছিল। শিল্পী বাছাই করা, তাদের প্রশিক্ষণ, দলগত আচরণ ইত্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালিত হতো। শিল্পীকে সম্মানীও দেয়া হতো নিয়মিতভাবে। পালা নির্বাচনে বৈচিত্র্য ছিল। দলের পালার মধ্যে হয়তো দুটো হতো পৌরাণিক, একটি-দুটি হতো ভক্তিমূলক, বাদবাকি ঐতিহাসিক। যাত্রার মৌসুম শুরু হতো সুনির্দিষ্টভাবে দুর্গাপূজার দিন, শেষ হতো ৩০ চৈত্র বাসন্তী পূজায়। বছরের

[৪২৯] অমলেন্দু বিশ্বাস, *বাংলাদেশের যাত্রাশিল্প*, শ্রাবণ, ঢাকা, প্র. প্র. মার্চ ২০০৩, পৃ.৩৪
[৪৩০] মিলন কান্তি দে, *যাত্রার সেকাল-একাল*, ইত্যাদি, ঢাকা, প্র.প্র. ২০১৫, পৃ ১৩৬
[৪৩১] যাত্রামালিক গোপাল পাণ্ডের কথা, সাপ্তাহিক পূর্বাণী, ঢাকা, ৪ জুলাই ১৯৯১

এই ছয় মাস বায়না অনুযায়ী ঘুরে ঘুরে যাত্রা পরিবেশনা করতো দলগুলো। সেই সময় রমজান মাসেও যাত্রাপালা অভিনীত হয়। ষাটের দশক থেকে যাত্রায় মুসলিম শিল্পীর অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। বরিশালে গঠিত হয়েছিল মুসলিম যাত্রা পার্টি, পরে এই দলের নাম রাখা হয় বাবুল যাত্রাপার্টি। মুসলিম ধর্মীয় ইতিহাস ভিত্তিক পালার মধ্যে ছিল *বিষাদ সিন্ধু*, *এজিদ বধ*, *জয়নাল উদ্ধার* ইত্যাদি। দুর্বল হাতে রচিত এই সব পালা, অনুমান করা যায়, ইতিহাস-অনুগত হওয়ার চাইতে লোকায়ত ইতিহাস-বোধ প্রকাশ করেছে বেশি, যা ছিল মধ্যযুগের পুঁথি সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।

পাকিস্তানী আমলে সংগঠিত এইসব দল ছাড়াও দেশব্যাপী ছিল আধা সংগঠিত অথবা দুর্বলভাবে সংগঠিত আরো বহুদল যারা সংলাপ নির্ভর পালার চাইতে গীতাভিনয়ে অধিকতর দক্ষ ও আগ্রহী ছিল। এইসব দলের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিবেদনে যাত্রাপালার ঘষামাজা ভাব অনেক কম হতো এবং গান হতো কাঁচাসুরে। কিন্তু যাত্রা চর্চা ও মঞ্চায়নে এইসব দল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। ঘেটু ও ঝুমুর গানের দলের সঙ্গে তাদের চরিত্রগত মিল ছিল। তারা সাধারণত *চন্দ্রভানু*, *কাঞ্চনমালা*, *বেদকন্যা*, *গুণাইবিবি*, *সখিনা বিবি* –– এইসব পালা অভিনয় করত। এই ধরনের দল থেকেই ষাটের দশকের মধ্যভাগে নিবেদিত হয় *রূপবান* যাত্রা। *রূপবান* যাত্রায় বারো দিনের শিশুর সঙ্গে যুবতী কন্যার বিয়ে হয়। শিশু স্বামীকে সর্ব-বিপদ থেকে রক্ষা করার মধ্য দিয়ে নারীর সক্রিয় ভূমিকাও এ পালায় লক্ষণীয়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের যাত্রামঞ্চ থেকে উঠে আসে জনপ্রিয় ছায়াছবি 'বেদের মেয়ে জোৎস্না'। এই দুই যাত্রাই জনগণের হৃদয় তন্ত্রীতে সাড়া জাগায় ব্যাপকভাবে।

৪.৮ পূর্ব বাংলায় যাত্রার মঞ্চায়ন

১৯৪৭-এ দেশবিভাগের পর যাত্রাশিল্পের পালাবদল আরও দারুণভাবে ঘটে। সে সময়ে বাংলাদেশের খ্যাতনামা পালাকার, কলাকুশলীরা দেশত্যাগ করেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ – এই ২৪ বছরে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের যাত্রার দলের সংখ্যা ছিল ২৬ টি।[৪৩২] এসব পেশাদার দল যাত্রা শিল্পের প্রসার ও শিল্পীদের আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করে। অপরদিকে সাধারণ মানুষকে বিনোদনের মাধ্যমে লোকশিক্ষা প্রদান করে। এই ২৪ টি বছর এদেশের শহর বন্দর গ্রাম, স্কুল-কলেজের মাঠগুলো ছিল যাত্রাগানে মুখরিত। যাত্রাব্যক্তিত্ব মিলন কান্তি দে জানিয়েছেন যে, ষাটের দশকে প্রতি বছর 'চট্টগ্রাম মুসলিম ইন্সটিটিউট' ও 'জে এম সেন হল' প্রাঙ্গনে যাত্রার আসর বসতো।[৪৩৩]দেশ-বিভাগ পরবর্তীসময়ে গড়ে উঠা পূর্ব-বাংলার দলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: সিরাজগঞ্জের বাসন্তী মুক্তমঞ্চ নাট্য প্রতিষ্ঠান (১৯৫৪), ঝালকাঠির নাথ কোম্পানি যাত্রাপার্টি (১৯৫৫), চট্টগ্রামের

[৪৩২] মিলন কান্তি দে, *যাত্রাশিল্পের সেকাল-একাল*, ঢাকার ৪০০ বছরের যাত্রা পরিক্রমা, ইত্যাদি, ঢাকা, প্র.প্র. ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১১৪-১১৫

[৪৩৩] মিলন কান্তি দে, *যাত্রাশিল্পের সেকাল-একাল*, ঢাকার ৪০০ বছরের যাত্রা পরিক্রমা, ইত্যাদি, ঢাকা, প্র.প্র. ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ.৯৫

বাবুল অপেরা (১৯৫৮), গীতশ্রী মুক্তমঞ্চ নাট্য প্রতিষ্ঠান (১৯৬৭), ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভোলানাথ অপেরা (১৯৬০), ভাগ্যলক্ষ্মী অপেরা (১৯৬০), সাতক্ষীরার আর্য অপেরা (১৯৬৪), ময়মনসিংহের নবরঞ্জন অপেরা (১৯৬৬), বরিশালের বাবুল যাত্রাপার্টি (১৯৬৬), ফরিদপুরের নিউবাসন্তী অপেরা (১৯৬৮), গোপালগঞ্জের আদি দিপালী অপেরা (১৯৬৯) এবং মানিকগঞ্জের জগন্নাথ অপেরা (১৯৭০)।

ভারতবর্ষ ভেঙে দুভাগ হবার পর তিনজন শক্তিমান পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে (শরীয়তপুর), জিতেন বসাক (জামালপুর) ও সত্যপ্রকাশ দত্ত (সাতক্ষীরা) এবং অভিনেত্রী জোৎস্না দত্ত (বিক্রমপুর) জন্মভূমি ছেড়ে চলে গেলেন ভারতে। ফলে বরিশালের নট্ট কোম্পানীও দেশ ছেড়ে ভারতে পাড়ি জমায়। পূর্ববঙ্গে যাত্রায় একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়। তবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জয়দূর্গা অপেরা (১৯৪৬) দেশে থেকে যায়। ১৯৪৬ সালে গোপালগঞ্জে রায় কোম্পানি যাত্রাপার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪ সালে দোর্দণ্ড প্রতাপে মাঠে আসে সিরাজগঞ্জের বাসন্তী অপেরা।

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে যাত্রাজগতের এক বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতা ছিলেন জামালপুরের দিকপাইত গ্রামের সূর্যকুমার দত্ত। তার পুরো পরিবার যাত্রাদলে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জয়দূর্গা অপেরা প্রতিষ্ঠিত হলে সূর্যদত্ত বড় মেয়ে মায়া দত্তকে নিয়ে এ দলে যোগ দেন। এ মায়া দত্তই বিভাগোত্তরকালে এদেশের যাত্রায় প্রথম মহিলা শিল্পী। তিনি নৃত্য পরিবেশন করতেন। পূর্ব-বাংলার যাত্রায় গানের সঙ্গে শিল্পীত নৃত্য পরিবেশিত হতো। যাত্রাশিল্পী মিলন কান্তি-দের বর্ণনায় সে চিত্র পাওয়া যায় :

> ...সূর্য দত্তের...মেজ মেয়ে ছায়া দত্ত নেচে নেচে গাইতেন 'মায়াবতী মেঘে এলো তন্দ্রা', চট্টগ্রামের মেয়ে ঝুমুর গাইতেন লতা মঙ্গেশকরের সেই বিখ্যাত গান 'আষাঢ় শ্রাবণ মানে না তো মন', ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পান্নাকে দেখেছি ৬০ এর দশকে 'আমি রূপনগরের রাজকন্যা রূপের জাদু এনেছি' – 'রাজধানীর বুকে' ছায়াছবির এই গানটির সঙ্গে নাচতে। সে কী নাচ! তার মিষ্টি কণ্ঠে, বাদ্যযন্ত্রের মৃদু লয়ে প্যাণ্ডেল ভরতি দর্শক মুগ্ধ হয়ে যেত।[৪৩৪]

১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রামের বাবুল থিয়েটার ১৯৫৮ সালে বাবুল অপেরায় পরিণত হয়। এ সংগঠনটিই যাত্রাভিনয়ে মহিলা শিল্পী গ্রহণে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে, তাই যাত্রাশিল্পের বিবর্তনের ধারায় 'বাবুল অপেরা' একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। এছাড়াও চট্টগ্রামে গীতশ্রী অপেরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভাগ্যলক্ষ্মী অপেরা, রয়েল ভোলানাথ অপেরা, কমলা অপেরা, সাতক্ষীরার আর্য অপেরা, ফরিদপুরের নিউ বাসন্তী অপেরা, গোপালগঞ্জের দীপালি অপেরা – এ সময়ের উল্লেখযোগ্য দল। সংগৃহীত দলিল ও কাগজপত্রে দেখা যায় যে, তখনকার সময়ে যাত্রানুষ্ঠানে কোনো বিধি নিষেধ ছিল না। মালিক ও শিল্পীরা স্বচ্ছন্দে পালা করে বেড়াতেন। দেখা যায়, রোজার মাসেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যাত্রা পরিবেশন হতো। দীর্ঘ ২৪ বছরে মাত্র একবার যাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান 'যাত্রায় মহিলা শিল্পীরা অভিনয় করতে পারবেন না' – এই মর্মে

[৪৩৪] মিলন কান্তি দে, যাত্রাশিল্পে নারী, 'যাত্রা বিষয়ক কর্মশালা-২০১৬' এ লিখিত প্রবন্ধ, নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। বাবুল অপেরার মালিক আমীন শরীফ চৌধুরী এই আদেশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। পল্লীকবি জসীমউদ্দীন তাকে সে সময় নানাভাবে সহযোগিতা করেন। প্রখ্যাত আইনজীবী হামিদুল হক চৌধুরী এ মামলা পরিচালনা করেন। তিন মাসের মধ্যে সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। পূর্ব পাকিস্তানে অনেক যাত্রা অভিনীত হলেও যাত্রা শিল্প-আন্দোলন হিসেবে কখনো প্রতিষ্ঠা পায়নি। মালিকদের বাণিজ্য আকাঙ্ক্ষা এবং ফড়িয়াদের অর্থলিপ্সাই এর প্রধান কারণ। এছাড়া পালা রচয়িতার সংকট ছিল তীব্র। এদেশের প্রায় সবগুলি দলকেই নির্ভর করতে হতো পশ্চিমবঙ্গে রচিত পালার ওপর। যদিও আমাদের দেশের পালাকার ব্রজেন দে, জিতেন বসাক প্রমুখ পশ্চিম বাংলায় গিয়ে যাত্রাশিল্পকে সমৃদ্ধ করেন।

১৯৫৮ সালে আইয়ুবের 'মার্শাল ল' জারির কিছু পরে *রূপবান* পালা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। কারওয়ান বাজার, ফার্মগেট, তেজগাঁও, রায়ের বাজার, ডেমরা এসব এলাকায় যাত্রামঞ্চ তৈরি করে লোকনাট্যের *রূপবান*কে নতুন করে রূপ দেয়া হয়। প্রথমদিকে কলাকোপা বান্দুরার ইউনুস মোল্লা এবং মুন্সীগঞ্জের খালপাড়ের আরশাদ আলী, – এই দুজন পুরুষ শিল্পী রূপবান চরিত্রে অভিনয় করেন। প্রচণ্ড জনপ্রিয়তার কারণে আরশাদ (১৯৩৪-২০০৬) 'রূপবান কন্যা' হিসেবে খ্যাত ছিলেন। স্বাধীনতার পরে 'শিল্পী অপেরা' নামে তিনি একটি দল গঠন করেন।

১৯৬৯ এর গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে যাত্রাপালা তথা এদেশের পেশাদার ও অপেশাদার সৌখিন যাত্রাদলগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৬৮-৬৯ সালে বাবুল অপেরার গণজাগরণমূলক পালা *একটি পয়সা* পরিবেশিত হয়। পালাটি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে তোলপাড় সৃষ্টি করে, যদিও এ পালাটি '৬৯ এর পটভূমিকায় রচিত নয়। কিন্তু এই সময়ের দেশের উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে এ পালার কিছু ঘটনা ও সংলাপ আশ্চর্যজনকভাবে মিলে যায়। এ পালার কেন্দ্রীয় চরিত্র দিবাকরের উচ্চারণ –

> সেই ভগবান কারা জানো? যারা তোমার আমার মত অজস্র মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে গড়ে তুলেছে সাতমহলা ইমারত, যারা জীবন্ত মানুষের অস্থি দিয়ে বাজিয়ে চলেছে জল তরঙ্গের বাজনা, যারা বুটের ঠোক্করে সমাজ ব্যবস্থা তছনছ করে চালিয়ে যাচ্ছে কালো টাকার কারখানা, যারা শুনেও শুনতে পায় না, দেখেও দেখতে চায় না, সেইসব পুঁজিপতি ভগবানদের কাছে আর কোন আবেদন নিবেদন নয়, আর কোন প্রার্থনা নয়, মেহনতি মানুষের সর্বশক্তির প্রচণ্ড আঘাতে তাদের খুশির অট্টালিকা চুরমার করে তাদের বুকে লাথি মেরে বুকের পাঁজর ভেঙে দিয়ে – কায়েম করতে হবে মেহনতী মানুষের ন্যায্য অধিকার।[৪৩৫] (প্রথম অংক, চতুর্থ দৃশ্য)

১৯৬১ সালে ব্রজেন দের *বর্গী এলো দেশে* পালা প্রকাশিত হয়। এখানে তরুণ সিরাজ তার নানা আলীবর্দী খাঁকে বলছে –– 'দুদিন দুটো মোহর দিয়ে এক বাঈজির কাছ থেকে বাংলা কথা শুনেছি। বেঁচে থাক আমার বাংলা, বেঁচে থাক আমাদের মধুক্ষরা বাংলা ভাষা।' ১৯৬৬ সালে বিধায়ক ভট্টাচার্যের *বিদ্রোহী মাইকেল মধুসূদন* পালা প্রকাশিত

[৪৩৫] ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *একটি পয়সা*, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই, পৃ.৪৮

হয়। এ পালায় একটি দৃশ্যে মাইকেল দেবকীকে বলছেন : 'ইংরেজি সাহিত্য আমার প্রাণের চেয়েও বড়। শেক্সপিয়র আমার দেবতা, কিন্তু তাই বলে বাংলাকেও তো ফেলে দিতে পারবো না। বাংলাদেশ আমার জন্মভূমি। বাংলা আমার মাতৃভাষা। তাই বাংলাতেও একটু-আধটু লেখার অভ্যাস করছি।'

এছাড়া পূর্ব-বাংলায় রবীন্দ্রসাহিত্যের ছয়টি রচনা যাত্রা পালাকারে পরিবেশিত হয়েছে বিভিন্ন সময়। *বৌ ঠাকুরানীর হাট* উপন্যাস অবলম্বনে পালা তৈরি করেন মন্মথ রায়। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের পালারূপ দেন সুজিত পাঠক। ব্রজেন্দ্রকুমার দে 'মস্তক বিক্রয়' কবিতা অবলম্বনে *প্রতিশোধ*, 'পূজারিণী' কবিতা নিয়ে *শেষ আরতি* এবং 'সামান্য ক্ষতি' কবিতা থেকে *সতী করুণাময়ী* রচনা করেন। বিশ শতকের ষাটের দশকে বাংলাদেশে কবিগুরুর দুটি যাত্রাপালা মঞ্চায়নের খবর পাওয়া যায়। একটি সিরাজগঞ্জের বাসন্তী অপেরা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভোলানাথ অপেরার *প্রতিশোধ* আরেকটি জয়দূর্গা অপেরার *পূজারিণী*। বাসন্তী অপেরার *প্রতিশোধ* পালায় সেকালের দুই স্বনামধন্য অভিনেতা অমলেন্দু বিশ্বাস ও তুষার দাশগুপ্ত অভিনয় করেন।[৪৩৬]

পূর্ববঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশীয় পালাকার না থাকায় এখনো এদেশের যাত্রা মালিকদের পশ্চিমবঙ্গের পালাকারদের রচনার ওপর নির্ভর করতে হয়। বিশেষ করে জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত নাট্যকাররা যাত্রাপালা রচনায় উৎসাহিত না হবার কারণে যাত্রাশিল্পে সাহিত্যধর্মী, মুক্তিযুদ্ধ ও একুশের চেতনা সংবলিত পালা মঞ্চায়নে একরকম বন্ধ্যাত্ব বিরাজ করছে। পশ্চিমবঙ্গের বিধায়ক ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত প্রমুখ নাট্যকার তাঁদের রচনাশৈলীর মধ্য দিয়ে যাত্রাপালায় নতুন ধারা সৃষ্টি করেন। সেই ধারায় কেউ যাত্রাপালা রচনায় ব্রতী হলে প্রকৃতপক্ষেই বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পটি সমৃদ্ধ হতো।

৪.৯ পূর্ব-বাংলার যাত্রাশিল্পী

সাতচল্লিশ পরবর্তী সময়ে এদেশের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সমন্বয়ে যাত্রার ঐতিহ্য অব্যাহত থাকে। দেশভাগের ফলে সৃষ্ট পালাকার-অভিনেতা সংকটকে অতিক্রম করার চেষ্টা হয়। অন্তত অভিনয়ের ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভর হয় পূর্ব-বাংলা। তার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় অমলেন্দু বিশ্বাসের স্মৃতিচারণে:

> দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়ের প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রাম ওয়াজিউল্লাহ ইন্সটিটিউটের নাট্যশিল্পীবৃন্দ ১৯৫০ সাল থেকে দর্শনীর বিনিময়ে নাট্যচর্চা ও প্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গে লোকজ নাট্যকলা যাত্রারও নিরীক্ষাধর্মী চর্চা শুরু করে। তারই ফলে সৃষ্টি হয়েছিল এদেশের দর্শকনন্দিত যাত্রাশিল্পী সাদেকুন্নবী, সাদেক আলী, নাজির আহমেদ, আবদুল হামিদ, সাধনা চৌধুরী, মঞ্জুশ্রী মুখার্জী, জাহানারা বেগম, শান্তি দেবী ও প্রবন্ধকার। তারা প্রত্যেকেই নাটক থেকে যাত্রায় এসেছিলেন। তদানীন্তন পাকিস্তানে ১৯৫৪ সালে উপরোক্ত শিল্পীদের দ্বারা বাবুল থিয়েটার নামে একটি ভ্রাম্যমান নাটকের দল গঠন করা হয়। এঁরা ছুটির অবকাশে বিভিন্ন স্থানে দর্শনীর বিনিময়ে নাটক প্রদর্শন করতেন।

[৪৩৬] মিলন কান্তি দে, *যাত্রাশিল্পের সেকাল-একাল*, ঢাকার ৪০০ বছরের যাত্রা পরিক্রমা, ইত্যাদি, ঢাকা, প্র.প্র. ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ.৮১

> পরবর্তীকালে এই বাবুল থিয়েটারই পূর্ব বাংলার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সহযোগে গঠিত পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের নির্ভেজাল প্রথম যাত্রা সংগঠনে রূপান্তরিত হয়ে পেশাভিত্তিক যাত্রা ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হয়। সেই পঞ্চাশ দশকে কোলকাতা মহানগরীর যাত্রাদলগুলিতেও গুঁফো রাণীরাই নারী চরিত্রে অভিনয় করতো। ...শাহজাদপুরের নারী-পুরুষ সম্মিলিত দ্বিতীয় যাত্রাদল বাসন্তী অপেরায় এ প্রবন্ধকারের পরিচালনায় তুষার দাশগুপ্ত, ঠাকুরদাস ঘোষ, কালী দত্ত, ফণীভূষণ, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, জয়শ্রী প্রামাণিক, অমিয় সরকার প্রমুখ শিল্পীগণ যুক্ত ছিলেন। এভাবেই বাংলাদেশে নারী পুরুষ নিয়ে যাত্রাদল গঠিত হতে থাকে।[৪৩৭]

পূর্ব বাংলায় যাত্রার দল গঠনের ক্ষেত্রে এভাবে থিয়েটার থেকে বা স্বতন্ত্রভাবে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে যাত্রাদল গড়ে উঠেছিল। দেশবিভাগের ফলে সৃষ্ট শূন্যতার পূরণে এদেশের অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে অবিভক্ত বাংলার পালাকারদের রচনার মঞ্চায়ন করা হয়।

বিভাগোত্তরকালে যে সমস্ত যাত্রাশিল্পী নানান প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে যাত্রাশিল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন : আশরাফ আলী, নয়ন মিয়া (বৃহত্তর ময়মনসিংহ), মন্মথ দত্ত, নগেন নন্দী, ব্রজেন নন্দী (নোয়াখালী), শ্যামাচরণ, অমলেন্দু বিশ্বাস, তুষার দাশগুপ্ত, নজির আহমদ, মঞ্জুশ্রী মুখার্জী (চট্টগ্রাম), নন্দদুলাল অধিকারী, মিনু ভট্টাচার্য, ম্যালকম অনিল ঘোষ, কালীপদ দাশ, বিমল পাল (যশোর), গজেন দত্ত, সাদেক আলী (পাবনা), এম.এ. হামিদ, জাহানারা বেগম (নওগাঁ), মরু ঘোষাল (চাঁদপুর), প্রতাপাদিত্য দত্ত, হরেন বিশ্বাস (রাজবাড়ী), মোহনলাল রায় (কিশোরগঞ্জ), রঞ্জু খান (ঢাকা) প্রমুখ। স্বনামধন্য এই যাত্রাশিল্পীরা জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করে, বহু চড়াই-উৎরাই পার করে যাত্রাশিল্পকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন শিল্পী সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

৪.৯.১ অমলেন্দু বিশ্বাস (১৯২৫-১৯৮৭)

অমলেন্দু বিশ্বাসের জন্ম ১৯২৫ সালে ২৯ মে বার্মায় পিতার কর্মস্থলে। তাঁর পৈতৃক নিবাস চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড থানার বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী মসজিদ্দা গ্রামে। *মাইকেল মধুসূদন* পালার সার্থক রূপকার এবং *লেলিন হিটলারের* নন্দিত অভিনেতা হিসেবে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। আধুনিক নাট্যরীতির সঙ্গে তিনি লোকজ আঙ্গিকের সমন্বয় ঘটান। তাঁর বর্ণাঢ্য যাত্রাজীবনে তিনি 'বাসন্তী মুক্তমঞ্চ নাট্য প্রতিষ্ঠান' (১৯৬০, সিরাজগঞ্জ), 'বাবুল অপেরা' (১৯৬১-৬২), 'কমলা অপেরা' (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), 'গীতশ্রী যাত্রা ইউনিট' (চট্টগ্রাম) প্রভৃতি দলে কাজ করেছেন। ১৯৬০-১৯৭০ সাল এই দশ বছরের যাত্রা মৌসুমে তাঁর অভিনীত পালার সংখ্যা ছিল ৭৫। এর মধ্যে সিরাজগঞ্জের বাসন্তী অপেরার পরিবেশনায় *ছদ্মবেশী*, *যুগের দাবি*, *জালিয়াত*, *চণ্ডীমঙ্গল*, *লোহার জাল*, *জাহান্দার শাহ*, *সোহরাব-রুস্তম* এবং *দোষী* যাত্রাপালা অন্তর্ভুক্ত। চট্টগ্রামের বাবুল অপেরা ও গীতশ্রী যাত্রা

[৪৩৭] অমলেন্দু বিশ্বাস, *বাংলাদেশের যাত্রাশিল্প*, শ্রাবণ, ঢাকা, প্র. প্র. মার্চ ২০০৩, পৃ.৩৪

ইউনিটের পরিবেশনায় *রাহুগ্রাস*, *জাগরণ*, *চন্দ্রশেখর*, *সত্যের জয়*, *নাচমহল*, *চাঁদ সুলতানা*, *মাটির মা*, *শয়তানের মুখোশ*, *একটি পয়সা*, *সাধক রামপ্রসাদ*, *গৃহলক্ষ্মী*, *নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা* এগুলি ছাড়াও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কমলা অপেরায় মঞ্চায়িত হয়েছে *প্রায়শ্চিত্ত*, *ধর্মের হাট*, *সমাজের বলি* ও *রাজনন্দিনী*।

অমলেন্দু বিশ্বাস চারণিক নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ব্রিটিশ বিমান বাহিনিতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪৯ সালে চট্টগ্রাম রেল বিভাগে চাকরিকালে তিনি 'বাবুল থিয়েটারে'র সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন, যা ১৯৫৮ সালে 'বাবুল অপেরা'য় রূপান্তরিত হয়। যাত্রানট তুষার দাশগুপ্তের প্রেরণায় অমলেন্দু বিশ্বাস এই দলের মাধ্যমে যাত্রায় নাম লেখান। *রাজা সন্ন্যাসী*, *মাইকেল*, *জানোয়ার*, *লেলিন*, *হিটলার* প্রভৃতি পালায় তাঁর অসাধারণ অভিনয় এখনও জনগণের মুখে মুখে চর্চিত। কিংবদন্তীতুল্য এই যাত্রাভিনেতা সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় লেখা হয় :

> যাত্রাঙ্গনের এই স্বাপ্নিক পুরুষ স্বীয় প্রতিভা, অধ্যাবসায় ও সাধনার বলে যে স্তরে উপনীত হয়েছিলেন, তা শুধু ঈর্ষনীয়ই নয়, দুর্লভও বটে। সকলের মুখে মুখে তিনি প্রশংসিত হয়েছেন যাত্রাসম্রাট হিসেবে। প্রচারবিমুখ এই শিল্পপ্রাণ ব্যক্তিত্ব আজীবন সৃষ্টির নেশায় মেতে থেকেছেন। নব নব সৃষ্টির প্রেরণা ও আনন্দে নিজে যেমনি, অপরকে তেমনি বিমুগ্ধ করে গেছেন তিনি।[৪৩৮]

নটসূর্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ভাবশিষ্য ছিলেন অমলেন্দু বিশ্বাস। ১৯৭৯ সালে *মাইকেল মধুসূদন* পালায় মধুসূদন চরিত্রে রূপদানের জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পান। ১৯৮০ সালে *জানোয়ার* পালায় অরণ্য সেনের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পান। অসাধারণ অভিনয় প্রতিভা, চরিত্র রূপায়ণে দক্ষতার জন্য তিনি বাচসাস পুরস্কার, মুনীর চৌধুরী পদক লাভ করেন। এছাড়া যাত্রাশিল্পে অবদানের কারণে ১৯৮৯ সালে একুশে পদক অর্জন করেন। তাঁর স্ত্রী জোৎস্না বিশ্বাস বাংলাদেশে যাত্রাসম্রাজ্ঞী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনিই অমলেন্দু বিশ্বাসের মৃত্যুর পর দলের হাল ধরেন।

৪.৯.২ জ্যোৎস্না বিশ্বাস (জন্ম ১৯৪৭)

১৯৪৭ সালের ২ মে সিরাজগঞ্জ শহরে জোৎস্না বিশ্বাসের জন্ম। তাঁর বাবা গণেশচন্দ্র ধর ছিলেন সখের অভিনেতা। সৌখিন কৃষ্ণকীর্তন দলে গান পরিবেশনের মাধ্যমে তিনি যাত্রাজগতে প্রবেশ করেন। *ভাওয়াল সন্ন্যাসী* পালায় রত্নাবলী অর্থাৎ নায়িকা চরিত্রে প্রথম বছরেই সুযোগ পান। দল-পরিচালক অমলেন্দু বিশ্বাস ঐ পালায় ছন্দক অর্থাৎ নায়ক চরিত্রে ছিলেন। ১৯৬১ সালে তাঁদের দুজনের বিয়ে হয়। তাঁরা যৌথভাবে 'চারণিক নাট্যগোষ্ঠি' পরিচালনা করতেন। *মাইকেল মধুসূদন* পালায় দেবকী চরিত্র রূপদানের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হন। অভিনয়ের পাশাপাশি দলের অধিকারী, নির্দেশক এবং পালাকার হিসেবেও যাত্রাশিল্পে তার অবদান প্রশংসনীয়। তাঁর রচিত

[৪৩৮] শাহীন রেজা নূর, 'পরলোকে যাত্রাশিল্পের অগ্রসেনানী অমলেন্দু বিশ্বাস', দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৭।

একমাত্র পালার নাম *রক্তস্নাত একাত্তর* (১৯৬৬) বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের ১৯৯৬ সালের বিজয় উৎসব মঞ্চে প্রথম এ পালাটির আসরায়ন ঘটে। চারণিক নাট্যগোষ্ঠীর মাধ্যমে এটি ২৭ বার বিভিন্ন মঞ্চে অভিনীত হয়।

৪.৯.৩ তুষার দাশগুপ্ত

তুষার দাশগুপ্তের জন্ম ১৯২৩ সালে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার ফকিরহাট গ্রামে। চট্টগ্রামের খ্যাতিমান যাত্রাভিনেতা ক্ষমাচরণ ও বামাচরণের উৎসাহে তিনি যাত্রার প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৫৪ সালে তিনি 'জয়দুর্গা অপেরা'য় যোগ দেন। পরবর্তীকালে তিনি 'গোকুলেশ্বরী অপেরা' ও 'সৎসঙ্গ অপেরা' নামে দুটি দল গঠন করেন। কিন্তু এ দলের মাধ্যমে তিনি সফলতা পাননি। ১৯৫৭ সালে 'বাবুল অপেরা'য় এবং ১৯৬০ সালে 'বাসন্তী মুক্তমঞ্চ নাট্যপ্রতিষ্ঠানে' যোগ দেন। ১৯৭০ সালে গীতশ্রী অপেরায় কাজ করার সময় নবাগত নায়িকা রীনা রানীকে তিনি বিয়ে করেন। এই রীনারানীই পরবর্তীসময়ে যাত্রার জনপ্রিয় নায়িকা শর্বরী দাশগুপ্তা। ১৯৭৪ সালে তিনি নিজের নামে তুষার অপেরা গঠন করেন। দেশীয় পালা মঞ্চায়ন, যাত্রায় আধুনিক কলাকৌশলকে আত্মীকরণ, নিত্যনতুন উপকরণ ব্যবহার তাকে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিল। পালাকার পরিতোষ ব্রহ্মচারী রচিত *ক্লিওপেট্রা*, *দস্যুরানী ফুলনদেবী* এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য থেকে রূপান্তরিত পালা *বিরাজ বৌ* অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি ব্যাপক প্রশংসা লাভ করেন। ১৯৮৬ সালের ৭ জানুয়ারি ৬৩ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন।

৪.৯.৪ শর্বরী দাশগুপ্তা

তুষার দাশগুপ্তের স্ত্রী শর্বরী দাশগুপ্তার জন্ম যশোরে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত যাত্রা উৎসবে তিনি ১৯৭৮ ও ১৯৭৯ সালে পরপর দুবার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করেন। *ক্লিওপেট্রা*, *দস্যুরানী ফুলনদেবী* পালায় তিনি স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

৪.৯.৫ মঞ্জুশ্রী মুখার্জি

১৯৩৭ সালে শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব-বাংলার প্রথম নারী যাত্রাভিনেত্রী।

৪.৯.৬ আরশাদ আলী (জন্ম ১৯৩৪)

১৯৩৪ সালে পালাকার-অভিনেতা আরশাদ আলীর জন্ম হয় মুন্সিগঞ্জের খালপাড়ে। তাঁর বড় ভাই ছেরুমিয়ার যাত্রার দলে রূপবানের ভূমিকায় অভিনয় করতেন আরশাদ আলী। *গৌরী মালা* ও *সতী কলঙ্কিনী* পালা দলের প্রয়োজনে রচনা করেছিলেন তিনি। *রূপবানের* ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে ঢাকার বাসিন্দাদের কাছে আরশাদ আলী আজও জনপ্রিয়।

৪.১০ পর্যালোচনা

১. ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশবিভাগজনিত কারণে যাত্রাশিল্পের ধারা ও প্রবাহ অনেকটাই বিঘ্নিত ও ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। স্বাভাবিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতাকে কেন্দ্র করে যেমন একটা নব্যযাত্রা গড়ে ওঠে, তেমনই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রিক যাত্রায় একলা পথচলা শুরু হয়। যাত্রার ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবর্তনের স্বরূপ অন্বেষায় এ দুটি ধারা প্রবহমান হয় – যার তাৎপর্য বিবেচনার উপযুক্ত। একই শিল্পধারা দুটি আলাদা রাষ্ট্রীয়, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেও, সময়ের ধারাবাহিকতায় শৈল্পিক ব্যবধান আদানপ্রদানে অন্তরায় হয়নি। দ্বিজাতিতত্ত্বকেন্দ্রিক দেশভাগ পূর্ব-বাংলা বা পূর্ব-পাকিস্তানের যাত্রাচর্চার ক্ষেত্রে এ অঞ্চলকে যাত্রার বহমান ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব হওয়া সত্ত্বেও দুই দেশের মানুষের মধ্যে আদান-প্রদান ও যাতায়াতে সাংস্কৃতিক বিনিময় পূর্বাপর টিকে থাকে। কোনো কোনো সময়ে সেক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলেও পূর্ব-বাংলার যাত্রা কলকাতা-কেন্দ্রিক যাত্রাচর্চার প্রভাব বলয়ের বাইরে যায়নি। ফলে কলকাতার যা কিছু অর্জন, নতুন উদ্ভাবন সাফল্য ও নিরীক্ষা তা পূর্ব-বাংলার যাত্রা চর্চাকারীদের কাছে অবিদিত ছিলো না। বিশেষ করে যাত্রা পালার ক্ষেত্রে কলকাতার পালাকারদের পালাই বেশিরভাগ অভিনীত হয়েছে। এখন পর্যন্ত সেই ধারা বর্তমান। ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, শম্ভুনাথ বাগ এই যাত্রার ক্ষেত্রে নতুন ধারার প্রবর্তন এবং প্রযোজনা রীতিতে নতুনত্ব আনয়ন করেন। ব্রজেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ আগের অধ্যায়ে আলোচিত হলেও এই পর্বেও তার সরব উপস্থিতি পূর্ব বাংলার যাত্রার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাবে।

২. তবে পূর্ব-বাংলার আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবতা ও অভিনেতাদের প্রতিভা তথা যোগ্যতার তারতম্য এই প্রভাবকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছে। ফলে ঢাকার যাত্রা কলকাতার যাত্রার প্রভাবের স্তরে থাকলেও এখানকার সদ্য-স্বাধীন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের দ্রুত নগরায়নের প্রেক্ষাপটে নিজস্ব দর্শকের উপযোগী করে প্রযোজনা করতে হয়েছে। ফলে আমরা লক্ষ করি পুরাণভিত্তিক দেবদেবীকেন্দ্রিক ভক্তিরসাশ্রিত পালার পরিবর্তে আধুনিক যুগের সমাজের সামনে আদর্শ হতে পারে, যেমন: হিটলার, লেলিন প্রমুখ চরিত্র অবলম্বনে অর্থাৎ যারা জনচিত্তে কৌতূহল সৃষ্টি করতে পারে – এমন জীবনীভিত্তিক পালা প্রচুর পরিমাণে অভিনীত হয়েছে। চরিত্রগুলোর ঐতিহাসিকতা রক্ষা না করে এ দেশের প্রেক্ষাপটে অভিযোজিত ও বাঙালিকরণ করা হয়েছে।

৩. উৎপল দত্তের রচিত যাত্রাপালা *রাইফেল* ও *সন্ন্যাসির তরবারি* বিপুল আলোচিত ও উল্লেখিত হতে দেখা যায়। উৎপল দত্ত যাত্রার ক্ষেত্রে গণনাট্যের আদলে গণযাত্রা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন; বিদেশি ইংরেজ

চরিত্রসমূহকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। এছাড়া খল বা নেতিবাচক চরিত্রের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক গভীরতার সন্ধান করেছিলেন অভিনয়ের ক্ষেত্রে; পঞ্চু সেনের আগ্রহে যাত্রায় যুক্ত হয়ে উৎপল দত্তের এ সমস্ত উদ্যোগ বিস্তৃত প্রভাব রাখে। তার এই প্রয়াসকে থিয়েট্রিকাল যাত্রা নামে অভিহিত করা হয়।

৪. ষাট-সত্তরের দশকে মার্কসবাদী দর্শনের আলোকে কয়েকটি বিপ্লবী পালার মঞ্চায়ন দেখা যায়। এগুলো হচ্ছে *একটি পয়সা*, *কান্না ঘাম রক্ত* ও *পাঁচ পয়সার পৃথিবী*। এ সমস্ত যাত্রায় অন্যায় অসত্য ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে ঐকতান বেজে ওঠে।

৫. পূর্ববাংলার যাত্রার পক্ষে পশ্চিম বাংলার যাত্রার সমৃদ্ধ ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব হয়নি। এমনকি ঐ পর্বে তো বটেই , ১৯৭১ পরবর্তী পর্বেও পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত পালাকারদের রচনা অভিনীত হতে দেখা গেছে। পূর্ব-বাংলায় যাত্রা পরিবেশনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের যাত্রা রচয়িতাদেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ, ভৈরবনাথ, উৎপল দত্ত প্রমুখের রচিত পালাকেই পূর্ব-বাংলার দলগুলো অনুসরণ করেছে, অনুকরণ করেছে। যাত্রার ঐতিহ্য আলোচনায় অভিনেতা অমলেন্দু বিশ্বাস, মিলন কান্তি দে অবলীলায় অবিভক্ত ভারতবর্ষের তথা কলকাতার পালাকারদের ও চিৎপুরের যাত্রা প্রতিষ্ঠানসমূহের উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ দেশভাগ হওয়া সত্ত্বেও বাংলা যাত্রার ঐতিহ্য বিভক্ত হয়নি।

৬. পূর্ব-পাকিস্তানে মুসলিম জাতীয়তা, আরবি ফার্সি ঐতিহ্যের বীরোচিত ভূমিকার অধিকারী চরিত্রকে ঘিরে পালা রচিত হয়। তা সত্ত্বেও ব্রজেন্দ্রনাথের রচিত বিভিন্ন পালাই সিংহভাগ জুড়ে মঞ্চস্থ হয়। তবে সৌরীন্দ্রমোহনের রচিত *চন্দ্রশেখর* পালা (বঙ্কিমন্দ্রের কাহিনি অবলম্বনে) চট্টগ্রামে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে।

৭. পাকিস্তান আমলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জয়দুর্গা অপেরার কালীপদ দাস (কালী গাইয়ে), চট্টগ্রামের বাবুল অপেরার মোহন লাল রায়, মানিকগঞ্জের অন্নপূর্ণা অপেরার অনন্তবর্মন, ময়মনসিংহের নবরঞ্জন অপেরার গৌরাঙ্গ আদিত্য প্রমুখ বিশিষ্ট বিবেকরূপী গায়কের জাদুকরি কণ্ঠ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ববাংলায় যাত্রার বিবেক এর ভূমিকার বিস্তৃতি ঘটেছে এদেশীয় শাসকদের শোষণের প্রতিবাদে, যাত্রাশিল্পের ক্রম অবক্ষয়ের বিপরীতে এবং মানুষের মুক্তির অভিসারী জাতীয়তাবাদের উদ্বোধনেই নিহিত রয়েছে তার বিকাশ। পূর্ব-বাংলায় আর্থসামাজিক বাস্তবতা যাত্রার বিবেক চরিত্রকে সমষ্টির কণ্ঠস্বরে পরিণত করে। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে সারা দেশ যখন উত্তাল ছিল তখন সর্বস্তরের জনসাধারণের সঙ্গে বিবেকের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে প্রতিবাদ। তাই *একটি পয়সা* পালায় বিপ্লবী বিবেক গেয়ে ওঠে : চলবে

গাড়ি, চলবে গাড়ি/জনতার দাবি আদায় করে/ জংশনে গিয়ে থামবে গাড়ি।[৪৩৯]এভাবেই বিবেক সোচ্চার হয়েছে অন্যায়, অধর্ম আর স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে। বিবেকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে মানবতার জয়গান। যাত্রামঞ্চে অত্যাচারী ও পাপিষ্ঠের হাতে আদর্শ ও ন্যায় পক্ষ যখন নির্যাতিত হয়। তখন দর্শকরাও ঐ অত্যাচারীর বিনাশ কামনায় উচ্চস্বরে স্লোগান দেয়। বিবেকের কণ্ঠেও ওঠে আসে সেই প্রতিধ্বনি।

৮. ১৯৬৫ সালে আমাদের টেলিভিশন ও এফডিসি চালু হবার আগে পর্যন্ত যাত্রা অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিনোদন মাধ্যম হিসেবে পূর্ব-বাংলায় অভিনীত হয়েছে। একই সময়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ঘিরে সামাজিক-রাজনৈতিক জাগরণও শুরু হয়। তার পূর্ব পর্যন্ত যাত্রা নির্বাচনের ক্ষেত্রে পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীদের ধর্মবিশ্বাসকে গুরুত্ব দিয়ে কখনও কখনও যা কিছু আরবি-ফারসি ঐতিহ্যের এমন বিষয়বস্তুকে যাত্রার টেক্সট হিসেবে নির্বাচন করা হয়। এতে করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভাবাদর্শের প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থনও লক্ষ্য করা যায়। যতদিন পর্যন্ত না বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলন স্পষ্ট এবং প্রতিষ্ঠিত হয় – ততদিন এই পাকিস্তানবাদী আদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল যাত্রা পালার অভিনয় হতে দেখা যায়। বাংলাদেশ হবার পরে যাত্রা সামাজিক অনাচার-অবিচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে অনেক বেশি সোচ্চার হয়ে ওঠে। তা আর নিছক বিনোদন মাধ্যম হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে না।

[৪৩৯] মিলন কান্তি দে, *যাত্রাশিল্পের সেকাল-একাল*, ঢাকার ৪০০ বছরের যাত্রা পরিক্রমা, ইত্যাদি, ঢাকা, প্র.প্র. ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ.১০৯

৫ম অধ্যায়
স্বাধীন স্বদেশ : বাংলাদেশের যাত্রার রূপ-রূপান্তর (১৯৭১-২০১৭)

৫.১ ভূমিকা

১৯৭১ সাল থেকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়। বাঙালি জাতিসত্তাও সুচিহ্নিত হয়। স্বাধীনতা-উত্তর কালে এই উৎসাহ-উদ্দীপনার স্রোত স্বাভাবিকভাবেই আমাদের যাত্রা জগতকে অনুপ্রাণিত করে। স্বাধীনতার আগে যাত্রায় পূর্ব-বাংলার প্রধান রাজনৈতিক ধারাসমূহের আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্যের প্রতিফলন ঘটে। সে কালের (১৯৪৭-১৯৭১) উপনিবেশ অনুধর্মী শহরে যাত্রাচর্চায় ইসলামী আদর্শের পুণর্জাগরণবাদী যাত্রাগুলো মূলত ইসলামের গৌরবময় ইতিহাস ও শৌর্যপ্রকাশক বিভিন্ন ঘটনা ও কিংবদন্তি-সমৃদ্ধ নাটক রচনার মধ্য দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক আদর্শবাদের ছায়ায় সময় ও সমাজকে অনুপ্রাণিত করে তোলার আকাঙ্ক্ষায় জারিত ছিল। ১৯৬৮-৭১ কাল পরিধিতে যাত্রাকলায় আধুনিকতার সূচনা ঘটে। ১৯৬৯ এর গণআন্দোলন ও '৭০ এর নির্বাচন পূর্ববাংলার সব শ্রেণি পেশার মানুষের অন্তর্তলে যে দুর্বিনীত শক্তির সঞ্চয় সম্ভব করে তুলেছিল তারই উষ্ণস্বর ধ্বনিত হয় যাত্রাচর্চায়। মূলত এ সময়কার যাত্রাবীজেই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের যাত্রাচর্চার গতিপথ নির্দেশিত ছিল। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির জীবনে এক অমূল্য অর্জন। সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক দমন-পীড়নের এক অসহ্য অক্ষে দাঁড়িয়ে বাংলার জনমন স্বাধিকারের লড়াইয়ে যেভাবে সাড়া দেয়, যুদ্ধোত্তরকালে সেই একই জাগ্রত চেতনার তরঙ্গাঘাত পুরোনো যাত্রাদর্শকেও ভাঙতে চেষ্টা করে। স্বাধীন বাংলাদেশের পটভূমিতে স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি নিয়ে একে একে যাত্রাদল গঠিত হতে থাকে।

৫.২ আর্থ সামাজিক পটভূমি

১৯৭১ সালের পর স্বাধীন বাংলাদেশে নিজস্ব যাত্রার ধারা গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের যাত্রা থিয়েটার ও প্রযুক্তিনির্ভর বিনোদন মাধ্যমের সাথে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের যাত্রা আপন সাংস্কৃতিক ধারাকে আঁকড়ে ধরে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। নবগঠিত দেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠার পর্বটি এই সময়ে সম্পন্ন হয়েছে। বাঙালির আত্মপরিচয় সন্ধানের প্রসঙ্গটি হলো এই সময়ের শিল্প-সংস্কৃতির শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য। এই পর্বে এসে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ এবং মানুষের সংগ্রামভিত্তিক যাত্রাপালার জোয়ার দেখা যায়। উল্লেখ করা যায়, ততদিনে বাংলাদেশে যাত্রার ক্ষেত্রে পৌরাণিক পালার অভিনয় হ্রাস পেয়েছে। বরিশালের নট্ট কোম্পানির কর্ণধার মাখনলাল নট্টের মন্তব্য:

> যাত্রার শুরুর দিকে যেমন পৌরাণিক গল্প ছিল যাত্রার বেস, দেশভাগের পর আবার সামাজিক গল্পের উপরে ভিত্তি করেই বাধা হত পালাগান। কিন্তু সমাজটা দ্রুত পাল্টায়, আর সেই সঙ্গে পরিবর্তন হয় লোকের চাহিদার। তাই '৭০ এর দশক নাগাদ সামাজিক পালাও দর্শকের কাছে চর্বিতচর্বণ হয়ে দাঁড়ায়। তখন সবাই রাজনৈতিক পালা চাইতে শুরু করে।[৪৪০]

এই রাজনীতির সূত্রেই উৎপল দত্তের প্রসঙ্গ পূর্বে আলোচিত হয়েছে। তিনি সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পালা রচনা ও পরিচালনা করেছেন। বাংলাদেশেও রাজনীতি সচেতন পালার প্রাচুর্য দেখা যায়। নতুন দেশ নতুন জাতিসত্তা গঠনের গন্তব্যের দিকে অভিসারী হওয়ায় যাত্রার বিষয়বস্তুতে জীবন গঠনের আদর্শ প্রাধান্য পায়। প্রথম অবস্থায় সামাজিক বঞ্চনা অনাচার-অবিচারও যাত্রাপালায় খুব বেশি স্থান পায়নি। অন্যান্য সাংস্কৃতিক মাধ্যমের মতো যাত্রাও অনেকটা যেন ত্যাগ স্বীকার করে একটা বৃহত্তর অর্জনের লক্ষ্যে বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পক্ষে কাজ করে এসেছে। বাংলাদেশের যাত্রার বিবেচনার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে যাত্রা কেবল গ্রামকে ঘিরেই জনপ্রিয় হয়; পরে ঢাকায় বিভিন্ন মেলা উপলক্ষে এ ধরনের যাত্রা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। তবে সত্তরের দশকের মধ্যভাগে এসে এই ধরনের প্রদর্শনীতে অনেক সময় অনভিপ্রেত, উত্তেজনাময় গান ও নাচ পরিবেশিত হয়েছে।

বাংলাদেশের যাত্রার ক্ষেত্রে অবিভক্ত বাংলার যাত্রা-ঐতিহ্য বরাবরই ক্রিয়াশীল ছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের এই সময়কার যাত্রা পরিস্থিতির তুলনা করা যেতে পারে:

> ১৯৫০ এর দশকের সূচনায় নাটকে বোঝা গেল দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ-দেশবিভাগ পর্যুদস্ত বাংলার লোকসমাজের প্রয়োজন হচ্ছে অন্য ধরনের যাত্রার, যার কাহিনি জটিল, ঘনঘটাপূর্ণ, বিশ্বাস্যতার সর্বরকম গণ্ডী অতিক্রমকারী। কাহিনির মধ্যে কাহিনি ঢুকিয়ে অনেক পর্দার সৃষ্টি করা হয়েছে। দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ-দেশবিভাগের ভয়ংকর চাপ মানুষের অভিজ্ঞতার গঠনকে পাল্টে দিয়েছে। অবিশ্বাস্য বলে আর কিছু নেই – বীভৎসতা তখন প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার গণ্ডীতে এসে যাচ্ছে। তার ফলে যাত্রাতেও একটি ধারা আসছে যা এই অভিজ্ঞতার অন্ধকারকে কাজে লাগাতে চায়। এই ধারাই ষাট-সত্তর দশকে প্রবল হয়ে ওঠে।[৪৪১]

এই সামাজিক অনাচার, বিশৃঙ্খলা ও নৈতিক অবনমনের ধারা অব্যাহত থাকে। তারই পরিণামে সামগ্রিক পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে:

> ১৯৬০ এর দশকে যাত্রার পরিপূণভার্বে অবসংস্কৃতি বৈশিষ্ট্য অর্জনের সময়। ... বঙ্গীয় তথা ভারতীয় বাস্তবের সর্বাঙ্গীণ ভাঙ্গন দ্রুতবেগে সর্বব্যাপী হয়ে ওঠতে লাগল এই দশক থেকেই। স্ট্রাকচার-সুপারস্ট্রাকরের এই চরিত্রহীন অবস্থা বেনজির। অত্যাচার, শোষণ, দমন আমাদের ইতিহাসের অঙ্গ, কিন্তু তার বিরুদ্ধে একটা চরিত্রবান ধারা, প্রতিবাদী প্রত্যয় সর্বদাই

---

[৪৪০] মাখনলাল নট্ট, *রঙ্গমঞ্চে নট্ট কোম্পানি*, কমলিনী চক্রবর্তী (অনুলিখন ও সম্পাদনা), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্র. প্র. ২০১৪, পৃ.৫৬

[৪৪১] পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা যাত্রার উদ্ভব ও গতি প্রকৃতি', *প্রবন্ধসঞ্চয়ন*, সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার (সম্পাদিত), রত্নাবলী, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ১৫৪৫

> প্রবহমান থেকেছে। কিন্তু ১৯৬০র দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বোঝা গেল পুরনো সর্বরকম পদ্ধতি, অত্যাচার ও প্রতিবাদের উভয়েরই, আর কার্যকর থাকছে না।'[৪৪২]

বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায় তাঁর *ইকোনোমিকস অব দ্য গ্রুপ থিয়েটার ইন ক্যালকাটা – এ কেস স্টাডি ইন নান্দীকার* শীর্ষক সন্দর্ভে কলকাতার যাত্রা সম্বন্ধে আলোচনায় এর পেছনে ক্রিয়াশীল আর্থ সামাজিক বাস্তবতাকে বিশ্লেষণ করে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বক্তব্য দিয়েছেন :

> যাত্রার এই পুনরুত্থানে পৃষ্ঠপোষকতা করল বৃহৎ সংবাদপত্র, সম্ভবত বৃহৎ শহুরে পুঁজিও। তৎকালীন কংগ্রেস মন্ত্রীসভার সোৎসাহ সমর্থন, বিশেষ করে ১৯৭২ এর পরে, যাত্রা পেল। ... গ্রাম্য ধনীর এক নতুন স্তরে উত্থান দেখা দিল – এদের অর্থ ও গ্রামে প্রভাব বিস্তারী এক ভাবাদর্শগত প্ররোচনা ছিল। এই সঙ্গে কংগ্রেসী যুব সংগঠনে গ্রামজীবনের কার্যকর ক্ষমতাকেন্দ্র হিসেবে জাগরণ যুক্ত হল। গ্রামের নব্য ধনীদের পরিবার থেকেই এই যুবকরা এসেছে। কলকাতাভিত্তিক যাত্রার নামে মধ্যস্তর ভিত তারাই। টাকা খাটানোর নানা রকম কাজে নিযুক্ত। সরকার যাত্রাকে প্রমোদকর থেকে মুক্তি দিল। বৃহৎ সংবাদপত্রও যাত্রার এই পুনরুত্থানে ভূমিকা পালন করল।... যাত্রাদলও তাদের নতুন গ্রামীণ পৃষ্ঠপোষকদের আধা শহুরে ভেজাল রুচি পরিপোষণে এগোল – এরা বাণিজ্যে লিপ্ত গ্রাম্য 'নব্য ভদ্রলোক'। মাইক্রোফোন, স্পটলাইট, সেট, দৃশ্যপট এসব ব্যবহৃত হতে থাকল। গ্রামে বিদ্যুৎ জেনারেটর ইত্যাদির প্রসার এসবে সাহায্য করল। কলকাতার সিনেমা ও মঞ্চের পরিচিত তারকাদের যাত্রাদলগুলি ভাড়া করতে শুরু করল। ...কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারের বিশিষ্ট অভিনেতাদের ভাড়া করে যাত্রা তার নিজের মর্যাদা ও উন্নাসিক মূল্য বাড়াতে চাইল।[৪৪৩]

পুরনো যুগে স্থানীয় জমিদাররা যাত্রার পৃষ্ঠপোষকতা করত। তাদের অর্থেই গ্রামে সারারাত যাত্রাপালা হতো যাতে প্রবেশাধিকার ছিল অবাধ, কোনো টিকেট লাগত না। নায়েক পার্টির[৪৪৪] সঙ্গে যাত্রাদলগুলোর চুক্তিতেও যাত্রা পরিবেশনার মানরক্ষার বিষয়টি উপেক্ষিত হতো না। এই সময়ে এসে বাণিজ্যে লিপ্ত গ্রাম্য নব্য ভদ্রলোকদের পৃষ্ঠপোষকতায় যাত্রা এই সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য হারায়, প্রভাবশালী নেতারা খানিকটা দালালের ভূমিকায় নামে, যাত্রা প্রযোজনার সমস্তই মুনাফা শিকারী অর্থনির্ভর হয়ে পড়ে। যাত্রার মরশুমের সময়ে টিকেট বিক্রি করে একটা যাত্রাদল এক রাতে ১০০০ টাকা পর্যন্ত অর্থ উপার্জন করে। দলগুলো একটা জেলায় এক সঙ্গে এর বায়না নেয়,

---

[৪৪২] পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা যাত্রার উদ্ভব ও গতি প্রকৃতি', *প্রবন্ধসঞ্চয়ন*, সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার (সম্পাদিত) কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ১৫৫০

[৪৪৩] উদ্ধৃত.পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা যাত্রার উদ্ভব ও গতি প্রকৃতি', *প্রবন্ধসঞ্চয়ন*, সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার (সম্পাদিত) কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ১৫৫১

[৪৪৪] প্রদর্শককে যাত্রার পরিভাষায় 'নায়েক' বলা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব সংস্কৃতিমনা ও যাত্রামোদী ব্যক্তি একত্রিত হয়ে স্কুল, কলেজ, ক্লাব বা কোনো জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যকল্পে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কমিটি গঠন করে যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন তাঁরা নায়েক পার্টি বলে খ্যাত।

ধর্মীয় উৎসবের উপলক্ষেও বিপুল অর্থ উপার্জন করতে থাকে। ফলে যাত্রার অর্থনীতিই যাত্রাশিল্পের সার্বিক অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পরিচালক, লেখক ও ভাড়া করা তারকারা ভালই সম্মানী পেত। অন্যদের প্রায় নিম্নস্তরে জীবন যাপন করতে হতো। ফলে যাত্রার ক্ষেত্রে এক সময় বাণিজ্য গড়ে ওঠে। গ্রামের নব্য ধনীদের রুচিই যাত্রাপালার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। যার মোড়কে যৌন সুড়সুড়ি, শেষ প্রচ্ছদে সতী সাধ্বীর আবরণ প্রকাশ পায়। সাধারণ মানুষকে ভোলাতে প্রগতিশীল বক্তৃতা থাকে, যা ছিল শোষণের বিরুদ্ধে চীৎকার। এই যাত্রা একদিকে প্রগতিশীল বক্তৃতা, অন্যদিকে কুসংস্কারের আশ্রয় হয়ে বিধ্বস্ত গ্রামজীবনকে সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধের বিবেচনায় ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। তার সঙ্গে যুক্ত হয় অতিনাটকীয় ও প্রায় হাস্যকর পারিবারিক সংকট। এসময় যাত্রার কাহিনি এক ক্লাইম্যাক্স থেকে আরেক ক্লাইম্যাক্সে যায়। এর বক্তব্য ছিল উঁচু পর্দায় বাধা স্থূল সংলাপে ভরপুর। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কাহিনি অবাস্তবতায় পূর্ণ। উন্মুক্ত যৌনতার পরিবর্তে আড়াল দিয়ে যৌনতার প্রদর্শনী চলে। এই যাত্রা আধা ঔপনিবেশিকতায় বাঁধা সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির যথার্থ প্রদর্শনী; গ্রাম্য নব্যধনী মক্কেলদের রুচি অনুযায়ী তৈরি, যা ছিল জনপদী জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ধর্ম যৌনতার মিশ্রণ। পরম্পরাগত সুন্দর, শৈলীপূর্ণ যাত্রা এভাবে শেষ হয়ে যায়। পুরনো যাত্রার শক্তিশালী কণ্ঠের দৃপ্ত অভিনয় বদলে যায় – মাইক্রোফোন এসে তার স্থান দখল করে। যাত্রার এই পরিবর্তনকে গবেষক বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায় এভাবে উপমিত করেছেন:

> গ্রামের মেয়েদের হাতের চিরাচরিত ব্রোঞ্জের চুড়ি বা শাঁখা বা গলার চুড়ি হঠিয়ে তার জায়গায় যেসব প্লাস্টিকের চুড়ি এসেছে, সেগুলির মতোই নতুন যাত্রা পুরনো যাত্রার প্রবল ভাবোদ্বেল, উচ্চগ্রাম শব্দোচ্চারণে নকল, ভেজাল প্রতিকল্প: বিশিষ্ট প্রকরণ সম্পন্ন লোক-ভাষার বাকরীতি আর সুরের অন্তিমতম অবশেষকেও তা এই প্রক্রিয়ায় বিনষ্ট করেছে।[৪৪৫]

পশ্চিমবঙ্গের পুঁজিপতি ও অর্থবান শ্রেণি যাত্রার মতো মাধ্যমকে ব্যবহার করে বিনষ্ট করে। ফলে এই সময়ে যাত্রার জোয়ার যাত্রাশিল্পের জন্য মৃত্যুকল্প হয়ে দাঁড়ায়। এই ছিল অবিভক্ত বাংলার দীর্ঘলালিত সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গের যাত্রার অবস্থা।

এই চিত্রের তুলনায় দেখা যায়, ১৯৭১ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের যাত্রায় ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটে। সদ্য স্বাধীন দেশে শিল্প সাহিত্যে সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে প্রাচুর্য ঘটে, যাত্রাও তার বাইরে থাকে নি। স্বাধীনতার পূর্বে যেখানে মাত্র ২২টি দল ছিল, মুক্তিযুদ্ধের পরে সেখানে যাত্রা দল হয় ২১০টি। যদিও এই দলগুলো হঠাৎ গজিয়ে

---

[৪৪৫] উদ্ধৃত.পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা যাত্রার উদ্ভব ও গতি প্রকৃতি', *প্রবন্ধসঞ্চয়ন*, সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার (সম্পাদিত) কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ১৫৫২

ওঠা ছিল না, ১৯৪৭ সাল পরবর্তী যাত্রাচর্চারই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। দীর্ঘ লালিত যাত্রাচর্চার ধারাবাহিকতাতেই যাত্রাশিল্পী, অধিকারী, নির্দেশক প্রমুখ নতুন উদ্যমে নতুন সংগঠনের মাধ্যমে যাত্রার অঙ্গনকে মুখরিত করে তোলে। কিন্তু এই জোয়ারের স্রোতে কিছু আবর্জনাও এসে পড়ে। কারণ এই প্রবাহে নতুন পুঁজির ভূমিকাও ছিল। যাত্রার অর্থনীতিতে তখন মুনাফার লোভে এসে উপস্থিত হয়েছে উঠতি বিত্তবান এক শ্রেণি। স্বাধীনতার পরে অল্প কয়েক বছরেই সমাজের একটা অংশ কালোবাজারী ও অন্যান্য অসাধু উপায়ে বিরাট বিত্তের অধিকারী হয়। সম্পদের অধিকারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক অবক্ষয়েরও শুরু হয়। নব্যধনীদের সদর্প পদচারণা সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে কলুষিত করে তোলে। এই নতুন অর্থশালী হওয়া মানুষেরা ভোগ বিলাসে যেমন গা ভাসিয়ে দেয় তেমনি সিনেমা, নাটক, যাত্রাসহ সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার পাশাপাশি সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিতে চেষ্টা করে। পশ্চিমবঙ্গের যাত্রার মত বড় পুঁজি না এলেও বাংলাদেশের এই নব্যধনীদের দাপট যাত্রাঙ্গনে অনুভূত হয়। স্থানীয় ভাবে যাত্রার আয়োজকরা, যাদেরকে বলা হয় নায়েক পার্টি এই অবস্থার ফলে লাভবান হন। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী প্রশাসনও তার ফায়দা থেকে বঞ্চিত থাকে না। এর ফলে প্রকৃত যাত্রাশিল্পীদের সংখ্যাও হ্রাস পায়। অদক্ষ অপ্রশিক্ষিত অভিনেতারা কখনো জীবিকার টানে কখনো উপযুক্ত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে যাত্রায় এসে জায়গা দখল করে নেয়। যাত্রায় প্রিন্সেসদের রমরমা নৃত্য এই সময়ে যাত্রা অনুষ্ঠানের অনিবার্য অঙ্গে পরিণত হয়। এই প্রপঞ্চটি বাংলাদেশের যাত্রার ক্ষেত্রে একচেটিয়াভাবে বিরাজ করে। কলকাতার বাণিজ্যিক থিয়েটারের সঙ্গে এর তুলনা মিলতে পারে।

কবিগান, ঝুমুর, বা যাত্রাপালার মত গ্রামীণ বিনোদনের আসরকে ঘিরে ভারতীয় তথা বাংলাদেশের সমাজে মুষ্টিমেয় স্থূলরুচির ব্যক্তির জড়ো হওয়ার দৃষ্টান্ত অপরিচিত নয়। তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসে এর চিত্র রয়েছে। স্থূল রুচির বিনোদনের সঙ্গে প্রকৃত শিল্পসৃষ্টির ধারার সংঘাত, দ্বন্দ্ব চিরন্তন ভাবেই ছিল। কবিয়াল নিতাইয়ের জীবনে এই দ্বন্দ্বসংকুল অবস্থার পরিচয় রয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যাত্রাপালার অভিনয়ের ক্ষেত্রে একটু একটু করে এই মালিক, ফড়িয়া, দালাল শ্রেণির প্রযত্নে স্থূল বিনোদনের চোরাপথ তৈরি হতে থাকে। ততদিনে বাংলাদেশের সবগুলো জেলায় সিনেমা হল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এক দশক পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এফডিসি। নিত্য নতুন মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে দর্শক পেতে হয় যাত্রাকে। অলিখিতভাবে যাত্রাশিল্পীকে চলচ্চিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে টিকে থাকতে হয়। এই সুযোগ নেয় মুনাফালোভী চক্র। যাত্রার শুরুতে যে মঙ্গলসূচক নাচ গানের রীতি ছিল সেটি চলচ্চিত্রের গানে-নাচের অনুকরণসহ যুক্ত হতে থাকে; প্রলম্বিতও হতে থাকে। এমনকি যাত্রার ফাঁকে ফাঁকে অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই এই নাচ পরিবেশিত হতে থাকে। অশ্লীলতার অনুপ্রবেশের দরুণ সমাজের নৈতিক মানদণ্ড উন্নয়ন ও নীতিবোধ রক্ষায় যাত্রার আগেকার দায়িত্বের

অবনমন ঘটে। তথাকথিত প্রিন্সেসদের নাচ ও উত্তেজক অঙ্গভঙ্গির প্রদর্শনে অশ্লীলতার আকর্ষণে জনতার সমাগম বাড়তে থাকে। সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মানদণ্ডে যাত্রার দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। এক পর্যায়ে যাত্রার প্রকৃত দর্শকরা এই অশ্লীল নাচেরই পৃষ্ঠপোষকদের দ্বারা বিতাড়িত হতে থাকে।

যাত্রাকে এখনকার অবস্থায় এসে সমাজের রুচি ও মূল্যবোধ গঠনের স্থলে বিনোদনের নানা রূপের মধ্যে যেভাবে পাওয়া যাচেছ; যেভাবে অশ্লীল উপাদানসমূহ এর মাঝে অলক্ষ্যে বাসা বেধেছে –– এই সবই আধুনিকায়ন ও নগরায়নের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া। বাস্তবে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করেই দীর্ঘ যাত্রা ঐতিহ্যের সূচনা ঘটে। বরিশালের 'মাছরঙ সঙ্গীত সমাজ' থেকে 'নট্ট কোম্পানি' নাম ধারণ করে। দেশবিভাগের পরে এই নট্ট কোম্পানি প্রায় শতাব্দী কাল জুড়ে কলকাতায় যাত্রাচর্চা অব্যাহত রাখে। এই 'নট্ট কোম্পানি'র কর্ণধার মাখনলাল তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ *রঙ্গমঞ্চে নট্ট কোম্পানিতে* এর বর্ণনা দিয়েছেন:

> কৃষ্ণ যাত্রা থেকে শুরু করে আরও পরিণত রূপে যে পালাগান তৈরি হল তা পুরোপুরিই পুববাংলায় হয়েছিল। পুববাংলার সংস্কৃতি একটু অন্য ধরনের ছিল। সেখানে শিক্ষার একটা বিরাট ঐতিহ্য ছিল। এই সব মিলিয়েই আমাদের বিনোদনের উপায়টাও একটু যেন আলাদা হয়ে যায়। স্মৃতি ঘাঁটলে আজও মনে পড়ে পুববাংলায় পালাকাররা পুরাণ আর ইতিহাস নিয়ে যত গল্প লিখেছেন অন্য কোথাও তত লেখা হয়নি। আসলে ওঁদের পড়াশোনার ধরনটাই ছিল সেইরকম। সামাজিক পালার থেকে বরং একটু পড়াশোনা করে পৌরাণিক পালা লিখতেই তাই পুববাংলার পালাকাররা বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন।[৪৪৬]

বিভাগপূর্ব সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাগুলো এই যাত্রাশিল্পের চর্চায় সরগরম ছিল। তার ঐতিহ্যও কম শক্তিশালী ছিল না। মাখনলালের বর্ণনায়:

> পুববাংলার দুটি জেলা, ফরিদপুর আর বরিশাল ছিল যাত্রাপালার পীঠস্থান। কত যে অপেরা হাউজ তৈরি হয়েছে এই অঞ্চলে। যাত্রা দেখতে গেলে টিকিট কিনতে হবে, এই রীতিটাই তো আমরা চালু করি। এপার বাংলায় তো তখন সব ফ্রি শো হত। পুজো বা কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে বিনোদন হিসেবে পালাগানের আয়োজন করতেন গৃহস্বামী। তিনিই বায়না করে দল নিয়ে গিয়ে তাদের দিয়ে গান করাতেন। কিন্তু আমাদের পুববাংলায় সে নিয়ম চলতো না। এখানে যাত্রা ছিল মানুষের বিনোদন। যে পালা দেখতে ইচ্ছুক সেই দেখতে পারে, কিন্তু টিকিট কেটে। এই যে টিকিট কেটে পালাগান শোনার রীতি, এটা দর্শকমহলে পালার গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়।[৪৪৭]

বাংলাদেশের যাত্রার ক্ষেত্রে অভিনয় রীতির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে নির্দিষ্ট মতও প্রকাশ করেছেন তিনি:

> এছাড়া পুববাংলার দলগুলোর অভিনয়ের ধরনটাও একটু আলাদা। আসলে আমরা তো বাঙাল ভাষায় কথা বলতাম। সেই ভাষা হয়তো বা সবার বোধগম্য হবে না, এই আশঙ্কায় আমরা পালা যখন করতাম, তখন একেবারে বইয়ের ভাষা ফলো করতাম। এই পালায় আমাদের ডায়ালগ থ্রোটা ছিল স্ট্যান্ডার্ড। মোটামুটি একই রকম ভাষায় সংলাপ বলাতাম আমরা।

---

[৪৪৬] মাখনলাল নট্ট, *রঙ্গমঞ্চে নট্ট কোম্পানি*, কমলিনী চক্রবর্তী (অনুলিখন ও সম্পাদনা), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্র. প্র. ২০১৪, পৃ.৪০-৪১

[৪৪৭] মাখনলাল নট্ট, *রঙ্গমঞ্চে নট্ট কোম্পানি*, কমলিনী চক্রবর্তী (অনুলিখন ও সম্পাদনা), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্র. প্র. ২০১৪, পৃ.৪১-৪২

> আর পশ্চিমবঙ্গে হত কী, একেক জেলায়, একেক ধরনের ডায়ালেক্টের প্রচলন। সেই অনুযায়ী সেখানকার ডায়ালগ থ্রোয়ের ধরনটা বদলে যেত। ভাষার এই তফাতটা দুই বাংলার পালার মধ্যে প্রচণ্ড ধরা পড়েছিল।[৪৪৮]

বস্তুত বাংলাদেশের এই অঞ্চলে যাত্রাপালার প্রাচীনতম ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও কলকাতার চিৎপুরকেন্দ্রিক যাত্রার তুলনায় এরা স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত ছিল। বাংলাদেশের 'নট্ট কোম্পানি' এর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। যাত্রাভিনেতা চপলকুমার ভাদুড়ীর (চপলরানি) কথায়ও তা প্রতিফলিত: 'কলকাতার যাত্রা সমাজে একটা কথা চালু ছিল, নট্ট মানে বাইরের দল, কলকাতার দল মানে চিৎপুরের দল।'[৪৪৯] চিৎপুরে অধিষ্ঠিত হলেও কলকাতাকেন্দ্রিক দলগুলোর পরিবেশনার সঙ্গে বাংলাদেশের যাত্রা উপস্থাপনার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সুচিহ্নিত ছিল। মুখ্যত পৃথক ছিল এদের সংলাপের ভাষা ও অভিনয় রীতি।

বাংলাদেশের যাত্রায় প্রিন্সেসদের যুক্ত হওয়াকে সুস্থ যাত্রার পক্ষের শিল্পীরা রোধ করতে পারেনি; অন্তত যতক্ষণ না যাত্রা প্রশাসনিকভাবে নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত হয়। ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত মাসব্যাপী শিল্পমেলায় স্বাধীনতা-পরবর্তী ঢাকা শহরের প্রথম পালা প্রদর্শিত হয়। কিন্তু সময়ের প্রবহমানতায় সৃজনশীল যাত্রাচর্চার এই মাত্রা লোপ পায়। এই পরিস্থিতির সম্পর্কে অমলেন্দু বিশ্বাসের বিশ্লেষণ উদ্ধৃতিযোগ্য:

> পূর্ব বাংলায় জনকল্যাণমুখী সংস্থাগুলো শুষ্ক মৌসুমে যাত্রা উৎসবের আয়োজন করতেন। উদ্দেশ্য ছিল সেসব প্রতিষ্ঠানের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা। জনকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ, যাত্রাভিনয়ে এবং মঞ্চে সুস্থ পরিবেশ বিরাজ করতো। স্ত্রী-পুত্র-পরিজনসহ যাত্রা দর্শনে উৎসাহিত হতেন সুধীজন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীন বাংলাদেশে সেই পরিবেশের অবনতি ঘটেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ছত্রছায়ায় যাত্রাদল হয়ে পড়ে প্রদর্শনী নির্ভর। অর্থ্যাৎ নামেমাত্র যাত্রা। মূলত জুয়া, হাউজি ইত্যকার আপত্তিকর বিষয়ই মুখ্য। স্থানীয় প্রশাসন পূর্বের মতো স্কুল কলেজ ও জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের জন্য যাত্রা অভিনয়ের অনুমতি দিতে রাজী নয়, ফলে আজকের যাত্রাদলগুলোও প্রদর্শনী নির্ভর হতে বাধ্য হয়েছে। আর প্রদর্শনী নির্ভর যাত্রা মাত্রাহীন।[৪৫০]

বাণিজ্যলোভী দল-মালিক ও প্রদর্শকের লোভ লালসা চরিতার্থ করতে গিয়ে যাত্রাঙ্গন হয়ে ওঠে প্রমোদ উদ্যান। এরপর ১৯৭৮ সালে শেরে বাংলা নগরের শিল্পমেলায়ও যাত্রার আয়োজন হয়। ধারণা করা হয়, এখান থেকেই যাত্রায় অশ্লীলতার সূচনা। ঐ যাত্রা প্রদর্শনীতে প্রিন্সেস লাকী খানের উত্তেজক ভঙ্গীতে নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে যাত্রাশিল্পের অধঃপতন দেখা দিতে থাকে। *The survival of Jatra* শীর্ষক অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভে গবেষক ড. আলমগীর হোসেইন জানান,

> The majority of *jatra* practitioners demand the complete exclusion of explicit dance segments. Many artists consider this element as the root of all the problems in *jatra*. Many *jatra* practitioners (e.g. Putul; A.

---

[৪৪৮] মাখনলাল নট্ট, *রঙ্গমঞ্চে নট্ট কোম্পানি*, কমলিনী চক্রবর্তী (অনুলিখন ও সম্পাদনা), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্র. প্র. ২০১৪, পৃ.৪২

[449] Z›`ªv PµeZx© (m¤úvw`Z), *অভিনেত্রীর ভূমিকায় চপলরানি*, নাট্যচিন্তা, কলকাতা, প্র. প্র.২০০২, ব্যবহৃত সংস্করণ ২০১২, পৃ.৭৮

[৪৫০] অমলেন্দু বিশ্বাস, *বাংলাদেশের যাত্রাশিল্প*, শ্রাবণ, ঢাকা, প্র. প্র. মার্চ ২০০৩, পৃ. ২৬

> Sarkar) even compared the explicit dance with blood cancer. However, at the primary stage of the revitalization, the exclusion of explicit dances could cause a financial loss for the exhibitors and the companies because a significant number of young male audience members would reject the shows.[451]

ফলে বিভিন্ন সময় যাত্রা নিষিদ্ধ করা হয়, তা সাধারণ মানুষের নৈতিকতার লঙ্ঘন বলেই নয় কেবল, বরং যুবক শ্রেণি তাদের যৌবকালের বয়সোচিত যৌন ও ভালগারের প্রতি কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার দরুণ আকৃষ্ট হয় বলেই। এই নাচের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে অমলেন্দু বিশ্বাসের পর্যবেক্ষণ:

> নাচ যাত্রার পূর্বেও ছিল। সেটা ছিল সখীনৃত্য। বর্তমানে যে নাচ হয় তা হচ্ছে হিন্দী, উর্দু–সিনেমা এবং ভিসিআর প্রভাবিত এক ধরণের অঙ্গভঙ্গী। পরিবেশিত নাচ ও গান যা মেয়েদের দ্বারা গীত হয় তা যারা পরিবেশন করে তারাও বোঝে না, আর দর্শকও বোঝে না। তবু এর মধ্যে একটি বিজাতীয় বিকৃত আনন্দের স্বাদ যেন থেকে যায়।[৪৫২]

এই সব প্রদর্শনীতে সৃষ্ট বিশৃংখলা ও মারামারির দরুণ এমন পরিবেশনার সময়ে অনেক যাত্রা অনুষ্ঠান বন্ধ রাখতে হয় ও মঞ্চোপকরণ ধ্বংস করা হয়। লোকজন অনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে চড়াও হয় – এর সঙ্গে যুক্ত হয় বিভিন্ন ধরনের জুয়ার আসর। ফলে অপরাধ ও শক্তি প্রদর্শনের এক চক্র গড়ে ওঠে। এ সঙ্গেই যাত্রামালিক, পৃষ্ঠপোষক ও মতলববাজ কর্ণধারগণ অভিনয়ের অবসরে 'প্রিন্সেস' নৃত্য অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। আর্থিক লোভই এর প্রধান কারণ। ফলে এই অসৎ পৃষ্ঠপোষকরাই খাঁটি লোক বিনোদনটির চরম সর্বনাশ সাধন করে। মাসুদা এম রশিদ চৌধুরীর ভাষ্য মতে,

> It is known that new owners of Jatra, patronizers and unscrupulous proprietors include these indecent "Princess" dance during the intervals to earn more money, degarding the status of Jatra. These patronizers have contributed to the destruction of Jatra as an honest folk entertainment.[453]

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের যাত্রাদল, অভিনেতা-অভিনেত্রী ও যাত্রা অভিনয়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

৫.৩ বাংলাদেশের যাত্রাদলের ইতিহাস

স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে অকস্মাৎ কালো টাকার মালিকেরা টাকা সাদা করার প্রয়োজনে যাত্রার দল করে এবং সাথে সাথে অধিক মুনাফা ও বাড়তি ফুর্তি লোটার প্রত্যাশায় এদেশে রাতারাতি গজিয়ে ওঠে অসংখ্য যাত্রার পেশাদার যাত্রাদল ১৯৭২ সালে হয় ৫০টি, ১৯৮৮ সালে গিয়ে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ২১০টিতে। এই অস্বাভাবিক দলস্ফীতি নানাধরনের শিল্পবিরোধী আচরণ ও উপস্থাপনার জন্ম দেয়। স্বাধীনতার কিছু পূর্বে গোপালগঞ্জের

---

[৪৫১] Dr. Md. Alamgir Hossain, *The survival of Jatra* , p-118

[৪৫২] অমলেন্দু বিশ্বাস, *বাংলাদেশের যাত্রাশিল্প*, শ্রাবণ, ঢাকা, প্র. প্র. মার্চ ২০০৩, পৃ. ২৭

[৪৫৩] S. M. Mohsin(edited), *Jatra Our Heritage,* Masuda M. Rashid Chowdhury, Jatra as a Cultural Identity, 2000, Bangladesh Shilpakala Academy pg. 22

ধীরেন্দ্রকুমার বাকচী 'দীপালি অপেরা' (১৯৬৯) চালু করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি 'আদি দিপালি অপেরা' (১৯৭২), তাঁর স্ত্রী বনশ্রী বাকচীর সঙ্গে যৌথ মালিকানায় '১নং দীপালি অপেরা' (১৯৭৪) গঠন করেন। পাশাপাশি তিনি 'নব দীপালি অপেরা' এবং 'দীপ দীপালি অপেরা' নামে আরো দুটি দল গঠন করেন। একই সঙ্গে পাঁচটি দলের অধিকারী হওয়া নিঃসন্দেহে যাত্রাশিল্পের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৯৭২ সালে ময়মনসিংহে 'সবুজ অপেরা' গঠিত হয়। এই দলে প্রথমে নূরুল ইসলাম অধিকারী হলেও পরে দেলোয়ার হোসেন বাচ্চুর তত্ত্বাবধানে এ দলটি অধিক জনপ্রিয় হয়। ১৯৭২ সালে নড়াইলের শেখ খলিলুর রহমানের তত্ত্বাবধানে 'রঙমহল অপেরা' প্রতিষ্ঠিত হয়। একই বছর নওগাঁর খগেন লস্কর 'রূপশ্রী অপেরা' গঠন করেন। এই বছরে গঠিত নতুন যাত্রাদলের তালিকায় আছে : মানিকগঞ্জের ডা. ব্রজেন্দ্রকুমার মণ্ডলের 'জগন্নাথ অপেরা', খুলনার ফজলুল করিম বিশ্বাসের 'শিরিন যাত্রা ইউনিট' ইত্যাদি। 'শিরিন যাত্রা ইউনিট'কে খুলনার প্রথম যাত্রাদল হিসেবে পাওয়া গেলেও জেলা গেজেটিয়ারসূত্রে জানা যায় যে, *রামায়ণ* ও *মহাভারতে*'র কাহিনি নিয়ে পূর্বে খুলনায় যাত্রা পরিবেশিত হতো। সাধারণত দুর্গাপূজার সময়, একাধিক রাতের জন্য যাত্রার আসর বসত। নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলিম সকলেই এক সঙ্গে বসে যাত্রা দেখত। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় তিন-চারটি যাত্রাদলের কথাও জানা যায় :

> There were three or four local *Jatra* parties, and occasionally parties of special skill were engaged from other districts. They charged Tk. 50 to Tk. 100 for a night's performance. The educated middle classes in Khulna, Bagerhat and Satkhira, and in advance village like Senhati, Mulghar and Magura, had also formed themselves into amateur dramatic societics their performances being given at night in houses built and set apart for the purpose.[৪৫৪]

১৯৭৩ সালে জন্ম নেয় যশোরে নিরঞ্জন রায়ের 'জোনাকী অপেরা' এবং রাজশাহীতে আজিজুল আলম চৌধুরীর 'আদি মিতালী অপেরা'। ১৯৭৪ সালে ঢাকার করম আলী ভূঁইয়ার 'বিজয়লক্ষ্মী অপেরা', হবিগঞ্জের হারুনুর রশিদ খানের 'হারুন অপেরা', ফেনীর সেলিম চৌধুরীর 'তরুণ যাত্রাপার্টি', কুমিল্লার বদরুল চৌধুরীর 'স্মরণিকা অপেরা', খুলনার অখিল চন্দ্র দাসের 'উত্তম অপেরা', ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কালু মাস্টারের 'বিশ্বরূপা অপেরা', যশোরের তুষার দাশগুপ্তের 'তুষার অপেরা', মানিকগঞ্জের তাপস সরকারের 'চারণিক নাট্যগোষ্ঠী', সিরাজগঞ্জের নিরঞ্জনচন্দ্র কুণ্ডুর 'বাণীশ্রী মুক্তমঞ্চ নাট্যপ্রতিষ্ঠান', বাগেরহাটের নূর মো: হাওলাদারের 'বঙ্গশ্রী অপেরা', কুষ্টিয়ার আলাউদ্দিন আহমদের 'গীতাঞ্জলি অপেরা', নারায়ণগঞ্জের আবদুল জব্বার ভূঁইয়ার 'নবজাগরণ অপেরা', গোপালগঞ্জের ধীরেন্দ্রকুমার বাকচীর 'নব দীপালি অপেরা' ও 'দীপ দীপালি অপেরা' এবং চট্টগ্রামের ললিতমোহন ঘোষের

[৪৫৪] খুলনা ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ার, ১৯৭৮, পৃ ৯১,

'নবারুণ নাট্যসংস্থা' এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৫ সালে যে সকল দল গঠিত হয় তার মধ্যে বাগেরহাটের নুর মো: হাওলাদার ও আলাউদ্দিন আহমদ হারুমিয়ার যৌথ মালিকানায় '১নং বঙ্গশ্রী অপেরা', যশোরের প্রহ্লাদ বিশ্বাস হিটলারের 'বৈকালী অপেরা' এবং বরিশালের সুভাষচন্দ্র সরকার মন্টুর 'তপোবন নাট্যসংস্থা' উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বাগেরহাটের আফজাল হোসেন মোল্লার 'জোৎস্না অপেরা' এবং মানিকগঞ্জের ফণী গোস্বামীর 'আনন্দময়ী অপেরা পার্টি' এ সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৬ সালে প্রশান্তকুমার রায়ের 'আদি সবুজ অপেরা' (ময়মনসিংহ), এম এ চৌধুরীর 'অগ্রদূত নাট্যসংস্থা' (চট্টগ্রাম), শেখ বোরহানউদ্দিনের 'বলাকা অপেরা' (মানিকগঞ্জ), খোকন চৌধুরীর 'নবচন্দন অপেরা' (নারায়ণগঞ্জ), আফতাব উদ্দিনের 'কোহিনূর অপেরা' (মানিকগঞ্জ) এবং পাণ্ডব আলীর 'বঙ্গলক্ষ্মী অপেরা' (কুমিল্লা) উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সাধুচরণ পণ্ডিত ও যুধিষ্ঠির মণ্ডলের যৌথ অধিকারিত্বে 'বাসুদেব অপেরা পার্টি' (মানিকগঞ্জ), আবদুস সালাম বাচ্চুর 'নিউ বলাকা অপেরা' (বগুড়া), গিয়াসউদ্দিন আহমদের 'আজাদ অপেরা' (নারায়ণগঞ্জ), মোতাহার মিয়ার 'লিলি অপেরা' (নোয়াখালী), প্রাণবল্লভ ঘোষের 'উদয়ন নাট্যসংস্থা' (চট্টগ্রাম), চুন্নু মিয়ার 'নব বঙ্গশ্রী অপেরা' (বাগেরহাট), শচীন ঘোষের 'বঙ্গদিপালী অপেরা' (মানিকগঞ্জ) প্রভৃতি দল এসময়ে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। বগুড়া জেলায় যাত্রাদল কম থাকলেও যাত্রা পরিবেশনের দিক থেকে বগুড়ার বেশ সুনাম আছে। বিশেষত গীতিযাত্রা, যেমন: *রূপবান*, *গুনাই*, *জরিনা সুন্দরী*, *আপন দুলাল* প্রভৃতি পালা এই এলাকায় বেশ জনপ্রিয় হয়। বগুড়ায় যাত্রা চর্চা দেশবিভাগের আগে থেকেই বিস্তার লাভ করে। জেলা গেজেটিয়ারসূত্রে তার তথ্য পাওয়া যায় :

> The district had its reputation in pre-partition days for folk songs and *Jatras*. The Muslims used to enjoy *Jari, Bichar, Marfati* and *Bayati* songs and also *Jatras* depicting love-tales of village people. Hindus used to enjoy *Kabi* songs, *Rashlila* songs *Baul* songs *Kirtan, Gambhira, Khemta and Jatras* depicting Hindu mythological love of Radha and Krishna, *avatarism* of Nimai and innumerable tales of love and war between virtue and vice.[৪৫৫]

১৯৭৭ সালে গঠিত হয় নিখিলকুমার রায় এর 'আনন্দ অপেরা' (পাবনা), শাহ আবদুল মন্নাফ-এর 'দি নব রঞ্জন অপেরা' (ময়মনসিংহ), আবদুল খালেক মোড়লের 'সাধনা অপেরা' (খুলনা), ডাবলু মিয়ার 'মিতালী অপেরা' (ময়মনসিংহ) ইত্যাদি। এছাড়া বীরেন্দ্র দাস এর 'লক্ষণ দাস অপেরা' (বরিশাল) এবং খোকন চৌধুরীর 'নিশিবাণী অপেরা' (নারায়ণগঞ্জ) নামের দুটি দলও এ সময়ে সক্রিয় হয়। পাবনা জেলায় 'আনন্দ অপেরা' ছাড়া আর কোন দলের নাম পাওয়া না গেলেও এই জেলার যাত্রাগানের ঐতিহ্য ছিল বলে জেলা গেজেটিয়ার সূত্রে জানা যায়। ১৯৭৮ সালের উল্লেখযোগ্য দল হল – 'প্রতিমা অপেরা' (গণেশচন্দ্র কুণ্ডু, যশোর), 'আরতি অপেরা' (আরতি রানী

[৪৫৫] বগুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ১৯৭৯, পৃ. ৮

বিশ্বাস, খুলনা), 'দি গীতাঞ্জলি অপেরা' (ডা. তোফাজ্জল হোসেন, কুষ্টিয়া), 'তরুণ অপেরা' (মতিউর রহমান, বরিশাল), 'জনতা অপেরা' (নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস, সিরাজগঞ্জ) প্রভৃতি। তখনকার সময়ে এ দলগুলো যাত্রা পরিবেশনায় জননন্দিত হয়। এছাড়া 'শামীম অপেরা' (আবু চেয়ারম্যান, রংপুর), 'প্রদীপ অপেরা' (প্রদীপ বিশ্বাস, খুলনা), 'ভদ্রা অপেরা' (আহমদ সরদার, খুলনা), 'আদি ঝর্ণা অপেরা' (মহিউদ্দিন হাওলাদার মনির, মাদারীপুর), 'রূপালী যাত্রাপার্টি' (শামসু মিয়া, কুমিল্লা) – এ সমস্ত দলগুলোও সুনামের সঙ্গে পরিবেশনা অব্যাহত রাখে। ১৯৭৯ সালে নতুন যাত্রাদলগুলোর মধ্যে – গোপালগঞ্জের জগদানন্দ ঠাকুরের 'নরনারায়ণ অপেরা', ময়মনসিংহের লাল মিয়ার 'লায়ন অপেরা', টাঙ্গাইলের অজিতসাহার 'চলন্তিকা নাট্যসংস্থা', বরিশালের আনিস আহমদের 'রূপাঞ্জলি নাট্যসংস্থা', কুষ্টিয়ার শেখ আজিজুর রহমান ও আখতার সিদ্দিকীর 'আদি গীতাঞ্জলি অপেরা', নরসিংদীর আনোয়ার আলীর 'সুমি নাট্যসংস্থা-১' নিয়মিত যাত্রা পরিবেশন করে। এছাড়াও খুলনার আবদুল শহিদ সরকারের 'মিতালী অপেরা', বরগুনার আলী আহমদের 'নাসির অপেরা' প্রভৃতি দল যাত্রাচর্চায় ভূমিকা রাখে। টাঙ্গাইল জেলার খ্যাতিমান যাত্রাভিনেতা হিসেবে বোয়ালীর বাঁশি মিয়া, কালিপুরের বিনোদ সাহা, নাগরপুরের নিকুঞ্জ সাহা, বিশ্বাস বেতকার কার্তিকচন্দ্র শীল, করটিয়ার ঠাকুরদাস পাল, আকুরটাকুরের অনিল বাগচী ও সুনীল বাগচী, পোড়াবাড়ির মতিলাল গৌড়, কাঞ্চনপুরের সিরাজুল ইসলাম খান মালা, শিবপুরের শিশির ভৌমিক এবং সন্তোষের গোপাল কর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

১৯৮০ সালে গঠিত আনিছুর রহমানের 'রয়েল বীণাপানি অপেরা' (বগুড়া), আবদুল মালেক মোড়লের 'দি সাধনা অপেরা (খুলনা) উল্লেখযোগ্য যাত্রাদল। তবে এ সময় যশোরে বিশিষ্ট নায়ক মানিক সেন 'মানিক অপেরা' নামে একটি দল গঠন করেন। অভিনয়ের ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করলেও দলটি বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে নি। গোপালগঞ্জের আবুল খায়ের মিয়া 'বঙ্গবানী অপেরা' দল গঠন করেন। ১৯৮২ সালে আবদুল হাই মাস্টারের 'ভাগ্যলিপি অপেরা'(নোয়াখালি) দেশব্যাপী পরিচিতি অর্জন করে। এবছর আলফাজ মিয়ার 'সবিতা অপেরা' (সাতক্ষীরা), নির্মলকুমার সরদারের 'সুদর্শন অপেরা' (যশোর), সন্তোষকুমার বিশ্বাসের 'স্বর্ণকলি অপেরা' (সাতপাড়, গোপালগঞ্জ) উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় দল। ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'সত্যনারায়ণ অপেরা' (নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল, মানিকগঞ্জ), এবং 'নিউ গীতশ্রী যাত্রা ইউনিট' (মফিদুল আলম খোকা, যশোর) যাত্রা পরিবেশনায় বেশ আলোড়ন তোলে। তবে যশোর এলাকার জগদীশচন্দ্র বর্মনের 'সারথী যাত্রা ইউনিট' এবং সুকুমার সরদারের 'দি তরুণ অপেরা' যাত্রামোদী দর্শকশ্রোতাদের মনোরঞ্জন করে। খোন্দকার আতাউর রহমানের 'রাজনীলা নাট্যসংস্থা' (ফরিদপুর), মোহাম্মদ আলী চৌধুরীর 'সোনালী অপেরা' (গাজীপুর), খোন্দকার আলিমুজ্জামানের 'আদি বলাকা অপেরা' (ফরিদপুর), গৌরাঙ্গ বিশ্বাসের 'অগ্রগামী নাট্যসংস্থা' (রাজবাড়ী), মেহবুব ইসলামের 'আর্য অপেরা'

(সাতক্ষীরা) এবং মো: নূরুল ইসলামের 'জনতা যাত্রা ইউনিট' (রংপুর) ইত্যাদি ১৯৮৪ সালের উল্লেখযোগ্য দল । তারাপদ কর্মকার 'অগ্রগামী নাট্যসংস্থার পরবর্তী অধিকারী হন। আর্য অপেরা'য় মেহবুব ইসলামের পরে মানিক মেম্বার এবং সর্বশেষ মজিবুর রহমান অধিকারী হন। ননী চক্রবর্তীর 'আদি অগ্রগামী যাত্রাসমাজ' (ঢাকা), নৃপেনবাবুর 'উজ্জ্বল নাট্যসংস্থা' (মাগুরা), শৈলেন রায়ের 'অঞ্জলি অপেরা' (গোপালগঞ্জ), আবুল কালামের 'কাকলী নাট্যসংস্থা' (মানিকগঞ্জ), আবদুর রশীদের 'চাঁদনী অপেরা' (কুমিল্লা), হামিদ মণ্ডলের 'আঞ্জু অপেরা' (জামালপুর), মো. জালালউদ্দিনের 'বঁশিরিয়া সৌখিন নাট্যদল' – প্রভৃতি এ বছরে গঠিত হলেও অল্প সময়েই নিজেদের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে।

১৯৮৫ সালে জন্ম নেয়া মানিকগঞ্জের 'তমসের সিকদারের নাট্যসংস্থা' দেশের উল্লেখযোগ্য নাট্যদলে পরিণত হয়। একই বছরে পরিতোষ ব্রহ্মচারী 'সোনালী অপেরা' (খুলনা) নামে যাত্রাদল করেন। জীবদ্দশায় তিনি দেশের শীর্ষস্থানীয় পালাকারের মর্যাদা পেয়েছিলেন। তাঁর রচিত *ক্লিওপেট্রা*, *দস্যুরানী ফুলন দেবী*, *এক যুবতী হাজার প্রেমিক*, *নদীর নাম মধুমতি*, *বিরাজ বৌ* প্রভৃতি পালা সারাদেশে ব্যাপক সাড়া জাগায়। এছাড়া রতন মিয়ার 'রূপশ্রী অপেরা' (কুমিল্লা), রাধাচরণ সাহা রায়ের 'নবযুগ অপেরা' (নেত্রকোণা) ও এ সময় বেশ আলোচিত হয়। নবযুগ অপেরার গৌরাঙ্গ আদিত্য দেশের শ্রেষ্ঠ বিবেকশিল্পী হিসেবে সমাদৃত হন। ১৯৮৫ সালে হায়দার আলীর 'নবরূপা অপেরা' (মানিকগঞ্জ) এবং স্বপনবাবুর 'স্বপন অপেরা' নামে আরও দুটি দলের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৮৫ সালের ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ টেলিভিশনে অমলেন্দু বিশ্বাস নির্দেশিত ও চারণিক নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজিত *মাইকেল মধুসূদন* পালাটি সম্প্রচারিত হয়। ১৯৮৬ সালে মানিকগঞ্জের কে এম হারুনুর রশিদ, ছাকেলা বেগম এবং আ. জলিল সিকতার (তারা মিয়া) যথাক্রমে 'মহানগরী যাত্রা ইউনিট', 'নিউ জয়ন্তী অপেরা' এবং 'আদি প্রগতি নাট্যসংস্থা' গঠন করেন। এছাড়াও সাধনকুমার মুখার্জী গণেশের 'চণ্ডী অপেরা' (যশোর), অসীমকান্তি বলের 'চন্দ্রা অপেরা' (গোপালগঞ্জ), আবদুর রশীদ ফকিরের 'বেঙ্গল অপেরা' (ময়মনসিংহ), এস আলম লাবুর 'রত্নশ্রী অপেরা' (মাদারীপুর), সুধীর বিশ্বাসের 'নিউ ফাল্গুনী নাট্যসংস্থা' (গোপালগঞ্জ) এ সময়ের উল্লেখযোগ্য যাত্রাদল। ছাকেলা বেগমের 'নিউ জয়ন্তী অপেরা' পরবর্তীসময়ে এসএম ইকবাল রুমির অধিকারিত্বে পরিচালিত হয়। ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত নতুন দলের তালিকায় রয়েছে শামসু হকের 'সুমি অপেরা' (নরসিংদী), নূর খাঁ চেয়ারম্যানের 'কপোতাক্ষ যাত্রা ইউনিট' (সাতক্ষীরা), আদব আলীর 'মহুয়া নাট্যসংস্থা (নেত্রকোণা) এবং শিপ্রা সরকার ইমা ও সুশীল সরকারের 'নিউ প্রতিমা অপেরা' (মানিকগঞ্জ)। ১৯৮৮ সালে নেত্রকোণার শহিদ মিয়া 'মণিহার অপেরা' এবং আবদুল মান্নান 'শাহী অপেরা' চালু করেন। এছাড়া এ সময় সাতক্ষীরার সাত্তার মিয়ার 'মণিহার যাত্রা ইউনিট' এবং নারায়ণগঞ্জের আজগর আলীর 'দুর্বার অপেরা' নতুন দল হিসেবে কার্যক্রম প্রকাশ করতে থাকে।

১৯৮৯ সালে মাঠে নামে কার্তিকচন্দ্র দাশের 'নিউ প্রভাস অপেরা' (সাতক্ষীরা), মিনতি বসু ও সুকল্যাণ বসুর যৌথ মালিকানায় 'নাট্যমঞ্জুরী যাত্রা ইউনিট' (সাতক্ষীরা), গোবিন্দলাল সাহার 'সততা নাট্যসংস্থা' (জামালপুর), আনোয়ার হোসেনের 'বিউটি অপেরা' (নারায়ণগঞ্জ), গোষ্ঠবিহারী মণ্ডলের 'রাজমহল অপেরা' (খুলনা), সোহরাব তালুকদারের 'শিল্পীতীর্থ নাট্যসংস্থা' (নাটোর)। পরবর্তীকালে 'রাজমহল অপেরা'র অধিকারী হন খুলনার শেখ বেলালউদ্দিন বিলু।

১৯৯০ সালে শহিদুল ইসলামের 'পারুল অপেরা' (যশোর), মুজিবর রহমান সরদারের 'বিশ্ববাণী যাত্রা ইউনিট' (নাটোর) এবং মো: নজরুল ইসলামের 'রাজধানী যাত্রা ইউনিট' (ঢাকা) – এই তিনটি দল বেশ জনপ্রিয় হয়। এছাড়া মো: আবদুল হালিমের 'আকাঙ্ক্ষা নাট্যদল' (ঢাকা), ননীগোপাল সরকারের 'জনান্তিক নাট্যগোষ্ঠী' (নেত্রকোণা) যাত্রাদল হিসেবে পরিচিতি অর্জন করে। ১৯৯১ সালে শাহনেওয়াজ ফিরোজ স্বপনের 'মধুছন্দা যাত্রা ইউনিট' (ফরিদপুর), শামসুল আলমের 'দি সিজার্স যাত্রা ইউনিট' (যশোর), কৃষ্ণা চক্রবর্তীর 'রামকৃষ্ণ যাত্রা ইউনিট' (বাগেরহাট) এবং আলমগীর হোসেনের 'বিশ্বেশ্বরী নাট্যসংস্থা' (ঢাকা) – বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৯৯২ সালে ঢাকায় মনজুরুল ইসলাম লাভলুর 'চন্দ্রা যাত্রা ইউনিট', আলাউদ্দিন দেওয়ানের 'তাজমহল যাত্রা ইউনিট' এবং নয়ন চৌধুরীর 'শিল্পী অপেরা' প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া মাগুরা জেলায় আবদুল সালামের 'উত্তরণ নাট্যসংস্থা' মাঠে নামে। এসময় শেখ আমজাদ হোসেন 'রংধনু লোকনাট্য' (খুলনা), পারভীন জামান 'আদি বঙ্গশ্রী অপেরা' (ফরিদপুর), আবদুল মান্নান 'উত্তরণ যাত্রা ইউনিট' (রংপুর) এবং আবদুল মান্নান 'মণিহার অপেরা' (সাতক্ষীরা) চালু করেন। ১৯৯৩ সালে 'পদ্মা যাত্রা ইউনিট' (প্রদীপকুমার সাহা, যশোর), 'দেশ অপেরা' (মিলন কান্তি দে, ঢাকা), 'চৈতালী অপেরা' (অতুলপ্রসাদ সরকার, মাগুরা), 'লক্ষ্মীভাণ্ডার অপেরা' (রণজিৎ সেন, চট্টগ্রাম) এবং 'আদমজী কিরণ নাট্যগোষ্ঠী' (নূর মোহাম্মদ নূরু, নারায়ণগঞ্জ) গঠিত হবার তথ্য পাওয়া যায়। ১৯৯৪ সালে নয়ন মিয়ার 'শিল্পী শোভা অপেরা' (মুন্সিগঞ্জ) এবং গোপালচন্দ্র পালের 'কণিকা অপেরা' (নড়াইল) গড়ে ওঠে। গীতিধর্মী পালা আসরায়নে 'শিল্পী শোভা অপেরা' অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৯৫ সালে সুভাষ চক্রবর্তীর 'রাজমনি অপেরা' (ফরিদপুর) এর জন্ম হয়। এছাড়াও 'সৌখিন গীতিনাট্য' (মো. শামীম হোসেন, গাজীপুর), 'তিনকন্যা অপেরা' (বশির আহমেদ, যশোর) এবং 'ঝুমুর টঙ্গী' (নুরুল ইসলাম সবুজ' গাজীপুর) –– এই তিনটি গীতিনাট্য দলের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৯৬ সালে আরশাদ আলীর 'বিনোদন ঝুমুর যাত্রা' (মুন্সিগঞ্জ) এবং আবদুল মতিন সরকারের 'শাহীন অপেরা' (কুমিল্লা) –– নামে দুটি গীতিধর্মী যাত্রার দল গড়ে ওঠে। এছাড়া আবুল হাশেমের 'বন্ধন নাট্যসংস্থা' (নেত্রকোণা) এবং সেকেন্দার আলীর 'সূর্যমহল অপেরা' (মানিকগঞ্জ) সাধারণ যাত্রার দল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৯৭ সালে এস আলম লাবুর 'নিউ সবুজ অপেরা' (মাদারীপুর), নার্গিস

আক্তার লিপির 'তাজমহল অপেরা' (শরীয়তপুর) এবং সুনীল চার্লস রডরিক্সের 'নাগরী সৌখিন ঝুমুর শিল্পীগোষ্ঠী' (গাজীপুর) -- এই তিনটি দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৯৮ সালে 'কেয়া যাত্রা ইউনিট' (মাসুম চৌধুরী, লক্ষ্মীপুর), 'তরুণ অপেরা' (মো: নূরুল ইসলাম, চাঁদপুর) এবং 'আনন্দ অপেরা' (বাবর চান, যশোর) -- এই তিনটি দল জন্মলাভ করে। ২০০১ সালে মোসাদ্দেক আলীর 'মৌসুমী অপেরা'র যাত্রা আরম্ভ হয়।

ধারাবাহিকভাবে যে সকল দলের নাম, স্বত্ত্বাধিকারীর নাম, জেলার নাম এবং গঠিত হবার সময় জানা গেছে কেবল সে দলগুলোর কথাই বিশ্লেষণে এসেছে। কিন্তু এর বাইরেও রয়ে গেছে অনেক সৌখিন ও পেশাদার যাত্রার দল। বিভিন্ন সময়ে গঠিত আরও যে সমস্ত যাত্রাদলের আংশিক তথ্য পাওয়া যায় সেগুলোর খণ্ডিত তালিকা দেয়া হল -- লক্ষ্মীনারায়ণ অপেরা (১৯৫৮), কমলা অপেরা (১৯৬৪, ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পান্না অপেরা (১৯৭২, ব্রাহ্মণবাড়িয়া), 'ঝিনুক অপেরা' (১৯৮১, হবিগঞ্জ), পূর্বাচল নাট্যসংস্থা (১৯৮৬, কিশোরগঞ্জ), 'রকি যাত্রা ইউনিট' (১৯৯০, নেত্রকোণা), 'পলাশ নাট্যসংস্থা' (১৯৮৮, নেত্রকোণা), 'নিউ লিলি অপেরা' (১৯৮৮, কেয়া চৌধুরী), 'মহাশক্তি অপেরা' (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), 'নবারুণ অপেরা' (সিরাজগঞ্জ), 'মঞ্জুরী যাত্রা ইউনিট' (নাটোর), 'কৃষ্ণাকলি অপেরা' (নেত্রকোণা), 'শাপলা অপেরা' (ময়মনসিংহ), 'প্রতিভা অপেরা' (যশোর), 'রূপান্তর অপেরা' (যশোর), 'ঝিনাইদহ যাত্রা পার্টি' (ঝিনাইদহ), 'কোহিনূর যাত্রাপার্টি' (সিলেট), 'ঝর্ণা যাত্রা পার্টি' (টাঙ্গাইল), 'ঝুমুর অপেরা' (টাঙ্গাইল), 'বিশ্ববাণী অপেরা' (ফেনী), 'শিল্পতীর্থ অপেরা' (ফেনী), 'দীপালি যাত্রা পার্টি' (নারায়ণগঞ্জ), 'নর্থবেঙ্গল যাত্রাপার্টি' (রংপুর), 'মল্লিকা অপেরা' (খুলনা), 'রাজলক্ষ্মী অপেরা' (বরিশাল), 'শ্রীদুর্গা যাত্রা পার্টি' (পাবনা), 'সাগর অপেরা' (পাবনা), 'সূর্যমুখী অপেরা' (পাবনা), 'লিপটন অপেরা' (আমির সিরাজী), 'চলন্তিকা অপেরা' (বাবুল আখতার), 'একতা অপেরা' (মাগুরা), 'কাঞ্চন অপেরা' (কাঞ্চন মিয়া), 'গীতালি অপেরা' (যশোর), 'মিনার্ভা অপেরা' (পটুয়াখালী), 'জয়ন্তী অপেরা' (চট্টগ্রাম), 'সমাজ অপেরা' (সিরাজগঞ্জ), 'ফাল্গুনী অপেরা' (বরিশাল), 'জোনাকী অপেরা' (জ্যোৎস্না হায়দার, চাঁদপুর) প্রভৃতি।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও যাত্রাদল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। যাত্রানুষ্ঠানের খবর সংবাদপত্রে নিয়মিত ছাপা হয় না। একসময় সাপ্তাহিক 'চিত্রালী', সাপ্তাহিক 'সিনেমা', সাপ্তাহিক 'পূর্বাণী' ও মাসিক 'ঝিনুক' – এ সমস্ত পত্রিকায় নিয়মিত যাত্রার খবর ছাপা হতো। মাত্র দু-তিনজন সাংবাদিকই যাত্রার খবর পরিবেশন করতেন। কোনও কোনও দলের খবর একাধিকবার এসেছে। দু-তিন জন সাংবাদিকের পক্ষে পুরো দেশের যাত্রা পরিবেশনার চিত্র তুলে আনাও অসম্ভব ব্যাপার। যাত্রার দল-মালিকরা তাদের পরিবেশনার তথ্য কিংবা কর্মকাণ্ডের কোন নথিপত্র সংরক্ষণ করেন না। তাই যাত্রাদলের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্ক্ষভাবে বর্ণনা প্রায় অসম্ভব। রাজনৈতিক-

সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে নতুন যাত্রাদলের জন্ম হচ্ছে এবং পুরোনো অনেক দল টিকে আছে –– এটি অবশ্যই নিজস্ব ঐতিহ্যের প্রতি সাধারণ মানুষের চিরন্তন আকর্ষণের স্বাভাবিক প্রতিফল।

৫.৪ বাংলাদেশে যাত্রাশিল্পের পরিবেশনা

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে যাত্রা শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন আশার সঞ্চার হয়। ইতিহাস ও পুরাণের গালগল্পের স্থলে যাত্রায় সৃষ্টি হয় জীবনীভিত্তিক পালার নতুন ধারা। পাশাপাশি দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধ, মা-মাটি-মানুষকে উপজীব্য করে অসংখ্য পালা রচিত হয়। বাংলাদেশ পর্বে *মাইকেল*, *লেলিন*, *হিটলার*, *নটি বিনোদিনী*, *বিদ্রোহী নজরুল* ও *বঙ্গবন্ধুর* জীবনীকেন্দ্রিক পরিবেশিত পালা নতুন জীবনাদর্শের সন্ধান দেয়। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নতুন যাত্রাদল গঠিত হয়। সে সমস্ত দলের নানানমুখী পরিবেশনার মাধ্যমে জনজীবনে নতুন ঐকতান ধ্বনিত হয়। বাবুল অপেরা (১৯৭৩), যশোরের সাগরদাঁড়ির মধুমেলায়, বিধায়ক ভট্টাচার্যের পালা *বিদ্রোহী মাইকেল মধুসূদন* পরিবেশন করে। নটসম্রাট অমলেন্দু বিশ্বাস মধুসূদন চরিত্রকে রূপদান করে দেশীয় যাত্রাভিনয়ের একটি নতুন ধারার সূচনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রামের গীতশ্রী যাত্রা ইউনিটের *লেলিন* (১৯৭৪), মানিকগঞ্জের চারনিক নাট্যগোষ্ঠীর *হিটলার* (১৯৭৫), চট্টগ্রামের নবারুণ নাট্য সংস্থার *নটী বিনোদিনী* (১৯৭৬), সিরাজগঞ্জের বাসন্তী অপেরার *মা-মাটি-মানুষ* (১৯৭৯), মানিকগঞ্জের নিউ গণেশ অপেরার *বিদ্রোহী নজরুল* (১৯৭৬), খুলনার শিরিন যাত্রা ইউনিটের *ক্লিওপেট্রা* ও *দস্যুরানী ফুলন দেবী* (১৯৮০) এবং ময়মনসিংহের নবরঞ্জন অপেরার *চিড়িয়াখানা* (১৯৮১) প্রভৃতি উন্নত পালা পরিবেশিত হয়।[৪৫৬] স্বাধীনতার প্রথম দশ বছরে ঐতিহ্যবাহী যাত্রাভিনয়ের গুণগত মান পরবর্তী সময়ে আর রক্ষা করা যায়নি।

১৯৮০-২০০০ সাল এই বিশ বছরে বিভিন্ন দলে বেশ কিছু উন্নতমানের পালা পরিবেশিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পালাগুলো হল : চট্টগ্রামের বাবুল অপেরার *নবাব সরফরাজ খাঁ;* মানিকগঞ্জের নিউ গণেশ অপেরার *আঁধারের মুসাফির*, *বর্ণ পরিচয়*, *দেবী সুলতানা*; বলাকা অপেরার *সুলতানা রাজিয়া*; নবপ্রভাত অপেরার *শ্রীমতি বেগম;* শিরীন যাত্রা ইউনিটের *এ পৃথিবী টাকার গোলাম;* অগ্রগামী নাট্য সংস্থার *যৌতুক* ও *দেবদাস;* চণ্ডী অপেরার *শার্দূল জারাক খান*, *বিশে ডাকাত;* প্রতিমা অপেরার *জালিম সিংহের মাঠ*; রাজমহল অপেরার *কে ঠাকুর ডাকাত*, *মুঘল-এ-আযম;* তুষার অপেরার *মানবী দেবী*, *বিরাজ বৌ;* চারণিক নাট্যগোষ্ঠীর *দস্যুরানী ফুলনদেবী* ও *রক্তস্নাত-৭১*। একুশ শতকের প্রথম দশকে উল্লেখযোগ্য দল ও পালার তালিকায় রয়েছে : আনন্দ অপেরার *ডাইনি বধূ*, নিউ বেঙ্গল অপেরার *দুই টুকরো বউমা*, চ্যালেঞ্জার যাত্রা ইউনিটের *জন্ম থেকে খুঁজছি মাগো*, সিজার্স যাত্রা ইউনিটের

[৪৫৬] মিলন কান্তি দে, *যাত্রাশিল্পের সেকাল-একাল*, ঢাকার ৪০০ বছরের যাত্রা পরিক্রমা, ইত্যাদি, ঢাকা, প্র.প্র. ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ.৬৩

চরিত্রহীন, সবুজ অপেরার *আনারকলি*, দেশ অপেরার *দাতা হাতেম তাই* ও *গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গা*, লোকনাট্য গোষ্ঠীর *বর্গী এলো দেশে* ও *সতী করুণাময়ী*, চারণিকা যাত্রা সমাজের *মহীয়সী কৈকেয়ী* প্রভৃতি।

বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে বাংলাদেশের যাত্রামঞ্চগুলোতে দুই ধরনের পালা মঞ্চায়িত হয়ে থাকে। (ক) সংলাপ প্রধান যাত্রা, যা নাটকীয় গুণসম্পন্ন। যেমন : *সিরাজউদ্দৌলা*, *মা-মাটি-মানুষ*, *সোহ্‌রাব-রুস্তম*, *জানোয়ার*, *একটি পয়সা*; (খ) রূপকথা কিংবা লোককাহিনিভিত্তিক সংগীতবহুল পালা। যেমন- *রহিম বাদশা ও রূপবান কন্যা*, *লাইলী-মজনু*, *আলোমতি-প্রেমকুমার*, *কমলার বনবাস*, *গুনাইবিবি* প্রভৃতি। বাংলাদেশের আঞ্চলিক লোককাহিনি যারা লিখেছেন কবি জসীমউদ্‌দীন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর *মধুমালা*, *পদ্মপার* যাত্রামঞ্চে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অভিনীত হয়। রংপুরের লোককাহিনিকে ভিত্তি করে পিরগঞ্জের দীনবন্ধু ঠাকুরের রচনায় *রাখালবন্ধু* যাত্রাপালাটি উত্তরবঙ্গে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়। চারুচন্দ্র রায় চৌধুরীর *মধুমালা*, বশিরউদ্দিন আহম্মদের *হিংসার পরিণাম*; রফিকুল ইসলাম রানার *রক্তাক্ত মসনদ*, *রাজার ছেলে ভিখারী*, *সুজনমালা*, *কলঙ্কিনি মালা*, *মা কেন কাঁদে*, *দস্যু জাফরান*, *গরীবের কান্না*; হীরেন্দ্রকৃষ্ণ দাসের *লাইলী মজনু*, মাস্টার সেকেন্দার আলীর *বেদকন্যা*, *আসমান সিংহের ফাঁসি* প্রভৃতি যাত্রাপালা গীতধর্মী যাত্রাদলে অভিনীত হয়। ভুলবাক্য ও অযৌক্তিক কাহিনি বিন্যাস এ সমস্ত যাত্রার পরিবেশনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। লোককাহিনির উপর ভিত্তি করেই এ সকল পালা রচিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন নামে প্রকাশিত *গুনাইবিবি*, *রহিম বাদশা ও রূপবান কন্যা*, *আলোমতি ও প্রেমকুমার*, *অরুণ শান্তি*, *ভিখারীর ছেলে সুজন*, *সাগর ভাসা*, *আপন দুলাল*, *কাজল রেখা*, *গহর বাদশা বানেছাপরী*, *ছয়ফুলমুলক বদিউজ্জামান* পালাও বিভিন্ন যাত্রাদলে অভিনীত হয়েছে। আমাদের দেশীয় পালাহীন মঞ্চে এ সকল পরিবেশনাই ছিল গীতাত্মক।

মাইকেলের জীবন-চরিত নিয়ে একাধিক নাটক রচিত হয়। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বনফুলের *শ্রীমধুসূদন* (১৯৩৯), মহেন্দ্রগুপ্তের *মহাকবি মাইকেল* (১৯৪২), নিতাই ভট্টাচার্যের *মাইকেল মধুসূদন* (১৯৪৩), অজয় চক্রবর্তীর *মহাকবি মধুসূদন*। ১৯৬৬ সালে বিধায়ক ভট্টাচার্য রচনা করেন *বিদ্রোহী মাইকেল মধুসূদন* পালা। এই যাত্রায় পালাকার ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে শব্দের মালা গেঁথেছেন। তির্যক, শানিত এবং ছন্দোময় উপস্থাপনায় এ পালার সংলাপগুলো বিন্যস্ত। নাটকীয় উৎকণ্ঠার সময় এসেছে দীর্ঘ এবং দীর্ঘতর বাক্য। যেমন একটি নাটকীয় মুহূর্তে মুন্সী রাজনারায়ণ দত্ত বলছেন,

> তুমি বিলেত যাও, কি নরকে যাও – আমার কিছুই যায় আসে না। আমি তোমাকে অনুরোধ করবো এই বাড়িতে না আসতে। তুমি যেখানে দাঁড়াবে, সেখানে গোবরজল দিতে হবে। তাকে আগুনে পুড়িয়ে শুদ্ধ করে নিতে হবে। যাও, তোমাকে এক পয়সাও দেব না।[৪৫৭]

[৪৫৭] মিলন কান্তি দে, *যাত্রাশিল্পের সেকাল-একাল*, ঢাকার ৪০০ বছরের যাত্রা পরিক্রমা, ইত্যাদি, ঢাকা, প্র.প্র. ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ.৬৩

এরকম দৃশ্য নাটকে দেখা গেছে যে মাইকেল কথোপকথনের পরে চলে যায়। কিন্তু যাত্রায় মধুসূদন এভাবে শান্তশিষ্টের মতো চলে যাবে না। নায়কোচিত বীরের মতো পিতার মুখের উপর একটি দীর্ঘ ও শাণিত সংলাপ প্রক্ষেপণ করে প্রচুর দর্শক করতালির মধ্যে সে প্রস্থান করবে। আর তাই পিতার ঐ সংলাপের পর মধুসূদনের উচ্চারণ:

> এবার আমি কিছু বলি, আপনি শুনুন। আজ যে জাতি ও ধর্ম নিয়ে আপনার গর্ব ও অহংকারের সীমা নেই, ভবিষ্যতে সে জাতিভেদ থাকবে না। এর জন্য ভগবানের প্রয়োজন হবে না। এর অসারতা বুঝেই মানুষই একদিন এই জাতিভেদ প্রথাকে ছেঁড়া জুতোর মতো ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আমি জানি, আমি কোনো অন্যায় করিনি। খ্রিস্টান হয়ে – আমি যে অসাধারণ – সেটাই প্রমাণ করেছি। আজ যেভাবে আপনি আমাকে অপমান করে নিঃসম্বল অবস্থায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন, সামনেই এমন দিন আসবে যেদিন আপনি আমাকে ছেলে বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করবেন। হ্যাঁ, গর্ববোধ করবেন। এমনদিন আপনার জীবিতকালেই আসবে – যেদিন মুন্সী রাজনারায়ণ দত্ত বললে কেউ আপনাকে চিনবে না। পরিচয় দিতে হবে আপনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাবা। মানুষের কাছে, সমাজের কাছে অর্থের জোরে সম্মান আপনি আদায় করতে পারলেন না, সেদিন নিজ থেকে সব জাতির প্রণাম আপনার পায়ে এসে পৌঁছাবে। সেদিন চোখের জলে বুক ভাসিয়ে আপনি সবাইকে ডেকে ডেকে বলবেন – ওগো, তোমরা শোন, আমি মাইকেল মধূসূদনের বাবা। আপনাকে এই অভিশাপ আমি দিয়ে যাচ্ছি, মুন্সী রাজনারায়ণ দত্ত মুছে গিয়ে সেদিন আপনি হবেন মাইকেল মধুসূদনের বাবা।[৪৫৮]

স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয় মুহম্মদ শফির *মহাকবি মধুসূদন*।

৫.৫ বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক যাত্রাপালা

স্বাধীনতা বাঙালির অসামান্য অর্জন। কিন্তু সে অর্জনের পথ সরল কিংবা অনায়াস নয়। স্বাধীনতার স্বপ্নময় প্রাপ্তির পেছনে জাতির দুঃসহ উৎসর্গ-মূল্য রয়েছে। তাই স্বাধীনতার পরও স্মৃতিতাড়িত বাঙালি যাত্রাকারদের দীর্ঘসময় যুদ্ধের ভয়াবহতার শিল্পরূপ দিতে হয়। যুদ্ধকালীন বাঙালির ইতিহাসের ভয়ঙ্কর অধ্যায় –– পাকসেনা কর্তৃক বাংলা মায়ের সম্ভ্রম লুণ্ঠনের করুণ চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে দেশমাতৃকার প্রতি সন্তানের অপরিশোধ্য দায় মেটাবার তৃষ্ণায় রচিত হয় উল্লেখযোগ্য যাত্রাকর্ম। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে অনেক পালাকারই যাত্রা রচনা করেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের সেই উত্তাল সময়গুলির সাক্ষ্য বহন করে এসব যাত্রা। মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকেন্দ্রিক যাত্রাপালা গুলোর যথাসম্ভব তালিকা নিম্নে দেয়া হলো :

---

[৪৫৮] *বিদ্রোহী মাইকেল মধুসূদন*, প্রথম অংক, চতুর্থ দৃশ্য, উদ্ধৃত.মিলন কান্তি দে, *যাত্রাশিল্পের সেকাল-একাল*, ঢাকার ৪০০ বছরের যাত্রা পরিক্রমা, ইত্যাদি, ঢাকা, প্র.প্র. ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ.১৫২

ক্রমিক নং	রচনাকাল	পালা	পালাকার
১.	১৯৭১	*আমি মুজিব নই*	মন্মথ রায়
২.	১৯৭১	*দুরন্ত পদ্মা*	দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৩.	১৯৭১	*জয়বাংলা*	উৎপল দত্ত
৪.	১৯৭১	*সংগ্রামী মুজিব*	নরেশ চক্রবর্তী
৫.	১৯৭১	*মুক্তিফৌজ*	নিরাপদ মণ্ডল
৬.	১৯৭১	*বঙ্গবন্ধু মুজিবুর*	সত্যপ্রকাশ দত্ত
৭.	১৯৭১	*বঙ্গবন্ধুর ডাক*	ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়
৮.	১৯৭১	*সাতকোটির মুজিব*	নাম জানা যায়নি
৯.	১৯৭২	*জল্লাদের দরবার*	কল্যাণ মিত্র
১০.	১৯৭২	*মুজিবের ডাক*	ব্রজেন্দ্রকুমার দে
১১.	১৯৭২	*আমি মুজিব বলছি*	অরুণ রায়
১২.	১৯৭২	*শেখ মুজিব*	সাধন চক্রবর্তী
১৩.	১৯৭২	*বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*	মৃণাল কর
১৪.	১৯৭৪	*নদীর নাম মধুমতি*	পরিতোষ ব্রহ্মচারী
১৫.	১৯৭৪	*মুক্তিসেনা*	বিপিন সরকার
১৬.	১৯৯৬	*রক্তস্নাত একাত্তর*	জ্যোৎস্না বিশ্বাস
১৭.	১৯৯৪	*বাংলার বিজয়*	দিলীপ সরকার
১৮.	১৯৯৫	*সোনার বাংলা*	এম এ মজিদ
১৯.	১৯৯৬	*একাত্তরের জল্লাদ*	আবদুস সামাদ
২০.	১৯৯৭	*বাংলার মুক্তি*	নজরুল ইসলাম সাজু
২১.	২০১৪	*বাংলার মহানায়ক*	মিলন কান্তি দে

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত এ সমস্ত পালায় এক বা একাধিক ঐতিহাসিক ভাষণযুক্ত করা হয়েছে, যাতে পালাকাহিনির আবেদন সর্বব্যাপী হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-সাহিত্যিকরা পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলেন। এ সময় কলকাতার বিভিন্ন যাত্রাদলে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পালা মঞ্চায়নের এক প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বাঙালিদের একটি স্বাধীন ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠার ন্যায়সংগত সংগ্রামের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তোলাই এ পালাগুলির উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গে শরণার্থী শিল্পীরা এসব পালায় অভিনয়

করেন। বঙ্গবন্ধুর সমগ্র জীবনের প্রায় প্রতিটি মুহূর্তে রয়েছে নাটকীয় উৎকণ্ঠা, যা তাঁর সংগ্রামী জীবনভিত্তিক পালা রচনায় পালাকারদের আলোড়িত করে।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের আলোকে প্রথম দিকে কয়েকটি পালা অভিনীত হতে দেখা যায়। এগুলো হচ্ছে *আমি মুজিব বলছি*, *সাতকোটির মুজিব* ও *জয় বাংলা*। *আমি মুজিব বলছি* পালাটিতে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ রয়েছে। *সাতকোটির মুজিব* পালায় ছয়দফা আন্দোলন থেকে ২৫ মার্চের কালো রাতে পাকবাহিনির হাতে বন্দি হওয়া পর্যন্ত শেখ মুজিবরের ঘটনাবহুল জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্র তুলে ধরা হয়। হানাদার বাহিনির অত্যাচারে নির্যাতিত নারীদের মর্মস্পর্শী চিত্র আঁকা হয়েছে *জয় বাংলা* পালায়। সত্যপ্রকাশ দত্তের *বঙ্গবন্ধু মুজিবুর* যাত্রাপালায় বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ এবং কয়েকটি রাজনৈতিক সংগ্রামের চিত্র উপস্থাপন করা হয়। পাশাপাশি ৭ মার্চের ভাষণটিও হুবহু রাখা হয় এই পালায়। কলকাতার আর্য অপেরার ব্যানারে এটি মঞ্চস্থ হয়। মুক্তিযোদ্ধারা যখন পাক হানাদার বাহিনির বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করছিলেন, সে সময় রাতের পর রাত যাত্রামঞ্চে ধ্বনিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর অমরবাণী –– 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম...।' মুজিব চরিত্রে অভিনয় করেন সে সময়ের পশ্চিমবঙ্গের শক্তিমান যাত্রাভিনেতা স্বপনকুমার। বাংলাদেশের মঞ্জুশ্রী মুখার্জী ছিলেন বীরাঙ্গনার ভূমিকায়।

১৯৭২ সালে পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচনা করেন *মুজিবের ডাক* পালা। ছয়দফা আন্দোলন থেকে ২৫ মার্চ কালরাতে পাকসেনাদের হাতে বন্দি হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের কিছু অধ্যায় এ পালায় তুলে ধরা হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও অন্যান্য রাজনৈতিক ঘটনা পরিক্রমায় বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনই এ পালায় চিত্রিত হয়েছে। শেখ মুজিব জীবনের কঠিন কঠোর যাত্রাপথে বাঙালির মুক্তির সঠিক পথেরই সন্ধান করেছেন । এই ভূখণ্ডের শোষিত-বঞ্চিত মানুষগুলোকে তিনি স্বতন্ত্র এক আবাসভূমি দিয়েছেন। তাই তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। এই শাশ্বত সত্যের আবেদন নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে অরুণ রায়ের *আমি মুজিব বলছি* পালায়। এ পালায় সংক্ষিপ্তভাবে বঙ্গবন্ধুর দুটি ভাষণ সংযুক্ত হয়। এ পালাগুলো পশ্চিমবঙ্গের লেখকদেরই রচনা।

বাংলাদেশের পালাকারদের মধ্যে বাগেরহাট জেলার বাজুয়া গ্রামের পরিতোষ ব্রহ্মচারী রচনা করেন *নদীর নাম মধুমতি*। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত এ পালা তুষার অপেরার ব্যানারে কয়েক বছর অভিনীত হয়। জোৎস্না বিশ্বাসের লেখা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পালা *রক্তস্নাত একাত্তর* চারণিক নাট্যগোষ্ঠীর পরিবেশনায় বিভিন্ন যাত্রামঞ্চে অভিনীত হয়। এ এইচ খান লিখিত বঙ্গবন্ধুর জীবন কাহিনি *ফাদার অব দ্যা নেশন* অবলম্বনে *বাংলার মহানায়ক* যাত্রাপালা রচনা করেন মিলন কান্তি দে। সময়ের নানা বির্তক ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে গবেষণাধর্মী এ পালায় পালাকার অসামান্য দক্ষতায় বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনকে উপস্থাপন করেন। পালায় ৩টি ভাষণ আছে। এগুলো

হচ্ছে -- ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু উপাধি গ্রহণের পর, ৭ মার্চ অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে, ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন। *বাংলার মহানায়ক* পালায় বঙ্গবন্ধুর একটি সংলাপ এরকম : 'আমার ৬-দফার মধ্যে আছে বাঙালির মুক্তিসনদ (ঝাঁজের শব্দ), ৬-দফার মধ্যে বেজে ওঠে বাঙালির ঐকতান (ঝাঁজের শব্দ), ৬-দফা বাঙালির বেঁচে থাকার অস্তিত্ব।'[৪৫৯]

ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত পালা *গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গা*। এটিও মুক্তিযুদ্ধের সময়কার রচনা। পালাকার শান্তিরঞ্জন দে সোনারগাঁওয়ের অধিপতি সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্‌কে উপস্থাপন করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতীকী চরিত্রে। কাহিনিতে দেখা যায়, দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ তোঘলক সসৈন্যে অতর্কিতে বাংলা আক্রমণ করেন। সাম্রাজ্যবাদী চক্রের এই হামলা প্রতিহত করতে গর্জে উঠলেন সুলতান। স্বাধীনতা রক্ষার উদাত্ত আহবান জানালেন দেশপ্রেমিক জনতাকে। যেমনটি বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। যার যা আছে তা-ই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা কর।' ৭ মার্চের ভাষণের কিছুটা ভাব-ব্যঞ্জনা ইলিয়াসের একটি সংলাপে ভাষারূপ পায় :

> আমার জান কবুল। সোনারগাঁও, সাতগাঁও, ঢাকা – তিন অঞ্চল জুড়ে আমি গড়ে তুলব এক দেশ, যার নাম হবে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। যে দেশের মানুষ একই সুরে গান গাইবে, একই ভাষায় কথা বলবে, একই কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে জয়ধ্বনি দেবে স্বাধীন বাংলার জয়।[৪৬০]

বাংলার মাটি থেকে বঙ্গবন্ধু ও জয় বাংলা কখনো মুছে যাবে না -- যাত্রাপালার সুরে ও ছন্দে এই সত্যকথন বারবার ঘুরে-ফিরে এসেছে।

যাত্রাপালার ক্ষেত্রে জীবনীনির্ভর পালা নতুন কোনো বিষয় না হলেও বাংলাদেশের পর্বে এসে জীবনীভিত্তিক পালার জোয়ার আসে। এর ক্ষেত্রে এমন বিবেচনা কার্যকর হয় যে, পালা রচনার বিষয়বস্তু এই বাংলা অঞ্চলের এমন কোনো আদর্শ বা বীর সত্তাকে নিয়ে হতে হবে যা নতুন দেশের মানুষের সামনে বীরপ্রতিমা হিসেবে উপস্থিত করা যায়। অবিভক্ত বাংলার বীরপ্রতিম চরিত্র হিসেবেই নজরুল ও মধুসূদনের জীবনী নিয়ে পালা রচিত হয়। জীবনীর বিষয় হবার ক্ষেত্রে বিদ্রোহী ও বিপ্লবী চরিত্র হিসেবে এরপরেই শেখ মুজিবর রহমানের স্থান অত্যন্ত উঁচুতে; বিশেষ করে পালাগুলোর রচনাকালে বঙ্গবন্ধু জীবিত ছিলেন; তার জীবদ্দশাতেই তাঁর জীবনের অর্জন নিয়ে পালা রচিত হচ্ছে এমন ঘটনা নিয়ে, যেসব ঘটনা ঐতিহাসিক আখ্যা তখনও লাভ করেনি। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকেন্দ্রিক যেসব পালা রচিত হয় তাতে জীবন্ত বাস্তব ঘটনাকেই উপজীব্য করা হয়। সমকালীন বিষয়কে

---

[৪৫৯] মিলন কান্তি দে, *দুটি যাত্রাপালা, দাতা হাতেম তা'য়ী, বাংলার মহানায়ক*, ইত্যাদি, ঢাকা, প্র.প্র. ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ.৯৩

এভাবে পালায় উপস্থাপন করার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের যাত্রার অগ্রযাত্রা শুরু হয়। বঙ্গবন্ধুর দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব, উদাত্ত কণ্ঠস্বর, তাঁর সংগ্রামী জীবন, তাঁর আহ্বানে এই ভূখণ্ডের মানুষের মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপ দেওয়া এই পালাগুলোতে যাত্রার বিষয় হিসেবে স্থান পায়। এগুলো জীবনীভিত্তিক পালা ছাড়াও রাজনৈতিক পালারও দৃষ্টান্ত; বিশেষ করে উৎপল দত্তের ধারায় সমসাময়িক বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক পালা রচনার আদর্শ।

৫.৬ বাংলাদেশের যাত্রাদল

বাংলাদেশে যাত্রাদলের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তথা যাত্রাদলের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নেই। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অথবা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে এ ব্যাপারে কোনো যথাযথ তথ্য সংরক্ষিত নেই। যাত্রাদল গঠন করতে জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে লাইসেন্স ও পালা পরিবেশনের অনুমতি নিতে হয়। সকল ব্যবসায় বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর লাইসেন্স নবায়ন করে থাকে। নতুন জেলায় যাত্রা পরিবেশনের জন্য নতুন করে অনুমতি নিতে হয়। এমনকি প্রতিরাতের জন্য আলাদা অনুমতি নিতে হয়। যদিও এই অনুমতি নেয়া অনেকটা হয়রানিমূলক আচরণের পর্যায়ে পড়ে। ২০০৪ সালে যাত্রাদলের সংখ্যা সম্পর্কে যাত্রাসম্রাট অমলেন্দু বিশ্বাস জানিয়েছেন,

> বাংলাদেশে আনুমানিক পঞ্চাশটি যাত্রাদল ও একশটি হাফ-যাত্রা ঘেটুযাত্রাদল মিলে সর্বমোট ১৫০টি যাত্রাদল রয়েছে। যাত্রাদল অর্থে যে সব দল কেবল মাত্র প্রতিষ্ঠিত নাট্যকারের সাহিত্যভিত্তিক পালার অভিনয় করে। হাফ-যাত্রা বা ঘেটু যাত্রা বলে খ্যাত অর্থে যে সব দল প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার ও সঙ্গে কাঁচা নাট্যকারের লেখা রূপকথার কাহিনী অবলম্বনে রচিত নিম্নমানের পালাও অভিনয় করে।[৪৬১]

অর্থাৎ 'হাফ-যাত্রা' বা 'ঘেটুযাত্রার' দলকে তিনি পূর্ণযাত্রার মর্যাদা দিতে সঙ্গত কারণেই কুণ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু এরাও ভ্রাম্যমাণ দল হিসেবে সক্রিয় থেকে একশ্রেণির মানুষের কাছে জনপ্রিয় হওয়ায় এদেরকেও মোট যাত্রাদলের সংখ্যা বলার সময় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ১৯৯২ সালে সকল জেলা প্রশাসকের বরাবর প্রদত্ত বাংলাদেশ যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের স্মারকলিপি থেকে জানা যায় :

> স্বাধীনতার আগে এদেশে যাত্রাদলের সংখ্যা ছিল ২২। ৭২-৭৩ মৌসুমে ৫০ টি দল সংগঠিত হয়। এরপর জনগণের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে দলের সংখ্যা ছিল ২১০। শিল্পী-কুশলী-কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪,৭০০। এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা প্রায় তিনলক্ষ।

বাংলাদেশ যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে এখনও যাত্রাদলের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। মাঠপর্যায়ে গবেষণার মাধ্যমে যাত্রা গবেষক তপন বাগচী জানিয়েছেন : '২০০১ সালে প্রায় ৮০ টি যাত্রাদল, ২০০২ সালে ৬৪টি যাত্রাদল এবং ২০০৩ সালে ৪০টি যাত্রাদল পালা পরিবেশন করার জন্যে মাঠে ছিল।'[৪৬২]

---

[৪৬১] অমলেন্দু বিশ্বাস, *বাংলাদেশের যাত্রাশিল্প*, শ্রাবণ, ঢাকা, প্র. প্র. মার্চ ২০০৩, পৃ.৩৭

[৪৬২] তপন বাগচী, *বাংলাদেশের যাত্রাগান জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ ১০৩

ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং সংবাদ ও প্রতিবেদন থেকে ২১৫ টি দলের নাম, মালিকের নাম, রেজিস্ট্রেশন গ্রহণের বছর ও জেলার নাম উদ্ধার করা গেছে (পরিশিষ্ট-১)। আরও কিছু দলের নাম পাওয়া গেলেও দলমালিকের নাম-সহ অন্যান্য তথ্য পাওয়া যায়নি। এর মধ্যে সৌখিন যাত্রাদলের সংখ্যাই বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। মৌসুমে দু-একটি যাত্রাপালা মঞ্চায়ণের জন্যে এ ধরনের সৌখিন যাত্রাদল গঠিত হয়। লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও অনেক দল কাজ করে না আবার অনেকে অন্যের লাইসেন্স ভাড়া নিয়ে দলের মূল নামের আগে 'আদি', 'নিউ', 'নব', 'নং' প্রভৃতি শব্দের মেলবন্ধনে নতুন যাত্রাদল গঠন করেছে। ২১৫টি দলের তালিকা পাওয়া গেলেও সাধারণত কোনো মৌসুমেই ৮০/৯০ টির বেশি যাত্রাদল মাঠে থাকে না। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ৮৮টি যাত্রাদলকে নিবন্ধন-পত্র প্রদান করেছে, তার মধ্যে নারী অধিকারী রয়েছেন ১৭ জন। স্বাধীনতার পরে যাত্রাদলের সংখ্যা ব্যাপক হারে বিস্তার করেছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী দুই দশক জুড়েই যাত্রা প্রসার লাভ করে। কিন্তু তারপর থেকে প্রশাসনিক জটিলতায় জড়িয়ে যাত্রা নিজস্ব ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি চারটি যাত্রা উৎসবের আয়োজন করে। উৎসব-স্মরণিকা থেকে তখনকার সময়ে অংশগ্রহণকারী দলের তালিকা অনুযায়ী ১৯৭৯ সালে ১৫টি, ১৯৮০ সালে ২৮টি, ১৯৮১ সালে ৩টি, ১৯৯৩ সালে ১৫টি এবং ১৯৯৫ সালে ১৪টি যাত্রা দলের অংশগ্রহণের তথ্য পাওয়া যায়। চারটি উৎসবে বেশ কিছু দল একাধিকবার অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। তবে ১৯৮১ সালে কেবল দেশি পালাকারদের পালা নিয়ে উৎসব আহ্বান করায় মাত্র ৩টি দল এতে সাড়া দিয়েছিল। ফলে উৎসব সফল হয়নি। দায়সারাভাবে উৎসবটি তিনদিন চললেও কোন স্মরণিকা প্রকাশ হয়নি। ২০১১ সাল পর্যন্ত শিল্পকলা একাডেমিতে তালিকাভুক্ত ২১৯টি দল এর তথ্য পাওয়া যায়। ২০১২ সাল থেকে ৬২টি দল তালিকাভুক্ত হয়। ২০১৬ সালের ১৮-২৫ নভেম্বর, ৮ দিনব্যাপী যাত্রা বিষয়ক কর্মশালা ও যাত্রাদলের নৃত্যশিল্পীদের জন্য নৃত্য কর্মশালা হয়। যাত্রাশিল্প উন্নয়ন নীতিমালা-২০১২ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি থেকে একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাত্রাশিল্প উন্নয়ন কমিটির অনুমোদন ও সিদ্ধান্তক্রমে এ পর্যন্ত ১০১টি (পরিশিষ্ট-২) যাত্রাদলকে কিছুশর্তে শর্তে নিবন্ধনপত্র প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান পরিসংখ্যান অনুযায়ী নিবন্ধনের মেয়াদ রয়েছে ৬৫ (পঁয়ষট্টি)টি যাত্রাদলের, নিবন্ধন বাতিলকৃত দল ১৫ (পনের)টি এবং মেয়াদোত্তীর্ণ দলের সংখ্যা ২১ (একুশ)টি। নীতিমালা অনুযায়ী ১৬ মার্চ ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত যে ৬৫ (পঁয়ষট্টি) টি নিবন্ধিত যাত্রাদলের মেয়াদ আছে সেসকল যাত্রাদল ছাড়া বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক নিবন্ধিত না হয়ে বা নিবন্ধন নবায়ন না করে আর কোন যাত্রাদলের যাত্রাপালা প্রদর্শন করার সুযোগ নেই।

নিচে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কিছু যাত্রাদলের পরিচয় তুলে ধরা হলো :

৫.৭.১ বাসন্তী মুক্তমঞ্চ নাট্যপ্রতিষ্ঠান (১৯৫৪)

১৯৪৪ সালে নারায়ণচন্দ্র দত্ত সিরাজগঞ্জের শাজাদপুরে 'বাসন্তী মুক্তমঞ্চ নাট্যপ্রতিষ্ঠান' গঠন করেন। ১৯৫৪ সাল থেকেই এটি পেশাদার যাত্রাদলে পরিণত হয়। বাংলাদেশের যাত্রাশিল্পে এ দলের অবদান উল্লেখযোগ্য। এই দলের মাধ্যমেই জোৎস্না বিশ্বাসের যাত্রাদলে পদার্পণ। স্বপনকুমার দেবনাথ এই দলের নায়ক ও নির্দেশক ছিলেন। বারীণ নন্দী, বিনয় চক্রবর্তী, মোস্তাক, ইরানী, অনন্ত দেববর্মণ, সেলিম রানা, অঞ্জলি দেবী, মীরা চক্রবর্তী, শান্তিলতা দত্ত, স্বপ্নাকুমারী, গায়ত্রী অধিকারী, প্রবোধকুমার ঘোষ, লক্ষ্মী রায় প্রমুখ শিল্পী এই দলে অভিনয় করেছেন। *কে ঠাকুর কে ডাকাত*, *সোহরাব রোস্তম*, *সাধক রামপ্রসাদ*, *মা মাটি মানুষ* ও *ঘুমন্ত পৃথিবী* এ দলের অভিনীত বিভিন্ন পালা।

৫.৭.২ বাবুল অপেরা (১৯৫৮)

১৯৫৮ সালে বাবুল অপেরা গঠিত হয়। চট্টগ্রামের আমিন শরীফ চৌধুরী 'বাবুল থিয়েটার'কে 'বাবুল অপেরা' নাম দেন। বাবুল অপেরার লাইসেন্স নম্বর চট্ট-৬/১৯৬৯। নায়িকা হিসেবে প্রথম নারীশিল্পী মঞ্জুশ্রী মুখার্জি এবং মুসলিম নারীশিল্পী জাহানা বেগমের এ দলের মাধ্যমেই আগমন ঘটে। অমলেন্দু বিশ্বাসও এ দলের মাধ্যমে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন। ১৯৭৯ সালে এ দলের পরিচালক ছিলেন মনীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং পালা নির্দেশক ছিলেন এম এ হামিদ। এম এ হামিদ, নরেন মণ্ডল, কল্যাণ চক্রবর্তী, অরবিন্দ মুখার্জি, জাহানারা, নমিতা মুখার্জি, সবিতা মুখার্জি, বীণাপানি দাস প্রমুখ এই দলের বিভিন্ন সময়ের স্বনামধন্য অভিনয় শিল্পী। *গলি থেকে রাজপথ*, *মানুষ পেলাম না*, *হাসির হাটে কান্না*, *মাইকেল মধুসূদন* ও *ভাওয়াল সন্ন্যাসী* এ দলের উল্লেখযোগ্য যাত্রাপালা। ১৯৭৯ সালের জাতীয় যাত্রা উৎসবের এটি শ্রেষ্ঠদলের মর্যাদা লাভ করে। এই দলের *গলি থেকে রাজপথ* পালায় ভবশঙ্করী চরিত্রের জন্যে এম এ হামিদ পুরস্কার লাভ করেন।

৫.৭.৩ দীপালি অপেরা (১৯৬৯)

গোপালগঞ্জের ধীরেন্দ্রকুমার বাকচী দীপালি অপেরার স্বত্ত্বাধিকারী। 'আদি দীপালি', '১নং দীপালি', 'নব দীপালি' প্রভৃতি নামে পরবর্তী সময়ে এ দলটি সম্প্রসারিত হয়। বাংলাদেশের যাত্রাঙ্গনে একসঙ্গে পাঁচটি যাত্রাদলের অধিকারী হিসেবে ধীরেন্দ্রকুমার বাকচী বিশেষ মর্যাদার আসন লাভ করেন। এই দলের লাইসেন্স নম্বর ফরিদ-৫/১৯৭৫। এছাড়া পালা নির্দেশক হিসেবে বিভিন্ন সময়ে নিমাই পোদ্দার, সুবোধ কর প্রমুখ শিল্পী বিভিন্ন সময়ে দায়িত্বপালন করেন। এ পালায় সংগীত পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন মাস্টার শুকলাল ভক্ত। নিমাই পোদ্দার ও দুলাল-দের নির্দেশনায় ১৯৭৯ সালের যাত্রা উৎসবে এ দলে রঞ্জন দেবনাথ এর *সংসার কেন ভাঙে* পরিবেশিত হয়। প্রিয়লাল বণিক, কৃষ্ণপদ আমিন, মনোজিৎ সাহা, প্রদ্যোৎ সেন, জীবন চক্রবর্তী, নিমাই পোদ্দার, ইরারানী দে, অঞ্জলি মুখার্জি, কণিকা পাল, পুষ্প অধিকারী প্রমুখ এ দলের অভিনয় শিল্পী। *সংসার কেন ভাঙে*, *বাঁশের*

কেল্লা, *মরণের পরে*, *ফেরারী বাদশা*, *আমি মা হতে চাই*, *যে আগুন জ্বলছে*, *গলি থেকে রাজপথ*, *কোহিনূর*, *ডাকিনীর চর*, *শ্রীকৃষ্ণ শকুনী*, *একটি পয়সা দাও*, *নবাব সিরাজউদ্দৌলা*, *বেগম আসমান তারা*, *নটী বিনোদিনী* এ দলের মঞ্চায়িত উল্লেখযোগ্য পালা। এ দলের নায়িকা *আমি মা হতে চাই* পালার মধুশ্রী চরিত্রের জন্য জাতীয় যাত্রা উৎসবে পুরস্কার লাভ করেছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ বাকচী একসময় গোপালগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান, উপজেলার চেয়ারম্যান প্রভৃতি জন প্রতিনিধিত্বমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। ফলে তার পক্ষে আর দল পরিচালনা করা সম্ভব হয় নি। তাঁর পাঁচটি দলের একটিও এখন আর সক্রিয় নেই।

৫.৭.৪ সবুজ অপেরা (১৯৭২)

ময়মনসিংহের গৌরীপুরের মো: নুরুল ইসলাম 'সবুজ অপেরা' গঠন করেন। এর লাইসেন্স নং ময়-১/১৯৭২। ঐতিহ্যবাহী এই দলটির বর্তমান অধিকারী দেলোয়ার হোসেন বাচ্চু। পেশায় প্রকৌশলী হলেও নেশায় যাত্রা–অধিকারী এই মানুষটি যাত্রায় সুস্থ ধারা টিকিয়ে রাখতে অনেক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। এম এ সিরাজ, সুলতান সেলিম প্রমুখ এই দলের পালা নির্দেশক হিসেবে কাজ করেছেন। প্রমোদ সরকার, অমল ভট্টাচার্য, সুজন ঘোষ, সরকার আবদুল মান্নান, দীনেশ ভৌমিক, সুমিতা বেগম, শিরিন বানু, রেখা সিদ্দিকী প্রমুখ এ দলের অভিনয়শিল্পী। আর সংগীত পরিচালক ছিলেন রঞ্জিত বিশ্বাস। বাংলাদেশের যাত্রা-অঙ্গনের 'বিবেক' চরিত্রের শ্রেষ্ঠ গায়ক-অভিনেতা গৌরাঙ্গ আদিত্য এই দলে দীর্ঘ দিন কাজ করেছেন। *গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গা*, *লালন ফকির*, *তটিনীর বিচার*, *স্বর্গের পরের স্টেশন* ও *বাগদত্তা* এ দলের উল্লেখযোগ্য পালা।

৫.৭.৫ নিউ গণেশ অপেরা (১৯৭২)

মানিকগঞ্জের খাবাশপুরের গণেশচন্দ্র ঘোষ নিউ গণেশ অপেরা গঠন করেন। এর লাইসেন্স নং ১/ডি-৭২। ১৯৯৫ সালের জাতীয় যাত্রা উৎসবে এ দলটি শ্রেষ্ঠ যাত্রা দলের পুরস্কার লাভ করে। *দেবী সুলতানা* পালার জন্য সুলতান সেলিম শ্রেষ্ঠ নির্দেশকের পুরস্কার পান। তিনি মুরশিদকুলি খান চরিত্রে অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পান আর রিক্তা সুলতানা দেবীর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পান। একসময় এই সুলতানা-রিক্তা জুটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলো। এই দলে সুনীল মণ্ডল, তপন হালদার, রবি পাল, সূর্য সরকার, ভানু পোদ্দার, সান্তনা কুণ্ডু, লিটন আখতার, বিমলা ঘোষ প্রমুখ শিল্পী কাজ করেছেন। *দুই টুকরো বৌমা*, *বর্ণ পরিচয়*, *দেবী সুলতানা*, *আঁধারের মুসাফির* ও *বৌমা তোমার পায়ে নমস্কার* এ দলের উল্লেখযোগ্য পালা।

৫.৭.৬ ১ নং দীপালি অপেরা (১৯৭৩)

গোপালগঞ্জের ধীরেন্দ্রকুমার বাকচীর স্ত্রী বনশ্রী বাকচী ১৯৭৪ সালে '১ নং দীপালি অপেরা' গঠন করেন। 'দীপালি' অপেরার সম্প্রসারিত পাঁচটি দলের একটি ছিল এই দল। এর লাইসেন্স নং- ৭১/১৯৭৩। ১৯৭৯ সালের জাতীয়

যাত্রা উৎসবে *বিদূষী ভার্যা* পালায় অভিনয়ের জন্য শর্বরী দাশগুপ্তা শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করেন। তুষার দাশগুপ্ত পালা নির্দেশক হিসেবে এ দলে দায়িত্ব পালন করেছেন। শর্বরী দাশগুপ্তা ও তুষারদাশগুপ্তা ছাড়াও নিমাই পোদ্দার, বলাই বিশ্বাস, রতন চক্রবর্তী, মনি পাল, সুজিত মৃধা, চিত্ত বসু, গীতা ঘোষ, হেমাঙ্গিনী রায়, মমতা সরকার, সবিতা সেন, অনিতা হালদার, ঊষা মৃধা, গোপাল পাল প্রমুখ এ দলের উল্লেখযোগ্য অভিনয়শিল্পী। *বিদূষী ভার্যা, সংসার কেন ভাঙে, ডাকিনীর চর, শ্রীকৃষ্ণ শকুনি* ও *নিহত গোলাপ* – এ দলে পরিবেশিত উল্লেখযোগ্য পালা।

৫.৭.৭ গীতাঞ্জলি অপেরা

কুষ্টিয়ার শালদহের আলাউদ্দিন আহমেদ 'গীতাঞ্জলি অপেরা' গঠন করেন। এর লাইসেন্স নম্বর কুষ্টিয়া ১০/১৯৭৪। ১৯৭৮ সালে কুষ্টিয়ার ডা. তফাজ্জল হোসেন 'দি গীতাঞ্জলি অপেরা' গঠন করেন। ১৯৭৯ সালে অর্থাৎ তার পরে শেখ আজিজুর রহমান ও আখতার সিদ্দিকী যৌথভাবে 'আদি গীতাঞ্জলি অপেরা' নামে একটি দল গঠন করেন। প্রখ্যাত অভিনেতা রাজবাড়ীর প্রতাপাদিত্য দত্ত এই দলের নির্দেশকের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া সংগীত ও নৃত্য পরিচালনার দায়িত্ব যথাক্রমে রমেশ সরকার ও রঞ্জু খান পালন করেছেন। ১৯৭৯ সালের জাতীয় যাত্রা উৎসবে *এ পৃথিবী টাকার গোলাম* পালায় পতিতপাবন চরিত্রে অভিনয়ের জন্য প্রতাপাদিত্য দত্ত পুরস্কৃত হন। চিত্তরঞ্জন ঘোষ, হেমন্তকুমার ঘোষ, মহীতোষ বিশ্বাস, রামদুলাল গাইন, দূর্গারানী সাহা, শিরীন বানু, স্বপ্না বেগম প্রমুখ এই দলের স্বনামধন্য অভিনয় শিল্পী। মহীতোষ বিশ্বাস ১৯৯৩ সালের জাতীয় যাত্রা উৎসবে শ্রেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী (বিবেক চরিত্রে) হিসেবে পুরস্কার পান। *এ পৃথিবী টাকার গোলাম, নাগমহল, প্রেম হলো অভিশাপ, সমাজ ও লৌহকপাট*–এ দলের উল্লেখযোগ্য পালা।

৫.৭.৮ চারণিক নাট্যগোষ্ঠী (১৯৭৪)

মানিকগঞ্জের তাপস সরকার চারণিক নাট্যগোষ্ঠির প্রতিষ্ঠাতা। এ দলের লাইসেন্স নম্বর ঢাকা- ৩/১৯৭৪। ১৯৭৭ সাল থেকে অমলেন্দু বিশ্বাস এ দলের কর্ণধার নিযুক্ত হন। ১৯৮৭ সালে অমলেন্দু বিশ্বাসের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী যাত্রা অভিনেত্রী জোৎস্না বিশ্বাস এই দলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এ দলের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখেন। চারণিক নাট্যগোষ্ঠির পালা নির্দেশক হিসেবেও তিনি সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অমলেন্দু বিশ্বাস ও জোৎস্না বিশ্বাস ছাড়াও এ দলে পরিতোষ পাল, সুলতান সেলিম, ননী চক্রবর্তী, চিত্ত ঘোষ, রাহজন বাইন, জিতেন শীল, মায়া ঘোষ, জাহানারা বেগম, নমিতা মল্লিক, বিজলী চক্রবর্তী প্রমুখ অভিনয় শিল্পী তাদের নিজ নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। শ্যামসুন্দর চৌধুরী, বাবু রহমান প্রমুখ এ দলে সংগীত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন

করেছেন। *মাইকেল মদুসূদন*, *জানোয়ার*, *লেলিন*, *হিটলার* ও *সম্রাট জাহান্দার শাহ* চারণিক নাট্যগোষ্ঠীর অত্যন্ত সাড়া জাগানো পালা।

৫.৭.৯ প্রতিমা অপেরা (১৯৭৯)

যশোরের মনিরামপুরের গণেশচন্দ্র কুণ্ডু প্রতিমা অপেরা গঠন করেন। যশোর- ১/১৯৭৯ এর লাইসেন্স নম্বর। ১৯৯৩ সালে শ্রেষ্ঠ যাত্রাদল হিসেবে এ দলটি পুরস্কৃত হয়। *জালিম সিংহের মাঠ* পালা নির্দেশনার জন্য অশোক কুমার ঘোষ শ্রেষ্ঠ নির্দেশক এবং দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে পুরস্কৃত হন। এছাড়া তিনি *গঙ্গা-পুত্র ভীষ্ম* পালায় 'ভীষ্ম' চরিত্রে অভিনয় করে ১৯৯৫ সালে পুরস্কার অর্জন করেন। একই পালায় চন্দ্রা ব্যানার্জি অম্বা চরিত্র রূপায়ণের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পান। এই দুই প্রধান অভিনয় শিল্পী ছাড়াও এই দলে মলয় ব্যানার্জি, মহাদেব গাইন, নিরঞ্জন কুরী, আরতী দাস, শিবানী বক্সী, শেফালী রায় প্রমুখ শিল্পী অভিনয় করেন। *গঙ্গা-পুত্র ভীষ্ম*, *জালিম সিংহের মাঠ*, *কবরের নীচে*, *বাবা তারকনাথ* ও *রাজা হরিশচন্দ্র*- এ দলের মঞ্চসফল পালা।

৫.৭.১০ রূপাঞ্জলি নাট্যসংস্থা (১৯৭৯)

বরিশালের আনিস আহমেদ এই নাট্য সংস্থা গঠন করেন। এই দলের লাইসেন্স নম্বর বরি- ৫/১৯৮০। মিলন কান্তি দে এ দলের পালা নির্দেশক ছিলেন। মাদারীপুরের সুজিতকুমার বারুরী এ দলের বিখ্যাত অভিনেতা। এছাড়া মিলন কান্তি দে, নৃপেন বালা, বিপুল গায়েন, সুজন ঠাকুর, আবদুল হাই, রবীন হালদার, মিনা বিশ্বাস, আল্পনা হালদার, শেফালী গায়েন, ভক্তিরানী বালা প্রমুখ এ দলের স্বনামধন্য অভিনয় শিল্পী। এ দলের সংগীত পরিচালক হিসেবে বিষ্ণুপদ এবং নৃত্য পরিচালক হিসেবে আল্পনা হালদার নিজ নিজ প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন। এই দলের উল্লেখযোগ্য পালা হলো : *আমি যারে চাই*, *শবরীর সংসার*, *আঁধারের মুসাফির*, *লালন ফকির*, ও *অনুসন্ধান*।

৫.৭.১১ জনতা যাত্রা ইউনিট (১৯৮৪)

রংপুরের মো. নুরুল ইসলাম ১৯৮৪ সালে জনতা যাত্রা ইউনিট গঠন করেন। এর লাইসেন্স নং রংপুর ২/১৯৮৫। এই দল থেকে ১৯৯৫ সালের জাতীয় যাত্রা উৎসবে শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী ও শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী নির্বাচিত হয়। সেকেন্দার রহমান দুদু এ দলের পালা নির্দেশক ছিলেন। বিনয় কুমার বণিক ছিলেন সংগীত পরিচালক এবং স্মারকের দায়িত্ব পালন করেন বেনীমাধব। রাজ্জাক মুরাদ, আকমল হোসেন, মাসুদ করিম, রনজিতকুমার বণিক, এম এ মজিদ, শামীমা রহমান শামু, ছবি সেন প্রমুখ এ দলের বিশিষ্ট অভিনয়শিল্পী। *নবাব সিরাজউদ্দৌলা*, ফকির বিদ্রোহ মুসা শাহ, *স্বাধীন সুলতান ইলিয়াস শাহ* এই দলের জনপ্রিয় পালা।

৫.৭.১২ দেশ অপেরা (১৯৯৩)

'দেশ অপেরা'র পরিবেশনাগুলো অনেকটা ঢাকাকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। *বিদ্রোহী নজরুল*, *এই দেশ এই মাটি*, *গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গা* প্রভৃতি পালাকে নাগরিক জীবনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন নট-নাট্যকার-নির্দেশক মিলন কান্তি দে। তিনি ১৯৯৬ সাল থেকে ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট (আইটিআই) বাংলাদেশ কেন্দ্রের নির্বাহী সদস্য। ১৪০০ বঙ্গাব্দ থেকে প্রতিবছর বৈশাখ উদ্‌যাপন উৎসব 'দেশ অপেরা'র কাছে তাৎপর্যপূর্ণ। তখন থেকে ঢাকায় প্রতিবছর 'দেশ অপেরা' যাত্রানুষ্ঠান করছে। *দি রিভার্স* (ঋত্বিক ঘটকের জীবন অবলম্বনে অনুপ সিংহ পরিচালিত ছবি)চলচ্চিত্রটির যাত্রা-অংশে 'দেশ অপেরা'র শিল্পীরা অভিনয় করে।

৫.৮ বাংলাদেশের যাত্রাপালাকারদের পরিচয়

১৯৪৭-৭১ পর্বে এদেশে অভিনীত পালা তথা পালাকারদের মধ্যে কমই পূর্ববঙ্গের ছিল। এদেশে পালা রচনার মত পরিপক্বতা তখনও অর্জিত হয়নি। অমলেন্দু বিশ্বাস অকপটে ক্ষোভ জানাচ্ছেন:

> আমার জন্য যন্ত্রণাদায়ক হলো এই সমতট বঙ্গেই যাত্রার উৎপত্তি। অথচ আমাদের দেশে কোনো পালা নাট্যকার নেই। পশ্চিমবঙ্গে যে নাটক লেখা হয়, আমরা সেটা নিয়েই অভিনয় করি। এমনকি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় যে কটি যাত্রাপালা এখানে অভিনীত হয়, সেগুলোও পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের লেখা। 'গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গা', 'বিদ্রোহী মুজিব', 'জয় বাংলা', 'বাঘা সিদ্দিকী' এইসব পালা আমাদের স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করে আসছে।
>
> আমি আমাদের দেশের অনেক নাট্যকারের পেছনে ঘুরেছি। তারা কথা দিয়েও কথা রাখেননি।[৪৬৩]

নিচে বাংলাদেশের যাত্রাপালাকারদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো:

৫.৮.১ সমীরেন্দ্রনাথ মজুমদার (জন্ম ১৯৪০)

পালাকার সমীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের জন্ম মানিকগঞ্জ জেলার তরা গ্রামে। লোকনাট্য সংস্থায় অভিনীত হয় তাঁর প্রথম পালা *সীমান্ত* (১৯৭৪)। এছাড়া তাঁর *মেহেরবান* (১৯৭৬), *তলোয়ার* (১৯৭৭), *লালকিল্লা* (১৯৭৮), *পূজারিণী বধূ*, *অন্নপূর্ণার মন্দির*, *ঘরের লক্ষী বড় বউ* এবং *প্রেমের সমাধি তীরে* প্রভৃতি পালাগুলো ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

৫.৮.২ কাজী আবুবকর সিদ্দিক (জন্ম ১৯৪০)

১৯৪০ সালে পালাকার আবুবকর সিদ্দিকের জন্ম। তাঁর *সাপুড়িয়ার মেয়ে* একটি পূর্নাঙ্গ যাত্রাপালা।

---

[৪৬৩] অমলেন্দু বিশ্বাস, *বাংলাদেশের যাত্রাশিল্প*, শ্রাবণ, ঢাকা, প্র. প্র. মার্চ ২০০৩, পৃ. ১৫

৫.৮.৩ মো: আমান উল্লাহ (জন্ম ১৯৪০)

পালা রচয়িতা মো. আমানউল্লাহর জন্ম ১৯৪০ সালে নরসিংদি জেলার পঞ্চবটী বাজারের নিকটস্থ বাউশিয়া গ্রামে। *কমলার বনবাস* পালা লিখে সত্তর দশকের শুরুতেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। *কমলার সংসার*, *সাগর রাজা* তাঁর রচিত গীতিধর্মী যাত্রাপালা।

৫.৮.৪ পরিতোষ ব্রহ্মচারী (১৯৪৩-২০০০)

পরিতোষ ব্রহ্মচারীর জন্ম বাগেরহাট জেলার কচুয়া থানার শিবপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী। তিনি খুলনা জেলার দাকোপ থানার বাজুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এই গ্রামেই তিনি স্থায়ী আবাস গড়ে তোলেন। ২০০০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[৪৬৪]মিলন কান্তি দে তাঁকে আধুনিক যাত্রাপালার নতুন রূপকার হিসেবে অভিহিত করেছেন।[৪৬৫] যাত্রাপালা রচনার পাশাপাশি তিনি মঞ্চনাটক, বেতারনাটক, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ১৮ টি পালার মধ্যে ১৯৮২ সালে জাতীয় যাত্রা উৎসবে *ক্লিওপেট্রা* (শিরিন অপেরার পরিবেশনায়) অভিনীত হয়। পাশ্চাত্য কাহিনির সার্থক রূপদানের কারণে এটি ব্যাপক প্রশংসিত হয়। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য পালাগুলো হচ্ছে *নদীর নাম মধুমতী*, *বনবাসে রাম*, *আবার দরিয়া ডাকে*, *ফেরারী নায়ক*, *নাগিনী নূরজাহান*, *এক যুবতী হাজার প্রেমিক*, *দস্যুরানী ফুলনদেবী*, *মহুয়া*, *শিরি-ফরহাদ*, *লাইলী-মজনু*, *বেদের মেয়ে জোছনা*, *মহানায়ক শ্রীকৃষ্ণ*, *আলীবাবা চল্লিশ চোর*, *চণ্ডীদাস রজকিনী*, *ডিসকো কুইন*, *ছোটমা ও বিরাজবৌ* (শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের আলোকে), *রিক্তের বেদন* (কৃষ্ণগোপাল বসাকের উপন্যাস অবলম্বনে), *বর্ণমালা মা আমার* প্রভৃতি। তাঁর পালাগুলি এখনও অপ্রকাশিত। ১৯৮৮ সালে পরিতোষ ব্রহ্মচারী মহান ভাষা আন্দোলন নিয়ে পূর্ণাঙ্গ যাত্রাপালা রচনা করেন। পালার শুরুতেই একটি প্রতীকী চরিত্রে বঙ্গজননী চিৎকার করে বলছেন : 'আমার বরকত কই?' এরপর নানা ঘটনা-উপঘটনার মধ্যে দিয়ে পালা কাহিনি এগিয়ে যায়। শেষ দৃশ্যে আবার বঙ্গজননী দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলছেন, 'আমার ছেলেদের রক্ত বৃথা যাবে না। আবার সূর্য উঠবে।' এভাবেই মুনীর চৌধুরী *কবর* নাটকের মাধ্যমে আমাদের শুনিয়েছেন : 'তোরা কোথায় গেলি? সব ঘুমিয়ে নাকি? সব মিছিল করে উঠে আয়। কবর খালি করে উঠে আয়।'[৪৬৬]

৫.৮.৫ মোহাম্মদ সাহেব আলী (জন্ম ১৯৪৩)

১৯৪৩ সালে যশোর জেলার ঝিকরগাছার মানিখালী গ্রামে পালাকার মোহাম্মদ সাহেব আলীর জন্ম। পিতার নাম মনসেফ আলী মণ্ডল। একানী চরিত্রের মাধ্যমে তাঁর যাত্রায় প্রবেশ। পরবর্তী সময়ে তিনি বিবেক চরিত্রের গান ও

---

[৪৬৪] তপন বাগচী, *বাংলাদেশের যাত্রাগান: জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্র. প্র. জুন ২০০৭, পৃ. ৯২

[৪৬৫] মিলন কান্তি দে, *যাত্রাশিল্পের সেকাল-একাল*, ইত্যাদি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-২০১৫, পৃ.২৪৫

[৪৬৬] আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), *মুনীর চৌধুরী রচনাসমগ্র (১)*, কবর, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, প্র.প্র. ২০০১,পৃ. ১৯৫-১৯৬

অভিনয়ের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। মুজিবর রহমানের বিশ্ববাণী অপেরায় (নাটোর) তাঁর দুটি পালা *আমি সাদ্দাম বলছি* এবং *জংলি মেয়ে* প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এছাড়া *কাফের*, *সন্ত্রাস*, *লাখো শহীদের এক কবর*, *একানব্বইয়ের ঘূর্ণিঝড়*, *জজ আসামী*, *দাঁড়াও যমরাজ আমি বেহুলা*, *রক্তে রাঙানো বাসর*, *অন্ধ সমাজ* প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য পালা। সমসাময়িক বিষয়বস্তু নিয়ে পালা রচনার কারণে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

৫.৮.৬ আকছারুল ইসলাম (জন্ম ১৯৪৫)

১৯৪৫ সালে কুষ্টিয়ায় পালাকার আকছারুলের জন্ম হয়। *ভাবী* (১৯৬২), *রাজদণ্ড* (১৯৬৫), *প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ* (১৯৬৬) – প্রভৃতি নাটক রচনার পর তিনি যাত্রা রচনায় আগ্রহী হন। কুষ্টিয়ার জাগ্রত প্রকাশনী থেকে পূর্বের তিনটি নাটকের বইয়ের মতো তাঁর প্রথম যাত্রাপালা *রাহুমুক্তি* প্রকাশিত হয়।[৪৬৭] তাঁর অন্যান্য পালাগুলো হলো: *ঘূর্ণিঝড়*, *রক্তসিন্ধু*, *অশ্রুনদী*, *মহামিলন*, *বাঙালির মেয়ে*, *অস্তমিত*, *মহাকালের চাকা*, *রক্তরাঙা গ্লোব*, *মহামানব*, *যোগফল*, *ফরিয়াদ*, *বাতাস* প্রভৃতি।

৫.৮.৭ মিলন কান্তি দে (জন্ম ১৯৪৮)

যাত্রানট, নির্দেশক, পালাকার ও সংগঠক মিলন কান্তি দে, চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার ছনহরা গ্রামে ১৯৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। যাত্রা-নাটক-আবৃত্তি এসবের সঙ্গে স্কুল জীবন থেকেই তাঁর যোগাযোগ। ১৯৫৮ সালে আইয়ূব খানের মার্শাল ল'র সময়ে কারওয়ান বাজারে *রূপবান* পালায় রহিম এর ভূমিকায় চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র মিলন কান্তি দে-কে উঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। ঐ শিশু বয়সেই যাত্রা অভিনয়ের বিশেষ স্টাইল তাঁর মনকে নাড়া দেয়। তিনি ১৯৬৬ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অর্থাৎ ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই যাত্রা জগতকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। যাত্রাশিল্পে মিলন কান্তি দের পঞ্চাশ বছর উৎসব পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় এ শিল্পের উন্নয়নের জন্য তাঁর একক উদ্যোগের কথা জানা যায়। যাত্রার উন্নয়নে তাঁর অবিরাম কর্মযজ্ঞের চিত্র ওঠে আসে মিলন কান্তি দের বর্ণনায়:

> প্রথম যাত্রাদলের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য স্কুল খোলা- ১৯৬৮, প্রথম যাত্রামঞ্চে নতুন আঙ্গিকে পালাকাহিনী উপস্থাপন- ১৯৬৯, প্রথম যাত্রা বিষয়ক দেয়াল পত্রিকা 'মঞ্জুশ্রী' প্রকাশ- ১৯৭১, যাত্রা জগতে প্রথম ও একমাত্র নাট্য সম্পাদক- ১৯৭৩, যাত্রা বিষয়ক প্রথম রিপোর্টিং দৈনিক বাংলায়- ১৯৭৩, বাংলাদেশে প্রথম যাত্রা বিষয়ক নিবন্ধ সাপ্তাহিক চিত্রালীতে- ১৯৭৩, বাংলাদেশে প্রথম যাত্রা বিষয়ক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ- ১৯৭৫, এদেশের যাত্রায় প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন ভিত্তিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা- ১৯৭৯, বেতারে প্রথম কথিকা পাঠ- ১৯৭৫, পরে ঢাকা বেতারের 'দর্পণ' অনুষ্ঠানে যাত্রাশিল্পে প্রথম একক অভিনয়- ২০০৮, যাত্রা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও এ শিল্প সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে 'যাত্রা

[৪৬৭] মো. আবদুর রাজ্জাক, বাংলা ভাষার মুসলিম লেখক গ্রন্থপঞ্জি, প্রথম খণ্ড, রোকেয়া খাতুন (প্রকাশক), রাজশাহী, ১৯৮৮, পৃ. ০৫

পাঠশালা' গড়ে তোলা ২০১০, গণসাক্ষরতা অভিযানের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম সারাদেশে শিক্ষামূলক যাত্রানুষ্ঠান পরিবেশনা-২০১১।[৪৬৮]

দীর্ঘ যাত্রা জীবনে তিনি ২১ টি যাত্রাদলের সঙ্গে অভিনেতা ও নির্দেশক হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়া ১৯৯৩ সালে তাঁর নিজের দল 'দেশ অপেরা' প্রতিষ্ঠা করেন। এ সমস্ত দলে তাঁর অভিনীত পালার সংখ্যা ১৫১ এবং নির্দেশিত পালার সংখ্যা ১১৫। *এই দেশ এই মাটি* (১৯৯৩), *বিদ্রোহী নজরুল* (২০০০) – তাঁর মঞ্চায়িত বিখ্যাত যাত্রাপালা। নানা কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে মিলন কান্তি দে বাংলাদেশের যাত্রাজগৎকে সমৃদ্ধ করেছেন। যাত্রায় অভিনয়ের-নির্দেশনা ও পালা রচনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি বহু পুরস্কার ও সম্মাননা অর্জন করেন। ১৯৯২-৯৩ সালের জাতীয় যাত্রা উৎসবে 'যাত্রা ব্যক্তিত্ব' হিসেবে তিনি বিশেষ সম্মান লাভ করেন। অমলেন্দু বিশ্বাস এর জীবনীভিত্তিক 'একক অভিনয়' কেন্দ্রিক যাত্রাপালা তাঁরই রচনা। পালার শিরোনাম *আমি অমলেন্দু বিশ্বাস* (২০০৮ সালের ১৭ অক্টোবর প্রদর্শিত)। এই পালার সফল একক অভিনয় শিল্পীও তিনি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনীভিত্তিক যাত্রাপালা *বাংলার মহানায়ক* (২০১৬) ও মুসলিম ঐতিহ্যভিত্তিক যাত্রাপালা *হাতেম তাই* (২০১৬)। তাঁর রচিত এই দুটি যাত্রাপালাই ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে। তাঁর দীর্ঘ যাত্রাজীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন বিভিন্ন লেখালেখির মাধ্যমে। পত্র-পত্রিকার সেসব লেখা থেকে প্রকাশিত হয়েছে *যাত্রাশিল্পের সেকাল একাল* (২০১৫, ইত্যাদি) নামে একটি আকরগ্রন্থ। পূর্ববাংলা ও বাংলাদেশের যাত্রার স্বরূপ অন্বেষণে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান দেয়।

৫.৮.৮ সাধনকুমার মুখার্জি (জন্ম ১৯৫০)

সাধনকুমার মুখার্জি ১৯৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। নিজদল 'চণ্ডী অপেরা'য় (১৯৮৬) তাঁর লেখা *চণ্ডালের মেয়ে* ও *পৃথিবীর আত্মহত্যা* নামে দুটি পালা আসরস্থ হয়।

৫.৮.৯ অতুলপ্রসাদ সরকার (জন্ম ১৯৫৩)

পালাকার অতুলপ্রসাদ সরকার মাগুরা জেলায় ১৯৫৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ দল 'চৈতালী অপেরা'য় *বিষাদ-সিন্ধু* অবলম্বনে তাঁর লিখিত পালা *কারবালা আজও কাঁদে* অভিনীত হয়েছে। এছাড়া তাঁর অন্যান্য পালাগুলো হচ্ছে – *হাসানের বিষপান*, *রমজানের চাঁদ*, *দুর্গা নয় দেবী*, *বেঈমান রুশদী*, *বাপের বেটা সাদ্দাম*, *নায়িকার শেষজীবন* প্রভৃতি।

[৪৬৮] আমি যে এক যাত্রাওয়ালা, পৃ.২৯

৫.৮.১০ ননী চক্রবর্তী (১৯৫৩-২০০৪)

১৯৫৩ সালে বিক্রমপুর জেলায় সিরাজদিখান থানার তালতলা গ্রামে পালাকার ননী চক্রবর্তীর জন্ম হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) *মেজদিদি* (১৯১৫) ও *দেবদাস* (১৯১৭) উপন্যাসের যাত্রারূপ তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ। এছাড়া তাঁর অন্যান্য পালাগুলো হচ্ছে – *যৌতুক* (১৯৮৪), *সকাল-সন্ধ্যা* (১৯৮৪), *কারবালা আজও কাঁদে* (১৯৯৬) প্রভৃতি।

৫.৮.১১ মহসিন হোসাইন (জন্ম ১৯৫৪)

নড়াইল জেলার কালিয়া থানার কলাবাড়িয়া গ্রামে ১৯৫৪ সালে পালাকার মহসিন হোসাইনের জন্ম। সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে নিলেও যাত্রা, কবিগান ও ফোকলোর গবেষণায় তিনি নিয়ত কর্মরত। নিমাই পোদ্দার, আবদুর রাজ্জাক, তুষার দাশগুপ্ত, অমলেন্দু বিশ্বাস প্রমুখ যাত্রাব্যক্তিত্বের অনুরোধেই তাঁর রচনার সূত্রপাত। তাঁর রচিত পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ পালা হলো: *নীলকরের ছায়ামূর্তি*, *সন্দ্বীপরাজা দিলওয়ার খাঁ*, *সম্রাট কবি বাহাদুর শাহ*, *মীরজাফরের আর্তনাদ* ও *অমরপ্রেম*। যাত্রাগুলো জগদানন্দ ঠাকুরের নরনারায়ণ অপেরা এবং নিরঞ্জন রায়ের জোনাকী অপেরায় আসরস্থ হয়। ঐতিহাসিক পালা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। *নবাব সিরাজউদ্দৌলা*'র পরবর্তী খণ্ড ধরা হয় *মীরজাফরের আর্তনাদ* পালাটিকে। মীরজাফরের অনুশোচনা, আর্তনাদ ও অনুতাপকে তিনি শেষোক্ত পালায় উপস্থাপন করেছেন। বাংলার ইতিহাসে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের এই নতুন মূল্যায়ন সত্যিই অভিনব ছিল।

৫.৮.১২ এম এ মজিদ (জন্ম ১৯৫৪)

খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার সাহস কুমারঘাটা গ্রামে এম এ মজিদের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম রাঙা মিয়া সরদার। যাত্রা শিল্পের এই নিবেদিত শিল্পী বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউটে চাকরিরত। তাঁর উল্লেখযোগ্য পালাগুলোর মধ্যে– *মোগল হাটে সন্ধ্যা* (১৯৭৯), *ঘুনে ধরা সমাজ* (১৯৭৯), *কমলা সুন্দরী* (১৯৮১), *মানিক পীরের দরগা* (১৯৮৮), *বেদের মেয়ে মহুয়া* (১৯৯৪), *ঘুমাও তুমি প্রিয়া* (১৯৯৪), *সোনার বাংলা* (১৯৯৫), এবং *সুন্দরবনের ডাকাত* (১৯৯৭) উল্লেখযোগ্য। যাত্রা পালাকার পরিষদের তিনি সাধারণ সম্পাদক। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের বিনোদন পাতায় তিনি যাত্রার খবর পরিবেশন করে থাকেন।

৫.৮.১৩ প্রদীপ চক্রবর্তী (জন্ম ১৯৫৮)

পালাকার প্রদীপ চক্রবর্তীর জন্ম নারায়ণগঞ্জে ১৯৫৮ সালে। তাঁর পিতার নাম পরিতোষ চক্রবর্তী। অভিনয়ের পাশাপাশি যাত্রাদল পরিচালনায় দক্ষ প্রদীপ চক্রবর্তী পালা রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য পালাগুলো হলো: *চৌধুরী বাড়ির কান্না*, *মা কেন কাঁদে*, *জামসেদ ডাকু*, *চা বাগানের মেয়ে*, *অমাবস্যার চাঁদ* প্রভৃতি।

৫.৮.১৪ রফিকুল ইসলাম রানা (জন্ম ১৯৫৯)

১৯৫৯ সালে ঢাকার কেরানীগঞ্জের শাক্তানড় পাড়ায় রফিকুল ইসলামের জন্ম। *গরিবের কান্না* তাঁর প্রথম গীতিধর্মী পালা। *রক্তাক্ত মসনদ*, *রাজার ছেলে ভিখারী*, *সুজন মালা*, *কলঙ্কিনী মালা*, *মা কেন কাঁদে*, *দস্যু জাফরান* প্রভৃতি তাঁর অন্যান্য পালা।

৫.৮.১৫ আবদুস সামাদ (জন্ম ১৯৫৯)

১৯৫৯ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর থানার কাচিহারা গ্রামে আবদুস সামাদের জন্ম। তাঁর প্রকাশিত পালার সংখ্যা ৫০। *বেকার কেন কাঁদে* (১৯৯০), *এ সমাজ ভাঙলো যারা* (১৯৯৩), *ভাঙে নদী কাঁদে মানুষ* (১৯৯৩), *ঘুমন্ত পৃথিবী* (১৯৯৩), *জীবন নিয়ে খেলা* (১৯৯৩), *কালো টাকার মানুষ* (১৯৯৫), *বেকারের আর্তনাদ* (১৯৯৫), *বীর বাঙালী* (১৯৯৬), *একাত্তরের জল্লাদ* (১৯৯৬), *বস্তি থেকে প্রাসাদ* (১৯৯৬), *বাইশ গাঁয়ের মোড়ল* (১৯৯৭), *এরই নাম সংসার* (১৯৯৮), *রক্তে রোয়া বাংলা* (১৯৯৮) উল্লেখযোগ্য। আবদুস সামাদের রচনায় কাহিনি বিন্যাস, চরিত্র চিত্রণ, এমনকি সংলাপ নির্মাণেও অপটুতা লক্ষ্য করা যায়।

৫.৮.১৬ রাখাল বিশ্বাস (জন্ম ১৯৬১)

রাখাল বিশ্বাসের জন্ম নেত্রকোণা জেলার কেন্দুয়া থানা সদরে ১৯৬১ সালে। গৌরাঙ্গবিশ্বাস তাঁর পিতার নাম। সৌখিন যাত্রাদলে তাঁর পালা পরিবেশিত হয়েছে। *দুঃখিনী বধূ*, *প্রেয়সী পতিতা*, *রক্তাক্ত সমাজ*, *কেল্লা তাজপুর*, *একাত্তরের সৈনিক*, *মহুয়া*, *দস্যুরানীর ফাঁসি*, *বেহুলা সুন্দরী*, *ডাইনি বেগম*,*পুষ্পচন্দন*, *কালো বাদশাহ*, *ঘূর্ণিঝড়*, *খুনি সম্রাট*, প্রভৃতি তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য পালা। তাঁর *ঘরভাঙ্গা সংসার* বা *পাষাণের চোখে জল* পালাটি কেন্দুয়া ডিগ্রি কলেজে মঞ্চস্থ হয়েছে।

৫.৮.১৭ দেবদাস ঢালী (জন্ম ১৯৬১)

১৯৬১ সালে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার বান্দা তেতুলতলায় পালাকার দেবদাস ঢালীর জন্ম হয়। *গীতাভিনয়* (১৯৮৮) তাঁর প্রথম পালা। পৌরাণিক পালা *শ্রীকৃষ্ণ শকুনি* শিরিন অপেরার প্রয়োজনে লিখেন। সরফরাজ খানের বীরত্বগাথা নিয়ে তিনি ঐতিহাসিক পালা *বাংলার মসনদ* রচনা করেন।

বাংলাদেশের মৌলিক যাত্রাপালা লেখকের অভাব সুষ্ঠু যাত্রাপালা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে একটি প্রধান অন্তরায়। পাকিস্তান আমল থেকে এখনও পর্যন্ত কলকাতার পালা লেখকদের যাত্রাই আমাদের সম্বল। ১৯৮০-৮১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে কিছু কিছু পালা লেখকদের আবির্ভাব দেখা যায়। প্রখ্যাত যাত্রানট ও সংগঠক চট্টগ্রামের তুষার দাশগুপ্ত পালাকার সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। পরিতোষ ব্রহ্মচারী বাংলাদেশের প্রথম সফল পালাকার। তুষার দাশই তাকে পৃষ্ঠপোষকতা করে পালাকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তুষার দাশগুপ্তের পরিচালনায় তাঁর *ক্লিওপেট্রা*

পালা শিল্পকলা একাডেমির তৃতীয় যাত্রা উৎসবে মঞ্চায়িত হয়। জাতীয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত নাট্যকারদের যাত্রা রচনায় আগ্রহী হতে দেখা যায় না। তবে মামুনুর রশীদ (জন্ম ১৯৪৮) এ বিষয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। সবুজ অপেরার ব্যানারে তাঁর রচিত *ওরা কদম আলী*, এবং চারণিক নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় *এখানে নোঙর* নাটক দুটি যাত্রাপালাকারে মঞ্চায়িত হয়। যাত্রার বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি ধারণ করতে না পারায় পালাগুলোর মঞ্চায়নে তেমন সাফল্য আসেনি। পশ্চিমবঙ্গের যাত্রার মানোন্নয়নে নিজের দায়বদ্ধতা থেকে পালা রচনা করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য (১৯০৭-১৯৮৬), উৎপল দত্ত ও অমরঘোষের (১৯২৮-২০১৪) মতো খ্যাতিমান নাট্যকাররা। একসময় ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ যে যাত্রাকে পরিপোষণ করেছিলেন – উৎপল দত্তের মতো মেধাবী নাট্যজন সে যাত্রার সেবা করে গেছেন। আমাদের সময়ের স্বনামখ্যাত নাট্যকাররাও যদি যাত্রারচনায় ব্রতী হতেন তাহলে সমাজ জীবন ঘনিষ্ট অনেক উৎকৃষ্ট পালা সম্ভারে সমৃদ্ধ হতো আমাদের যাত্রাশিল্প। এদেশের পালাকারদের সম্পর্কে অমলেন্দু বিশ্বাসের মূল্যায়ন কঠোর–'হাতে গোনা যে কয়েকটি পালা এদেশে রচিত হয়েছে, সেগুলি পশ্চিম বাংলার মুদ্রিত যাত্রাপালার নকল বা গিলিত চর্বণ'[৪৬৯], তারপরেও এদেশে পালাকারদের অনুপস্থিতি ছাড়া অন্য কোনো ঘাটতি তাৎক্ষণিক ভাবে অনুভূত হয়নি।

৫.৯ বাংলাদেশে যাত্রার নানা প্রতিবন্ধকতা

মানুষের মনের আকুতি, সামাজিক অবক্ষয় রোধ এবং সমাজের অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্যে যুগযুগব্যাপী গ্রামীণ জনপদে বিভিন্ন আঙ্গিকে যাত্রা অভিনীত হয়ে আসছে। যাত্রার আদর্শিক চেতনাই হচ্ছে দেশপ্রেম, জাতীয় জাগরণ, সাম্য, মৈত্রী, অসুরের বিনাশ ও মানবপ্রেমের জয়ধ্বনি। ঐতিহ্যগত বিচারে যাত্রা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশের প্রধানতম কবি শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) এর উচ্চারণ :

> যাত্রা বাংলাদেশের হৃদয় থেকে উঠে এসেছে। ... যাত্রাই আধুনিক নাটকের উৎস। যাত্রা আজও মধ্যরাতের দর্শককে আলোড়িত করে। ... এই লোক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসার, আমাদের সংস্কৃতির বিকাশের জন্যই জরুরী।[৪৭০]

যাত্রাশিল্পের প্রতি মঞ্চসারথি আতাউর রহমানের (জন্ম-১৯৪১) দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয় :

> আমি ব্যক্তিগতভাবে যাত্রাকে প্রসেনিয়াম মঞ্চে নিয়ে আধুনিক করার পক্ষপাতী নই, যা এখন পশ্চিমবঙ্গে যাত্রার ক্ষেত্রে হচ্ছে। তাহলে যাত্রা তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হারাবে। যাত্রার নিজস্ব ফর্মকে অবিকৃত রেখে শুধু অপ্রাসঙ্গিকতা ও অশ্লীলতাকে বর্জন করলেই হতে পারে একটি প্রগতিশীল, পরিশীলিত ও উন্নতমানের শিল্পমাধ্যম।[৪৭১]

---

[৪৬৯] অমলেন্দু বিশ্বাস, *বাংলাদেশের যাত্রাশিল্প*, শ্রাবণ, ঢাকা, প্র. প্র. মার্চ ২০০৩, পৃ.৩৬

[৪৭০] মুজিবর রহমান খান (সম্পাদিত), *জাতীয় যাত্রা উৎসব ১৯৭৯-৮০ স্মরণিকা*, নাট্যকলা বিভাগ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৯, পৃ.২৩

[৪৭১] আতাউর রহমান, যাত্রা : নাট্যকর্মীর দৃষ্টিকোণ থেকে, মুজিবর রহমান খান (সম্পাদিত), *জাতীয় যাত্রা উৎসব ১৯৭৯-৮০ স্মরণিকা*, নাট্যকলা বিভাগ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৯, পৃ.২৩

ঐতিহ্যগত বিনোদন মাধ্যম হিসেবে যাত্রা লোক-মানসে নৈতিকতা নির্মাণের দায়িত্ব পালন করে আসছে। বর্তমান সময়ের যাত্রা ক্ষেত্রে সার্বিক অবক্ষয় ঘটার পূর্ব পর্যন্ত তা কার্যকর ছিল। কোনো একটি যাত্রা প্রদর্শনী তার দর্শকদের উদ্বুদ্ধ বা অনুপ্রাণিত করেছে এমন দৃষ্টান্ত অনেক। উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী পর্বে যাত্রার এই ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করেছি। ফলে গণমানুষের কাছে যাত্রা আদরণীয় হওয়ার পাশাপাশি এর লোকমানস গঠনের তথা জনমত তৈরির সামর্থ শাসক শ্রেণির কাছে সুবিদিত ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে রচিত যাত্রা ভারতের বহুস্থানে জনমত সংগঠনে ভূমিকা রেখেছে। যদিও স্বাধীনতার পরেই এর আঙ্গিকগত নমনীয়তার সুযোগকে ব্যবহার করে এক শ্রেণির অসাধু অর্থ লগ্নিকারী যাত্রার ক্ষতি সাধন করে। ফলে বাংলাদেশের যাত্রা এই সময়ে ক্রমাগত নিষিদ্ধ হতে শুরু করে। এই সেন্সরের সূচনা হয়েছিল ১৯৩৫ সালে ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর *জরাসন্ধ* পালাটি আংশিক সেন্সর করার মাধ্যমে। কর্তিত পালাটি তার অভিনয় অব্যাহত রাখতে পেরেছিল। বস্তুত যাত্রা তার টেক্সটের মধ্যে পরোক্ষভাবে সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করত। বিভিন্ন সামাজিক বিষয়কে কেন্দ্র করে নানান পালা রচিত হতো। মাখনলালের কথায় :

> বিনোদনেরও সমাজকে শিক্ষামূলক কিছু দেয়ার আছে। তাই যখন পালার গল্প নির্বাচন করা হয় বা বিষয় ভাবা হয় তখন আমি এবং আমার দলের অন্যান্যরাও এমন কিছু গল্প বা চরিত্রের উপর পালা তৈরি করার চেষ্টা করি যার সমাজে কোনো উল্লেখযোগ্যতা আছে। এইভাবে গল্প নির্বাচন করেই আজ পর্যন্ত চলে আসছি।[৪৭২]

পালাকাররা এই ধারাতেই 'টুকরো টুকরো সংলাপ আর স্বদেশি বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ' ঘটাতেন। এর বেশি তারা অগ্রসর হতে পারেননি। মুকুন্দদাসের একাধিক যাত্রাপালা নিষিদ্ধ হয়। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের হাতিয়ারে পরিণত হবার জন্যে মুকুন্দদাসের স্বদেশি যাত্রা বন্ধকল্পে ১৯৩৩ সালে 'Bengal Place Of Republic Amusement Act' প্রবর্তিত হয়। এই আইনের আওতায় যাত্রা দলগুলোর লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ১৮৭৬ সালের অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনটি বাতিল হলেও যাত্রাশিল্পের নিয়ন্ত্রণের কালো আইনটি একই ক্ষমতা সহ বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। এই আইন ছাড়াও বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সরকার কিংবা স্থানীয় প্রশাসন যাত্রানুষ্ঠান কখনও স্থগিত রেখেছে, আবার কখনও এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। দেশভাগের পর যাত্রার উপর প্রথম সরকারি আঘাত আসে ১৯৬২ সালে। পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান যাত্রাদলে নৃত্যশিল্পী এবং নারীশিল্পীর অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করেন। ফলে এই সময়ের জনপ্রিয় *রূপবান* যাত্রাও নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে। কবি জসীমউদ্‌দীন এ ঘটনার প্রতিবাদে লিখেছেন –

---

[৪৭২] মাখনলাল নট্ট, *রঙ্গমঞ্চে নট্ট কোম্পানি*, কমলিনী চক্রবর্তী (অনুলিখন ও সম্পাদনা), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্র. প্র. ২০১৪, পৃ.৮৪

> গভর্নর সাহের রূপবান যাত্রা কেন নিষিদ্ধ করিয়াছেন দেশবাসীর কাছে সেজন্য কোন যুক্তি প্রদর্শন করেন নাই। এই আদেশের সঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন অতঃপর ইসলাম সমর্থন করে না এরূপ সকল অনুষ্ঠানই তিনি নিষিদ্ধ করিয়া দিবেন।[৪৭৩]

এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বাবুল অপেরার স্বত্তাধিকারী আমিন শরীফ চৌধুরী আদালতে মামলা করেছিলেন। মামলা পরিচালনা করেন প্রখ্যাত আইনজীবী ও সাংবাদিক হামিদুল হক চৌধুরী এবং সাক্ষী হন কবি জসীমউদ্‌দীন। মামলার কারণে সরকার এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়।

১৯৭৩ সালের শেষের দিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত মাসব্যাপী শিল্পমেলায় স্বাধীনতা-পরবর্তী ঢাকা শহরের প্রথম পালা প্রদর্শিত হয়। বাবুল অপেরা, চারণিক নাট্যগোষ্ঠী, গীতশ্রী অপেরা এ আয়োজনে অংশগ্রহণ করে। ঢাকার দর্শক প্রথমবার অমলেন্দু বিশ্বাসের অভিনয় দেখে চারণিক নাট্যগোষ্ঠীর ব্যানারে। কিন্তু সময়ের প্রবহমানতায় সৃজনশীল যাত্রাচর্চার এই মাত্রা হারিয়ে যায়। বাণিজ্যলোভী দল-মালিক ও প্রদর্শকের লোভ লালসা চরিতার্থ করতে গিয়ে যাত্রাঙ্গন হয়ে উঠল প্রমোদ উদ্যান। এরপর ১৯৭৮ সালে শেরেবাংলা নগরের শিল্পমেলায়ও যাত্রার আয়োজন থাকে। ধারণা করা হয়, এখান থেকেই যাত্রায় অশ্লীলতার সূচনা। ঐ যাত্রা প্রদর্শনীতে প্রিন্সেস লাকী খানের উত্তেজক ভঙ্গীতে নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে যাত্রাশিল্পের অধঃপতন দেখা দিতে থাকে। সেই বছরেই বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে যাত্রার অশ্লীলতার বিরুদ্ধে ২৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয়।

স্বাধীনতার পর প্রথম দশ বছর যাত্রাশিল্পের ওপর কোন নিষেধাজ্ঞা জারির খবর পাওয়া যায় নি। ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে ঢাকাসহ কয়েকটি জেলায় যাত্রা পরিবেশনের ব্যাপারে জটিলতা সৃষ্টি হয়। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের অনুমতি না পেয়ে যাত্রানুষ্ঠান বন্ধ রাখতে হয়। যাত্রা সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট জনেরা তৎকালীন ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী শামসুল হুদা চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবি জানালে মন্ত্রী অতিদ্রুত এই বিষয়ে নেতিবাচক পদক্ষেপ নেন। ফলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে যাবতীয় মেলা নিষিদ্ধ করা হয়। নিষেধাজ্ঞায় বলা হয়–

> প্রতিবছর নভেম্বর মাস পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় কৃষি, শিল্প, সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী/বিনোদনমূলক আনন্দমেলার আয়োজন হয়। অতীতে দেখা গিয়াছে যে, এই ধরনের মেলা[র] [সম্পর্কে] প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনমনে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। মেলার ছত্রছায়ায় নানাবিধ অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ বিস্তার লাভের সুযোগ পায়। এই ধরনের কোন কোন মেলায় অতীতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি [র] [অবনতি] সৃষ্টি হইয়াছে এবং প্রশাসনকে বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। নজিরবিহীন বন্যায় দেশের কৃষিক্ষেত্রে অভাবনীয় ক্ষতি হইয়াছে। বর্তমান প্রশাসন ব্যাপক বন্যা-উত্তর ত্রাণ ও পুনর্বাসন তৎপরতায় নিয়োজিত থাকিয়া এই ক্ষতি যথাসাধ্য পূরণের প্রচেষ্টা চালাইতেছে।

---

[৪৭৩] জসীমউদ্‌দীন, আমাদের লোকনাট্য ও রূপবান যাত্রা, উদ্ধৃত. সৈকত আসগর (সম্পাদিত), *বাংলার লোকসংস্কৃতি : যাত্রাশিল্প*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, এপ্রিল ২০০২, পৃ.৮১

> ২। উপরিউক্ত অবস্থার [পরি] প্রেক্ষিতে এবং দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বর্তমান বৎসরে যাবতীয় বিনোদনমূলক প্রদর্শনী/মেলা নিষিদ্ধকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

এই সার্কুলার প্রদর্শনী/মেলার বন্ধের নামে কার্যত যাত্রাপ্রদর্শনীই বন্ধ হয়ে যায়। কিছুদিন পরে এই নিষেধাজ্ঞা শিথিল হলে যাত্রা আবার চালু হয়। ১৯৮৫ সালের ৭ আগস্ট 'ক' অঞ্চলের সামরিক প্রশাসকের দপ্তর থেকে এক সার্কুলারে ১৫ আগস্টের মধ্যে ঢাকা বিভাগীয় সকল জেলার সকল প্রকার প্রদর্শনী, আনন্দমেলা, যাত্রা, সার্কাস, 'অবশ্যই বন্ধ করিতে হইবে' বলে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৪৭৪]

১৯৮৯ সালের ১ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্কুলারের মাধ্যমে যাত্রানুষ্ঠানের সময়সীমা আশ্চর্যজনক ভাবে সাত দিনের জন্যে বেঁধে দেয়া হয়। যাত্রাশিল্পীদের আন্দোলনের ফলে সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি তারিখে ওই আদেশ সংশোধন করে সাতদিনের বদলে সর্বোচ্চ ছয় সপ্তাহ নির্ধারণ করে।[৪৭৫]

সামরিক শাসকদের ক্ষমতা দখলের বছরেই –– সামরিক দপ্তরের নির্দেশনামার মাধ্যমে যাত্রাশিল্পের উপর আঘাত আসে। মানিকগঞ্জের বিভিন্ন এলাকার যাত্রানুষ্ঠান বন্ধ করে দেবার জন্য ১৭ অক্টোবর ১৯৯১ তারিখে এক নির্দেশনা জারি করা হয়। উপঅঞ্চল ৩৮১ পদাতিক ব্রিগেডের সদর দপ্তর সাভার সেনানিবাস থেকে উপ-আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের পক্ষে একজন মেজর স্বাক্ষরিত পত্রে এই দপ্তরের অনুমতি ব্যতিরেকে কে বা কারা যাত্রা শো চালানোর অনুমতি দিয়েছে তার বিস্তৃত বিবরণ জরুরি ভিত্তিতে পাঠানোর জন্য সাভার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হয়।[৪৭৬] এরপর ৯ নভেম্বর থেকে সরকার আবার যাত্রাশিল্পের ওপর চড়াও হয়। গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে যাত্রাশিল্পের ওপর প্রথম নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয়। ভুল বানানে লেখা বেতারবার্তার ভাষা ছিল এরকম –

> সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, এখন হইতে যাত্রা, মেলা, প্রদর্শনী এবং সার্কাসের অনুমতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ের পূর্বা অনুমোদন [পূর্বানুমোদন] ব্যতীত [ব্যতিরেকে] প্রদান করিবেন না। ইতিমধ্যে কোনরূপ অনুমতি দেওয়া হইলে আইনানুগভাবে উক্ত অনুমতি বাতিলের ব্যাখ্যা [ব্যবস্থা] করিতে হইবে। হাউজী, লটারী, লাকী ড্র যে নামেই অভিহীত [অভিহিত] হউক না কেন সকল প্রকার জোয়া [জুয়া] অবিলম্বে বন্ধ করতে হইবে।[৪৭৭]

উনিশ শতকের নব্যবাবু সম্প্রদায় যাত্রাকে হীন দৃষ্টিতে দেখেছে। কিন্তু স্বাধীন স্বদেশে প্রগতিশীল শিক্ষিত সম্প্রদায় তথা সংস্কৃতিজনরা এই ঐতিহ্যকে গভীরভাবে সম্মান করে। তাই ১৯৯১ সালের শাসকগোষ্ঠী যাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলে কবীর চৌধুরী সোচ্চার কণ্ঠে 'যাত্রাকে ধ্বংস করা চলবে না' বলে প্রতিবাদ জানান। ন্যায্য অধিকার আদায়ের দাবিতে রাজপথের মিছিলে যাত্রাশিল্পীদের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন মামুনুর রশীদ, রামেন্দু মজুমদার

---

[৪৭৪] 'ক' আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসকের দপ্তর প্রেরিত সার্কুলার, স্মারক নং ৭০৭২/ফি/২০জি/পি/আর/৮৫/২০৭৮, তারিখ ৭/০৮/১৯৮৫

[৪৭৫] সকল জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের বরাবর স্বরাষ্ট্র সচিব প্রেরিত বেতারবার্তা, স্মারক নং ১২২৬/স্বঃমঃ (নিরা-২), তারিখ ২/১২/১৯৮৯

[৪৭৬] 'যাত্রা বন্ধ', *সাপ্তাহিক চিত্রালী*, ঢাকা, ৬ অক্টোবর ১৯৯১

[৪৭৭] গাজীপুরের জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে প্রেরিত স্বরাষ্ট্র সচিবের বেতারবার্তা, স্মারক নং ১৫১২-স:ম:নি: তারিখ ৯/১১/১৯৯১

(জন্ম ১৯৪১) ও কামাল লোহানীর মত সাংস্কৃতিক-ব্যাক্তিত্ব। ১৯৯১ সালের এই নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানীর বক্তব্য:

> সময়টা ছিল যাত্রার মওসুম। পুরোদমে যাত্রা চলছে। তার আগের বছর বন্যার তোড়ে যাত্রাশিল্পের সকল আয়োজন ভেসে গিয়েছিল। তাই দু'বছরের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার তাগিদ প্রত্যেকের মনেই। কিন্তু আকস্মিকভাবে এমন এক নিষেধাজ্ঞা জারী হল এই শিল্পের উপর, যার ফলে সকলে পঙ্গু হয়ে বসে পড়লেন। গ্রামবাংলার নানান জায়গায় যাত্রা প্যান্ডেলের কাঠামোটা দিনের পর দিন যাত্রানুরাগীদের বিদ্রুপ করতে থাকল।[৪৭৮]

বাংলাদেশ যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের দাবি ও আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১১ ডিসেম্বর কিছু শর্ত সাপেক্ষে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়।[৪৭৯]

তবে ১৯৯২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি আবার যাত্রা ও সার্কাস অনুষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। আদেশে বলা হয় যে আর কোনো যাত্রানুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া যাবে না এবং ইতোমধ্যে যে সমস্ত দলকে অনুমতি দেয়া হয়েছে তার সময়সীমা বাড়ানো যাবে না।[৪৮০]

যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদ এবং যাত্রাশিল্পী ও মালিকদের পক্ষ থেকে এই আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানানো হলে সরকার ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ তারিখে কিছু শর্ত আরোপ করে যাত্রানুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করে একটি পরিপত্র জারি করে। ১৯৯৩ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি আবার বেতার বার্তার মাধ্যমে প্রদর্শনী যাত্রা/সার্কাস/আনন্দমেলা অনুষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে।[৪৮১]

যাত্রাশিল্পের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে একাত্ম হয় এদেশের লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীরা। ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রের মাধ্যমে এক বিবৃতিতে তাঁরা বলেন –

> নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে যাত্রাশিল্পের ওপর বারবার আক্রমণাত্মক মনোভাব আমাদের কাছে উদ্বেগজনক। আর যাত্রার নামে জুয়া হাউজির যে অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে, তার জন্যে যাত্রাদলের মালিক ও শিল্পীরা দায়ী নন। কারণ ঐসব অসামাজিক কর্মকাণ্ড যাত্রামালিকেরা চালান না, চালায় প্যান্ডেলের প্রদর্শকরা। যেখানে জুয়া হাউজির ওপর বিধিনিষেধ থাকার কথা, সেখানে যাত্রাশিল্পকে দমননীতির আওতায় কেন কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে, এটাই আমাদের প্রশ্ন।... আমরা অবিলম্বে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার-সহ যাত্রাশিল্পের বিভিন্ন সমস্যার বাস্তবমুখী সমাধানের লক্ষে কার্যকর ব্যবস্থা

---

[৪৭৮] কামাল লোহানী, বাংলার লোকঐতিহ্য : প্রসঙ্গ যাত্রাশিল্প, উদ্ধৃত. সৈকত আসগর (সম্পাদিত), *বাংলার লোকসংস্কৃতি : যাত্রাশিল্প*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, এপ্রিল ২০০২, পৃ. ২৪৮

[৪৭৯] স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জারিকৃত পরিপত্র, স্মারক নং স্বঃমঃ (নিঃ-২)/ ১৭৪৭(৫০), তারিখ ২২/০২/১৯৯২

[৪৮০] সকল জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে প্রেরিত স্বরাষ্ট্র সচিবের বেতারবার্তা, স্মারক নং ৩৯৫- স্বঃমঃ(নিঃ), তারিখ ২২/০২/১৯৯২

[৪৮১] সকল জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে প্রেরিত স্বরাষ্ট্র সচিবের বেতারবার্তা, স্মারক নং স্বঃমঃ(নিঃ-২)-১এ-১/৮৫ (অংশ)/১১৩, তারিখ ১০/০২/১৯৯৩

> গ্রহণের জন্যে সরকারের কাছে জোর দাবী জানাচ্ছি এবং যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের গৃহীত সকল কর্মসূচির প্রতি সমমনা প্রগতিশীল গোষ্ঠীসমূহের একাত্মতা ও সংহতি প্রত্যাশা করি।[৪৮২]

এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, কামাল লোহানী, সন্তোষ গুপ্ত, আনিসুজ্জামান, রফিকুল ইসলাম, মমতাজউদ্দিন আহমেদ, সাঈদ আহমদ, রাজীব হুমায়ুন, রামেন্দু মজুমদার, আব্দুল্লাহ আল মামুন, কবীর চৌধুরী, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সন্‌জীদা খাতুন, সেলিনা হোসেন, আসাদ চৌধুরী, রশীদ হায়দার, আলী যাকের, আসাদুজ্জামান নূর, নাসিরউদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, আনিসুর রহমান, নরেন বিশ্বাস, নিরঞ্জন অধিকারী, ম. হামিদ এবং মামুনুর রশীদ। এই বিবৃতির ফলে যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের আন্দোলন বেগবান হয়। ২১ নভেম্বর তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বেতারবার্তার মাধ্যমে সকল জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে জানানো হয় যে, পূর্বপ্রদত্ত শর্ত সাপেক্ষে ১৯৯৪ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যাত্রানুষ্ঠানের অনুমতি দেয়া যাবে।[৪৮৩]

আবারও ১৯৯৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারির আদেশের সংশোধন করে আগের মতো কিছু শর্ত সাপেক্ষে যাত্রানুষ্ঠানের অনুমতি দেয়া হয়।[৪৮৪] এরপর ১৯৯৪ সালের ২০ জানুয়ারি এক সার্কুলারে যাত্রানুষ্ঠানে অনুমতির সময়সীমা ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ এর পরিবর্তে ২১ জানুয়ারি ১৯৯৪ পর্যন্ত এগিয়ে আনা হয়।[৪৮৫] ১৯৯৩ সালের নিষেধাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যনির্দেশক গোলাম সারোয়ার (জন্ম ১৯৫২) জানিয়েছেন:

> যাত্রাশিল্প... এক ভয়াবহ সংকটে পড়ে...যাত্রাশিল্প যেন ফেরারী আসামী। দেশের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী এই পেশাদারি শিল্পটি একেবারে কুরে মরতে বসে। নির্বাচিত ঐ গণতান্ত্রিক সরকার আর যাত্রাশিল্পের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকায় নি। যাত্রা যদি বাঙালির ঐতিহ্যবাহী শিল্পই হবে, তাহলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বন্ধ করে দেবে, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় চুপ থাকবে কেন? এখানে বড় প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের নীতিনির্ধারকদের নিয়ে, যাঁরা নাটক বা যাত্রাকে বাঁচাবেন, কিন্তু তাঁরা যাত্রাকে ফাত্রা কিংবা নাটক ফাটক এখনও বলে থাকেন।[৪৮৬]

যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদ সরকারের কাছে দাবি জানানোর পাশাপাশি জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রীর কাছেও স্মারকলিপি প্রদান করে। পরিষদের সভাপতি রমজান আলী মিয়া এবং সাধারণ সম্পাদক মিলন কান্তি দে স্বাক্ষরিত স্মারকলিপিতে যাত্রাশিল্পের রক্ষাকল্পে ছয়দফা দাবি জানানো হয়। স্মারকলিপিতে নিষেধাজ্ঞার ফলে যাত্রাশিল্পের অনিশ্চিত ভবিষ্যত নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় : 'ঐতিহ্যবাহী যাত্রাশিল্পের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে।

---

[৪৮২] বাংলাদেশ যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের কাছে রক্ষিত বিবৃতির অনুলিপি

[৪৮৩] সকল জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে প্রেরিত স্বরাষ্ট্র সচিবের বেতারবার্তা, স্মারক নং স্বঃমঃ(নিঃ-২)-কে-নীতি-৪/৯৩-১৮২৬, তারিখ ২১ নভেম্বর, ১৯৯৩

[৪৮৪] স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জারিকৃত পরিপত্র, স্মারক নং স্বঃমঃ (নিঃ-২)-কে-নীতি-৪/৯৩-১৮২৭(১৫০), তারিখ ২১ নভেম্বর ১৯৯৩

[৪৮৫] মাদারীপুর জেলার সকল ওসি এবং টিএনও বরাবরে জেলা প্রশাসক প্রেরিত অনুলিপি, স্মারক নং জে এম, ৪-৬/৯৩-৯৪/৮২(৯), তারিখ ২২ জানুয়ারি ১৯৯৪

[৪৮৬] গোলাম সারোয়ার, *যাত্রায় সংকট : একাল ও সেকাল*, উদ্ধৃত. সৈকত আসগর (সম্পাদিত), *বাংলার লোকসংস্কৃতি : যাত্রাশিল্প*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, এপ্রিল ২০০২, পৃ.৪২২

১৯৯১ সাল হইতে পর্যায়ক্রমে চারবার যাত্রাপ্রদর্শনীর উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ফলে সারাদেশে ১৭ হাজার শিল্পী ও কলাকুশলীর সাড়ে তিন লক্ষ পোষ্য অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাইতেছে।'[৪৮৭]

দীর্ঘদিন বহালকৃত এই নিষেধাজ্ঞার কারণে যাত্রাশিল্পী ও কলা-কুশলীরা জীবিকার পথ হারিয়ে অন্তহীন সমস্যার মধ্যে পড়ে। পাশাপাশি যারা স্থানীয়ভাবে বিনোদন ও লোকরঞ্জনের জন্য সংস্কৃতি চর্চার প্রত্যাশায় যাত্রার আয়োজন করতেন তারাও স্তিমিত হয়ে পড়েন। মিলন কান্তি দে জানিয়েছেন :

> ঐতিহ্যবাহী যাত্রাশিল্পে প্রথম নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় ১৯৮৪ সালের ১৭ অক্টোবর। পরবর্তী নিষেধাজ্ঞা ১৯৮৫ সালের ১০ জানুয়ারি। তবে এই নিষেধাজ্ঞার ন্যাক্কারজনক ভয়ালরূপ ১৯৯১ সালের নির্বাচিত সরকারের শাসনামলে দৃষ্ট হয়। '৯১ এর নভেম্বর থেকে '৯৬ এর ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত দফায় দফায় ছয়বার যাত্রা বন্ধের আদেশ দেয়া হয়। সে সময় যাত্রা বন্ধ ছিল ১০১৪ দিন। আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৩৩ কোটি ৯ লাখ ৫০ হাজার টাকারও অধিক। হাজার হাজার শিল্পীর আহাজারি, সীমাহীন দুর্ভোগ আর ভোগান্তির কবলে পড়ে যাত্রাশিল্প।[৪৮৮]

১৯৯৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সরকার যাত্রানুষ্ঠানের অনুমতির জন্য ঢাকা বাদে সকল জেলা প্রশাসককে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক লাইসেন্সধারী যাত্রাদল এবং রেজিস্টার্ড সার্কাস দলকে যাত্রা/সার্কাস অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হয়। তবে যাত্রামঞ্চে বা আশেপাশে কোথাও জুয়া, অশ্লীলনৃত্য এবং মাদকদ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। এই আদেশে মাইকের ব্যবহার সীমিত রাখার কথা বলা হয়।[৪৮৯] সকল যাত্রা-কুশলীরা এই সিদ্ধান্তে আনন্দিত হয়। তারাও জুয়া, হাউজি, অশ্লীল-নৃত্য বন্ধ করার দাবি জানিয়েছিল। ১৯৯৭ সালের ৯ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্কুলারে বলা হয় যে, রমজানের পবিত্রতা রক্ষার্থে ১১ জানুয়ারি ১৯৯৭ থেকে রমজান শেষ না হওয়া পর্যন্ত যাত্রানুষ্ঠানের অনুমতি না দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়।[৪৯০] যাত্রাশিল্পী ও মালিকরা এই আদেশের প্রতি সম্মান জানিয়ে রমজান মাসে যাত্রানুষ্ঠান বন্ধ রাখেন। ১৯৯৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের ঘোষণায় সরকার যাত্রা প্রদর্শনীর উপর সকল বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে নেয়।[৪৯১] তারপর ১১ ডিসেম্বর তারিখে অনুমতি প্রদানের নীতিনির্ধারণী পরিপত্র প্রকাশ করে।[৪৯২]

---

[৪৮৭] রেজানুর রহমান, 'বারবার নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়িয়া যাত্রাশিল্পের ভবিষ্যত অনিশ্চিত', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা-১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪

[৪৮৮] মিলন কান্তি দে, বর্তমান সময়ে যাত্রার প্রবহ : সংকট ও সমাধান, *যাত্রা : ঐতিহ্যের নবজাগরণ*, নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী , ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ. ২৫

[৪৮৯] সকল জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে প্রেরিত স্বরাষ্ট্র সচিবের বেতারবার্তা, স্মারক নং স্বঃমঃ)-কে-নীতি-৪/৯৩-১৫৭৯(১৫০), তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

[৪৯০] সকল জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে প্রেরিত স্বরাষ্ট্র সচিবের বেতারবার্তা, স্মারক নং স্বঃমঃ(নিঃ-২)-কে-নীতি-৪/৯৩-(অংশ) ৬৪(১৫০)-নিরা-২, ৯ জানুয়ারি ১৯৯৭

[৪৯১] সকল জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে প্রেরিত স্বরাষ্ট্র সচিবের বেতারবার্তা, স্মারক নং -কে-নীতি-২/৯৮-৮৭(১৫)-নিরা-২, তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

[৪৯২] স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জারিকৃত পরিপত্র, স্মারক নং স্বঃমঃ (নিঃ-২)-১৭৪৭(৫০), তারিখ ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৯

২০০৫ সালের ২৭ জানুয়ারি যাত্রা সংক্রান্ত এক সার্কুলার জারি করা হয়। স্মারক নং এস ৯৪ -২০০৩/২০৯ (৮০) অনুযায়ী সার্কুলারটি এরকম : এখন থেকে এমপি এবং ওসির মতামতে যাত্রানুষ্ঠানের অনুমতি দেয়া যাবে। কিন্তু অনুষ্ঠান চলাকালীন কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। শর্তযুক্ত এই সার্কুলারের প্রভাবে যাত্রাশিল্প মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়ে। সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল কর্মকর্তাই অনাকাঙ্ক্ষিত নিয়মভঙ্গের অজুহাতে যাত্রা প্রদর্শনের অনুমতি দেয় না। ফলে যাত্রার প্রবাহ আশঙ্কাজনকভাবে রুদ্ধ হয়ে পড়ে।

২০০৭ সালের ১০ ডিসেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত সার্কুলারে বলা হয় : যাত্রা প্রদর্শনের অনুমতি জেলা প্রশাসক এবং মহানগর এলাকার জন্য পুলিশ কমিশনার দিবেন। সেক্ষেত্রে এসপি, এসপি সার্কেল, টিএনও এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ইতিবাচক মতামতের প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট এলাকায় অনুষ্ঠানের অনুমতি দিতে পারবেন। তেমনি মেট্রোপলিটন এলাকার পুলিশ তখনই যাত্রার অনুমতি দিবেন, যখন সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার যাত্রার পক্ষে তার মতামত দিবেন। অবশ্য এর আগে সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে উপ-পুলিশ কমিশনারের দপ্তরে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে একটি তদন্ত প্রতিবেদন পাঠাতে হবে। নেতিবাচক প্রতিবেদন হলে যাত্রানুষ্ঠানের অনুমতি মিলবে না – তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এলাকার পরিবেশহীন অবস্থার কথা জানাবেন। দেখা যায় এ পরিস্থিতিতে আবেদনকারী বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরাঘুরির পর সময়-অর্থ ও শ্রমের বিপুল অপচয় করার পর একসময় জানতে পারবেন যে, তিনি এই এলাকায় আদৌ যাত্রানুষ্ঠান করতে পারছেন না।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ২০০৯ সালের ১৪ অক্টোবর মন্ত্রী পরিষদের মাধ্যমে যে সার্কুলার জারি করেছে, তাতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে – যাত্রা, পালাগান ও সার্কাসের ওপর এ মন্ত্রণালয়ের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে বাস্তবতা এই যে শুধুমাত্র জেলা পুলিশ সুপার ও উপপুলিশ কমিশনার ইতিবাচক মতামত না পাঠানোর জন্য অনেক জেলায় এই ভরা মৌসুমেও যাত্রা প্রদর্শিত হচ্ছে না। ১৯৭০-১৯৮০ দশকে যাত্রাপালা মঞ্চায়নে কোনো বাধ্য-বাধকতা ছিল না। ১৯৯২ সালের ২২ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সার্কুলারে প্রথম পুলিশের মতামত গ্রহণ করার বিধান রাখা হয়।

বহুমাত্রিক সংকটে যাত্রার গতিপথ প্রতিনিয়ত বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। অনুমতি সমস্যার সঙ্গে এনডোর্সমেন্টের কড়াকড়ি ও এল.আর ফান্ড এর সমস্যা যাত্রার স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করে। দেশীয় সংস্কৃতির পথকে বাধাগ্রস্থ করতে ইংরেজ সরকার ১৯৩৩ সালের ২৮ নভেম্বর বেঙ্গল প্লেসেস অব পাবলিক এ্যামিউজমেন্ট অ্যাক্ট নামে যে আইনটি চালু করে, তার ৬ নং উপধারায় এসেছে এনডোর্সমেন্ট। বিধানটি হচ্ছে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় যাত্রানুষ্ঠান করতে হলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন থেকে যাত্রাদলের লাইসেন্স এনডোর্স করতে হয়। এতে সরকারিভাবে নির্দিষ্ট ফি

থাকলেও দিগুণ-তিনগুণ টাকা দিয়ে লাইসেন্স পেতে হয়। এ সমস্ত বাধা অতিক্রমের পর আবার এল.আর.ফাণ্ডের (লোকাল রিক্রিয়েশন ফান্ড) টাকা গুণতে হয়। এল.আর.ফান্ড জেলা প্রশাসনের আওতাভূক্ত একটি তহবিল। জেলা পর্যায়ে যাত্রা, সার্কাস, পুতুল নাচ এবং বাণিজ্যিকভাবে আরও কিছু অনুষ্ঠান হলে এ ধরনের তহবিলের জন্যে অলিখিতভাবে টাকা পয়সা গ্রহণ করা হয়। এই টাকা গ্রহণের পরিমাণ স্থানভেদে বিভিন্নরকম।

প্রশাসনিক এ-সমস্ত সীমাবদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি বিরোধী অশুভ চক্রের করালগ্রাসেও যাত্রা তার স্বকীয়তা হারাচ্ছে।

অন্যদিকে উদীচীতে, ছায়ানটে এবং দেশব্যাপী যাত্রার বিভিন্ন প্যান্ডেলে বোমা হামলা চালানো হয়। ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি রাতে রাজশাহী জেলার বাগমাড়া উপজেলার খালপাড় গ্রাম হাইস্কুল মাঠে যাত্রানুষ্ঠান চলার সময় বোমা বিস্ফোরিত হয়। এর ১৫ দিন পর বগুড়া জেলার শাজাহানপুর উপজেলার লক্ষ্মীকোলা গ্রামে অনুষ্ঠানরত যাত্রা প্রদর্শনীতেও একইরকম ঘটনা ঘটে। যাত্রা বিষয়ে প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি এমনিতেই ভাল ছিল না। বোমা হামলার ঘটনাকে তারা যাত্রা বন্ধ করার উপযুক্ত অস্ত্র হিসেবে বেছে নেয়। সরকারের পালাবদল হলেও যাত্রাশিল্পের হয়রানি এখনও বন্ধ হয়নি। নিষেধের বেড়াজালে আটকা রয়েছে আমাদের যাত্রাশিল্প। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নব্য ধনিক শ্রেণির অভ্যুদয়ের ফলে-এখানে সেখানে রাতারাতি গড়ে উঠতে লাগল যাত্রাদল। পাশাপাশি অ-শিল্পীরাও এই যাত্রাদলে অর্থ লুটপাটের আশায় ভিড় করে। যার পরিণাম ধীরে ধীরে ভয়াবহ হয়। যাত্রাদলে কিশোরী, যুবতী নারী এবং তাদের অভিভাবক নামক দালালরা এসে ভিড় করে। যারা হয়ে ওঠে মালিকের অর্থ উপার্জনের ও ভোগের উৎস। ফলে দেশজ সংস্কৃতির বাহন থেকে যাত্রা অপসংস্কৃতির ধারকে পরিণত হয়। কেননা সময়ের পালাবদলে যাত্রাকে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়েছে, প্রচলিত সহজলভ্য রুচিহীন বিনোদনের মাধ্যমের সঙ্গে। সাধারণ মানুষের আসর থেকে যাত্রা চলে এসেছে প্রদর্শনী মঞ্চে। যার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়েছে হাউজী বা জুয়ার আসর। যাত্রার আসরে দর্শক জুয়া খেলায় হয়ে যায় সর্বশান্ত, সেই অর্থশোক ভোলার জন্য তাদের কামনা হয়ে ওঠে অশ্লীল-অর্ধ উলঙ্গ নাচ। আর সেই প্রয়োজনে আমদানী হয় এক শ্রেণির প্রিন্সেস। যাত্রাশিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেক শিল্পী, কলাকুশলী আছেন – যারা এই অশ্লীল নৃত্য, ঘৃণ্য বিষয়াদির সঙ্গে বিন্দুমাত্র সংশ্লিষ্ট নন। আবার অনেক মালিক অধিক মুনাফা অর্জনের জন্যে যাত্রায় বাড়তি প্রিন্সেস ভাড়া করে এনে এই ঝাঁঝালো নৃত্যের ব্যবস্থা করেন। তখন প্রিন্সেসরা তাদের নিজস্ব যন্ত্র ও যন্ত্রী নিয়ে এসে রাত চুক্তি পারিশ্রমিকে কাজ করেন। সে কলঙ্কের বোঝা খড়গাঘাত করে যাত্রা শিল্পের অস্তিত্বে। ফলে অশ্লীলতার অভিযোগে যাত্রা শিল্প হয় নিষিদ্ধ।[৪৯৩]

[৪৯৩] স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১৩৩৫/১(১৫০) স্বঃ মিঃ (নিঃ২) তাং ২৮.১২.৮৬ আদেশ ক্রমে বন্ধ করা হয় এবং ২৫১২ স্বঃ মিঃ (নিঃ ২) ৯.১১.৯১ আদেশক্রমে নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে আরোপিত আদেশে প্রত্যাহার করা হয়

২০১২ সালের সরকারি গেজেটে যাত্রাশিল্প উন্নয়ন নীতিমালা প্রকাশিত হয়। তাতে যাত্রাদল মালিক পক্ষের সাথে আয়োজক কর্তৃপক্ষের চুক্তি স্বাক্ষরের বিধান রাখা হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে নিবন্ধিত যাত্রাদলসমূহ চুক্তি অনুযায়ী যাত্রাপালা পরিবেশন করবেন। তার জন্য স্থানীয় জেলা প্রশাসনের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। অনুমোদিতস্থানে যাত্রা প্রদর্শনের সূত্রে নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব স্থানীয় প্রশাসনকে অর্পণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক বা মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রশাসনকে এই নিরাপত্তা বিধানের কথা বলা হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে চারটি নিরাপত্তার শর্ত আরোপ করা হয়েছে:

১) যাত্রাপালার কাহিনি এবং পরিবেশিত নৃত্য কোনক্রমেই জাতীয় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থী হবে না।

২) যাত্রাদল মালিকপক্ষ ও আয়োজন কর্তৃপক্ষ (নায়েক পার্টি) কর্তৃক স্থানীয় জেলা প্রশাসনকে নিশ্চিত করতে হবে যে, প্যান্ডেলের ভেতরে বা পাশে কোনোখানে কোনো অসামাজিক বা অনৈতিক কাজ-কর্ম চলবে না।

৩) যাত্রা অনুষ্ঠানের নামে কোনো রকম অশ্লীল নাচ-গান বা কোনো রকম অসামাজিক কাজকর্ম ঘটতে দেখা গেলে আয়োজক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। এমন অভিযোগ পাওয়া গেলে বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় স্থানীয় জেলা প্রশাসক বা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার এই মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে যাত্রানুষ্ঠান যে কোনো সময় বন্ধ করে দিতে পারবেন।

৪) যাত্রানুষ্ঠানে অবৈধ চাঁদা আদায়, দুর্বৃত্তায়ণ প্রভৃতি দেখা গেলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্যরা তা কঠোরভাবে দমন করবেন।[৪৯৪]

এই শর্ত চারটির অজুহাতেই যাত্রা প্রদর্শনের অনুমতি বিলম্বিত বা প্রত্যাখাত হয়।

স্কুল-কলেজের প্রাঙ্গন ছেড়ে যাত্রা এখন চলে গেছে বস্তির নোংরা ময়লা কারখানার পাশে, পরিত্যক্ত বালুর মাঠে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা সার্কুলারে বলা হয়েছে, বিভিন্ন স্কুল কলেজের মাঠে বা প্রাঙ্গনে যাত্রা, সার্কাস ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্পূর্ণ নিষেধ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহতসহ আইনশৃঙখলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়া এবং জুয়া হাউজি খেলার মারাত্মক পরিণতিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাত্রাবন্ধের কারণ হিসেবে দেখানো হয়।

এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যাত্রাদলগুলো তাদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অনেকেই মুনাফা লোভী না হয়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য তাদের অভিনয়কে নিবেদন করছে। অনেকেই যাত্রার অনিশ্চিত

[৪৯৪] যাত্রাশিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০১২ এর সরকারি গেজেট, web site: www.bgpress.gov.bd

ভবিষ্যতের জন্য অন্য পেশায় যোগ দিয়েছে। ফতোয়াবাজদের দ্বারাও যাত্রা প্রদর্শনী বন্ধের দাবি উঠেছে। বহু ধরনে প্রতিবন্ধকতায় যাত্রা শিল্প বন্ধ হয়ে যাবার হুমকির মুখে রয়েছে।

৫.১০ সেন্সর কমিটির আলোকে বাংলাদেশের যাত্রাপালা

বাংলাদেশ পর্বের যাত্রা গত ত্রিশ বছর ধরেই সেন্সরশীপের কবলে পড়ে। ১৯৭৯ সালে এর সূচনা হয়, পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে এই পালাগুলো তাদের আত্মপ্রকাশে বিরত কিংবা স্থগিত থাকতে বাধ্য হয়। বলা চলে যাত্রা শিল্পের চর্চা রহিত হয়। এই নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করার উপযুক্ত দুটো দিক রয়েছে। সাধারণত কোনো রচনা, সৃষ্টি, বা শিল্প ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, যৌন ক্ষেত্রে আপত্তিকর বিষয়বস্তুর জন্য সেন্সর করা হয়। সেক্ষেত্রে ঐ আপত্তিকর অংশ বা পুরো সৃষ্টিটিকে সেন্সর করা হয়, বা প্রচার স্থগিত করা হয়। এর ফলে ঐ সব ক্ষেত্রের শিল্পী, সাহিত্যিক, স্রষ্টাগণ নিজ থেকেই কিছু সেন্সর আরোপ করেন যাতে ঐ ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে না হয়। সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্রকে বিভিন্ন সময়ে সেন্সরের আওতায় আসতে দেখা গেছে। ফ্যাসিস্ট সরকার, সামরিক বাহিনী, বা জনস্বার্থ বিরোধী স্বৈর-শাসকদের প্রতিপক্ষতাই এই সেন্সরের কারণ হয়; যার ফলে নাটক, যাত্রা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্থায়ী প্রতিবন্ধকতা আরোপ করে। তাই যাত্রা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এমন অন্তরায় ঘটানো হয়েছে যেন কোনোভাবে এর অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় না। ১৮৭৬ সালের ব্রিটিশ অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের কিছু অংশ ছিল এরকম:

> If any Magistrate has reason to believe that any house, room or place is used, or is about to be used, for any performance prohibited under this Act, he may, by his warrant, authorize any officer of police to enter with such assistance as may be requisite, by night or by day, and by force if necessary, any such house, room or place, and to take into custody all persons whom he finds therein, and to seize all scenery, dresses and other articles found therein and reasonably suspected to have been used, or to be intended to be used, for the purpose of such performance.[495]

এই আইনের আওতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর নাটক সেন্সর কমিটির তত্ত্বাবধানে বর্তমানে যাত্রাপালা পরিবেশনার ছাড়পত্র দেয়া হয়ে থাকে। আইন-শৃঙ্খলা, ধর্মীয় প্রসঙ্গ, অনৈতিক ও অশ্লীলতা, নকল এবং ঐতিহাসিকতা ইত্যাদি বিচারের মাধ্যমে মঞ্চায়নযোগ্য নাটককে এ কমিটির সুপারিশক্রমে ছাড়পত্র দেয়া হয়ে থাকে। এই কমিটির ছাড়পত্র দেশের সর্বত্র বৈধ বলে বিবেচিত। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি জারি করা সার্কুলার হুবহু তুলে ধরা হলো :

[495] *The Dramatic Performance Act*, India Act XIX, 1876, Paragraph 8: Power to grant warrant to police to enter and arrest and seize.

> নির্দেশ মোতাবেক জানান যাচ্ছে যে, দেশে নাট্যচর্চাবিকাশ কল্পে নাটক পদ্ধতি সহজ করার উদ্দেশ্যে ২৫/০১/৭৭ ইং তারিখে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের পত্র নং ১-/১৪/৭৫-৫ (প্রশাসন)/ ৩১০৪(১০)-এ গঠিত 'বাংলাদেশ নাটক সেন্সর কমিটি' এর দেয়া ছাড়পত্র দেশে বৈধ বলে গণ্য হবে। আর কোন ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে না।[৪৯৬]

নাটকের তরজমা, রূপান্তর বা ভাবানুবাদের ক্ষেত্রে মূল লেখকের নাম উল্লেখ করার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু নকল এড়াতে এ পদক্ষেপ খুব একটা কার্যকর নয়। কারণ, মৃত বা বিদেশি লেখকের রচনা সম্পাদকের নাম জুড়ে দিয়ে কৌশলে ছাড়পত্র নেয়া হয়।

সার্কুলারে নাটকের আপত্তিকর অংশ বাদ এবং নাটকটির মান যাচাই করে ছাড়পত্র দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এ বিষয়ে সেন্সর কমিটির আহ্বায়ক এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর তৎকালীন মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তফা কামালের (১৯৩৬-১৯৮৯) উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন –

> ছাড়পত্রপ্রাপ্ত সকল নাটকই গুণগত মানে উৎকৃষ্ট এমন কথা হয়তো বলা যাবে না। তবে এই তালিকায় অবশ্যই উন্নতমানের অনেক নাটক আছে। এইসব নাটকের সফল মঞ্চায়ন নিঃসন্দেহে আমাদের দেশে নাট্যান্দোলনে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবে।[৪৯৭]

১৯৭৫ সালে নাটক সেন্সর কমিটি গঠনের পর ১৯৮৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত মোট ১১৫৮টি নাটকের ছাড়পত্র দেয়া হয়। এর মধ্যে যাত্রামঞ্চে অভিনয়-উপযোগী পালা রয়েছে ২০৪টি। এ তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত পালার সংখ্যাই বেশি। বাংলাদেশের পালাকারদের মৌলিক পালার সংখ্যা সন্তোষজনক নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলো লোককাহিনির রূপান্তর কিংবা পশ্চিমবঙ্গের পালার নকল। তবে সেন্সর কমিটির তালিকার বাইরেও প্রচুর পালা মঞ্চায়িত হয়েছে। ছাড়পত্রপ্রাপ্ত পালাগুলোর নাম এবং সেন্সর অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হলো:

পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দের ১১টি পালার ছাড়পত্র দেয়া হয়। এগুলো হলো *বর্গী এলো দেশে*, *সমাজের বলি*, *কোহিনূর*, *বিচারক*, *রক্ততিলক*, *সোহরাব রুস্তম*, *সুলতানা রাজিয়া*, *আঁধারের মুসাফির*, *সম্রাট জাহান্দার শাহ্*, *নটী বিনোদিনী*, এবং *বিদ্রোহী নজরুল*। *কোহিনূর পালার* কোহিনূরের সংলাপে 'আল্লাহতালার... কাজ ছিল না' (পৃ.৪) মোমেনের সংলাপে 'আরে হতভাগ্য... জন্মেছেন আপনি' (পৃ.১৬); মেহেদীর সংলাপে 'হিন্দু জাতটাই... সেবায়ও নেই' (পৃ.৫০); হোসেনের সংলাপে 'রক্তের দোষ... বেঈমানী করেছে' এবং কোহিনূরের সংলাপে 'বোকা হিন্দুরা... মনে রাখে না' (পৃ.৮৪), বাক্যগুলোর অংশ সেন্সর করা হয়েছে।[৪৯৮] *বিচারক* পালার সোমনাথের সংলাপে 'ছোটলোকের... মারবার স্থান' (পৃ.২২); মহামায়ার সংলাপে 'যাও ছোটলোকেরা... তুমিও সেখানে যাও' (পৃ.২৫) এবং পক্ষীরাজের সংলাপে 'চল বাংলাদেশে যাই... গায়ের রঙ কালো হয়ে যায়' (পৃ.৪৪), এই অংশ সেন্সর করা

---

[৪৯৬] শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগের সার্কুলার, স্মারক নং এফ-১-৪৪/৭৫-(সং) তারিখ ২০-১-৭৮ ইং

[৪৯৭] বাংলাদেশ নাটক সেন্সর কমিটি, *মঞ্চায়নের জন্য ছাড়পত্র-প্রাপ্ত নাটকের তালিকা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বি-সং ১৯৮৫, ভূমিকা

[৪৯৮] বাংলাদেশ নাটক সেন্সর কমিটি, *মঞ্চায়নের জন্য ছাড়পত্র-প্রাপ্ত নাটকের তালিকা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বি-সং ১৯৮৫,পৃ ২৬

হয়।[৪৯৯] এই পালাগুলো ছাড়াও *পাহাড়ের চোখে জল*, *কলিঙ্গ বিজয়*, *সমাজের বলি*, *বাঙালি*, *রাজ সন্ন্যাসী*, *গাঁয়ের মেয়ে*, *ধর্মের বলি*, *লোহার জাল*, *সোনাইদীঘি*, *সীতার বনবাস*, *নন্দকুমারের ফাঁসি*, *যাদের দেখে না কেউ* প্রভৃতি যাত্রাপালা বাংলাদেশের মঞ্চে অভিনীত হয়।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের *নবাব সিরাজদ্দৌলা* ও *পানিপথ* পালাদুটিও মঞ্চায়নের জন্য ছাড়পত্র প্রাপ্ত। এছাড়া তাঁর *তটিনীর বিচার*, *সবার উপরে মানুষ সত্য* প্রভৃতি পালা আমাদের যাত্রামঞ্চে দেখা যায়।

রঞ্জন দেবনাথের প্রায় ২৪ টি পালা ছাড়পত্র পেয়েছে। এগুলো হলো – *ফেরিওয়ালা*, *নীচুতলার মানুষ*, *এ পৃথিবী টাকার গোলাম*, *কন্যাদায়*, *সংসার কেন ভাঙে*, *সাত পাকে বাঁধা*, *প্রেম হলো অভিশাপ*, *নন্দরানীর সংসার*, *জীবন নদীর তীরে* (কলঙ্কিনী বধূ), *আমরাও মানুষ*, *এরই নাম সংসার*, *জ্বলন্ত বারুদ*, *স্বামী সংসার সন্তান*, *এক মুঠো অন্ন চাই*, *যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ*, *বিদূষী ভার্যা*, *গলি থেকে রাজপথ*, *পুত্রবধূ*, *একটি গোলাপের মৃত্যু*, *একটি পয়সা দাও*, *আজকের সমাজ*, *পৃথিবী আমারে চায়*, *প্রিয়ার চোখে জল* এবং *জোড়াদিঘির চৌধুরী পরিবার*। এছাড়াও তাঁর *শশীবাবুর সংসার*, *বন্দি বিধাতা*, *ঝড় থামলো*, *জীবন্ত শয়তান*, *রাতের আতঙ্ক*, *দীপ নেভে নাই*, *বধূ এলো ঘরে*, *সন্ধ্যা প্রদীপ শিখা* প্রভৃতি পালা আসরস্থ হয় ও জনমনে সাড়া জাগায়। তবে সেন্সর কমিটি *নীচুতলার মানুষ* পালার 'এই বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠী' (পৃ.২৯), 'বণিকের মুনাফা লুটবার সুযোগ করে দিয়েছে বেঈমান শাসকগোষ্ঠি' (পৃ.৭৮) এবং 'আমলাতন্ত্র আর শাসকযন্ত্রকে পুড়িয়ে ছাই করে দাও (পৃ.৮৬), এই অংশটি সেন্সর করা হয়েছে।[৫০০] *এ পৃথিবী টাকার গোলাম* পালায় 'ওরা হচ্ছে গভর্নমেন্টের পোষাকুকুর (পৃ.৭৭) – এ অংশটিবাদে অভিনয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে।[৫০১] একটি গোলাপের মৃত্যু পালায় ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৬৫, ৮৬, ১৩০, ১৪৫, ১৪৭ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন সংলাপ ও শব্দ বাদ দেয়া হয়েছে।[৫০২] *আজকের সমাজ* পালায় 'বাঙ্গালী লোগকো হুম ভুখা মারে গা' (পৃ.২৮), 'যে প্রভিন্সে আপনি ব্যবসা করছেন, সে আসামেই হোক, বিহার কিংবা পশ্চিম বাংলাই হোক স্থানীয় শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা আপনাদের করতেই হবে। কিন্তু আপনি তা করছেন না।' (পৃ.২৯); এবং 'ভিন্ন প্রদেশের' (পৃ.৬১) বাক্যগুলো সেন্সর করা হয়েছে।[৫০৩] *প্রিয়ার চোখে জল* পালায় রহিমের সংলাপে 'মালাউন', 'শালা কাফের মালাউন' ও 'কাফেরের বাচ্চা' (পৃ.২৪), অংশ বাদ দেয়া হয়েছে।[৫০৪]

কমলেশ ব্যানার্জি এদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় পালাকার। তাঁর ১১টি যাত্রা ছাড়পত্র লাভ করে এদেশের যাত্রামঞ্চে পরিবেশিত হয়। পালাগুলো হচ্ছে *মার্ডার*, *বাঈজীর মেয়ে*, *আমার ছেলে ফিরিয়ে দাও*, *মানুষ নিয়ে খেলা*, *সমাজ*,

---

[৪৯৯] বাংলাদেশ নাটক সেন্সর কমিটি, *মঞ্চায়নের জন্য ছাড়পত্র-প্রাপ্ত নাটকের তালিকা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বি-সং ১৯৮৫,পৃ ২৭

[৫০০] বাংলাদেশ নাটক সেন্সর কমিটি, *মঞ্চায়নের জন্য ছাড়পত্র-প্রাপ্ত নাটকের তালিকা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বি-সং ১৯৮৫, পৃ ৯

[৫০১] বাংলাদেশ নাটক সেন্সর কমিটি, *মঞ্চায়নের জন্য ছাড়পত্র-প্রাপ্ত নাটকের তালিকা*, (২য় পর্ব), প্রাগুক্ত, পৃ ৪

[৫০২] বাংলাদেশ নাটক সেন্সর কমিটি, *মঞ্চায়নের জন্য ছাড়পত্র-প্রাপ্ত নাটকের তালিকা*, (২য় পর্ব), প্রাগুক্ত, পৃ ১৮

[৫০৩] বাংলাদেশ নাটক সেন্সর কমিটি, *মঞ্চায়নের জন্য ছাড়পত্র-প্রাপ্ত নাটকের তালিকা*, (১ম পর্ব), প্রাগুক্ত, পৃ ২৪

[৫০৪] বাংলাদেশ নাটক সেন্সর কমিটি, *মঞ্চায়নের জন্য ছাড়পত্র-প্রাপ্ত নাটকের তালিকা*, (২য় পর্ব), প্রাগুক্ত, পৃ ৬৮

নীচের পৃথিবী, *অভিশপ্ত ফুলশয্যা*, *শাঁখা দিও না ভেঙে*, *বিশ্বাসঘাতক*, *হাসির হাটে কান্না*, *কুল ভাঙা ঢেউ* এবং *জবাব দাও*। *আমার ছেলে ফিরিয়ে দাও* পালায় 'আমি পুলিশকে... ফিরিয়ে দিতে হবে' (পৃ.৪৪) এবং 'অশোকা কি বলছো ?... মন্ত্রীরাই তো বিয়ে করে না' (পৃ.৫৬) অংশটি বাদ দেয়া হয়েছে।[৫০৫] *শাখা দিও না ভেঙে* পালাটির কালীর সংলাপ 'শালা মেয়েছেলে এমন জিনিস, দেখলেই মন টনটন, মাথা বনবন, দেহ ছমছম করবেই' (পৃ.৪) – এই অংশ সেন্সর করা হয়েছে। [৫০৬]

ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ১২টি পালা বিভিন্ন ছাড়পত্র পায়। *পাঁচ পয়সার পৃথিবী*, *বর্ণপরিচয়*, *একটি পয়সা*, *পদধ্বনি*, *পাগলা গারদ*, *জানোয়ার*, *মা মাটি মানুষ*, *চিড়িয়াখানা*, *ঈশা খাঁ*, *কান্না ঘাম রক্ত*, *অচল পয়সা চলছে* এবং *মিনাবাজার* প্রভৃতি পালাগুলো ছাড়পত্র পেয়ে বাংলাদেশের যাত্রামঞ্চে অত্যন্ত জনপ্রিয়তার সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। এছাড়া *বিধি আনন্দময়ী*, *নাচমহল*, *অশ্রু দিয়ে লেখা*, *সম্রাট আলমগীর*, *নিহত গোলাপ*, *রক্তে রোয়া ধান*, *বেগম আসমান তারা*, *তাজমহল*, *শাহান শাহ আকবর*, *একটি ফুলের মৃত্যু*, *ময়লা কাগজ*, *পাঁচ পয়সার পৃথিবী*, *বাঁচতে চাই* প্রভৃতি পালা অভিনীত হয়।

বিধায়ক ভট্টাচার্যের *মাইকেল মধুসূদন* পালাটি চারণিক নাট্যগোষ্ঠীর মাধ্যমে দেশব্যাপী জনপ্রিয় হয়। অমলেন্দু বিশ্বাসের অনবদ্য অভিনয়ে এ পালা সর্বসাধারণে অভিনন্দিত হয়। পাশাপাশি যাত্রাবিমুখ শিক্ষিত নাগরিক এ পালার আকর্ষণে আসরে আসে। এছাড়া *বিশ বছর আগে* এবং *তাই তো* পালাদুটি বিধায়ক ভট্টাচার্যের ছাড়পত্রপ্রাপ্ত অন্যান্য পালার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

গৌরচন্দ্র ভড়ের *ন্যায়দণ্ড*, *অগ্নি সংস্কার* ও *জীবন মরণ* পালা তিনটি বিভিন্ন দলে অভিনীত হয়। *জীবন মরণ* পালার পাণ্ডুলিপির দিলীপের সংলাপে 'ক্যাবারে অর্ধউলঙ্গ রূপসী নাচছে। পাশের সঙ্গিনীকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। দেশপ্রেমের চেয়ে যে যুবতীর প্রেমের চুমু অনেক মিষ্টি।' (পৃ.৬০) এবং ধীরাজের সংলাপে 'আদালত ওদের পক্ষে রায় দেয়'।' (পৃ.৬৭)–এই অংশটি বাদ দেয়া হয়েছে।[৫০৭] এছাড়া তাঁর *কণ্ঠহার*, *বর্ণসিঁড়ি*, *জনতার আদালত*, *দুশমনের দুনিয়া*, *তাসের ঘর*, *সোনারগাঁ*, *সাহেব বিবি গোলাম* প্রভৃতি পালা জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

জিতেন্দ্র বসাকের *মুঘল-এ-আজম*, *বাগদত্তা*, *সোনার হরিণ*, *ফরিয়াদ*, *সিপাহী বিদ্রোহ*, *জীবন জিজ্ঞাসা*, *দুর্গেশনন্দিনী*, *জীবন্ত পাপ*, *লালবাঈ*, *অগ্নিপরীক্ষা* প্রভৃতি পালা দর্শকপ্রিয়তা পায়। *মুঘল-এ-আজম* পালার ৮, ১৩,

[৫০৫] বাংলাদেশ নাটক সেন্সর কমিটি, *মঞ্চায়নের জন্য ছাড়পত্র-প্রাপ্ত নাটকের তালিকা*, (১ম পর্ব), প্রাগুক্ত, পৃ ২৪
[৫০৬] বাংলাদেশ নাটক সেন্সর কমিটি, *মঞ্চায়নের জন্য ছাড়পত্র-প্রাপ্ত নাটকের তালিকা*, (২য় পর্ব), প্রাগুক্ত, পৃ ১১
[৫০৭] বাংলাদেশ নাটক সেন্সর কমিটি, *মঞ্চায়নের জন্য ছাড়পত্র-প্রাপ্ত নাটকের তালিকা*, (২য় পর্ব), প্রাগুক্ত, পৃ ৪৯

২৩, ২৪, ৩৪, ৪৩, ৬৯, ৭০, ৮১, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৯১, ১০৪ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন সংলাপ এবং 'কাফের', 'কাফেরের বাচ্চা', 'পয়গম্বরের বাচ্চা', 'কুত্তা', 'মুঘলাই কুত্তা', 'পাঠান কুত্তা' শব্দগুলো সেন্সর করা হয়।[৫০৮]

নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায়ের *মমতাময়ী মা*, *সিঁদুর নিও না মুছে*, *গরীব কেন মরে*, *মা যদি মন্দ হয়*, *অমানুষ*, *ভাঙছে শুধু ভাঙছে*, *প্রেমের সমাধি তীরে* এবং *স্ত্রীর শেষ পত্র* পালা ছাড়াও *মা হলো বন্দী*, *এক মুঠো অন্ন*, *নিশিপুরের বৌ*, *মরমী বধূ* পালাগুলো বাংলাদেশের যাত্রামঞ্চে জনপ্রিয়তার সাথে অভিনীত হয়।

প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের *মানুষ পেলাম না*, *রিকশাওয়ালা*, *নাগরদোলা*, *পেটের জ্বালা*, *রিক্তা নদীর বাধ*, *নেভাও আগুন*, *পৃথিবীর পাঠশালা*, *বাঁশের কেল্লা*, *কবরের নীচে*, *সোনাডাঙার মেয়ে (যে আগুন জ্বলছে)*, *সারথি থামাও রথ*, *এক ফোঁটা অশ্রু*, *মানুষ পেলাম না*, *পেটের জ্বালা*, *আনার কলি*, *রক্ত দিয়ে কিনলাম* প্রভৃতি পালা ছাড়পত্র পায়।

শম্ভুনাথ বাগের *লেলিন*, *হিটলার* অত্যন্ত জনপ্রিয় পালা। অমলেন্দু বিশ্বাসের অনবদ্য অভিনয় এ পালাগুলোকে প্রাণবন্ত করে তোলে। এছাড়া তাঁর *ঘুমভাঙার গান*, *মহেঞ্জোদাড়ো*, *রক্তাক্ত আফ্রিকা*, *কাঞ্চী কাবেরী* পালা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন দলে অভিনীত হয়।

শক্তিপদ রাজগুরুর *জীবন কাহিনী*, *মেঘে ঢাকা তারা*, *কুমারী মন* পালা তিনটি দর্শক গ্রহণযোগ্যতা পায়। আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের *হর-পার্বতী* ও *রানী ভবানী* পালাদুটি বিভিন্ন দলে অভিনীত হয়। এছাড়া তাঁর *পাষাণের মেয়ে*, *ভুলি নাই*, *যুগের দাবি*, *মরেও যারা মরে না* প্রভৃতি পালা জনপ্রিয় হয়। কানাইলাল নাথের *আমি মা হতে চাই*, *মা ও ছেলে*, *কবরের কান্না*, *আগুন নিয়ে খেলা*, *শহর থেকে দূরে* প্রভৃতি পালাও গুরুত্বপূর্ণ।

সত্যপ্রকাশ দত্তের *আমি সিরাজের বেগম*, *চাপাডাঙার বউ* (তারাশঙ্কর বন্দ্যোাধ্যয়ের উপন্যাস অবলম্বনে), *অগ্নিবাসর*, *পঞ্চনদীর তীরে*, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর* দর্শকপ্রিয়তা পায়। নন্দগোপাল রায় চৌধুরীর *রানী দুর্গাবতী*, *সাধক রামপ্রসাধ*, *বিপ্লবী বাঙালি*, *স্বাধীনতার বলি*, *বন্দীর ছেলে* প্রভৃতি পালা আসরস্ত হয়। দেবেন্দ্রনাথের *মহাতীর্থ কালীঘাট*, *লালন ফকির*, *মৃত্যুর চোখে জল* প্রভৃতি পালা ছাড়পত্র পায়। কিন্তু এর বাইরে তাঁর *যাত্রা হলো শুরু*, *সাত ভাই চম্পা*, *কবি কৃত্তিবাস* প্রভৃতি পালাও অভিনীত হয়। *মহাতীর্থ কালিঘাট* পালার ১ পৃষ্ঠা থেকে ৮ পৃষ্ঠা সেন্সর করা হয়েছে।[৫০৯] জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় এর *গোলাপে রক্ত*, *সূর্য এনে দাও*, *লৌহ কপাট* (জরাসন্ধের উপন্যাস

[৫০৮] বাংলাদেশ নাটক সেন্সর কমিটি, *মঞ্চায়নের জন্য ছাড়পত্র-প্রাপ্ত নাটকের তালিকা*, (২য় পর্ব), প্রাগুক্ত, পৃ ১৬

[৫০৯] বাংলাদেশ নাটক সেন্সর কমিটি, *মঞ্চায়নের জন্য ছাড়পত্র-প্রাপ্ত নাটকের তালিকা*, (২য় পর্ব) প্রাগুক্ত, পৃ ২৮

অবলম্বনে), *ফুলেশ্বরী* (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস) পালা ছাড়পত্র পায়। তবে *লৌহকপাট* পালা থেকে 'পির', 'পয়গম্বর', 'মহম্মদ' শব্দগুলো বাদ দেয়া হয়।[৫১০]

অনিলকুমার দাসের *চাবুক* পালার শংকরের সংলাপে 'বাংলাদেশের ...পাচ্ছে না।' (পৃ.৬) গানের বানী 'ধনীর বুকে... তাদের শির' (পৃ.৬৪), শংকরের সংলাপে 'পুলিশ?... সমুচিত শিক্ষা।' (পৃ.৯২) – এই অংশ সেন্সর করা হয়।[৫১১]

মোহাম্মদ জালালউদ্দিনের *গাঁয়ের বুকে*, *ভিখারীর মেয়ে*, *রঙ্গিলা একটি মেয়ের নাম* পালাগুলো ছাড়পত্র পায়। তবে *কিছু খেতে দাও* পালায় সোনার সংলাপে 'আরে শালা...রেলস্টেশন তার নাম'; রূপার সংলাপে 'কবিতা বন্ধ কর শালা'; সোনার সংলাপে 'বন্ধ করলাম' (পৃ.৫৮)। পিলেখাঁর সংলাপে 'আল্লার কুদরত', 'উড়োজাহাজ দিয়ে হজ... নাসিরউদ্দীন চৌধুরী' (পৃ.৭২); কালাইর সংলাপে 'আরে তোমার ...আমি করিয়াছি'; জ্ঞানের সংলাপে 'শয়তান কোনদিন...মঙ্গল চিন্তা করে না' (পৃ.১০১); সোনাচাঁদের সংলাপে 'নইলে শহরে কি...তুমি যাবে কি? (পৃ.১১৬) এই অংশগুলো সেন্সর করা হয়েছে।[৫১২] মাস্টার সেকেন্দার আলীর *বেদকন্যা* ও *হোসেন শহীদ কারবালা* মঞ্চায়নের জন্য ছাড়প্রাপ্ত পালা। আবুবকর সিদ্দিকের *বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না* পালায় 'এবার বিয়ের খোৎবা শুরু করি... বলুন সবে আল্লাহুম্মা আমি' (পৃ.৭৬) এই অংশ সেন্সর করা হয়েছে।[৫১৩] সমরেন্দ্র হালদারের *শ্মশান মন্দির* পালায় মনির সংলাপ 'এই বাংলার বুকে আমাদের মতো শতশত পরিবার... সর্পিনী করে তুলো না।' (শেষপৃষ্ঠা) – এই অংশ বাদ দেয়া হয়েছে।[৫১৪] শাহজাহান বিশ্বাসের *মানুষ কেন পাগল হয়* পালায় ১৪,১৫,৪৬ ও ৪৭ পৃষ্ঠার কয়েকটি সংলাপ সেন্সর করা হয়েছে।[৫১৫] এছাড়া *দস্যুরানী ফুলনদেবী* পালাও ছাড়পত্র পেয়েছে। কিন্তু মঞ্চে পূর্ণেন্দু রায়ের *দস্যুরানী ফুলনদেবী* বেশি অভিনীত হয়েছে। এছাড়া পরিতোষ ব্রহ্মচারীর *দস্যুরানী ফুলনদেবী* পালাটি তুষার অপেরায় অভিনীত হয়েছে। দিলীপ সরকারের *অনেক রক্তের পরে* পালার নেয়ামতের সংলাপে 'এই যে, ও মৌলবী সাব, শয়তানরা বন্দিগো কী করছে?'– অংশ সেন্সর করা হয়েছে। [৫১৬]

মহেন্দ্রগুপ্তের *কঙ্কাবতীর ঘাট*, *টিপু সুলতান* পালাদুটি যাত্রামঞ্চে অত্যন্ত জনপ্রিয়তার সাথে অভিনীত হয়। শচীন ভট্টাচার্যের *কলকি অবতার*, *সম্রাটের মৃত্যু* পালা; রাজদূতের *সমাজের মৃত্যু*, *বাবার বিয়ে*; অগ্রদূতের *একটি ফুলের মৃত্যু*, *অন্ধকারের নীচে সূর্য*, *রবিবারের সকাল*; কালীপদ দাসের *কমলাসুন্দরী*, *রাজা হরিশচন্দ্র*; মোহাম্মদ

---

[৫১০] বাংলাদেশ নাটক সেন্সর কমিটি, *মঞ্চায়নের জন্য ছাড়পত্র-প্রাপ্ত নাটকের তালিকা*, (২য় পর্ব) প্রাগুক্ত, পৃ ৪৭
[৫১১] বাংলাদেশ নাটক সেন্সর কমিটি, *মঞ্চায়নের জন্য ছাড়পত্র-প্রাপ্ত নাটকের তালিকা*, (২য় পর্ব) প্রাগুক্ত, পৃ ৫২
[৫১২] বাংলাদেশ নাটক সেন্সর কমিটি, *মঞ্চায়নের জন্য ছাড়পত্র-প্রাপ্ত নাটকের তালিকা*, (১ম পর্ব), প্রাগুক্ত, পৃ ২৮
[৫১৩] বাংলাদেশ নাটক সেন্সর কমিটি, *মঞ্চায়নের জন্য ছাড়পত্র-প্রাপ্ত নাটকের তালিকা*, (১ম পর্ব), প্রাগুক্ত, পৃ ২৬
[৫১৪] বাংলাদেশ নাটক সেন্সর কমিটি, *মঞ্চায়নের জন্য ছাড়পত্র-প্রাপ্ত নাটকের তালিকা*, (২য় পর্ব), প্রাগুক্ত, পৃ ৪৬
[৫১৫] বাংলাদেশ নাটক সেন্সর কমিটি, *মঞ্চায়নের জন্য ছাড়পত্র-প্রাপ্ত নাটকের তালিকা*, (২য় পর্ব), পৃ ৫৩
[৫১৬] বাংলাদেশ নাটক সেন্সর কমিটি, *মঞ্চায়নের জন্য ছাড়পত্র-প্রাপ্ত নাটকের তালিকা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বি-সং ১৯৮৫, (২য় পর্ব), পৃ.৬৩

আলাউদ্দিনের *কাচমহল*, *বোবাকান্না*; আরশাদ আলীর *গৌরীমালা*, *নারীর চক্রান্ত*; শাহ সিকান্দার আজাদের *চাঁদকুমারী চাষার ছেলে*, *মধুমালতী*, সমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *পলাশীর পরে*; সৌরিন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের *মাটির মা*; মোহাম্মদ মতিউর রহমানের *'রাজ সিংহাসন'*, *গরীবের আর্তনাদ*, *যৌতুক হলো অভিশাপ*, *মানুষ-অমানুষ*; হীরেন্দ্রকৃষ্ণ দাসের *গরীবের ছেলে*, *দাসীপুত্র*, *আলেফ লায়লা*, *রাজমুকুট*, *জীবন্ত কবর*, *অভিশপ্ত যৌতুক*; নিশিকান্ত বসুরায়ের *পথের শেষ*; স্বদেশ হালদারের *ঝাড়ুদার*; শৈলেশ গুহনিয়োগীর *বৌদির বিয়ে*; অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের *আনারকলি*, *রঘু ডাকাত*, *মগের দেশ*, *নটীর প্রেম*, *মানুষের ভগবান*; চণ্ডীচরণ ব্যানার্জির *সিঁদুর পরিয়ে দাও*, একেএম মনিরুল হকের *ছয়ফুলমুলক বদিউজ্জামান*; ডা. শাহাদাত আলী খানের *মনসবদার*; সৈয়দ শাহজাহান টি. আহম্মেদের *আপন দুলাল*; ইসমাইল হোসেনের *বাইশ বছর পরে*; শাহজাহানের *লায়লী মজনু*; জসিম উদ্দিনের *আলোমতি প্রেমকুমার*; পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের *বেদের মেয়ে*; নুরুদ্দিন আহমদের *চুড়িওয়ালী*; মোহাম্মদ আরিফুর রহমানের *এ সমাজ কাদের*; নূরউদ্দিন আহমেদের *ঝিনুকমালা*; এম গোলাম রহমানের *উদয়নালা*, একেএম মনিরুল হকের *রহিম বাদশা রূপবান কন্যা*; নরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর *বিনয় বাদল দীনেশ*; আগন্তক এর *নিহত গোলাপ*; বশিরউদ্দিন আহমদের *হিংসার পরিণাম*; অরুণকুমার দে রচিত *গরিবের ছেলে*; সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নহবত*; স্বপনকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *শ্মশানে হলো ফুলশয্যা*; উৎপল দত্তের *টিনের তলোয়ার*; সুনীল চৌধুরীর *তালপেতার সেপাই*; সঞ্জীবন দাসের *হতভাগিনী মা*; নবেন্দু সেনের *ভাঙা মানুষের পালা*; সমর মুখার্জির *ব্যাভিচার*; কল্যাণ চক্রবর্তীর *শাঁখা সিঁদুর আলতা*; বসন্ত ভট্টাচার্যের *ভগবান ভূত*; অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্যের *এখন আমরা কোথায়*; শিবাজী রায়ের *জয় মা কালী বোর্ডিং*; আবুল কাসেমের *গুনাইবিবি*; হাসি শেখের *বর্ণমালার*; পরিতোষ ব্রহ্মচারীর *বিরাজ বৌ* (কাহিনি : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়); মণিদত্তের *শশীবাবুর সংসার* (কাহিনি : আশাপূর্ণা দেবী); আবদুল মতিন খানের *শকুন্তলা* (কাহিনি : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর) মোহাম্মদ আবুল হোসেনের *দেবদাস* (কাহিনি : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়); শচীন সেনগুপ্তের *সিরাজদ্দৌলা*; বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের *চন্দ্রনাথ* (কাহিনি : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়); অনিল দের *গুপী গাইন বাঘা বাইন* (কাহিনি : উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী); কাজী রফিকের *মনসার পালা* (কাহিনি : বিজয়গুপ্ত); মোহাম্মদ হাসানের (সম্পা.) *তোতামিয়া ও গুনাইবিবি;* এম এ খালেকের *লাইলি মজনু*, *সুলতান আযম ও চণ্ডীদাস-রজকিনী*; গণেশ গুহের *অচল পালা*; সরোজকুমার আইচের *রত্নাকর গিরিশচন্দ্র*; মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানের *হীরা চুন্নি পান্না* প্রভৃতি পালা ছাড়পত্র পেয়েছে। নাটক সেন্সর কমিটি প্রতিটি পাণ্ডুলিপিকে নাটক বললেও এর অনেক গুলোই আসলে যাত্রাপালা। যাত্রামঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী বলেই এগুলোকে এ আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫.১১ বাংলাদেশের যাত্রাশিল্পী

৫.১১.১ মেহবুব ইসলাম (১৯৫৬-১৯৯৪)

১৯৭৫ সালে মুক্তিযোদ্ধা মেহবুব যাত্রাঙ্গনে পা রাখেন। ফরিদপুরের নিউ বাসন্তী অপেরার মাধ্যমে তার অভিনয় জীবনের শুরু। ১৯৭৬ সালে তিনি কুষ্টিয়ার 'বঙ্গলক্ষ্মী অপেরা'য় নায়ক হিসেবে যোগ দেন। সহজ সাবলীল অভিনয়ে দর্শকমন জয় করার ক্ষমতা ছিল তাঁর। কোহিনূর অপেরা, ঝিনুক অপেরা, নবপ্রভাত অপেরা, নাট্যমঞ্জুশ্রী যাত্রা ইউনিট প্রভৃতি দলে তিনি কাজ করেন। *প্রেমের সমাধি তীরে, জেল থেকে বলছি, শবরীর সংসার, আনারকলি, জীবন নদীর তীরে, লালন ফকির* প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য পালা। তাঁর স্ত্রী তপতী ইসলামও একজন নন্দিত নায়িকা ছিলেন। এই সফল জুটি নবজাগরণ অপেরা, সত্যনারায়ণ অপেরা, বলাকা অপেরা প্রভৃতি যাত্রাদলে সাফল্য বয়ে আনেন। মেহবুব অভিনয়ের পাশাপাশি সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যাত্রাশিল্পের উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছেন। ১৯৯৪ সালে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের দরুণ তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর অকাল মৃত্যুর ফলে একজন প্রতিভাবান অভিনেতাকে যাত্রাজগৎ হারাল। তপতী ইসলাম এখনও অভিনয় করে যাচ্ছেন।

৫.১১.২ গৌরাঙ্গ আদিত্য (জন্ম-১৯৩৪)

বাংলাদেশের মোহনগঞ্জ উপজেলায় গৌরাঙ্গ আদিত্যের জন্ম হয়। *নিমাই-সন্ন্যাস* পালায় অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁর যাত্রাজীবন শুরু হয়। বার-তেরো বছর বয়সে তিনি গানের তালিম নিয়েছিলেন ওস্তাদ বীরেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামীর কাছে। তারপর ময়মনসিংহের ওস্তাদ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের কাছে শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন যাত্রাদলে পেশাদার বিবেক হিসেবে কাজ করেন। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তিনি নবযুগ অপেরা ছাড়াও বাবুল অপেরা, ভাগ্যলক্ষ্মী অপেরা, রয়েল ভোলানাথ অপেরা, চারণিক অপেরা, সবুজ অপেরায় একচ্ছত্র বিবেক হিসেবে যাত্রাশিল্পের সেবা করেছেন।

৫.১১.৩ কৃষ্ণা চক্রবর্তী (১৯৬৬)

কৃষ্ণা চক্রবর্তী বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট থানার টাউন নওয়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা নিতাই চক্রবর্তী ছিলেন যাত্রা অভিনেতা। ১৯৭২ সালে বঙ্গরূপালী অপেরার মাধ্যমে যাত্রায় শিশুশিল্পী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৪ সালে বিখ্যাত যাত্রানট তুষার দাশগুপ্তের 'তুষার অপেরা'য় আবারও শিশুশিল্পী হিসেবেই যোগদান করেন। ১৯৯১ সালে 'রামকৃষ্ণ যাত্রা ইউনিট' এবং ২০১৩ সালে 'কৃষ্ণা যাত্রা ইউনিট' গঠন করেন। মানিকগঞ্জের প্রগতি নাট্য সংস্থা, ময়মনসিংহের নবরঞ্জন অপেরা এবং সাতক্ষীরার নিউ প্রভাস অপেরায় বিভিন্ন সময়ে তিনি কাজ করতেন। তাঁর অভিনীত কিছু উল্লেখযোগ্য পালা হচ্ছে: *দোষী কে*, *ডাইনী বধূ*, *তটিনীর বিচার*, *মা হলো বন্দি*, *নীচু তলার মানুষ*, *লালন ফকির*, *বাগদত্তা এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলা* (সিরাজ চরিত্রে)। ২০১৭ সালের ৮ মে ক্যান্সারে

আক্রান্ত হয়ে নিজ বাড়িতে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। যাত্রাপথে তাঁর বহুদিনের সহকর্মী মিলন কান্তি দে তাঁর মৃত্যুর পর একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন:

> বিচিত্রমুখি চরিত্রের অন্বেষায় এক ব্যাকুলচিত্ত অভিনয় শিল্পী তিনি। সহজাত অভিনয় ও অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে খুব সহজেই দর্শকের কাছে চলে যেতে পারতেন। আমরা বাংলাদেশ যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে ২০০৭ সালে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে 'বাংলার যাত্রালোকে বহুমাত্রিক অভিনয়ের এক পদ্মপুল্প' উপাধীতে ভূষিত করেছিলাম। [৫১৭]

কৃষ্ণা চক্রবর্তী নেত্রকোণায় বিভিন্ন যাত্রাদলে কাজ করে খ্যাতি অর্জন করেন। ননীগোপাল সরকারের অনুসন্ধানে এ সম্পর্কে জানা যায় :

> স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে প্রফেশন্যাল যাত্রাপার্টি ছাড়া এমেচারে নারীদের কোন অংশগ্রহণ ছিল না।... তবে ময়মনসিংহ, জামালপুর এবং নেত্রকোণায় কৃষ্ণা, ইলা, রীতা, ফরিদা, সাধনা, শিরিন, মাধবী, আঞ্জু প্রমুখ শিল্পীরা সাতপাই এলাকায় অবস্থান করে। এখানে একটা মিনি নাটক পাড়া গড়ে উঠেছে। রেল ক্রসিং-এ বেশ কটি যাত্রা পোষাকের বিপণী রয়েছে। এগুলোকে কেন্দ্র করেই বর্তমানে নেত্রকোণা জেলার সর্বত্র এমেচার যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।[৫১৮]

এই ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে কৃষ্ণা চক্রবর্তী ২০১৫ সালে বাংলাদেশ যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদ এর মহিলা বিষয়ক সম্পাদক এবং যাত্রাশিল্প ফেডারেশন এর সিনিয়র এসিসট্যন্ট সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন।

৫.১১.৪ আরশাদ আলী

আরশাদ আলী *কে ঠাকুর কে ডাকাত* পালায় ভূজঙ্গনারায়ণ, *লালন ফকির* পালায় লালন, *চাঁদ সুলতানা* পালায় মুরাদ, *খোঁড়া বাদশা* পালায় তৈমুর, *গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গা* পালায় অম্বর চরিত্রে অভিনয় করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত দ্বিতীয় জাতীয় যাত্রা উৎসবে (১৯৭৯-৮০) বাসন্তী অপেরার পরিবেশনায় *চাঁদ সুলতানা* পালায় অভিনয় করে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং চতুর্থ যাত্রা উৎসবে (১৯৯২-৯৩) রাজমহল অপেরার *কে ঠাকুর কে ডাকাত* পালায় অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কারে ভূষিত হন। হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ২০০৬ সালে তিনি মারা যান।

৫.১১.৫ ভিক্টর দানিয়েল

খুলনা জেলার দৌলতপুর থানার মুজগুন্নি গ্রামে তিনি জন্ম নেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভাগ্যলক্ষ্মী অপেরায় ১৯৭৪ সালে তাঁর যাত্রাজীবনের সূচনা। সৃজনশীল অভিনেতা ও নির্দেশক হিসেবে তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। আধুনিক ও সমকালীন চিন্তাকে ধারণ করে তিনি যাত্রাভিনয়ে নতুন মাত্রা যুক্ত করেন। সেটি হচ্ছে কণ্ঠস্বরকে উচ্চগ্রামে না নিয়ে মধ্যলয়ে থেকে সংলাপ প্রক্ষেপণ করা –– যাকে বলে 'খাদের অভিনয়'। *এ পৃথিবী টাকার গোলাম* পালায় ভাস্কর,

---

[৫১৭] ১৩-৫-২০১৭ তারিখে গবেষকের গৃহীত সাক্ষাৎকার

[৫১৮] ননীগোপাল সরকার, লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডারে নেত্রকোণার যাত্রাপালা, *নেত্রকোণার লোকজগত*, সাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি, নেত্রকোণা, বাংলাদেশ, পৃ ৩৭-৩৮

জীবন থেকে নেয়া পালায় শান্ত এবং *কালাশের* পালায় কালাশের চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় আজও মানুষের মনে দাগ কেটে আছে।

৫.১১.৬ তাপস সরকার (জন্ম ১৯৪৮)

১৯৪৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলায় বরাইদ গ্রামে তিনি জন্ম নেন। বাবা পার্বতীশংকর, মা সুবর্ণপ্রভা সরকার। তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধ ফেরত তরুণরা যখন নবনাট্য আন্দোলনের সাথে যুক্ত হচ্ছেন, সেই সময় তাপস সরকার একটি ভিন্নমাত্রার যাত্রাদল 'চারণিক নাট্যগোষ্ঠি' গড়ে তোলেন। চারণকবি মুকুন্দদাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই এই নামকরণ হয়। তাপস সরকার ছিলেন এ দলের সত্ত্বাধিকারী। পরে ১৯৭৭ সালে তিনি ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেন লোকনাট্য গোষ্ঠী। এ দলের প্রযোজনায় মঞ্চায়িত পালাগুলো হচ্ছে – *আনারকলি*, *সতী করুণাময়ী*, *গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গা*, *নন্দ রানীর সংসার*, *মা-মাটি-মানুষ*। প্রত্যেক পালায় তিনি অভিনয় করেছেন। তাপস সরকার সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গঠিত যাত্রাশিল্প উন্নয়ন কমিটির একজন সদস্য।

৫.১১.৭ হাবিব সারোয়ার (জন্ম ১৯৫৬)

স্বাধীনতার পর সত্তর দশকে দেশীয় যাত্রামঞ্চে হাবিব সারোয়ার এর আবির্ভাব হয়। ময়মনসিংহ জেলার শম্ভুগঞ্জের চরঝাউগড়া গ্রামে জন্ম নেন। সবুজ অপেরা, নবরঞ্জন অপেরা, নিউ গণেশ অপেরা, নিউ রংধনু অপেরা, দেশ অপেরা, জয়যাত্রা প্রভৃতি যাত্রাদলে তিনি কাজ করেছেন। উচ্চগ্রামে ছন্দময় সংলাপ প্রক্ষেপণ তাঁর একটি নিজস্ব শৈলী। *জীবন এক জংশন*, *মা হলো বন্দি*, *ভিখারী ঈশ্বর*, *সোহ্‌রাব-রুস্তম*, *তটিনীর বিচার*, *মা-মাটি-মানুষ*, *দেবী সুলতানা* প্রভৃতি তাঁর অভিনীত বিখ্যাত পালা। ২০০৭ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত কোনো যাত্রাপালায় দেশ অপেরা'র পরিবেশনায় তিনি নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা চরিত্রে অভিনয় করেন।

৫.১১.৮ পূর্ণিমা ব্যানার্জী (১৯৬৯)

নড়াইল জেলার কালিয়া থানার গাজীরহাটে পূর্ণিমা ব্যানার্জীর জন্ম। বাবা গৌর সাহা ও মা কমলা সাহাও ছিলেন যাত্রাশিল্পী। গোপালগঞ্জের জোনাকী অপেরা, দিপালী অপেরা, সাতক্ষীরার প্রভাস অপেরা, আর্য্য অপেরা এবং খুলনার রাজদূত অপেরা এবং আদি রাজমহল অপেরা সহ মোট ২২টি দলে তিনি কাজ করেন। *মা বিক্রির মামলা*, *দস্যুরানী ফুলনদেবী*, *দেবী সুলতানা*, *আনারকলি*, *মা-মাটি-মানুষ*, *কলঙ্কিনী কেন কংকাবতী* সহ তিনি প্রায় ১০০ টি পালায় অভিনয় করেন।

৫.১১.৯ মুকুন্দ ঘোষ (১৯০৪-২০১৭)

মুকুন্দ ঘোষের জন্ম বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার ওয়ারিয়া গ্রামে। মুকুন্দ ঘোষ তাঁর বিচিত্র অভিনয় কুশলতায় গ্রাম বাংলাকে মাতিয়েছেন, তাঁর সুমিষ্ট উচ্চকণ্ঠে দর্শক আলোড়িত হয়েছেন, কখনও হেসেছেন, কখনও কেঁদেছেন। ১৯৬৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে প্রতিষ্ঠিত ভাগ্যলক্ষ্মী অপেরার স্বত্ত্বাধিকারী গোপাল কৃষ্ণ পাণ্ডের দলে সহনায়ক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৭ সালে খুলনা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত মাসব্যাপী যাত্রামেলায় তিনি 'যাত্রার মহানায়ক' উপাধিতে ভূষিত হন। পরের বছর পুরোপুরি নায়ক চরিত্রে অভিনয়ের ডাক আসে সাতক্ষীরার আর্য অপেরা থেকে। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ২৬টি যাত্রাদলের মধ্যে এটি অন্যতম ছিল। পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত যাত্রাপালাকার সত্যপ্রকাশ দত্তের পালা রচনার সূচনা হয়েছিল এ দল থেকে। আর্য অপেরায় অভিনয়ের পর অমলেন্দু বিশ্বাস, তুষার দাশগুপ্ত, ভিক্টর দানিয়েল, অশোক ঘোষ, স্বপন কুমার প্রমুখ খ্যাতনামা যাত্রাশিল্পীদের সঙ্গে এগিয়ে চলে মুকুন্দ ঘোষের অভিনয় যাত্রা। একে একে অভিনয় করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জয়দূর্গা অপেরা, গোপালগঞ্জের ১ নম্বর ও ২ নম্বর দিপালী অপেরা, জোনাকী অপেরা, চট্টগ্রামের বাবুল অপেরা, সাতক্ষীরার প্রদীপ অপেরা, মানিকগঞ্জের নিউ গণেশ অপেরা এবং নেত্রকোণার নবযুগ অপেরা। ১৯৬৬ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত মুকুন্দ ঘোষ অভিনয় করেন।

৫.১২ বিবেকের রূপান্তর

যাত্রাপালায় সুদীর্ঘকাল ধরে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় বিবেকের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রকাশকাল অনুসারে তেমনি কিছু পালার বিবেকের নাম করা হলো : ব্রজেন দের *চণ্ডমুকুল* (১৯৩৮), *রক্ততিলক* (১৯৪২), *দেবতার গ্রাস* (১৯৪৩), *রাজনন্দিনী* (১৯৪৪), *রাজ সন্ন্যাসী* (১৯৪৮), *রাহুগ্রাস* (১৯৫৯), *সোহরাব-রুস্তম* (১৯৬১) এবং *ময়ূর সিংহাসন* (১৯৬৬)। ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদের *চন্দ্রহাস* (১৯৪০), সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের *রক্তবীজ* (১৯৫১), জিতেন বসাক এর *বাগদত্তা* (১৯৫৫), নন্দদুলাল রায় চৌধুরীর *সাধক রামপ্রসাদ* (১৯৫৫), উৎপল দত্তের *সন্ন্যাসীর তরবারি* (১৯৭২), ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের *মেহের-উন-নেসা* (১৯৭৬), সেকেন্দার আলী সিকদারের *বেদকন্যা* (১৯৬৭), জালাল আহমেদের *রাজর* (১৯৯৩), মিলন কান্তি দের *দাতা হাতেম তায়ী* (২০০৪) – এ সমস্ত পালায় বিবেকের আবির্ভাব ঘটেছে। *সোহরাব-রুস্তম* পালায় তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিবেক দেখা যায়। মা তাহমিনা যখন পিতৃ-পরিচয় জানতে ব্যাকুলচিত্ত সোহরাবের কাছে রুস্তমের নামটি বলতে যাবেন, তখনই ক্ষিপ্রগতিতে বিবেক বাঁধা দিয়ে বলেছে :

> খাঁচার পাখি উড়ে যাবে, খুলিস না দোর খুলিস না
> ঘুমিয়ে আছে গর্তে ফণী, খোঁচা দিয়ে তুলিস না।

রাবণ যখন সীতাকে হরণ করে তখন ক্ষুব্ধ বিচলিত অগণিত মানুষের একজন হয়ে বিবেক মঞ্চে তেড়ে আসে :

ভুল করিস নে ওরে রাবণ
নারী হরণ করে ডাকিস নারে অকাল মরণ।

বাদশা নওফেল যখন দাতা হাতেম তায়ীর জগৎজোড়া খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত তখনই বিবেক দৌড়ে এসে বাদশাকে সাবধান করে বলে :

ওরে পাগল, পা বাড়াসনে আর
প্রতিহিংসার আগুনে তুই হবি ছারখার।

এভাবে সত্য ও ন্যায়ের বাণী প্রচারকেই বলা হয় যাত্রাপালার বিবেক। বিবেকের পরিবেশিত গানই যাত্রার প্রাণ। তবে সময়ের পালাবদলে যাত্রাপালার ঐতিহ্য বিবেকের কণ্ঠ ক্রমেই নীরব হয়ে যাচ্ছে। আধুনিক পালা লেখকরা বিবেকের জায়গায় তরুণদের চটুল গান জুড়ে দিচ্ছেন। সিনেমার ঢঙের এ সমস্ত গানের মাধ্যমে চলে বিবেকহীন যাত্রাপালার অশোভন প্রদর্শনী। তার সঙ্গে যুক্ত হয় প্রিন্সেসদের অশৈল্পিক ও কুরুচিপূর্ণ নৃত্য। মুকুন্দদাসের যাত্রায় গানের মাধ্যমে স্বদেশপ্রেমের জাগরণী মন্ত্রে উজ্জীবিত হতো মানুষ। তিনি গানে গানে ঔপনিবেশিক শাসকশক্তির বিরুদ্ধে জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন। সামাজিক প্রতিবাদের অন্যতম মঞ্চে পরিণত হয় যাত্রাপালা।

কালক্রমে 'বিবেক' ও সাধারণভাবে অন্তর্হিত হয়। এখন 'গায়ক' জাতীয় চরিত্র কখনও কখনও বিবেকের জায়গা নেয়।[৫১৯] আগে গানের মাধ্যমে বিবৃতি ও সংলাপ দুয়ের কাজই চলত। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে *বামন ভিক্ষা* পালাতে গান ছিল আটচল্লিশটি। এখন দশ বারোটি গানেই যাত্রা পরিবেশিত হয়। যেমন – শম্ভুনাথ বাগ রচিত *হিটলার* পালাতে গানের সংখ্যা ৬টি।

স্বাধীনতা-উত্তর সময়েও বিবেক চরিত্র দর্শকপ্রিয়তা পায়। ময়মনসিংহের নিখিল রায়, মানিকগঞ্জের জাবরা গ্রামের উপেন দাশ ও বলাই দাশ, ঝিনাইদহ জেলার যাদবপুর গ্রামের প্রয়াত মহীতোষ বিশ্বাস, খুলনার চুকনগরের তপন দেবনাথ, রাজবাড়ী জেলার জঙ্গল গ্রামের চিত্তঘোষ এবং বর্তমানে পুরনো ঢাকায় বসবাসরত সরল খাঁ প্রমুখ বিবেক চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯৯৩ সালে মহীতোষ এবং ১৯৯৫ সালে সরল খাঁ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত জাতীয় যাত্রা উৎসবে বিবেকের অভিনয়ে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেন।

৫.১৩ বাংলাদেশে যাত্রার উন্নয়নে গৃহীত কিছু পদক্ষেপ

১৯৮৮ সালে যাত্রার কলা-কুশলী ও সংশ্লিষ্টদের ন্যায্য অধিকার ও পেশাগত নিশ্চয়তার জন্য গড়ে ওঠে যাত্রাশিল্পী উন্নয়ন পরিষদ। সরকারি উদ্যোগে প্রণীত যাত্রা-নীতিমালা গেজেটভুক্ত হয় ২০১২ সালে। এ নীতিমালার আলোকে

[৫১৯] শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পালাগানের পালাবদল*, স্মারক পুস্তিকা, পৃ.৩৩, উদ্ধৃত. পবিত্র সরকার, *নাটমঞ্চ নাটরূপ*, যাত্রা প্রিয় পরম্পরা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্র.প্র.২০০৮, পৃ.৩৮৮

২০১৫ সাল পর্যন্ত ৮৮টি যাত্রাদলকে নিবন্ধন দেয় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। বাংলাদেশে ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে প্রায় নিয়মিতভাবে পক্ষকাল ও মাসকালব্যাপী পর্যায়ক্রমে পাঁচটি জাতীয় যাত্রা উৎসব হয়েছে। জাতীয় উদ্‌যোগে যাত্রার হিত সাধনের এ প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয়। এসব আয়োজন শুধু যাত্রার বিভিন্ন পালা পরিবেশনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। পাশাপাশি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রী, শ্রেষ্ঠ পালা, শ্রেষ্ঠ দলসহ আরো অন্যান্য বিষয়ে পুরস্কৃত করা হয়। কোনো কোনো যাত্রা উৎসবে সেমিনার ও কর্মশালার ব্যবস্থা ছিল। অমলেন্দু বিশ্বাস পর পর দুবার শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পান। পরপর দুবার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হন শবরী দাশগুপ্তা। স্বপনকুমার ও সুলতান সেলিম যথাক্রমে এর পরের উৎসবগুলোর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হন; শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হন রিক্তা সুলতানা ও চন্দ্রা ব্যানার্জি। বিভিন্ন পর্যায়ে পুরস্কৃত হন অশোক ঘোষ, মেরি চিত্রা, প্রতিমা সরকার, এম সিরাজ, মহীতোষ, অমল দত্ত, সরল খাঁ, মুক্তি রানী প্রমুখ। মিলন কান্তি দে ১৯৯৩ সালে চতুর্থ জাতীয় যাত্রা উৎসবে বিশেষ যাত্রা ব্যক্তিত্বের সম্মান অর্জন করেন। সৃজনশীল এই যাত্রা চর্চাকে উৎসাহিত করেছে বাংলা একাডেমিও। একুশের বইমেলা মঞ্চে ১৯৮৭ সালে চারণিক নাট্যগোষ্ঠী এবং ২০০৮ সালে চারণিকা যাত্রা সমাজ পরিবেশন করেছে যাত্রাপালা *বিদ্রোহী মাইকেল মধুসূদন*। ২০০৯ সালে দেশ অপেরার *গঙ্গা থেকে বুড়িগঙ্গা* এবং ২০১১ সালে লোকনাট্য গোষ্ঠীর *সতী করুণাময়ী* পালা একুশের মেলামঞ্চে পরিবেশিত হয়েছে। লোকনাট্য গোষ্ঠীর পরিবেশনায় বাংলা একাডেমির বইমেলা (২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১) মঞ্চে এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনে (৭মে ২০১১) পরিবেশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের *সতী করুণাময়ী* পালাটি। এর পাশাপাশি সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, আইটিআই বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিভিন্ন আয়োজনে যাত্রার মঞ্চায়ন সত্যিই প্রশংসনীয়। এছাড়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগে যাত্রার ওয়ার্কশপ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার অ্যান্ড পারফর্মেন্স স্টাডিজ বিভাগের পাঠ্যসূচিতে যাত্রা অন্তর্ভুক্তি ঐতিহ্যবাহী এই নাট্যধারার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতকেই ইঙ্গিত করে। ১৯৭৮ এর এপ্রিল থেকে চিত্রালীতে নিয়মিত 'যাত্রা বিভাগ' চালু হয়। যাত্রাশিল্পের প্রচার ও প্রসারে সাপ্তাহিক *চিত্রালী* অত্যন্ত অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সত্তরের দশকের শেষের দিকে দৈনিক ইত্তেফাক গ্রুপের সাপ্তাহিক প্রকাশনা 'পূর্বাণীতে' নিয়মিত যাত্রা বিভাগ রাখা হয়।

৫.১৪ পর্যবেক্ষণ

১৯৭১ সালের পরে, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে যাত্রা শিল্পের ধারা এবং গতি দুটোই পরিবর্তিত হয়েছে। বাংলাদেশ সময়ে এসে যাত্রা অভিনয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে নিচের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রতীয়মান হয়:

১) বাংলাদেশের যাত্রাপালা নির্বাচনের ক্ষেত্রে জীবনীভিত্তিক পালার প্রাধান্য দেখা যায়। এ পর্বের পালায় শেখ মুজিবর রহমান, কাজী নজরুল ইসলাম, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, লেলিন, হিটলার প্রভৃতি ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তিদের

নিয়ে যাত্রা পরিবেশিত হয়। এসব ব্যক্তিবর্গের জীবন নবগঠিত দেশের সামনে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপিত হয়। ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিজীবন ভিত্তিক যাত্রা মঞ্চায়নের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। ব্রজেন্দ্রকুমার দে *মায়ার ডাক* ও *ধরার দেবতা* দিয়ে এই ধারার পালা রচনার সূত্রপাত করেন। এখনকার পালার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *বিদ্রোহী মাইকেল মধুসূদন*, *বিদ্রোহী নজরুল*।

২) এছাড়া জীবনীপালার মধ্যে আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকেন্দ্রিক যাত্রাপালার মঞ্চায়ন। ১৯৭১ পরবর্তী অধিকাংশ পালাই মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত যার প্রচার প্রসার আশির দশকের ক্ষমতাসীন শাসকদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে সামরিক শাসনের অধীনে যখন চিন্তা, বাকশিল্পের স্বাধীনতা রুদ্ধ হয়ে যায়, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসে, সে সময় যাত্রা অনুষ্ঠান তার সামর্থ্যের মধ্যে যে ব্যাপক জনসংযোগের শক্তি ধারণ করে, তাই শাসকদের চক্ষুশূল হয়ে ওঠে।

৩) তৎকালীন শাসকচক্র ঐ ঝুঁকি রোধ করার জন্য যাত্রার উপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপের কৌশল অবলম্বন করে। তাতে যাত্রার ব্যাপক গণসংযোগের বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে অন্যান্য বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করা হয়। অশ্লীলতার অভিযোগটি ছিল যাত্রাপালা বহির্ভূত বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত; যার জন্য দায়ী ছিল যাত্রার আয়োজক স্থানীয় নব্য ধনীদের অর্থের লোভ ও তাদের বিনিয়োগ কৃত কালো টাকা। ফলে যাত্রাকে যে অঘোষিত সেন্সরের অধীনে আনা হয় তার দৃষ্টান্ত অন্য কোনো সাংস্কৃতিক উপকরণের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। যাত্রাপালার আংশিক বা চরণ বিশেষ সেন্সর করার প্রবণতা বাংলাদেশ পর্বে অনেকটাই নতুন। এর আগে ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর *জরাসন্ধ* পালার কিছু অংশ সেন্সর করে। যে সময়ে দেশে স্যাটেলাইট টেলিভিশন উন্মুক্ত হচ্ছে সে সময় অর্থাৎ ৯০ এর দশকেই যাত্রা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের লাল ফিতায় বাঁধা পড়ে। আকাশ সংস্কৃতির পাশাপাশি দেশীয় সংস্কৃতির রূপটি নিষিদ্ধ হয়। তারও পরে ডিজিটাল সংস্কৃতির যুগেও যাত্রা অনুষ্ঠানের অনুমতি পাওয়া যায়নি। ইন্টারনেটের অবাধ গতিবিধির যুগেও যাত্রাকে সেই স্বাধীনতা দেয়া হয়নি।

৪) পাকিস্তান পর্বে একবারসহ বাংলাদেশ পর্বে অনেকবার যাত্রা নিষিদ্ধ হয়। যাত্রার বিশেষ প্রদর্শনী কোনো অজুহাতে নিষিদ্ধ করা হলে কোনোভাবে তার টিকে থাকার উপায় থাকে না। এই সামগ্রিক পরিস্থিতি বাংলাদেশের যাত্রাশিল্পের জন্য মরণঘন্টা বাজিয়ে দেয়।

৫) বাংলাদেশ পর্বে এসেও শাসকশ্রেণির মানসে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের অভিনয় নিয়ন্ত্রণ প্রবণতা কার্যকর থাকে। প্রকৃত অর্থে ব্রিটিশদের অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের আদলেই যাত্রা প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। কখনো অশ্লীলতা, কখনো যাত্রা দর্শকদের মধ্যে অস্থিরতা, আইনশৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি প্রভৃতি অজুহাতকে সামনে আনা হয়। বস্তুত তা অগণতান্ত্রিক ও সামরিক শাসকদের সংস্কৃতিবিরোধী মানসিকতারই প্রতিফলন। যদিও

এজন্য যাত্রার প্রিন্সেসদের নাচকে দায়ী করা হয়; কিন্তু অবান্তরভাবে জুড়ে দেওয়া প্রিন্সেস নৃত্যই এর একমাত্র কারণ ছিল না। সেটি ছিল এর উপলক্ষ, যাকে শাসক শ্রেণি নিজের স্বার্থ সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যাত্রাশিল্পের এই অবক্ষয় দুই বাংলাতেই সত্তরের দশক থেকে ঘটতে শুরু করে। পশ্চিমবঙ্গের যাত্রার বিপুল রমরমা অবস্থা, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা, বড় পুঁজি ও সংবাদপত্রের আনুকূল্য সত্ত্বেও সেখানে যাত্রার সর্বব্যাপ্ত অবক্ষয়কে রোধ করা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এই অবক্ষয়ের চিত্র বর্তমান আছে।

৬) এ সময়পর্বে বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার প্রকরণেও পরিবর্তন ঘটেছে। যাত্রা খোলা মাঠের মুক্ত অঙ্গনে বাণিজ্যিক প্ররোচনায় 'ওয়ান ওয়াল' যাত্রায় রূপান্তরিত হয়েছে। ততদিনে যাত্রার আসর ক্রমেই উঁচু হতে থাকে। আসর ঘিরে লোক বসানো বন্ধ হয়ে যায়। আসরের যাত্রায় অভিনেতাদের ঘিরে যেখানে দর্শক আসন থাকত; অভিনেতারা যখন মঞ্চে আসতেন এ বিষয়ে সতর্ক থাকতেন; এমন ভাবে মঞ্চে দাঁড়াতেন যাতে সব দিক থেকেই দর্শক তাদের মুখের একটা অংশ দেখতে পায়। কোনো ভাবে দর্শকের দিকে যেন পেছন না পড়ে তাও লক্ষ করতে হত; সেভাবে স্বতন্ত্র অ্যাঙ্গেলে দাঁড়াতে হত তাদেরকে। সেই বিশেষ সংলাপ ও বাচনভঙ্গিও এখনকার যাত্রার অভিনয়ে অবশিষ্ট থাকেনি। দর্শকও যাত্রাপালার বিষয়বস্তুর পরিবর্তে যাত্রা প্রদর্শনীর অনাবশ্যক ঢংয়ে মোহিত হয়। সংলাপের পরিমিতি বোধের স্থানে স্বগতোক্তি, দীর্ঘ ভাষণ স্থান করে নেয়। যাত্রার মূল বিষয়ের চেয়ে আনুষঙ্গিক অংশগুলোই অধিক স্থান দখল করে।

উপসংহার

১.

অভিনয় নৃত্যগীতাদি সমন্বিত সুকুমার শিল্প হচ্ছে যাত্রাগান। দর্শক শ্রোতা সাধারণের সাংস্কৃতিক মননশীলতা সৃষ্টির মাধ্যম এ শিল্প সুদীর্ঘ কাল ধরে বাংলা সংস্কৃতির অঙ্গরূপে চর্চিত, লালিত এবং প্রচলিত আছে। লৌকিক জীবন চেতনার প্রকাশ ঘটাতে এবং তার সাথে লোকজীবনের নানাবিধ সাংস্কৃতিক বোধকে সম্মিলিত করে এই যাত্রা নামক পতিপাদিত শিল্পটি (Performing art) গড়ে উঠেছে। এর সাথে যুক্ত থেকেছে ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস, পুরাণ নানাবিধ সাংস্কৃতিক দিক। এ অর্থে যাত্রা ও দেশের লোকজ সংস্কৃতির অন্যান্য শাখা বা ধারার সাথে একটি শক্তিশালী তথা উন্নত ধারা বা শাখা হিসেবে শিল্পীত রূপ লাভ করেছে।

বাংলা যাত্রার বিবর্তনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট, নিশ্চিত, স্পষ্ট ধারাবাহিক পরিবর্তনের রূপরেখা নির্ণয় করা অসম্ভব। কারণ যাত্রার আদি রূপটি ঠিক কী ছিল সেই নিদর্শন কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। যাত্রার সবচেয়ে প্রাচীন অভিনয়ের উল্লেখ হিসেবে চৈতন্যদেবের সপার্ষদ কৃষ্ণযাত্রার অভিনয় সম্বন্ধে বৈষ্ণব পদকর্তা ও চৈতন্য চরিতকারদের সোৎসাহ বিবরণ রয়েছে। চৈতন্যদেবের অনুরাগের উপলক্ষ ছিল এর বিষয়বস্তু –– শ্রীকৃষ্ণের জীবন তথা কৃষ্ণপ্রেম। কৃষ্ণের এক অবতার হিসেবে চৈতন্যদেবের কৃষ্ণভাগবত বা অন্য গ্রন্থের তুলনায় কৃষ্ণযাত্রায় সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে অন্যতর একটি দিক রয়েছে। নগর সংকীর্তনের মত যাত্রাও জনসংযোগের উপযুক্ত এক মাধ্যম। কৃষ্ণনামের প্রচারের পক্ষে চৈতন্যদেবের *রুক্মিণীহরণ* পালায় অভিনয় তার অনুসারীদের মধ্যেও ব্যাপক অনুকরণ ঘটায়। চৈতন্যপরবর্তী সময়ে কৃষ্ণযাত্রার জনপ্রিয় হয়ে ওঠা তারই প্রমাণ। ভক্তি আন্দোলনের সময় থেকে এর সূত্রপাত বলা যায়; ভক্তের দল নেচে গেয়ে সারিবদ্ধ আন্দোলনে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছে। মন্দিরে মন্দিরে নাট্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবতার বাণী মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে। যাত্রার সূত্রপাত সঠিক কোথা থেকে ও কবে নাগাদ হয়েছিল তা নিশ্চিত বলা না গেলেও ভক্তি আন্দোলনের এই নাচ গান সমন্বয়ে ভক্তির প্রসার ঘটেছে তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। প্রকরণের বিচারে নাচ গানের এই অনন্য সমাবেশ থেকে ধীরে ধীরে যাত্রা যে আঙ্গিক হিসেবে রূপ নিয়েছে তাতে কোনো মতভেদ নেই।

'যাত্রা' অর্থে সংঘবদ্ধ বিচরণ; তার সঙ্গে গানের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে; যাত্রাগান নামটিই তার সাক্ষ্য। এর উদ্ভবের সঠিক দিনকাল নিয়ে গবেষকদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত মতের পরিচয় রয়েছে। তবে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বর্ণনা থেকেই যে পালাগানের সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে মতান্তর নেই। পরবর্তীতে সৃষ্ট বাংলা যাত্রার ক্ষেত্রে এই প্রকরণ-সমূহ আরো বৃহত্তর পরিসরে বিকশিত হয়েছে। কৃষ্ণযাত্রা থেকে উদ্ভূত যাত্রা নামে পরিচিত বাংলা যাত্রায় সৌখীন

যাত্রাদলের প্রবর্তনতায় পথ চলা শুরু হয়। যাত্রাদলের পেশাদার হয়ে ওঠা সেই অভিযাত্রায় আরেক ধাপ। পেশাদারিত্বের প্রয়োজনে মালিক ও অভিনেতা যন্ত্রীশিল্পীদের মধ্যে ভিন্ন অর্থনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তখনও গ্রামীণ বিত্তশালী, জমিদারসহ গ্রামবাসীর আর্থিক অংশগ্রহণে যাত্রাপালার বায়না হত। এক একটা যাত্রাদল লোকের চাহিদা ও বোঝার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাজগোজ, সিচুয়েশন, সংলাপের ধরন বদলেছে। গানে কবিতায় গল্প বলার রীতি পরিচিত ছিল যাত্রা নামে; ঝুমুর বা অন্য দ্বৈতকণ্ঠের গানের পাশাপাশি 'পাঞ্চালি'র গীতি আলেখ্যে একক চরিত্র নিজের মুখে গানে গল্পে স্বগতোক্তির ব্যবহার করত। তা ছাড়াও ধার্মিক বিষয়ে কোনো গায়ক 'কথকতা' করতেন। তার পাশে কীর্তনের ক্ষেত্রে গানই মুখ্য হত; যেখানে যাত্রার সঙ্গে প্রচলিত কবিগানেরই সাদৃশ্য ছিল বেশি।

যাত্রা কখনও কখনও যাত্রাগান নামে উল্লিখিত হয়; প্রকৃত যাত্রা সমস্ত লোকগান থেকে স্বতন্ত্র। অন্যান্য লোকগানে সমাজের নিচের স্তর থেকে অভিনেতা যুক্ত হলেও যাত্রাতেই সমাজের সব স্তর থেকেই অভিনেতা অভিনেত্রীরা এসে যুক্ত হয়; সমস্ত জাতপাত ধর্ম মিলে মিশে একাকার হয়ে যাওয়া যাত্রার ক্ষেত্রে অন্যতর আঙ্গিক। গ্রামবাংলায় যাত্রার বিপুল জনপ্রিয়তা তারই প্রমাণ; চিরস্থায়ী বন্দোবস্থের আগের সময়ে যেখানে পুরাণের কাহিনির আধ্যাত্মিক টানকে অক্ষুণ্ন রেখে পালা রচিত হত। নব্য জমিদার তালুকদারের বিত্তের প্রতাপে যাত্রায় জৌলুষ যুক্ত হতে থাকে। গ্রামীণ বিনোদনের থেকে শহুরে বিনোদনে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এই পর্বান্তর শুরু। আসরের যাত্রার থেকে রঙ্গমঞ্চের যাত্রায় পরিবর্তিত হয়। মুক্তঅঙ্গন থেকে রঙ্গমঞ্চে স্থানান্তরিত হওয়ায় থিয়েটারের নিয়ম কানুন এসে ভর করে। প্রবেশ, প্রস্থান, উইংস, আলোকসম্পাত, মাইক্রোফোন, টেপরেকর্ডারে সঙ্গীতের আবহ সবই। যাত্রার ক্ষেত্রে বলা হত 'যাত্রা শোনা' যেখানে থিয়েটারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল 'দেখা'। যাত্রার আসর ছিল তক্তপোশ দিয়ে দুই আড়াই হাত উঁচু; হ্যাজাকের আলো, সাজঘর আসর থেকে বেশ দূরে। অভিনেতাদের ভরাট কণ্ঠ, সংলাপ বলার ক্ষেত্রে উঁচু পর্দায় বাঁধা স্বরলোপের পদ্ধতি, বিভিন্ন সুর তাল লয় সমন্বিত বিবেকের উদাত্ত গান, বিবেকের ছুটে এসে গান ধরা ও আসর মাতিয়ে প্রস্থান করা, পালা শুরুর র আগের দু প্রস্থ কনসার্ট, তার অনুবর্তী সখীর নাচ ছিল যাত্রার বৈশিষ্ট্য। যাত্রা অভিনেতার চলা, দাঁড়ানো, বসা, কথা বলা, মেকআপ সমস্তই জীবনোপম হওয়ার চেয়ে বড় মাপে হতো। যাত্রাশিল্পীরা নাম মাত্র মাস মাইনে পেত; অভিনেতাদের অভিজ্ঞ কেউ অধিকারী হত; হ্যাজাক, হারিকেন, লণ্ঠন কয়েকটা জোগাড় করে কারো মাঠ গোছের স্থান বেছে নিয়ে যাত্রা হত; পুরনো পোশাক-আশাক নিয়ে কাজ সারত; যাত্রাদলে গদির মালিক বলে বিনিয়োগকারী নেই। 'পালা'র সময়ে ধরা পেলার থালায় পয়সা থেকেই উপার্জন হত। দর্শকরা যেমন অভিনেতাদের লক্ষ্য করেন, অভিনেতারাও দর্শকদের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করে বুঝে নিতেন নিজের অভিনয়ের পর্যায়কে; তার অনুসারে চড়া বা নিচু তারে অভিনয় বাঁধতেন। দর্শকের সঙ্গে অভিনেতার

নৈকট্য, দর্শকের মাঝে দাঁড়িয়ে অভিনয় এই পরস্পর আত্মীয়তার অনুভব যাত্রাগানের মূল কথা। পালাকারকেও দৃশ্যের দৈর্ঘ্য ও অঙ্কবিভাগ নিয়ে সতর্ক থাকতে হয় না; স্বাধীনভাবে দৃশ্যের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করেন; যাত্রায় দৃশ্য পরিবর্তন প্রবেশ-প্রস্থান বজায় রাখার বালাই নেই। চরিত্র হত সহজ সরল, চরিত্রে দ্বন্দ্ব থাকলে তাও সরল ধরনেই। ফলে কনসার্ট শেষে সখীর নাচ, আসর বন্দনা তথা মহড়া গানের পরে পালা ধরে রাখতে হত মূল চরিত্রের অভিনেতাদেরকেই; অভিনয়ের গতি ঢিমে তালে হয়ে পড়লে বিবেকের গানে তাকে জাগিয়ে তোলা হতো। সবসময় যাত্রা পালার স্ক্রিপ্ট বা 'সাট' থেকে পার্ট বলছেন এমন নয়; পরিস্থিতি পরিবেশ অনুযায়ী কথার পিঠে কথা বানিয়ে, পদ্যের সঙ্গে পদ্য, ছন্দের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে অভিনয় করতে হতো। কোনো চরিত্রের অভিনেতার অন্তর্ধান বা অসুস্থতার প্রেক্ষিতে অন্য অভিনেতাকে তাৎক্ষণিক ভাবে তার ভূমিকায় রূপায়ণ করতে হতো। ফলে পেশাদার যাত্রায় এসে দলগুলোর জনপ্রিয়তা পালাকারের পরেই যাত্রার মূল চরিত্রগুলোর অভিনেতাদের উপরেই নির্ভর করত। ক্রমে দলের মুখ্য অভিনেতারাই যাত্রা অভিনয়ের নিয়ন্ত্রকে পরিণত হন। এভাবে যাত্রায় তারকা অভিনেতার একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই পথ ধরেই গ্ল্যামারপূর্ণ অভিনেতাদের আমদানি করতে হয়। দলের অধিকারী, প্রশিক্ষক, ম্যানেজার মিলে পালা নির্বাচন, রচনার ফরমায়েশ, পালাকারের সঙ্গে চুক্তিপত্র, অভিজ্ঞ অভিনেতা অভিনেত্রীদের চুক্তিবদ্ধ করা থেকে নায়েক পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করে বায়না নেওয়া পর্যন্ত প্রদর্শনীর জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সরবরাহ করতেন। আর্থিকভাবে লাভবান হবার জন্য কখনো একই যাত্রা একাধিক স্থানে একই রাত্রে অভিনয় করতে হতো। ফলে পেশাদার যাত্রা প্রতিযোগিতামূলকভাবে তার বিষয়বস্তুতে যতটা যুগোপযোগী জনপ্রিয়তর করেছে তার চেয়েও পালার আঙ্গিকে বড় মাপের পরিবর্তন নিয়ে আসে। কনসার্ট, আসর বন্দনা প্রভৃতি পরিস্থিতি অনুযায়ী গ্রহণ বর্জন করে অভিনয়ের সময় সংক্ষেপ করা হল। অভিনেতা, পালাকার, গীতিকার, সুরকার হিসেবে দক্ষ কাউকে চুক্তিবদ্ধ করা হয়। মেকআপ, পোশাকে জৌলুষ যুক্ত হয়ে যাত্রা নাটকীয়তা সৃষ্টি করল। পেশাদার যাত্রায় কত বেশি নতুনত্ব, কত জাঁকজমক আনা যায় তার প্রতিযোগিতা হতো। এই চমক দর্শক সাধারণের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে দেয় অভিনেতার; এরই ধারায় চরিত্র বা পালা নির্বাচনে অতিনাটকীয়তার আমদানি ঘটে। পুরনো সংলাপহীন গাননির্ভর বিবেক চরিত্র লোপ পায়, এক সময় বিদেহী চরিত্র হিসেবে যাত্রা শুরু করে স্বতন্ত্র চরিত্র হিসেবেই বিবেক দর্শকের মন জয় করে নিয়েছিল। সত্তরের দশকের পরে সুর তাল লয় সম্বলিত অগণিত গান যেমন যাত্রা থেকে লোপ পায়; সেই সঙ্গে এসব গানের বড় অংশের ধারক বিবেক চরিত্রও হারিয়ে যায়। এই সূত্রে যাত্রার জনপ্রিয়তা হ্রাস ও অর্বাচীন কালে যুক্ত হওয়া অন্যান্য উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটে।

২.

বাংলা যাত্রার উদ্ভবকাল বিষয়ে গবেষকদের মতান্তর থাকলেও যাত্রার উদ্ভবের উৎস হিসেবে প্রধানত দুটি মত পাওয়া যায়। একদল যাত্রা দেবদেবীর মহিমা কীর্তন-জাত বলে মন্তব্য করেন। এর বিপরীতে অন্যদল বিভিন্ন পুরাণ ভাগবত এর কথকতার পাঁচালী গান থেকে যাত্রাগানের উদ্ভব হয় বলে মনে করেন। উভয় মতের মধ্যেই গ্রামীণ শ্রোতার আসরের উপস্থিতিতে এই পরিবেশনার অস্তিত্ব নিহিত। লোকায়ত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এ অভিনয় আঙ্গিকটিতে উভয় ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্যই বিকশিত হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে যাত্রার উদ্ভব সম্পর্কে এ সমস্ত অনুমান সৃষ্টি হয়। যাত্রার আঙ্গিকে যেমন দেবলীলাবন্দনা, তেমনি পাঁচালির কলেবরে কাহিনি বয়ানের চিত্রও বিদ্যমান। যাত্রার পরিবর্তন মূল কাঠামোর দিক থেকে কতখানি তা নিশ্চিত নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে কিছুটা আঁচ করা যায়। কীভাবে কবে পাল্টাল তা সঠিকভাবে নির্দেশ করা দুরূহ। যাত্রার আদি রূপটি নিশ্চিত করে জানা যায় না। চৈতন্য যুগের অব্যবহিত পরে একটা নির্দিষ্ট রূপ গড়ে ওঠে। যে যাত্রা মূলত মধ্যযুগের জমিদার অভিজাত শাসিত গ্রাম সমাজের বিনোদন তা আবার নানা মূল্যবোধের সঞ্চারক।

বাংলা যাত্রার উদ্ভবের কাল প্রাচীন যুগ –– এই বিতর্কে প্রাচীনকালে যাত্রার অস্তিত্বের সঙ্গে বাংলা ভাষার উদ্ভবের সময়টি সাংঘর্ষিক। আবার ষোড়শ শতক থেকে চৈতন্যদেবের অভিনয়ে অংশ গ্রহণের কাহিনি তথ্য বিচ্ছিন্ন, একক দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত। তাই ষোড়শ শতক থেকে বাংলা যাত্রার উদ্ভব –– এমন মতও গ্রহণযোগ্য নয়। বরং বিধিবদ্ধ ইতিহাস রচনার মত নিদর্শন আঠারো শতকের গোড়া থেকে মেলে –– যার ক্ষেত্রে কোনো ছেদ ঘটেনি বলা যায়। আমাদের উদ্দিষ্ট বিবর্তন সন্ধানের জন্য ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অনিবার্য প্রাকশর্ত। তার অনুসারে তথ্য প্রমাণ সাপেক্ষে শিশুরাম অধিকারীকে প্রথম বাংলা যাত্রাকার হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আঠারো ও উনিশ শতকের যাত্রার বিবর্তনমূলক ইতিহাসের সূচনা ওখান থেকেই।

৩.

আঠারো শতকের প্রথমপাদ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দীর্ঘ কয়েক শতকের সময় পরিক্রমায় যাত্রাকে বহু উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সময়ের ধারাবাহিকতায় যাত্রায় আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যেমন আমূল পরিবর্তন ঘটে তেমনি আধুনিকায়ন, নগরায়ন, মন্বন্তর, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যাত্রা নতুন কালপর্বে এসে উপনীত হয়। সেই সঙ্গে প্রসেনিয়াম নাটক, চলচ্চিত্র, বেতার, টেলিভিশন, ইন্টারনেট প্রভৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে যাত্রাকে অনেক কিছুর সঙ্গে সংযোজন-বিয়োজন করে চলতে হয়। অন্যান্য শিল্পাঙ্গিক যেমন যাত্রার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে, তেমনি যাত্রাও অপরাপর শিল্পরীতির কৌশলকে আত্মস্থ করে নিয়েছে। সময়ের পালাবদলে জনরুচির পরিবর্তন ও দর্শকের চাহিদারও রূপান্তর ঘটে; বৈদ্যুতিক আলো ও মাইকের ব্যবহার যাত্রার গুণগত পরিবর্তন আনে। তার সঙ্গে অভিনেয় পরিসরেরও সংকোচন

ঘটে। যাত্রার টেক্সটের প্রবণতার বদল, পৌরাণিকতা ছেড়ে ইহলৌকিকতার আশ্রয় এবং এর গীতময়তা থেকে কাহিনি নির্ভরতায় ঝুঁকে পড়া লক্ষণীয়। ধর্মীয় ভক্তিরসের স্থান নিয়েছে পার্থিব বোধ।

৪.

ধর্মনিরপেক্ষ যাত্রা উনিশ শতকে এসে বিভিন্ন ধর্মীয় পুরুষ, ঋষি, অবতার, কিংবদন্তি ব্যক্তিদেরকে ঘিরে রচিত হয়। ফলে ধর্মসম্পৃক্ত নয়, বরং রোমান্টিক ফোকলোরের অবলম্বনে পরিবেশনা গড়ে ওঠে। তার মধ্যে ঝুমুর যাত্রা, ঢঙ যাত্রা, গম্ভীরা যাত্রা[৫২০]উল্লেখযোগ্য। এই পর্বান্তরের সূচনার পেছনে ঔপনিবেশিক শাসকদের আবির্ভাব এবং মুদ্রণ সংস্কৃতি বা ছাপাখানার প্রবর্তনকে উল্লেখ করা যেতে পারে। সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে আধুনিকতার অভিঘাত যে পরিবর্তন নিয়ে আসে এই ধর্মনিরপেক্ষ যাত্রার উদ্ভব তারই সমগোত্রীয়। পরবর্তী সময়ে যাত্রার কাহিনিতে ধর্মাশ্রিত বিষয় ব্যবহৃত হয় কিন্তু যাত্রা আর আগের মতো ধর্মানুষ্ঠান ও কৃত্য সংশ্লিষ্ট থাকে নি। অনেকেই যাত্রার এই বিভাজনকে 'প্রাচীন' যাত্রা এবং 'নূতন' যাত্রা অভিধায় প্রত্যক্ষ করেছেন।

৫.

বিশ শতকের প্রথমার্ধে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল মোচনে বাংলা যাত্রাপালায় স্বাদেশিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু জনচিত্তে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে থাকে। এ সময় যাত্রা তার শ্রেষ্ঠ পালাকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী ও দলের পরিচর্যা অর্জন করে। নতুন যাত্রা নামে পরিচিত বাংলা যাত্রার বিকাশের শিখর ছিল এই পর্বটি। বাংলা মুদ্রণ সংস্কৃতির বিকাশ দর্শক শ্রোতার পঠন-পাঠন ও জানাশোনার পরিধি বাড়িয়ে দেয়। কলকাতা নগরীর পত্তন ও এর বিস্তার যাত্রাপালার ধারাটিকে উনিশ শতকের সংস্কৃতিতে নির্দিষ্ট ও অনস্বীকার্য স্থান দখল করতে সহায় হয়। নাগরিক বিদগ্ধ জনদের লালিত রুচিবান, 'উচ্চ' কৃষ্টির পাশাপাশি এই গ্রামীণ উৎসের বিনোদন শিল্প মাধ্যমটি গড়ে উঠতে সক্ষম হয়। জনপ্রিয়তার দরুণ সংস্কৃতির অন্যান্য ধারার আশেপাশে যাত্রারও ঠাঁই হয়। দর্শক ও পরিবেশনা উভয় দিক বিচারেই – কবিগান, আখড়াই, খেউর, কবির লড়াই এর স্রোতটি এসে যাত্রাপালার ধারায় মিশে যায়। আধুনিকতার নিরিখে মান উত্তীর্ণ হতে না পারলেও জনচিত্ত হরণে যাত্রা বিফল হয়নি। বরং দেখা যায়, যে কোনো ধরনের টেক্সট বা পাঠখণ্ড অথবা কাহিনি যাত্রার কাঠামোয় পরিবেশিত হয়। সমসময়ে আলোচিত ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠা যে কোনো বিষয় নিয়ে যাত্রা রচিত ও পরিবেশিত হয়। কোনো জনপ্রিয় যাত্রায় রূপ পায় বিখ্যাত উপন্যাস, আবার নাটককে যাত্রায় রূপান্তর করা হয়। গান ও নৃত্যের পরিসর ছেড়ে দিয়ে যাত্রায় কাহিনি ও অভিনয়ের খ্যাতি ইতিহাস রচনা করে। আবার যাত্রা পালা মাধ্যমটির অভিনয়ের নমনীয়তা, আঙ্গিক হিসেবে এর সব রকমের ধারণকে সম্ভব করে। যাত্রার প্রাণশক্তি দর্শকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ। দর্শকের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে

[৫২০] *Acinpakhi Infinity : Indigenious Theatre of Bangladesh,* University Press Limited, Bangladesh, First publised 2000, P. 252, 240, 282, 302

যাত্রাশিল্পীকে তার অভিনয় করতে হতো। প্রয়োজনে পরিস্থিতি অনুযায়ী সংলাপসহ নাট্য পদক্ষেপও তাৎক্ষণিক উদ্ভাবন করতে হতো। মুহূর্তের সৃজনশীলতায় কখনো কখনো পালার পাঠও বদলে যেত। নির্ধারিত অভিনেতার অনুপস্থিতিতে যে কোনো সময় অন্য অভিনেতাকে মঞ্চে নামানো হতো। সাবলীলভাবে তারা উতরে যেতেন মহড়ায় শোনা স্মৃতিধার্য 'পার্ট'কে ভরসা করে। প্রম্পটারের বদৌলতে পরিবেশিত হত অনন্য জীবন্ত পরিবেশনাগুলো। কোনো পালা, পালাকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, যাত্রাদলের খ্যাতি দূর দূরান্ত থেকে দর্শককে টেনে আনতো যাত্রার পরিবেশনার স্থলে। ক্রমে ক্রমে কলকাতার চিৎপুর যাত্রাশিল্পের চর্চার ঠিকানা হয়ে ওঠে। মৌসুমের সময় যাত্রাপালার কলাকুশলী, মালিক, অধিকারী, 'নায়েক' পার্টিতে গমগম করতো এই চিৎপুর। বায়না নিয়ে যাত্রাদলগুলো এক এক অঞ্চলে গিয়ে পুরো মৌসুমটা কাঁপিয়ে দিত। যাত্রার পরিবেশনা থিয়েটার কোম্পানি বা রেপার্টরির ধরনে প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক শক্তিশালী অভিনেতা-অভিনেত্রীর পাশাপাশি জীবনধারণের তাগিদে সাধারণ কর্মহীন মানুষও যাত্রায় এসে যুক্ত হত। ফলে সামগ্রিক বিচারে এ সময় যাত্রার বিস্তার ঘটে। এই পর্বে থিয়েট্রিক্যাল যাত্রার উদ্ভব হওয়া পর্যন্ত যাত্রার নিরবিচ্ছিন্ন বিকাশ ঘটে। বাংলা যাত্রার বিকাশে এই সময়টা ছিল সবচেয়ে তুঙ্গ মুহূর্ত।

বিংশ শতাব্দীতে এসেই মূলত শহুরে থিয়েটারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রতিক্রিয়ায় যাত্রার বিষয় ও আঙ্গিকে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউ থিয়েটারের পাশাপাশি বাংলা যাত্রাকেও স্পর্শ করে। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই লোকনাট্য স্বদেশি যাত্রার আদর্শ প্রচারের বাহক হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা কেন্দ্রিক ঘটনা যাত্রার বিষয়বস্তু হতে আরম্ভ করে। এমনকি ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনীভিত্তিক পালাও বিংশ শতাব্দীতে যাত্রায় নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়। পাশাপাশি এ সময় আঙ্গিক ও প্রায়োগিক দিক থেকে যাত্রা আরও বেশি পরিমার্জিত ও নাগরিক হয়ে ওঠে। এ সময় থেকেই যাত্রা অভিনীত হতে থাকে প্রসেনিয়াম মঞ্চে, থিয়েটারের মতো বদ্ধ প্রেক্ষাগৃহে। আধুনিক যাত্রায় ব্যবহৃত হয় বৈদ্যুতিক আলোর নিয়ন্ত্রণ, গান এবং নাচের অংশ নামমাত্র থাকে; প্রাধান্য দেখা দেয় নাটকীয় সংলাপের। স্বাদেশিকতার প্রতিষ্ঠা বিশ শতকের যাত্রায় প্রাণ সঞ্চার করে। এ সময় বিনোদনের পাশাপাশি সামাজিক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও যাত্রা জনপ্রিয় হয়। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে দেশভাগ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক সংকটের মত বিষয়ও জাতীয়তা বোধের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লেষণে ও বিবেচনায় যাত্রার পরিসরে ঠাঁই করে নেয়।

বিশ শতকের যাত্রা নানান সংযোজন বিয়োজনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। মাথার ওপর সামিয়ানা, সামনে অগুণিত শ্রোতা-দর্শক, মাঝখানে পথ প্রাসাদের বিভাগ কয়েকটা তক্তপোষ বিছানো। আড়ালহীন যাত্রার এই আসরে দৃশ্যান্তর বদলে যায় রাজ-দরবার থেকে পর্ণ-কুটির, জন-বসতি থেকে ভয়াল অরণ্য। কনসার্টের সুরে সুরে বদল

হয়ে যায় চরিত্র – বদলে যায় সংলাপ – বদল হয়ে যায় গান। এতদিন উন্মুক্ত আসরে যা ছিল শুধু অভিনয়ের চমক, তা সরিয়ে দিয়ে যুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্য, অত্যাচার আর বম্বিং, তুষারপাত, ফাঁসির মঞ্চ, প্রজ্বলন্ত মানুষ, খোলা আসরে জিপগাড়ি, দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় ইত্যাদি বছরে বছরে নতুন বিস্ময়ের পথেই পালাকারদের স্বতন্ত্র স্বভাব হারিয়ে যায় –– স্খলিত হয় পালা নাটকের বৈশিষ্ট্য। অভিনেতারা খেই হারিয়ে ফেলেন এই চমকের দৌরাত্ম্যে। দেশবিভাগ পরবর্তী পর্যায়ে নানান পরিবর্তনকে অঙ্গীকার ও স্বীকরণ করে বিকশিত হতে থাকে বাংলা যাত্রা।

৬.

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশবিভাগ জনিত কারণে যাত্রা শিল্পের ধারা ও প্রবাহ অনেকটাই বিঘ্নিত ও ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। স্বাভাবিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতাকে কেন্দ্র করে যেমন একটা নব্যযাত্রা গড়ে ওঠে, পাশাপাশি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকেন্দ্রিক যাত্রায় একলা পথচলা শুরু হয়। যাত্রার ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবর্তনের স্বরূপ অন্বেষায় এ দুটি ধারা প্রবহমান হয় –– যার তাৎপর্য বিবেচনার উপযুক্ত। একই শিল্পধারা দুটি আলাদা রাষ্ট্রীয়, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেও, সময়ের ধারাবাহিকতায় শৈল্পিক ব্যবধান উভয়ের আদানপ্রদানে অন্তরায় হয়নি। ফলে যাত্রাচর্চার ক্ষেত্রে দ্বিজাতিতত্ত্বকেন্দ্রিক দেশভাগ পূর্ববাংলাকে যাত্রার বহমান ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব হওয়া সত্ত্বেও দুই দেশের মানুষের মধ্যে আদান-প্রদান, যাতায়াত ও সাংস্কৃতিক বিনিময় অটুট ছিল। কোনো কোনো সময়ে সেক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলেও পূর্ব-বাংলার যাত্রা কলকাতা-কেন্দ্রিক যাত্রাচর্চার প্রভাব বলয়ের বাইরে যায়নি। ফলে কলকাতার যা কিছু অর্জন, নতুন উদ্ভাবন, সাফল্য ও নিরীক্ষা পূর্ব-বাংলার যাত্রা চর্চাকারীদের কাছে অবিদিত ছিল না। বিশেষ করে যাত্রা পালার ক্ষেত্রে কলকাতার পালাকারদের পালাই বেশির ভাগ অভিনীত হয়েছে। এখন পর্যন্ত সেই ধারা বর্তমান। ১৯৪৭-৭১ কালপর্বে ব্রজেন্দ্রকুমার দে ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, শম্ভুনাথ বাগ প্রমুখ এই যাত্রার ক্ষেত্রে নতুন ধারার প্রবর্তন ও প্রযোজনা রীতিতে নতুনত্ব আনয়ন করেন। বাংলা যাত্রার পালাবদলে তাঁদের লেখনি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাঁদের মধ্যে ব্রজেন দে একাই কাল্পনিক, সামাজিক, লোককাহিনিভিত্তিক এবং জীবনীমূলক পালা রচনার ধারা প্রবর্তন করেন। রাজনীতি ও গণজাগরণের চিন্তাকে ভিন্নমাত্রায় উপস্থাপন করেন উৎপল দত্ত ও শম্ভুনাথ বাগ। যদিও জীবনীপালা রচনায় শম্ভুনাথের দক্ষতা প্রশংসনীয়। ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পরিবার-সমাজ তথা স্বদেশের কল্যাণ কামনায় লিখে গেছেন একের পর এক জনপ্রিয় যাত্রা। এই চারজন প্রধান পালাকার ছাড়াও অনেকের পালাই পূর্ব-বাংলায় অভিনীত ও পরিবেশিত হয়েছে। তবে পূর্ব-বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা ও অভিনেতাদের প্রতিভা তথা যোগ্যতার তারতম্য নতুনভাবে উপস্থাপন করেছে। ফলে কলকাতার যাত্রা, ঢাকার যাত্রার ওপর প্রভাবের স্তরে থাকলেও এখানকার সদ্য-স্বাধীন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের দ্রুত নগরায়নের

প্রেক্ষাপটে নিজস্ব দর্শকের উপযোগী করে প্রযোজনা করতে হয়েছে। ফলে আমরা লক্ষ করি পুরাণভিত্তিক দেবদেবী কেন্দ্রিক ভক্তিরসাশ্রিত পালার পরিবর্তে আধুনিক যুগের সমাজের সামনে আদর্শ হতে পারে, যেমন: মধুসূদন, নজরুল প্রমুখ চরিত্র অবলম্বনে অর্থাৎ যারা জনচিত্তে কৌতূহল সৃষ্টি করতে পারে –– এমন জীবনীভিত্তিক পালা প্রচুর পরিমাণে অভিনীত হয়েছে। একই সময়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ঘিরে সামাজিক-রাজনৈতিক জাগরণও শুরু হয়। তার আগ পর্যন্ত যাত্রা নির্বাচনের ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীদের ধর্মবিশ্বাসকে গুরুত্ব দিয়ে আরবি-ফারসি ঐতিহ্যের ইসলামী ঐতিহ্য বলে পরিচিত বিষয়বস্তুকে যাত্রার টেক্সট হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। এতে করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভাবাদর্শের প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থনও লক্ষ্য করা যায়। যতদিন পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলন স্পষ্ট এবং প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে – ততদিন এই পাকিস্তানবাদী আদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল যাত্রাপালার অভিনয় দেখা গেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে যাত্রা পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের সামাজিক অনাচার-অবিচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে অনেক বেশি সোচ্চার হয়ে ওঠে। তা আর নিছক বিনোদন মাধ্যম হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে না। বাংলাদেশ পর্বে এসে যাত্রা তার আঙ্গিকে সরলীকৃত, তরলায়িত হওয়া সত্ত্বেও এক সেন্সরতুল্য নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়ে। কাহিনি, বিষয়বস্তু, গান ও সংলাপে যাত্রাপালা দিন দিন উৎকর্ষতা হারায়। বিশ শতকের সত্তরের দশকে আর্থিক হাতছানিতে নিজের শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয় যাত্রা। তখন গ্রাম সমাজের সাংস্কৃতিক ভাঙন ঘটে। এ সময় পেশাদারি থিয়েটার ও বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র যাত্রার ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার লাভ করে। এরই ফলে যাত্রা লোকহিতৈষী তথা মূল্যবোধ নির্মাণকারী ভূমিকার পরিবর্তে অগ্রহণযোগ্য নানা অনুষঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় প্রকারান্তরে পেশাদারী ও বাণিজ্যিক সিনেমার নকলে পরিণত হয়।

৬.

শুধু পালার বিষয়বস্তুর রূপান্তরই নয় –– প্রয়োগ রীতিতেও দৃশ্যমান হয়েছে নানা যুগোচিত পরিবর্তন। আগে একটি পালায় বিশ থেকে পঁচিশটি গান থাকতো। রেডিও-সিনেমার সহজ শ্রব্যতার কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে গানের সংখ্যা কমতে শুরু করে। এ সময় দেববালাগণ, রঙ্গবালাগণ, বনবালাগণ, ভিক্ষুকরা,সৈনিকগণ, সখিগন প্রভৃতি ‘গণের’ গানের প্রয়োগ প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। এছাড়া যাত্রায় ঘেষেড়া-ঘেষেরাণী, মেথর-মেথরাণী, ঝাড়ুদার,-ঝাড়ুদারণীর আদি রসাত্মক গানের প্রয়োগও বিলুপ্ত হতে লাগল। এমনকি ধীরে ধীরে বিবেকও হারিয়ে যেতে লাগল। তখন একটি পালায় পাঁচ-সাতখানা গান থাকে মাত্র।

যাত্রায় আলোর ব্যবহারেও এসেছে ভিন্নতা। আসরের চারকোণায় হ্যাজাক ঝুলিয়ে দেয়া হতো। সে আলোয় শুধু দেখা যেত। সময়ের ব্যবধানে দিন থেকে যখন রাতে যাত্রা অভিনীত হতে শুরু করল তখন উজ্জ্বল আলোর

প্রয়োজন বাড়তে লাগল। একালে ইলেকট্রিক আলোতে যাত্রা আলোকিত হতে থাকে। বিভিন্ন ধরনের রঙিন আলো, শ্যাডো, মেঘ, আগুন, সবই এখন আলোর কারসাজিতে দেখানো সম্ভব। এসব দেখে দর্শকও আনন্দিত হতো। ফলে চার-পাঁচ হাজার দর্শকের স্থানে এখন যাত্রা আসরে উপস্থিত থাকে বিশ-পঁচিশ হাজার দর্শক। এতো দর্শকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন খালি গলায় অসম্ভব, তাই বিদ্যুতের কল্যাণে মাইক্রোফোনের ব্যবহার আরম্ভ হলো।

নানারকম যান্ত্রিক কৌশলের প্রয়োগেও যাত্রার উপস্থাপনায় নতুনত্ব এসেছে। আর্তের চিৎকার, যুদ্ধের দামামা, ঝড়-বৃষ্টি-জলের নাদ, কুচকাওয়াজের শব্দ সবই যান্ত্রিক ধ্বনিতে প্রযুক্ত হচ্ছে। আসরের আলোর সঙ্গে যুক্ত 'ডিমার'-এর প্রয়োগে আগ্নেয়াস্ত্রের নানান কৌশল, রাতের অন্ধকার ও দিনের আলো দৃশ্যমান হয়। আলোক প্রক্ষেপণের জন্য 'লাইটম্যান' থাকে। এসব যুগোচিত পরিবর্তন যাত্রাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। এখন যাত্রা আর অভিনয়-গান নির্ভর নয়। নানাভাবেই যাত্রা দর্শকের মনোরঞ্জন করে যাচ্ছে। এতোসব পরিবর্তনে যাত্রার অভিনয়ে-সংলাপে পরিবর্তন এসেছে। আবেগের নিরন্তর উত্থান পতন যাত্রার সংলাপের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যাত্রার সংলাপের বিশেষ ধরন আছে। যাত্রাকারকে সামষ্টিক কমিউনিকেশনের দিকে খেয়াল রেখে সংলাপ লিখতে হয়। মাইকের ব্যবহারের কারণে সংলাপ প্রক্ষেপণ অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

৭.

যাত্রা বাংলার সুপ্রাচীন কালের লোকজ ও মৌলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। অনেক চড়াই-উৎরাই ও প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করে যাত্রা বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। কালের বিবর্তনে, গ্রহণ বর্জনের ভিতর দিয়ে যাত্রা তার ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। সমকালীন আধুনিকতাকে যথাসম্ভব আত্তীকৃত করে যাত্রা তার স্বতন্ত্র ঐতিহ্যকে লালন করে চলেছে। এ কালে যাত্রার ওপর আরোপিত অশ্লীলতার দায়ভাড় একেবারেই অনভিপ্রেত –– যা শ্রেণি বা ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ সঞ্জাত। গ্ল্যামার, তারকাখ্যাতি, শহুরে আবহাওয়া, উপযুক্ত পালার অভাব, পালা তৈরির ব্যয়বৃদ্ধি, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার দৈন্য, সর্বোপরি নিষেধাজ্ঞা তথা সেন্সরের অস্তিত্ব গ্রামীণ বিনোদন যাত্রার বর্তমানে ম্রিয়মান অবস্থার জন্য দায়ী। কিন্তু ঐতিহ্য সচেতনতা, বিশুদ্ধতা, নৈতিকবোধ এখনো যাত্রা থেকে অপসৃত হয়নি। তবে এই প্রবাহ ফল্গু হয়ে লোকমানসের অন্তরালে হারিয়ে গেলেও কোনো উপযুক্ত পালাকার, পৃষ্ঠপোষক, পরিস্থিতিতে নতুন ভাবে বেঁচে উঠতে পারে। কালচক্রের ঘূর্ণাবর্তে প্রদর্শিত যাত্রা বিতর্কিত হলেও মহাকালের যাত্রাপথে আপন ঐতিহ্যকে ধারণ করে যাত্রা এগিয়ে যাবে –– এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

গ্রন্থপঞ্জি

১. সংগৃহীত যাত্রাপালা

১. অরুণ দাস, *জারজ সন্তান*, রতন বুক হাউস ও নাটক মহল, বাংলাবাজার ঢাকা, প্রকাশকাল উল্লেখ নেই

২. অতুল প্রসাদ শিকদার, *দূর্গা নয় দেবী বা কালো সমাজের কষাঘাত*, আল-আমিন বুক ডিপো, বাংলাবাজার ঢাকা, প্র. প্র. ডিসেম্বর ২০০৯

৩. অনীলকুমার দাস, *কে দেবে কবর*, রতন বুক হাউস ও নাটক মহল, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্র. ১৩৮৫

৪. ঐ, *সোনার সংসার*, রতন বুক হাউস ও নাটকমহল, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্র. প্র. ২০০৩

৫. অরবিন্দ মণ্ডল, *বর্ণালী বর্তিকা*, গাংচিল প্রকাশনী, যশোর ২০১৫

৬. ঐ, *বৌদির ঘরে দাদা কাঁদছে*, প্রকাশক- যুথিকা বিশ্বাস, যশোর, ২০১৫

৭. আবদুল করিম খান, *কাসেম মালা বা মালার প্রেম*, বুক মার্ট, নরসিংদী, প্রকাশকাল উল্লেখ নেই

৮. আবুল কালাম, *গুনাই বিবি*, সালমা বুক ডিপো, বাংলা বাজার, ঢাকা, ৪র্থ প্রকাশ ২০০৮

৯. আবুল কাশেম, *পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ*, বুক স্টল, নরসিংদী, প্রকাশকাল উল্লেখ নেই

১০. আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *ফাঁসির মঞ্চে*, রতন বুক হাউস ও নাটক মহল, বাংলা বাজার ঢাকা, প্রকাশকাল উল্লেখ নেই

১১. আবদুল হাই দুর্বার, *খচ্চর*, সালমা বুক ডিপো, ঐ, প্র. প্র. ২০১১

১২. ঐ, *ময়নার চর*, ঐ, দ্বি. প্রঃ ২০০৯

১৩. আরশাদ আলী, *গৌরী মালা*, নাটক প্রকাশনী, বাংলাবাজার ঢাকা, বরিশাল, প্র. প্র. ১৯৭৩, ন.প্র. ১৯৯৭

১৪. ঐ, *নারীর চক্রান্ত*, ঐ, প্র. প্র. ১৯৮৬, ৪র্থ প্র. ১৯৯৭

১৫. আগন্তুক, *নিহত গোলাপ*, রতন বুক হাউস ও নাটক মহল, বাংলাবাজার ঢাকা, প্রকাশকাল উল্লেখ নেই

১৬. ঐ, *ঘুন ধরা সমাজ*, ঐ

১৭. ঐ, *রতন মঞ্জরী*, সালমা বুক ডিপো, প্র. প্র. ১৯৯৪

১৮. ঐ, *খুনী কে?* , রতন বুক হাউস, বাংলা বাজার ঢাকা, প্র. প্র. ২০০৮

১৯. ঐ, *মোঘল হাটের সন্ধ্যা*, সালমা বুক ডিপো, প্র. প্র.১৯৯৪

২০. ঐ, *বেদের মেয়ে মহুয়া*, মফিজ বুক হাউস, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৪

২১. আব্দুস সামাদ, *অচল পৃথিবী*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০৮

২২. ঐ, *অশ্রু কেন ঝরে*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৩

২৩. ঐ, *অসতী নারী*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০৯

২৪. ঐ, *আমি কেন খুনি*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০৮

২৫. ঐ, *এ কালের মীরজাফর*, সালমা বুক ডিপো, ঢাকা, আগস্ট ১৯৯৭

২৬. ঐ, *এ সমাজ ভাঙল যারা*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০৩

২৭. ঐ, *একাত্তরের জল্লাদ*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৬

২৮. ঐ, *এর নাম সমাজ*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮

২৯. ঐ, *কালো টাকার মানুষ*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৫

৩০. ঐ, *খুনি*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৫

৩১. ঐ, *গরিব কেন কাঁদে*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০৫

৩২. ঐ, *গণ হত্যার কসাই*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৬

৩৩. ঐ, *ঘুমন্তপৃথিবী*, সালমা বুক ডিপো, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৩

৩৪. ঐ, *জীবন নিয়ে খেলা*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০২

৩৫. ঐ, *দুই দুসমন*, সালমা বুক ডিপো, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৬

৩৬. ঐ, *ধনীর দুনিয়া*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০৩

৩৭. ঐ, *পতিতার সংসার*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০৮

৩৮. ঐ, *বস্তি থেকে প্রাসাদ*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০৯

৩৯. ঐ, *বাঙ্গালী আজও কাঁদে*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৬

৪০. ঐ, *বাইশ গাঁয়ের মোড়ল*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭

৪১. ঐ, *বাঙালীর আর্তনাদ*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭

৪২. ঐ, *বিজয় বাঙ্গালী*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭

৪৩. ঐ, *বীর বাঙ্গালী*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৬

৪৪. ঐ, *বেকার কেন কাঁদে*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০৩

৪৫. ঐ, *বেকারের আর্তনাদ*, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

৪৬. ঐ, *ভাঙ্গে নদী কান্দে মানুষ*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০১

৪৭. ঐ, *ভুলের প্রায়শ্চিত্ত*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯

৪৮. ঐ, *মা কেন কলঙ্কিনী*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০৮

৪৯. ঐ, *মানুষ কেন কাঁদে*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৩

৫০. ঐ, *মানুষ নয় পশু*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৬

৫১. ঐ, *মুক্তিযোদ্ধার কেচ্‌কামাইর*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৫

৫২. ঐ, *রক্তে রক্তাক্ত বাংলা*, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

৫৩. ঐ, *রক্তে রাঙা রাজপথ*, সালমা বুক ডিপো, বাঙলা বাজার, ঢাকা, প্র.প্র.ডিসেম্বর

৫৪. ঐ, *রক্তের বন্যা*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮

৫৫. ঐ, *রক্তে রোয়া বাংলা* , ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮

৫৬. ঐ, *রক্ত নদী ৯ মাস* , ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

৫৭. ঐ, *রক্তের মিন্দি বা দস্যু পাঞ্জা*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০৩

৫৮. ঐ, *যুগে যুগে চামচা*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭

৫৯. ঐ, *শয়তানের ফাঁসি*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৬

৬০. ঐ, *শয়তানের মুখোশ*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮

৬১. ঐ, *সমাজের কিট*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৪

৬২. ঐ, *সন্ত্রাস আর কতদিন?* , ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০৮

৬৩. ঐ, *সমাজের শয়তান*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৪

৬৪. ঐ, *সোনার বাংলা শ্মশান কেন* , ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০৮

৬৫. ঐ, *স্বর্গেও শয়তান*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮

৬৬. ঐ, *স্বজন প্রীতি*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৩

৬৭. উৎপল দত্ত, *জালিওয়ানওয়ালাবাগ*, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ মে ১৯৮৭

৬৮. ঐ, *রাইফেল*, ঐ, পঞ্চম প্রকাশ ফাল্গুণ ১৩৮৬

৬৯. ঐ, *সন্ন্যাসীর তরবারি*, ঐ, পঞ্চম প্রকাশ ভাদ্র ১৪০২

৭০. ঐ, *সাদা পোশাক*

৭১. ঐ, *স্বাধীনতার ফাঁকি*, ঐ, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৮৩

৭২. এ. কে. এম. মিন্নত আলী, *ইন্টারভিউ*, সালমা বুক ডিপো, বাংলাবাজার, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০১১

৭৩. এ, সোবহান ভুঞা, *কৃষকের আর্তনাদ*, বুকমার্ট ও সালমা বুক ডিপো, বাংলাবাজার, ঢাকা, ন.স. ১৯৯৬

৭৪. এম. এ. মজিদ, *জেলভাঙ্গা কয়েদী*, রতন বুক হাউস, ঐ

৭৫. ওবায়দুর রহমান খাঁ, *ভানুমতি*, গ্রন্থ কুটির, ঐ প্রকাশকাল জুলাই- ১৯৮৫

৭৬. *হত্যার প্রতিশোধ*, ঐ, প্র. প্র. ২০০৯ ইং

৭৭. কল্যাণ মিত্র, *দায়ী কে*, সালমা বুক ডিপো, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ-২০১১ ইং

৭৮. ঐ, *শুভ বিবাহ*, ঐ, ঐ

৭৯. ঐ, *সাগর সেচা মানিক*, সালমা বুক ডিপো, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ- ২০১১

৮০. ঐ, *সূর্য্য মহল*, ঐ, ঐ

৮১. কমলেশ ব্যানার্জী, *অভিশপ্ত ফুলশয্যা*, রতন বুক হাউস ঢাকা

৮২. ঐ, *আমার ছেলে ফিরিয়ে দাও*, ঐ

৮৩. ঐ, *বিশ্বাসঘাতক*, ঐ, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০১১

৮৪. ঐ, *মানুষ নিয়ে খেলা*, ঐ

৮৫. ঐ, *লক্ষ্মীর হাতে ভিক্ষের ঝুলি*, ঐ

৮৬. *শাঁখা দিওনা ভেঙ্গে*, রতন বুক হাউস, প্র. প্র- ২০০৯

৮৭. ঐ, *সমাজ*, ঐ

৮৮. ঐ, *হাসির হাটে কান্না*, ঐ

৮৯. কাজী নজরুল ইসলাম সাজু, *এক ফোঁটা বিষ দাও*, সালমা বুক ডিপো, বাংলাবাজার, ঢাকা, দ্বি.প্র.২০০৯

৯০. কালীপদ দাস, *নিমাই সন্ন্যাস*, সদর লাইব্রেরী, বাংলা বাজার, দ্বিতীয় প্রকাশ-২০০৮

৯১. ঐ, *প্রতিশোধ*, ঐ , ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৩৮৮

৯২. ঐ, *রাজা হরিশ্চন্দ্র*, সালমা বুক ডিপো, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

৯৩. কানাইলাল নাথ, *একুশে ফেব্রুয়ারি*, সালমা বুক ডিপো, প্র. প্র- ২০০৫

৯৪. ঐ, *কে ঠাকুর ডাকাত*, রতন বুক হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা

৯৫. ঐ, *চণ্ডী তলার মন্দির*, ঐ

৯৬. ঐ, *বেঈমান বিধাতা*, ঐ, প্রথম সংস্করণ- ১৯৮৬

৯৭. ঐ, *মা ও ছেলে*, রতন বুক হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা

৯৮. ঐ, *হাসানের বিষপান*, ঐ, দ্বিতীয় প্রকাশ-২০১১

৯৯. ঐ, *বেদকন্যা*, কালাম অপটিক্যাল, পটুয়াখালি, নতুন সংস্করণ- ২০০৩

১০০. কুমার অভিজিৎ, *মায়ের চিতায় অগ্নি শপথ*, রতন বুক হাউস ও নাটকমহল, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রকাশকাল উল্লেখ নেই

১০১. গৌর চন্দ্র ভড়, *কণ্ঠহার*, নাটক ভবন, বনানী, ঢাকা ও বর্ণসিঁড়ি, নবাবপুর, ঢাকা, প্রকাশ উল্লেখ নেই

১০২. ঐ, *কয়েদী*, রতন বুক হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রকাশ উল্লেখ নেই

১০৩. চন্ডীচরণ ব্যানার্জী, *পতিতার সংসার বা জেলের জন্য দায়ী কে?*, রতন বুক হাউস ও নাটকমহল, বাংলাবাজার ঢাকা, প্রকাশকাল উল্লেখ নেই

১০৪. চারুচন্দ্র রায় চৌধুরী, *মধুমালা*, প্র. প্র. ১৯৯৬

১০৫. ঐ, *লাইলী মজনু*, ঐ, ৫ম প্রকাশ মার্চ -২০০৩

১০৬. ছবি বন্দোপাধ্যায়, *চোর*, রতন বুক হাউস, বাংলাবাজার ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৯২

১০৭. জসীম উদ্‌দীন, *বেদের মেয়ে*, পলাশ প্রকাশনী, প্র. স. ১৯৯৩

১০৮. ঐ, *মধুমালা*, পলাশ প্রকাশনী, প্র.প্র.১৯৫৬, প.স. ১৯৯৩

১০৯. জি. পি. ভট্টাচার্য, *নাচ ঘরের কান্না*, রতন বুক হাউস ও নাটকমহল, বাংলাবাজার, ঢাকা

১১০. জিতেন্দ্রনাথ বসাক, *বাগদত্তা*, রতন বুক হাউস, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

১১১. ঐ, *ফরিয়াদ*, ঐ

১১২. ঐ, *মোঘলে আযম*, ঐ

১১৩. দীনেশচন্দ্র সেন, *রাখালের রাজগি*, পলাশ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০০

১১৪. দেবেন্দ্র নাথ, *লালন ফকির বা সাঁই সিরাজ*, রতন বুক হাউস ও নাটক মহল, ঐ

১১৫. ঐ, *মৃত্যুর চোখে জল*, রতন বুক হাউস, ঐ, প্র. প্র. ২০০৮

১১৬. নটরাজ, *সুজন সখী*, সালমা বুক ডিপো, ঐ, দ্বি. প্র. ২০১১

১১৭. নন্দ গোপাল রায় চৌধুরী, *বন্দীর ছেলে*, ঐ, প্র. প্র. ২০০৮

১১৮. ঐ, *সাধক রাম প্রসাদ*, সালমা বুক ডিপো, ঐ, প্র. প্র. ১৯৮৫

১১৯. নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায়, ঐ, *এক পয়সার মা*, রতন বুক হাউস, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

১২০. ঐ, *কালো সিঁদুর*, শাহিন বুক ডিপো, বাংলা বাজার, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

১২১. ঐ, *গরীব কেন মরে*, রতন বুক হাউস,বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

১২২. ঐ, *জেল থেকে বলছি*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৩৯২

১২৩. ঐ, *প্রেমের সমাধি তীরে*, ঐ

১২৪. ঐ, *বিষাক্ত পৃথিবী*, ঐ, প্রথম প্রকাশ ২০০৪

১২৫. ঐ, *ভাঙছে শুধু ভাঙছে*, আদর্শ প্রকাশনী, সাতমাথা, বগুড়া, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

১২৬. ঐ, *মা হলো বন্দী*, ঐ

১২৭. ঐ, *মানবী দেবী*, রতন বুক হাউস ও নাটক মহল, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

১২৮. ঐ, *মমতাময়ী মা*, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

১২৯. ঐ, *সিঁদূর নিও না মুছে*, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

১৩০. ঐ, *স্বামীর চিতা জ্বলছে*, ঐ

১৩১. ঐ, *সোনা ডাঙার বউ*, নতুন বইঘর, বাংলা বাজার, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

১৩২. নাজমুল আলম, *মরা মানুষের পাঠশালা ও ফুল্লরা অপেরা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর-২০১২

১৩৩. পূর্ণেন্দু রায়, *দস্যুরাণী ফুলন দেবী*, রতন বুক হাউজ, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্র. উল্লেখ নাই

১৩৪. প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, *আনারকলি*, রতন বুক হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্র. প্র. ২০০৮

১৩৫. ঐ, *পেটের জ্বালা*, সালমা বুক ডিপো, প্র. প্র- ২০০৮

১৩৬. ঐ, *বাসরে বিধবা বধূ*, রতন বুক হাউস, ঢাকা, প্র. প্র- ২০০৪

১৩৭. ঐ, *বিধবার গায়ে হলুদ*, ঐ

১৩৮. ঐ, *মানুষ পেলাম না*, রতন বুক হাউস ও নাটকমহল, বাংলাবাজার, ঢাকা

১৩৯. ঐ, *রিক্সাওয়ালা*, সালমা বুক ডিপো, ঐ, প্র. প্র.১৯৯৪

১৪০. ঐ, *রিক্তা নদীর বাঁধ*, সালমা বুক ডিপো, ঢাকা, প্র. প্র- ১৯৯৪

১৪১. মকবুল হোসেন, *ভাষান যাত্রা*, সুলভ পুস্তিকা, বরিশাল, দ্বিতীয় সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০

১৪২. ঐ, *শাহজাহান ও টিপু সুলতান*, কোরান মঞ্জিল লাইব্রেরী, বরিশাল, দ্বি.স.২২ শে পৌষ, ১৩৮৭

১৪৩. মহাদেব হালদার, *অচিন গাঁয়ের বধূ*, রতন বুক হাউস ও নাটক মহল, প্রথম প্রকাশ- ২০০৮

১৪৪. ঐ, *ঘর ভাঙা ঝড়*, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

১৪৫. ঐ, *প্রতিমা বিসর্জন*, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

১৪৬. ঐ, *মাটি মায়ের ছেলে*, ঐ, প্রথম প্রকাশ- ২০০৩

১৪৭. ঐ, *ভগবানের কান্না*, ঐ, প্রথম প্রকাশ- ২০০৮

১৪৮. ঐ, *ভিখারিনী মা*, ঐ,দ্বিতীয় প্রকাশ- ২০১১

১৪৯. ঐ, *ভুলি নাই প্রিয়া*, ঐ, প্রথম প্রকাশ- ২০০৮

১৫০. ঐ, *লক্ষ টাকার লক্ষ*, ঐ

১৫১. ঐ, *রক্তে রাঙা মায়ের আঁচল*, ঐ, প্র. প্র.২০০৩

১৫২. ঐ, *শ্মশানে কাঁদছে ভালোবাসা*, ঐ, প্রথম প্রকাশ- ২০০৮

১৫৩. ঐ, *শ্মশান চিতায় প্রিয়া*, ঐ, প্রথম প্রকাশ- ২০০৪

১৫৪. ঐ, *সংসার হলো শ্মশান*, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

১৫৫. ঐ, *সন্তান হারা মা*, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

১৫৬. ঐ, *সিদুঁর দিয়ে কিনলাম*, ঐ, প্রথম প্রকাশ- ২০০৪

১৫৭. ঐ, *স্বামী ভিক্ষা দাও*, ঐ, প্রথম প্রকাশ- ২০০৯

১৫৮. মনোতোষ চক্রবর্তী, *আজকের মীরজাফর*, রতন বুক হাউস, বাংলাবাজার ঢাকা, প্র. উল্লেখ নেই

১৫৯. মিলনকান্তি দে, *দুটি যাত্রাপালা- দাতা হাতেম তা'য়ী*, বাংলার মহানায়ক, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, প্র. প্র. ফেব্রুয়ারি ২০১৬

১৬০. মোঃ নাসির দুলাল, *অত্যাচারীর পরিণাম*, সালমা বুক ডিপো, বাংলাবাজার, ঢাকা, দ্বি.প্র.২০১১

১৬১. মোঃ আলাউদ্দীন, *কাচমহল*, গ্রন্থ কুটির, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রকাশকাল অক্টোবর' ৭৬

১৬২. মোঃ কফিল উদ্দিন আহম্মদ, *নিজাম খুনী*, সালমা বুক ডিপো, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্র.প্রঃ ১৯৯৮

১৬৩. মোঃ বাহাউদ্দীন আহমদ, *পুষ্পমালা*, সালমা বুক ডিপো, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯৪

১৬৪. মোঃ মুজিবুর রহমান শেখ, *বন্ধুর বাঁশী বাজে*, মফিজ বুক হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্র. প্র.অক্টোবর ২০০১

১৬৫. মোঃ ইউসুফ আলী (কানাই), *বাহরাম বাদশা*, সালমা বুক ডিপো, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২য় প্রকাশ ২০০৮

১৬৬. মোঃ জয়নাল আবেদীন, *বিজয় নিশান*, বুক মার্ট ও সালমা বুক ডিপো, বাংলাবাজার, ঢাকা, নতুন সংস্করণ ১৯৯৬

১৬৭. মোঃ জালালউদ্দিন, *কিছু খেতে দাও*, বুক মার্ট, নরসিংদী, প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪

১৬৮. ঐ, *গাঁয়ের বুকে*, সালমা বুক ডিপো, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-২০০৯

১৬৯. ঐ, *দুই ভাই*, সালমা বুক ডিপো, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৬৬

১৭০. ঐ, *প্রীতি চন্দন*, সালমা বুক ডিপো, ঢাকা

১৭১. ঐ, *ভিখারির ছেলে*,ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০০

১৭২. ঐ *ভিখারির মেয়ে*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৯

১৭৩. ঐ, *মালির ছেলে*, সালমা বুক ডিপো, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০০৯

১৭৪. ঐ, *রক্ত রাঙা বাংলাদেশ*, ঐ, চতুর্থ প্রকাশ ২০০০

১৭৫. ঐ, *রাজ্য হারা*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯০

১৭৬. ঐ, *রাজরক্ত*, বুক মার্ট, নরসিংদী, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৪

১৭৭. মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, *বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না*, সালমা বুক ডিপো, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৭২

১৭৮. ঐ, *রাজুবালা জাবেদ কুমার*, ঐ

১৭৯. ঐ, *সৎমা*, ঐ, দ্বিতীয় প্রকাশ- ১৯৯৬

১৮০. ঐ, *সাপুরের মেয়ে*, সালমা বুক ডিপো, বাংলাবাজার, ঢাকা, তৃ. প্র.১৯৯৯

১৮১. মোঃ মতিউর রহমান, *গরীবের আর্তনাদ*, সালমা বুক ডিপো, পুর্নমুদ্রণ- ২০০৫, প্র. প্র. ১৯৭৮

১৮২. ঐ, *মানুষ-অমানুষ*, সালমা বুক ডিপো–বুক মার্ট–মিতা লাইব্রেরী, নরসিংদী, প্রথম মুদ্রণ-১৩৮৯

১৮৩. ঐ, *রাজ সিংহাসন*, সালমা বুক ডিপো, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৮২

১৮৪. ঐ, *যৌতুক হলো অভিশাপ*, ঐ, পুর্নমুদ্রণ- ২০০৫

১৮৫. ঐ, *শাহী ফরমান*, ঐ, প্র. প্রঃ ১৯৯৬

১৮৬. মোঃ রফিকুল ইসলাম (রানা), *গরীবের কান্না*, সালমা বুক ডিপো, ঢাকা, প্র. প্র-২০১১

১৮৭. ঐ, *রাহেলার বনবাস*, ঐ, দ্বিতীয় প্রকাশ- ২০১১

১৮৮. ঐ, *সতী কলংকিনী*, সালমা বুক ডিপো, বাংলাবাজার, ঢাকা, দ্বি.প্র.২০০৮

১৮৯. মোঃ সামসুল হক, ঐ, *আলোমতি ও প্রেমকুমার*, সালমা বুক ডিপো, তৃতীয় প্রকাশ-১৯৯৪

১৯০. ঐ, *কমলার বনবাস*, সালমা বুক ডিপো, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৭৯

১৯১. ঐ, *কাজল রেখা*, ঐ, প্র. প্র- ১৯৮৯

১৯২. ঐ, *গরীবের আর্তনাদ*, সালমা বুক ডিপো, বাংলাবাজার ঢাকা, প্র. প্র- ২০০২

১৯৩. ঐ, *মতিমালা*, ঐ, দ্বিতীয় প্রকাশ-২০০৮

১৯৪. ঐ, *মানুষ অমানুষ*, ঐ, প্র. প্র- ২০০২

১৯৫. ঐ, *রহিম বাদশা ও রূপবান কন্যা*, ঐ, চতুর্থ প্রকাশ–১৯৯৫

১৯৬. ঐ, *রাজসিংহাসন*, ঐ

১৯৭. ঐ, *সাগর ভাসা*, ঐ, দ্বিতীয় প্রকাশ- ১৯৯৪

১৯৮. বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, *মিসর-কুমারী* (সম্পাদনায়- ফরিদ উদ্দিন খাঁ), নাটক ঘর, বাংলাবাজার-ঢাকা, প্র. উল্লেখ নেই

১৯৯. বশির উদ্দিন আহম্মদ, *হিংসার পরিণাম*, সালমা বুক ডিপো, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্র.প্র. ২০০৮

২০০. ব্রজেন্দ্র কুমার দে, ঐ, *আকালের দেশ*, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, কলকাতা

২০১. ঐ, *আঁধারের মুসাফির*, রতন বুক ডিপো, ঐ

২০২. ঐ, *কবি চন্দ্রাবতী*,কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী, কলকাতা

২০৩. ঐ, *কোহিনূর*, রতন বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

২০৪. ঐ, *জনতার মুকুট*

২০৫. ঐ, *দেবতার গ্রাস*, ডায়মন্ড লাইব্রেরী, কলকাতা

২০৬. ঐ, *বাঙালি*, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, কলকাতা

২০৭. ঐ, *বাঁশের বাঁশি*, সালমা বুক ডিপো, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রকাশ সাল উল্লেখ উল্লেখ নেই

২০৮. ঐ, *বিচারক*, ডায়মন্ড লাইব্রেরী, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ ১৩৭৯

২০৯. ঐ, *লীলাবসান*, ডায়মন্ড লাইব্রেরী, কলকাতা, নবম সংস্করণ

২১০. ঐ, *লৌহ প্রাচীর*, নাটক ঘর, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

২১১. ঐ, *যাদের কেউ নেই*, কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী, কলকাতা

২১২. ঐ, *সম্রাট জাহান্দার শাহ্*, ডায়মন্ড লাইব্রেরী, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ১৩৬৯

২১৩. ঐ, *সতীর ঘাট*, ঐ, ১৩৭০

২১৪. ঐ, *সোনাই দীঘি*, ডায়মন্ড লাইব্রেরী, কলকাতা,

২১৫. ঐ, *সোহরাব রুস্তম*, রতন বুক হাউস ও নাটক মহল, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্র. উল্লেখ নেই

২১৬. ভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, *অশ্রু দিয়ে লেখা*, রতন বুক হাউস ও নাটক মহল, ঢাকা

২১৭. ঐ, *অচল পয়সা*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০৫

২১৮. ঐ, *অভাগীর সংসার*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০৮

২১৯. ঐ, *একটি পয়সা*, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

২২০. ঐ, *খুনের জবাব*,ঐ

২২১. ঐ, *খুন করেছি মাকে*, ঐ

২২২. ঐ, *গরিব হয়ে কি পেলাম*, রতন বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

২২৩. ঐ, *চুয়া-চন্দন*, ভৈরব পুস্তকালয়, কলকাতা

২২৪. ঐ, *তাজমহল*, রতন বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা ,ঐ

২২৫. ঐ, *থানায় যাচ্ছে ছোটবউ*, ঐ, প্রকাশ-১৪০১

২২৬. ঐ, *দেবী সুলতানা*, শাহীন বুক ডিপো, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

২২৭. ঐ, *নাচ মহল*, রতন বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮

২২৮. ঐ, *পাল্কী ভাঙ্গা বউ*, রতন বুক হাউস, প্রথম প্রকাশ-২০০৩

২২৯. ঐ, *পাগলাগারদ*,ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

২৩০. ঐ, *পুত্রবধূর সিধুর চুরি*, রতন বুক হাউস ও নাটক মহল, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্র.উল্লেখ নেই

২৩১. ঐ, *বড় লোকের বেটিলো*, রতন বুক হাউস ও নাটক মহল, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্র. প্র.২০০৪

২৩২. ঐ, *বন্দী মুসাফির*,রতন বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা প্রথম প্রকাশ-১৩৯৭

২৩৩. ঐ, *বৌ হয়েছে রঙের বিবি*, ঐ

২৩৪. ঐ, *বৌমা তোমার পায়ে নমস্কার*, শাহীন বুক ডিপো, বাংলা বাজার, ঢাকা

২৩৫. ঐ, *ভিখারী ঈশ্বর*, রতন বুক হাউস ও নাটক মহল, ঢাকা

২৩৬. ঐ, *মা যশোদা কাঁদে*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০৩

২৩৭. ঐ, *মা মাটি মানুষ*, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

২৩৮. ঐ, *মাতৃঋণ শোধ*, রতন বুক হাউস ও নাটক মহল, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্র.উল্লেখ নেই

২৩৯. ঐ, *শ্মশান হলো বাসর*, রতন বুক হাউস ও নাটক মহল, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্র. প্র. ২০০৪

২৪০. ঐ, *সংসার জেলখানা*, রতন বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা প্রথম প্রকাশ ২০০৯

২৪১. ঐ, *সাত টাকার সন্তান*, রতন বুক হাউস, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৬

২৪২. ঐ, *সেলাই করা সংসার*, রতন বুক হাউস ও নাটক মহল, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্র.উল্লেখ নেই

২৪৩. ঐ, *স্বর্গের পরের ষ্টেশন*, প্রকাশনী ও প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

২৪৪. রনজীৎ কুমার সেন, *কবরের কান্না*, মফিজ বুক ডিপো, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্র.সেপ্টেম্বর ১৯৯০

২৪৫. রতনকুমার ঘোষ, *রাজ-অভিষেক*, নির্মল বুক এজেন্সী, কলিকাতা, প্র. প্র. অগ্রহায়ণ, ১৩৮১

২৪৬. রঞ্জন দেবনাথ, *অনুসন্ধান*, রতন বুক হাউস ও নাটক মহল, বাংলা বাজার, ঢাকা

২৪৭. ঐ, *আজকের সমাজ*, ঐ, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০০৯

২৪৮. ঐ, *একটি গোলাপের মৃত্যু*, ঐ

২৪৯. ঐ, *এ পৃথিবী টাকার গোলাম*, ঐ

২৫০. ঐ, *একটি পয়সা দাও*, ঐ, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০০৯

২৫১. ঐ, *এক মুঠো অন্ন চাই*, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

২৫২. ঐ, *কলঙ্কিনী কেন কঙ্কাবতী*, ঐ, প্রথম প্রকাশ ২০০৪

২৫৩. ঐ, *কলংকিনী বধূ*, ঐ

২৫৪. ঐ, *কুলি*, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

২৫৫. ঐ, *গলি থেকে রাজপথ*, রতন বুক হাউস ও নাটক মহল, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্র.উল্লেখ নেই

২৫৬. ঐ, *চরিত্রহীন*, ঐ

২৫৭. ঐ, *জীবন্তশয়তান*, রতন বুক হাউস ও নাটক মহল, বাংলা বাজার, ঢাকা, ঐ

২৫৮. ঐ, *জোড়া দীঘির চৌধুরী পরিবার*, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

২৫৯. ঐ, *নীচু তলার মানুষ*, রতন বুক হাউস, প্রথম প্রকাশ ২০০৮

২৬০. ঐ, *ধার করা সিঁদুর অসতী বৌ*, ঐ, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪

২৬১. ঐ, *পাঁচ পয়সার প্রেম*, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

২৬২. ঐ, *পান্না হীরা চুনী*, ঐ, প্রথম প্রকাশ ২০০৩

২৬৩. ঐ, *পুত্রবধূ*, ঐ, প্রথম প্রকাশ ২০০৩

২৬৪. ঐ, *প্রিয়ার চোখে জল*, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

২৬৫. ঐ, *পৃথিবী আমারে চায়*, ঐ

২৬৬. ঐ, *প্রেম হলো অভিশাপ*, ঐ

২৬৭. ঐ, *ফেরিওয়ালা*, রতন বুক হাউস ও নাটক মহল,, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

২৬৮. ঐ, *বন্দী বিধাতা*, রতন বুক হাউস, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

২৬৯. ঐ, *বধূর চিতা*, ঐ

২৭০. ঐ, *বধূ-বলিদান বা কাঁচের পুতুল*, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

২৭১. ঐ, *বধূ এলো ঘরে*, ঐ

২৭২. ঐ, *মরমী বধূ*, ঐ

২৭৩. ঐ, *মায়ের চোখে জল*, রতন বুক হাউস, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

২৭৪. ঐ, *মেঘে ঢাকা তারা*, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

২৭৫. ঐ, *রক্তে ঝরা রাত্রি*, ঐ, প্রথম প্রকাশ ২০০১

২৭৬. ঐ, *শশী বাবুর সংসার*, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

২৭৭. ঐ, *সয়ম্বরা*, ঐ, প্রথম প্রকাশ ২০০১

২৭৮. ঐ, *সংসার কেন ভাঙে*, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

২৭৯. ঐ, *সংসার আদালত*, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

২৮০. ঐ, *সাত পাকে বাঁধা*, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

২৮১. ঐ, *সাজাহান আজও কাদেঁ*, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

২৮২. ঐ, *সূর্য স্বাক্ষী*, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

২৮৩. ঐ, *স্মৃতিটুকু থাক*, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

২৮৪. রাজদূত, *ভিক্ষুক*, রতন বুক হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্র. প্র-২০০৮

২৮৫. ঐ, *বাবার বিয়ে*, রতন বুক হাউস ও নাটক মহল, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রকাশকাল উল্লেখ নেই

২৮৬. ঐ, *সূর্য আছে আলো নেই*, রতন বুক হাউস, বাংলা বাজার , ঢাকা, প্র. প্র- ২০০৮

২৮৭. লাল মিয়া, *রাখাল বন্ধু*, সালমা বুক ডিপো, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্র. প্র- ২০০৮ ইং

২৮৮. শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, *দেবদাস*, রতন বুক হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্র. প্র- ২০০৮

২৮৯. ঐ, *নবাব সিরাজদ্দৌলা*, রতন বুক হাউস, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

২৯০. ঐ, *পানিপথ*, ঐ, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্র. প্র- ২০০৮

২৯১. শচীন ভট্টাচার্য, *সম্রাটের মৃত্যু*, মালেকা-বানু বরিশাল

২৯২. শক্তিপদ সিংহ, *ডাইনী বধু*, রতন বুক হাউস ও নাটকমহল, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্র. উল্লেখ নেই

২৯৩. শম্ভুনাথ বাগ, *ঘুম ভাঙার গান*, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, কলকাতা

২৯৪. শাহ্ সিকান্দার আজাদ, *চাঁদ কুমারী চাষার ছেলে*, সালমা বুক ডিপো, ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০৯

২৯৫. ঐ, *নয়নতারা*, ঐ, দ্বিতীয় প্রকাশ-১৯৯৯

২৯৬. ঐ, *রূপকমল চন্দ্রমালা*, ঐ, প্র. প্র- ১৯৯৪

২৯৭. শান্তিরঞ্জন দে, *গঙ্গা থেকে বুড়ি গঙ্গা*, রতন বুক হাউস ও নাটক মহল, বাংলা বাজার ঢাকা, প্র. প্র. ২০০৩

২৯৮. শেখ মোসলেম, *বন্দিনী যশোদা*, রতন বুক হাউস, প্র. প্র- ২০০৮

২৯৯. ঐ, *বোবা বধুর ফুলশয্যা*, ঐ, প্রকাশকাল- ২০০৩

৩০০. ঐ, *স্বামীর রক্তে শপথ নিলাম*, ঐ, প্র. প্র- ২০০৮

৩০১. শিবাজী রায়, *এক মুঠো আগুন*, ঐ, প্রকাশ কাল উল্লেখ নেই

৩০২. ঐ, *মন্দির থেকে মসজিদ*, রতন বুক হাউস, ঐ, প্রকাশকাল উল্লেখ নেই

৩০৩. শৈলেশ গুহ নিয়োগী, *বৌদির বিয়ে*, রতন বুক হাউস ও নাটক মহল, ঐ, প্র.উল্লেখ নেই

৩০৪. ঐ, *ফাঁস*, ঐ, ঐ

৩০৫. সঞ্জীবন দাস, *আবীর ছড়ানো মুর্শিদাবাদ*, রতন বুক হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্র. উল্লেখ নেই

৩০৬. সত্য প্রকাশ দত্ত, *দু-টুকরো বৌমা*, রতন বুক হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্র. উল্লেখ নেই।

৩০৭. সজল কান্তিমন্ডল, *বাঁচার লড়াই*, সালমা বুক ডিপো, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রকাশকাল- ১৯৯৬

৩০৮. সব্যসাচী, *রূপ হল অভিশাপ*, রতন বুক হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্র. প্র- ২০০৮

৩০৯. স্বপনকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ময়লা কাগজ*, রতন বুক হাউস, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

৩১০. ঐ, *মা কিনবে গো*, রতন বুক হাউস, বাংলাবাজার ঢাকা, প্র. প্র- ২০০৪

৩১১. ঐ, *মন্দিরে আজান*, ঐ

৩১২. ঐ, *শ্মশানে হলো ফুলশয্যা*, ঐ

৩১৩. স্বদেশ হালদার, *ঝাড়ুদার*,ঐ

৩১৪. সেকেন্দার আলী, *বেদকন্যা*, কালাম অপটিক্যাল, পটুয়াখালী, নতুন সংস্করণ-২০০৩

৩১৫. ঐ, *হাসানের বিষপান*, সালমা বুক ডিপো, ঐ, দ্বিতীয় প্রকাশ-২০১১

৩১৬. সেকেন্দার আলী সিকদার, *একুশে ফেব্রুয়ারি*, সালমা বুক ডিপো, ঢাকা, প্রকাশকাল ২০০৫

৩১৭. ঐ, *এজিদ বধ*, রতন বুক হাউস, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ২০০৯

৩১৮. সুনীল চৌধুরী, *ভানুমতীর খেলা*, রতন বুক হাউস ও নাটক মহল, বাংলা বাজার, ঢাকা

৩১৯. ঐ, *মা বিক্রির মামলা*, রতন বুক হাউস ও নাটক মহল, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্র. প্র- ২০০৩

৩২০. ঐ, *মক্কার মাটি গঙ্গার জল*, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

৩২১. ঐ, *রক্ত দিয়ে বোনের বিয়ে*, ঐ

৩২২. ঐ, *রাধা কেন কাঁদে*, ঐ

৩২৩. হীরেন্দ্র কৃষ্ণ দাস, *অভিশপ্ত রাজ দরবার*, সালমা বুক ডিপো,, দ্বিতীয় প্রকাশ-১৯৯৬

৩২৪. ঐ, *অরুণ শান্তি*, ঐ, দ্বিতীয় প্রকাশ-২০১১

৩২৫. ঐ, *অনুতপ্ত বেঈমান*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০১

৩২৬. ঐ, *আজকের সন্তান*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮

৩২৭. ঐ, *আক্কেল আলীর আদালত*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৫

৩২৮. ঐ, *আলিফ লায়লা*, বুক মার্ট, নরসিংদী, তৃতীয় প্রকাশ-১৯৯১

৩২৯. ঐ, *আদম বেপারির নির্বাচন*, সালমা বুক ডিপো, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭

৩৩০. ঐ, *আপন দুলাল*, দ্বিতীয় প্রকাশ-১৯৯৪

৩৩১. ঐ, *আলম মালা*, ঐ, দ্বিতীয় প্রকাশ-১৯৯৮

৩৩২. ঐ, *ঈশ্বরের চোখে জল*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৬

৩৩৩. ঐ, *একাত্তরের মীরজাফর*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮

৩৩৪. ঐ, *এক ফোঁটা ফেন দাও*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৬

৩৩৫. ঐ, *একাত্তরের বিপ্লব*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০১

৩৩৬. ঐ, *কমলার প্রেম*, ঐ, দ্বিতীয় প্রকাশ-২০০৯

৩৩৭. ঐ, *কলঙ্কিত মসনদ*, ঐ, চতুর্থ প্রকাশ-১৯৯৮

৩৩৮. ঐ, *কলংকিনী মালা* , ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০৫

৩৩৯. ঐ, *কাঞ্চনমালা*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০১১

৩৪০. ঐ, *কেরামত আলীর কেরামত*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৬

৩৪১. ঐ, *কে বেঈমান*, শাহীন লাইব্রেরী, নরসিংদী, তৃতীয় প্রকাশ-১৯৯২

৩৪২. ঐ, *গরীবের সংগ্রাম*, সালমা বুক ডিপো,, প্রথম প্রকাশ-২০০৫

৩৪৩. ঐ, *গরীবের সংসার*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮

৩৪৪. ঐ, *গহুর বাদশা বানেছা পরী*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৪

৩৪৫. ঐ, *চক্রান্তের পরিনাম*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০৫

৩৪৬. ঐ, *চাবুকের জবাব*, বুক মার্ট ও সালমা বুক ডিপো, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৩৯৭ (ব

৩৪৭. ঐ, *ছয়ফুল মুল্লুক বদিউজ্জামান*, সালমা বুক ডিপো, দ্বিতীয় প্রকাশ-২০০০

৩৪৮. ঐ, *ছোটদের নবাব সিরাজদৌলা*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭

৩৪৯. ঐ, *জরিনার বনবাস* , ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০৮

৩৫০. ঐ, *জলন্তবারুদ*, ঐ, দ্বিতীয় প্রকাশ-১৯৮৮

৩৫১. ঐ, *জালিমের চাবুক*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮

৩৫২. ঐ, *জীবন্তপাপ*, বুক স্টল, নরসিংদী, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

৩৫৩. ঐ, *জীবন্তকবর*, সালমা বুক ডিপো, প্রথম প্রকাশ-১৪০০ বাংলা

৩৫৪. ঐ, *দাসী পুত্র*, বুক মার্ট, নরসিংদী, প্রথম মুদ্রণ ১৩৮৫ বাংলা

৩৫৫. ঐ, *নয়নমালা*, সালমা বুক ডিপো, প্রথম প্রকাশ-২০০৫

৩৫৬. ঐ, *নরক থেকে বলছি*, ঐ, সালমা বুক ডিপো, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৬

৩৫৭. ঐ, *পরাজিত সম্রাট*, ঐ, বুক মার্ট ও সালমা বুক ডিপো ,প্রথম প্রকাশ-১৯৯৬

৩৫৮. ঐ, *পরাজিত বেঈমান*, সালমা বুক ডিপো, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭

৩৫৯. ঐ, *পাপের পরিণাম* , ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৬

৩৬০. ঐ, *পাষাণের চোখে জল*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮

৩৬১. ঐ, *পাহাড়ী মেয়ে*, ঐ, দ্বিতীয় প্রকাশ-২০০৯

৩৬২. ঐ, *পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ*, বুক মার্ট, নরসিংদী, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

৩৬৩. ঐ, *ফান্দে পরিয়া কান্দে*, সালমা বুক ডিপো, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮

৩৬৪. ঐ, *ফিরিয়ে দাও সিংহাসন*, নাটক প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্র. প্র. ১৯৯৭

৩৬৫. ঐ, *ফেরারী সম্রাট*, সালমা বুক ডিপো, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-২০০৫

৩৬৬. ঐ, *বনবাসে মানিক মালা* ,দ্বিতীয় প্রকাশ-২০০৯

৩৬৭. ঐ, *বস্তির ছেলে*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮

৩৬৮. ঐ, *বন্দীর ছেলে*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭

৩৬৯. ঐ, *বাংলার মাটি*, ঐ, সালমা বুক ডিপো, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-২০০১

৩৭০. ঐ, *বাংলা বাচাঁও* , ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৬

৩৭১. ঐ, *বাঁচার সংগ্রাম*, সালমা বুক ডিপো, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮

৩৭২. ঐ, *বাঈজীর ছেলে*, ঐ, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই

৩৭৩. ঐ, *বিমাতার চক্রান্ত*, ঐ, দ্বিতীয় প্রকাশ-২০০৮

৩৭৪. ঐ, *বিজয়মালা*, ঐ, বুক মার্ট, নরসিংদী, তৃতীয় প্রকাশ-১৪০০

৩৭৫. ঐ, *বিধবার কান্না* , সালমা বুক ডিপো, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৪

৩৭৬. ঐ, *বিষাদ সিন্ধু* , ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭

৩৭৭. ঐ, *বিদ্রোহী বেগম*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০৮

৩৭৮. ঐ, *বিজয় বসন্ত*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৩

৩৭৯. ঐ, *বেঈমানের চক্রান্ত*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৪

৩৮০. ঐ, *বেকারের কান্না*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০১১

৩৮১. ঐ, *বেঈমানের ছেলে* , ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০৫

৩৮২. ঐ, *বেঈমানের অত্যাচার*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০৯

৩৮৩. ঐ, *বেদেনীর প্রেম* , বুক স্টল, নরসিংদী, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

৩৮৪. ঐ, *ভিখারির আর্তনাদ*, সালমা বুক ডিপো, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৬

৩৮৫. ঐ, *ময়ূর সিংহাসন*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৬

৩৮৬. ঐ, *মাতৃহত্যার প্রতিশোধ*, ঐ, দ্বিতীয় প্রকাশ-১৯৯৮

৩৮৭. ঐ, *মিছিল আসছে*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮

৩৮৮. ঐ, *মাধব মালার প্রেম*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮

৩৮৯. ঐ, *মা হলো বন্দী*, ঐ, দ্বিতীয় প্রকাশ-২০০৮

৩৯০. ঐ, *মানুষ গড়ার কারিগর*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৬

৩৯১. ঐ, *মাতৃ হত্যার প্রতিশোধ*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮

৩৯২. ঐ, *মিলন মালা*, ঐ, দ্বিতীয় প্রকাশ-২০০৮

৩৯৩. ঐ, *মেম বধূ মা-চাকরাণী*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮

৩৯৪. ঐ, *রক্তাক্ত তলোয়ার*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৪

৩৯৫. ঐ, *রক্তাক্ত বাংলা*, সালমা বুক ডিপো, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৬

৩৯৬. ঐ, *রাজাকারের ফাঁসি*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮

৩৯৭. ঐ, *রাজ মুকুট*, শাহীন লাইব্রেরী, নরসিংদী, ঐ

৩৯৮. ঐ, *রাজ বন্দী*, ঐ, দ্বিতীয় প্রকাশ-২০০৯

৩৯৯. ঐ, *যৌতুকের বলি*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৪

৪০০. ঐ, *শশী মালার প্রেম*,ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০১১

৪০১. ঐ, *শাহী তলোয়ার*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৬

৪০২. ঐ, *সন্ত্রাসীকে ধরুন*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮

৪০৩. ঐ, *সতীনের অত্যাচার* , ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০৫

৪০৪. ঐ, *সতিনের চক্রান্ত*, বইমেলা, নরসিংদী, দ্বিতীয় প্রকাশ-১৯৯৯

৪০৫. ঐ, *সর্বহারার কান্না*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৬

৪০৬. ঐ, *সতীনের ছেলে*, ঐ, সালমা বুক ডিপো, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-২০০৯

৪০৭. ঐ, *সৎমার চক্রান্ত*, সালমা বুক ডিপো, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭

৪০৮. ঐ, *সংসার চক্রান্ত*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭

৪০৯. ঐ, *স্বর্ণসিংহাসন*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০৮

৪১০. ঐ, *স্মাগলার* , ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮

৪১১. ঐ, *হরতাল*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৮

৪১২. ঐ, *হামিদ বাদশা ভেলুয়া সুন্দরী*, ঐ, প্রথম প্রকাশ-২০০১

Dhaka University Institutional Repository

২. সহায়ক গ্রন্থ

২.১ বাংলা গ্রন্থ

১. অনুপম হায়াৎ, *পুরানো ঢাকার সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-২০০১

২. অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়, *সামাজিক চালচিত্রে যাত্রাগান*, ভারবি, কলকাতা, ১৯৯৮

৩. অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, *নাটক সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, প্রতিভাস, কলকাতা, প্র. প্র. ২০১১

৪. অমলেন্দু বিশ্বাস, *বাংলাদেশের যাত্রাশিল্প*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪

৫. অমিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের রূপ-রীতি ও আঙ্গিক*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ১৯৯৮

৬. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চদশ সংস্করণ অক্টোবর ২০১৪

৭. অমরনাথ পাঠক, *বিষয় : যাত্রা থিয়েটার*, প্রভাতকুমার দাস (সম্পাদিত), অন্বয়, কলকাতা, ২০১৬

৮. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, দ্বিতীয় খণ্ড, মডার্ন বুক এজন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্র.সং-১৯৬২, দ্বিতীয় সং-১৯৭১

৯. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, চতুর্থ খণ্ড, মডার্ন বুক এজন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, প্র.সং.১৯৭৩

১০. অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, এপ্রিল-১৯৯৮

১১. অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলার লোকনাট্য যাত্রা ও সাতটি রবীন্দ্র-নাটক*, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৩৯৪ মহালয়া

১২. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, *বাঙলার প্রথম*, অতুল সুর (সম্পাদিত), কলিকাতা, সাহিত্যলোক, ১৯৮০

১৩. অহীন্দ্র চৌধুরী, *বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র*, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

১৪. অহীন্দ্র চৌধুরী, *নিজেরে হারায়ে খুঁজি* (প্রথম পর্ব), সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, প্র.প্র ২০১১

১৫. অহীন্দ্র চৌধুরী, *নিজেরে হারায়ে খুঁজি* (দ্বিতীয় পর্ব), সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, প্র.প্র ২০১১

১৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, মুখার্জী এন্ড কোং কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ জুন ২০০৯

১৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য ১ম খণ্ড*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ ২০০৪

১৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকশ্রুতি*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৩৯২

১৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন*, ১৯৬৪

২০. আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অজিতকুমার ঘোষ (সম্পাদিত), *শতবর্ষে নাট্যশালা*, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, জুন ১৯৭৩

২১. আলীম আল রাজী, *বাংলা লোকনাট্য পালাগান : প্রকৃতি ও প্রয়োগ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১০

২২. আসকার ইবনে শাইখ, *বাংলা মঞ্চনাটকের পশ্চাৎভূমি*, ঢাকা, সাতরং প্রকাশনী, ১৯৮৬

২৩. আনন্দবর্ধন, *ধ্বন্যালোক*, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী (সম্পাদিত), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, নভেম্বর ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

২৪. আদিত্য মুখোপাধ্যায়, *বাংলার লোকসংস্কৃতি*, অমর ভারতী, কলকাতা, ২০০৫

২৫. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, ঢাকা, বর্ণমিছিল, ১৯৭৮

২৬. ইসমাইল মোহাম্মদ, *নাট্যকলার ক্রমবিকাশ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭

২৭. উৎপল দত্ত, *গদ্য সংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, নাট্যচিন্তা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, প্র. প্র. ১৯৯৮

২৮. উৎপল দত্ত, *নাটক সমগ্র-২*, *মিত্র ও ঘোষ*, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৩

২৯. ওবায়দুল হক সরকার, *পঞ্চাশ দশকের পত্রপত্রিকায় ঢাকার নাটক*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-জুন ১৯৯৪

৩০. ওবায়দুল হক সরকার, *সেকালে আমাদের নাট্যচর্চা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৫

৩১. কপিলা বাৎসায়ন, *ভারতের নাট্য-ঐতিহ্য : বিচিত্র প্রবাহ* (নারায়ণ চৌধুরী অনূদিত), ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি, ১৯৮০

৩২. কবিকঙ্কন (মুকুন্দরাম চক্রবর্তী), *চণ্ডী-মঙ্গল*, সুকুমার সেন (সম্পা), সাহিত্য আকাদেমি, নয়াদিল্লী, ১৯৯৩

৩৩. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৩

৩৪. কালিদাস রায়, *বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (অখণ্ড সংস্করণ)*, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, প্রথম অপর্ণা সংস্করণ ২০০৭

৩৫. কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী, *নবদ্বীপ মহিমা*, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী (সম্পাদিত), নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নবদ্বীপ, নদীয়া, পরিবর্ধিত সংস্করণ ২০১১

৩৬. কৌশিক সান্যাল, *মঞ্চসজ্জা দৃশ্যসজ্জা*, গণমন প্রকাশন, কলকাতা, জুন ২০০৬

৩৭. কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত*, আনন্দ, কলকাতা, প্র.সং ১৩৯২, নবম মুদ্রণ ১৪১৭

৩৮. ক্ষেত্র গুপ্ত, *বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০২

৩৯. গীতা সেনগুপ্ত, *বিশ্ব রঙ্গালয় ও নাটক*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা ১৯৭৫

৪০. গুপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, *বাংলার লৌকিক দেবতা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭৮,প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬

৪১. গোপেশচন্দ্র দত্ত, *কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৬

৪২. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা*, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১লা অক্টোবর ১৯৭২

৪৩. গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ, *৩০০ বছরের যাত্রাশিল্পের ইতিহাস*, পুষ্প প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৬

৪৪. জলধর সেন, *কাঙাল হরিনাথ*, অশোক চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), উরুদশ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১০

৪৫. জয়গুরু গোস্বামী, *চারণকবি মুকুন্দদাস*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, প্র.প্র সেপ্টেম্বর ১৯৭২

৪৬. জয়তী ঘোষ, *মন্মথ রায় : জীবন ও সৃজন*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, বইমেলা ২০১০

৪৭. *ঢাকা মহানগরীর নাট্যচর্চা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯২

৪৮. তপন বাগচী, *বাংলাদেশের যাত্রাগান জনমাধ্যম ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন-২০০৭

৪৯. তপন বাগচী, *বাংলাদেশের যাত্রাগানের চালচিত্র*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ মে ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

৫০. তপন চক্রবর্তী, *অশ্বিনী কুমার দত্ত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৯৪

৫১. Z›`ªv PµeZx© (m¤úvw`Z), *অভিনেত্রীর ভূমিকায় চপলরানি*, নাট্যচিন্তা, কলকাতা, প্র. প্র.২০০২, ব্যবহৃত সংস্করণ ২০১২

৫২. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী* ১৩ ও ১৪, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৪১৮

৫৩. দর্শন চৌধুরী, *বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস*, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, প্র.প্র.১৯৯৫, পঞ্চম সং ২০১১

৫৪. দিব্যজ্যোতি মজুমদার, *লোকসংস্কৃতির ভবিষ্যৎ ও লোকায়ত মন*, গাঙচিল, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১০

৫৫. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ , কলকাতা, প্র.প্র.১৯৮৬, ব্যবহৃত তৃতীয় মুদ্রণ ২০০২।

৫৬. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ , কলকাতা প্র.মু.১৯৮৬, ব্যবহৃত তৃতীয় মুদ্রণ ২০০২

৫৭. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, ২য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্র.প্র. ১৯৩৫ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ব্যবহৃত সংস্করণ ২০০৬

৫৮. দুর্গাদাস লাহিড়ী (সম্পাদিত), *বাঙ্গালীর গান*, কলিকাতা, ১৩১২

৫৯. দুর্গাদাস লাহিড়ী (সম্পাদিত), *বাঙালির গান*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সংস্করণ এপ্রিল ২০০১

৬০. দুলাল ভৌমিক, *সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

৬১. দেবযানী মুখোপাধ্যায়, *পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে ও বাঙলা যাত্রা*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্র.প্র. ১৪১৩

৬২. দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলার মঞ্চগীতি*, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৯৯

৬৩. ঐ (সম্পাদিত), *বিনোদিনী গাথা*, সূত্রধর, কলকাতা, ডিসেম্বর-২০১২

৬৪. ঐ (সম্পাদিত), *বিনোদিনী রচনাসমগ্র*, পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম পত্রভারতী প্রকাশ জুলাই ২০১৪

৬৫. দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (১)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮

৬৬. দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (২)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮

৬৭. দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৩)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮

৬৮. দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *নির্বাচিত বাংলা যাত্রা (৪)*, সাহিত্য অকাদেমি ও পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮

৬৯. দেবদাস ভট্টাচার্য, *যাত্রা হল শুরু*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্র.প্র. এপ্রিল ২০১৬

৭০. নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, *শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ*, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৭৮

Dhaka University Institutional Repository

৭১. নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, *চারণকবি বিজয়লাল জীবন সাহিত্য*, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ২০০৫

৭২. নেপাল মজুমদার, *ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ* (প্রথম খণ্ড), কলকাতা , দে'জ পাবলিশিং, ১৪০১

৭৩. নীলিমা ইব্রাহিম, *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজ ও বাংলা নাটক*, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, প্র.প্র.১৯৬৪

৭৪. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্র.প্র.১৩৫৬, ষষ্ঠ সং ১৪১৪

৭৫. পবিত্র সরকার, *নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, মার্চ ২০০৮

৭৬. পুলক চন্দ, *জাগরণের চারণ মুকুন্দদাস ও তাঁর রচনাসমগ্র*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্র. প্র. ২০১১

৭৭. প্রভাতকুমার গোস্বামী, *দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক*, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, প্র.প্র.১৩৮৫

৭৮. প্রভাতকুমার দাস , *যাত্রা-থিয়েটার ও অভিযাত্রা*, কালিন্দী ব্রাত্যজন, কলকাতা বইমেলা, ২০১৬

৭৯. প্রভাতকুমার দাস, *যাত্রার সঙ্গে বেড়ে উঠা*, কারিগর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪

৮০. প্রভাতকুমার দাস (সম্পাদিত), *থিয়েটার পত্রিকার চল্লিশ বছর*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৪২১

৮১. প্রভাতকুমার দাস (সংকলিত ও সম্পাদিত), *বাংলা যাত্রাপালার গান*, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, প্র. প্র. জানুয়ারি ২০১৪

৮২. প্রসাদ সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), *বিপিনবিহারী গুপ্ত- পুরাতন প্রসঙ্গ ও বিচিত্র প্রসঙ্গ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্র. প্র. জানুয়ারি ২০১৬

৮৩. ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ, *অভিনয় শিক্ষা*, ডায়মণ্ড লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রকাশ সাল উল্লেখ নেই।

৮৪. বঙ্কিম বন্দোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, সুবোধ চক্রবর্তী (সম্পাদিত), কামিনী প্রকাশনালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ মাঘ ১৩৯৭, ব্যবহৃত সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯১

৮৫. বদিউর রহমান (সম্পাদিত), *মুকুন্দদাসের যত লেখা*, প্যাপিরাস, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৮

৮৬. বদিউর রহমান (সম্পাদিত), *চারণকবি মুকুন্দদাস*, প্যাপিরাস, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১০

৮৭. বদিউর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলার চারণ মুকুন্দদাস*, প্যাপিরাস, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১০

৮৮. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, *জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি*, প্রশান্তকুমার পাল (সম্পাদিত), সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯২০, দ্বিতীয় সুবর্ণরেখা সংস্করণ ১৪১৯

৮৯. বরুণকুমার চক্রবর্তী, *লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে*, পুস্তকবিপণি, কলকাতা, জুন ২০১০

৯০. বরুণকুমার চক্রবর্তী ও দিব্যজ্যোতি মজুমদার (সম্পাদিত), *বাঙলার লোকসংস্কৃতি*, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, সেপ্টেম্বর-১৯৯৬

৯১. বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, প্র.প্র.১৯৬৮, তৃ.প্র.২০০৯

৯২. বিনোদিনী দাসী, *আমার কথা ও অন্যান্য রচনা*, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৪১৮

৯৩. বিষ্ণু বসু (সম্পাদিত), *বাঙালি মননে মঞ্চ ও নাটক*, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৮

৯৪. বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণ*, সদেশ, কলকাতা, প্রথম সদেশ সংস্করণ ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

৯৫. বিপিনবিহারী গুপ্ত, *পুরাতন প্রসঙ্গ ও বিচিত্র প্রসঙ্গ*, প্রসাদ সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), প্র.প্র. জানুয়ারি ২০১৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৯৬. বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, *যাত্রাগানের ইতিবৃত্ত*, আশা, কলকাতা, প্র প্র.১৩৮৪

৯৭. বৃন্দাবন চন্দ্র কুন্ডু, *বাংলা থিয়েটারের পটভূমি*, প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশ (১ম খণ্ড), অভিষিক্তা পাবলিকেশন, কলকাতা, প্র.প্রকাশ ২০০৮

৯৮. বৃন্দাবন চন্দ্র কুন্ডু, *বাংলা থিয়েটারের পটভূমি*, প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশ (২য় খণ্ড), অভিষিক্তা পাবলিকেশন, কলকাতা, প্র.প্রকাশ ২০০৮

৯৯. বৃন্দাবন চন্দ্র কুন্ডু, *বাংলা থিয়েটারের পটভূমি, প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশ (৩য় খণ্ড)*, অভিষিক্তা পাবলিকেশন, কলকাতা, প্র.প্রকাশ ২৫ ডিসেম্বর, ২০০৯

১০০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫-১৮৭৬)*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ শ্রাবণ ১৪০৫

১০১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *হরিনাথ মজুমদার*, ১৩৫১, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

১০২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, প্রথম সং ১৩৩৯, ব্যবহৃত মুদ্রণ-১৪১৫

১০৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংকলক ও সম্পাদক), সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, প্রথম সং ১৩৪০, ব্যবহৃত মুদ্রণ-১৪০১

১০৪. বৈদ্যনাথ শীল, *বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা*, দ্বি-সং, এ.কে. সরকার এন্ড কোং, কলকাতা, ১৯৭০

১০৫. বিপিন চন্দ্র পাল, *সত্তর বৎসর*, কল্পন, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৫

১০৬. ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা*, দ্বিতীয় পর্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ব্যবহৃত দে'জ সং. ২০১৫

১০৭. মাখনলাল নট্ট, *রঙ্গমঞ্চে নট্ট কোম্পানি*, কমলিনী চক্রবর্তী (অনুলিখন ও সম্পাদনা), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্র. প্র. ২০১৪

১০৮. মহ.মনোয়ার হোসেন, *যাত্রা : দেশপ্রেম ও সমাজচেতনা*, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, আগস্ট-২০১১

১০৯. মণীন্দ্রলাল কুণ্ডু, *বাঙালির নাট্যচেতনার ক্রমবিকাশ*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০

১১০. মঈনউদ্দীন আহম্মদ, *যাত্রার যাত্রা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, প্র. প্র. অক্টোবর ১৯৮৫

১১১. মন্মথ রায়, *লোকনাট্য যাত্রাগান*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ডি.এল. রায় রিডারশিপ বক্তৃতামালা ১৯৭০, প্রকাশকাল ১৯৭৬

১১২. মন্মথমোহন বসু, *বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, দ্বি-সং ১৯৫৯

১১৩. *মঞ্চায়নের জন্য ছাড়পত্র-প্রাপ্ত নাটকের তালিকা*, বাংলাদেশ নাটক সেন্সর কমিটি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, বর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৫

১১৪. মিজান রহমান, *বরিশালের লোকনাটক বিষয় ও পরিবেশনা*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, প্র.প্র. ফেব্রুয়ারি ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

১১৫. মিলনকান্তি দে, *যাত্রাশিল্পের সেকাল-একাল*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

১১৬. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, জুন-১৯৭৯

১১৭. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র (ষষ্ঠ খণ্ড-নবম খণ্ড)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১১৮. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়, *প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য নাট্য-প্রসঙ্গ ও নাট্যোপাদান*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্র.প্রকাশ ২০০৬

১১৯. মুহম্মদ আবদুল জলিল, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নভেম্বর-১৯৮৬

১২০. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

১২১. মোরশেদ শফিউল হাসান, *পূর্ব বাংলায় চিন্তাচর্চা (১৯৪৭-১৯৭০) দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ব্যবহৃত সংস্করণ আগস্ট ২০১২।

১২২. মোতাহার হোসেন সুফী, *রঙ্গপুরের নাট্যচর্চার ইতিহাস*, মুক্তধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-২০১২

১২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জীবনস্মৃতি*, বিশ্বভারতী, কলিকাতা,১৩৯৮

১২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছেলেবেলা, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪০২

১২৫. রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও অনিরুদ্ধ রায় (সম্পা), *মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*, রামকান্ত চক্রবর্তী, মধ্যযুগের বাংলার বৈষ্ণবধর্ম এবং তার প্রভাব, কে.পি. বাগচী, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১২

১২৬. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১১

১২৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, *মধ্যযুগ*, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, পঞ্চম সংস্করণ ১৯৯৮

১২৮. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *আধুনিক যুগ*, ঐ, ব্যবহৃত মুদ্রণ ২০০৫

১২৯. রামেন্দু মজুমদার (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের নাট্যচর্চার তিনদশক*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, মার্চ ১৯৯৯

১৩০. রামেন্দু মজুমদার (সম্পাদিত), *নাটক তত্ত্ব ও শিল্পরূপ*, (নাট্যকলা বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন), সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুন ২০১৩

১৩১. রাহমান চৌধুরী, *রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মঞ্চনাটক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন-২০০৭

১৩২. শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, *বাঙলার নাটক ও নাট্যশালা*,

১৩৩. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *বাংলা সাহিত্যে নবযুগ*, *এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং*, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ-মাঘ, ১৩৬৩

১৩৪. শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য*, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-২০০৬

১৩৫. শামসুজ্জামান খান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য*, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,

Dhaka University Institutional Repository

জুন-২০০৮

১৩৬. শিশির কর, *ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই*, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৮৮

১৩৭. সঞ্জীব নাথ, *বাংলার লোকনাট্য : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য*, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, জানুয়ারী, ২০০৩

১৩৮. সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা (১১০০-১৯০০)*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭৪

১৩৯. সাইমন জাকারিয়া, *বাংলাদেশের লোক নাটক-বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

১৪০. সাইমন জাকারিয়া, মর্তুজা, নাজমীন, ফোকলোর ও লিখিত সাহিত্য - *জারিগানের আসরে বিষাদ-সিন্ধু আত্তীকরণ ও পরিবেশন-পদ্ধতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্র.প্র. ফেব্রুয়ারি ২০১১

১৪১. সাইদুর রহমান লিপন, *বাংলাদেশের লোকনাট্যে অভিনয় পদ্ধতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১০

১৪২. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, *নাট্যতত্ত্বমীমাংসা*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্র.প্র.১৯৬৩

১৪৩. সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার (সম্পাদিত), *প্রবন্ধ সঞ্চয়ন*, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০০৬

১৪৪. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, *জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি*, সংহতি, ঢাকা, প্র. প্র.২০১৫

১৪৫. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, *বাংলা নাটকের বিবর্তন*, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৭৩

১৪৬. সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যোৎসব কতিপয় দলিল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্র.প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

১৪৭. সুরজিত বন্দোপাধ্যায়, *যাত্রায় স্বপনকুমার*, থীমা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০১১

১৪৮. সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্র.প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

১৪৯. সুবীর রায় চৌধুরী, *বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দে'জ পুনঃ প্রকাশ ১৯৯৯

১৫০. সুকুমার সেন, *নট নাট্য নাটক*, মিত্র এন্ড ঘোষ, কলকাতা, ১৩৭২

১৫১. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১)*, আনন্দ, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৮

১৫২. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২)*, ঐ, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭৫

১৫৩. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৩)*, ঐ, সপ্তম সংস্করণ, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ

১৫৪. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৪)*, ঐ, পঞ্চম মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৭

১৫৫. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৫)*, ঐ, পঞ্চম মুদ্রণ, জুন ২০০৯

১৫৬. সুশান্ত সরকার ও নাজমুল আহসান (সম্পাদিত), *যাত্রা : উদ্ভব ও বিকাশ*, লোকনাট্য ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কেন্দ্র (লোসাউক), খুলনা, ১৯৯৪

১৫৭. সেলিম আল দীন, *মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন- ১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

১৫৮. সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্যকোষ*, *সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র ৫*, সাইমন জাকারিয়া (সম্পাদিত), প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১০

১৫৯. সেলিম মোজাহার, *স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকাকেন্দ্রিক মঞ্চনাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে-২০০৮

১৬০. সোমেন্দ্রচন্দ নন্দী, *বাংলা ঐতিহাসিক নাটক সমালোচনা*, বঙ্গীয় নাট্য সংসদ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮১

১৬১. সৈকত আসগর (সম্পাদিত), *বাংলার লোকঐতিহ্য : লোকনাট্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্র.প্র. নভেম্বর-১৯৯৯।

১৬২. সৈকত আসগর (সম্পাদিত), *বাংলার লোকসংস্কৃতি : যাত্রাশিল্প*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্র.প্র. এপ্রিল-২০০২

১৬৩. সৈয়দ জামিল আহমেদ, *হাজার বছর : বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, জুন-১৯৯৫

১৬৪. সৌগত চট্টোপাধ্যায়, *লোকসংস্কৃতি অন্দর মহল-বার মহল*, পুস্তকবিপণি, কলকাতা, এপ্রিল ২০১০

১৬৫. স্বরোচিষ সরকার, *মুকুন্দদাস : ১৮৭৮-১৯৩৪*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭

১৬৬. স্বামী অভেদানন্দ, *আমার জীবনকথা*, শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, প্র.সং.১৯৬৪, পঞ্চম সং.২০০৮

১৬৭. স্বামী অভেদানন্দ, *আমার জীবনকথা*, শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা, প্র.সং.১৯৬৪, পঞ্চম সং.২০০৮

১৬৮. স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (সম্পাদিত), *উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি*, পুস্তকবিপণি, কলকাতা, নভেম্বর ২০০৩

১৬৯. স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত (সম্পাদিত), *বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, পুস্তকবিপণি, কলকাতা, এপ্রিল ২০১০

১৭০. যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, *পদাবলিতে নিমাই সন্ন্যাস*, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ডিসেম্বর-২০০৯

১৭১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় , *গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, এপ্রিল-১৯৭২

১৭২. হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল-১৯৬১

১৭৩. হীরালাল দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল*, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭২

১৭৪. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *তরী হতে তীর*, মণীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৮৬

Dhaka University Institutional Repository

২.২ ইংরেজি গ্রন্থ

1. Balwant Gargi, *Folk Theatre of India*, 1991, Rupa & Co, Calcutta,
2. Durant Will, *THE Case for INDIA*, Simon and Schuster, New York.
3. Faubion Bowers, *Theatre in the East*, A surgery of Asian Drama,Grove press Inc, New York, 1956
4. Kironmoy Raha, *Bengali Theatre*, National Book Trust, India, 1978,
5. Mary Frances Dunham, *Jarigan: Muslim Epic Songs of Bangladesh*, The University Press Limited, Bangladesh, 1997
6. P Guha-Thakurta, *The Bengali Drama: Its origin and development*, Kegan paul, Trech,Trubner & co, London, 1930
7. Shushil Kumar De, *Bengali Literature in the Nineteenth Century 1757-1857*, Firma K.L Mukhopadhyay, Calcutta, 1962
8. Sayed Jamil Ahmed, *Achinpakhi Infinity The Indigenous theatre of Bangladesh*, The University Press Limited, Dhaka 2000
9. Syed Mahammad Shahed, *Asthetic of Gandhi*, Adorn publication, Dhaka, 2012
10. Hemendranath Dasgupta, *Indian Stage*, Vol-1.

২.৩ পত্রিকা

১. অরূপ দাস (সম্পাদিত), *তাঁতঘর একুশ শতক*, পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, মার্চ ২০০৮

২. প্রভাত কুমার দাস (সম্পাদিত), *যাত্রা আকাদেমি পত্রিকা*, পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি, কলকাতা, তৃতীয় সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৮

৩. ঐ, *যাত্রা আকাদেমি পত্রিকা*, পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি, কলকাতা, চতুর্থ সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৯

৪. ঐ, *যাত্রা আকাদেমি পত্রিকা*, পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি, কলকাতা, পঞ্চম সংখ্যা, জুন ২০১০

৫. প্রভাত কুমার দাস ও সুবিমল মিশ্র (সম্পাদিত), *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, সাময়িক পত্র বিশেষ সংখ্যা, ১১৩ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৪১৩, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা,পুর্ণমুদ্রণ-১৪১৭

৬. প্রভাতকুমার দাস (সম্পাদিত), *বিশেষ বাংলা যাত্রা সংখ্যা*, বহুরূপী , সংখ্যা ১২৪, অক্টোবর, ২০১৫

৭. সনৎ কুমার মিত্র (সম্পাদিত), *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, যাত্রা বিশেষ সংখ্যা-১, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০১

৮. সনৎ কুমার মিত্র (সম্পাদিত), *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, যাত্রা বিশেষ সংখ্যা-২, কার্তিক-পৌষ ১৪০১

৯. সারা আরা মাহমুদ (সম্পাদিত), *লোকনাট্য*, নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০১২

১০. সুবীর মিত্র (সম্পাদিত), যাত্রা আকাদেমি পত্রিকা, *ব্রজেন্দ্র কুমার দে সংখ্যা*, পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি, কলকাতা, ডিসেম্বর- ২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

২.৪ স্মরণিকা

১. আবুল কামাল শফি আহমেদ (সম্পাদিত), *সপ্তাহব্যাপী যাত্রা উৎসব-২০০৮*, স্মরণিকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, মার্চ-২০০৮

২. এস. এম. মহসীন (সম্পাদিত), *জাতীয় যাত্রা উৎসব* ১৯৯২-৯৩, স্মরণিকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, জানুয়ারী-১৯৯৩

৩. মনিরুজ্জামান মনির (সম্পাদিত), *সপ্তাহব্যাপী যাত্রা উৎসব-২০০৬*, স্মরণিকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, মার্চ-২০০৬

৪. মুজিবর রহমান খান (সম্পাদিত), *জাতীয় যাত্রা উৎসব* ১৯৭৯-৮০, স্মরণিকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর-১৯৭৯

৫. সারা আরা মাহমুদ (সম্পাদিত), *যাত্রা : ঐতিহ্যের নবজাগরণ*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০০৮

৬. সারা আরা মাহমুদ(সম্পাদিত), *লোকনাট্য সপ্তাহ-২০১০*, স্মরণিকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, এপ্রিল-২০১০

7. *Jatra: Our Heritage*, Bangladesh Shilpakala Academy, June-2000

২.৫ অভিধান

১. অলোক রায় (সম্পাদিত), *সাহিত্যকোষ নাটক*, বাগর্থ।

২. ওয়াকিল আহমদ, *লৌকিক জ্ঞানকোষ*, গতিধারা, ঢাকা, প্র.প্র. জুন ২০১১

৩. করুণাময় গোস্বামী, *সঙ্গীতকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

৪. কাজী আবদুল ওদুদ, *ব্যবহারিক শব্দকোষ*, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, প্রকাশসাল উল্লেখ নেই।

৫. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*, দি ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৩৭

৬. নগেন্দ্রনাথ বসু, *বাংলা বিশ্বকোষ*, পঞ্চদশ ভাগ, বিআর পাবলিশিং কর্পোরেশন, ১৩১১

৭. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুরী, *পুরাণ কোষ*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্র. প্র.আগস্ট ২০১৬

৮. পি. আচার্য, *শব্দসন্ধান শব্দাভিধান*, বিকাশ গ্রন্থ ভবন, কলকাতা, প্র. ১৯৯২, ব্যবহৃত সং ১৯৯৬

৯. বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদিত), *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটর, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৫

১০. বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *সংসদ বাংলা নাট্য অভিধান*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০

১১. *বাংলা পিডিয়া (৮ম খণ্ড)* : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩

১২. দুলাল চৌধুরী (সম্পাদিত), *বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা, প্র.প্র. ২০০৪

১৩. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ, জুন ২০০৯।

১৪. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *যথাশব্দ*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা, চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ ২০১১

১৫. রাজশেখর বসু, *চলন্তিকা অভিধান*, এমসি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নতুন সংস্করণ ১৪২১

১৬. সুকুমার সেন, *ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধার্থ বাংলা-কোষ*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

১৭. সন্ধ্যা দে, *বাংলা নাট্যকোষ*, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১০

১৮. সুভাষ ভট্টাচার্য, *সংসদ ইতিহাস অভিধান (২য় খণ্ড)*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, জানু ২০১৩

১৯. সুবলচন্দ্র মিত্র, *সরল বাংলা অভিধান*, নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্র. প্র.১৯০৬, ব্যবহৃত সংস্করণ ২০১৩

২০. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ জুলাই ২০১০

২১. সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত), *পৌরাণিক অভিধান*, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ পৌষ ১৪০৪

২২. সুশীলকুমার দে ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *ভারতকোষ* (১ম খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৭১

২৩. সুশীলকুমার দে ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *ভারতকোষ* (২য় খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩

২৪. সুশীলকুমার দে ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *ভারতকোষ* (৩য় খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৭৪

২৫. সুশীলকুমার দে ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *ভারতকোষ* (৫ম খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৮০

২৬. সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম (সম্পাদিত), *চরিতাভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ এপ্রিল-২০০৩

২৭. সৈয়দ মোহাম্মাদ শাহেদ (সম্পাদিত), *বাংলা একাডেমী লেখক অভিধান*, একাডেমী, ঢাকা, পরিমার্জিত সং. সেপ্টেম্বর ২০০৮

২৮. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম খণ্ড।।অ-ন, অষ্টম মুদ্রণ : ২০১১

২৯. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, সাহিত্য অকাদেমি, দ্বিতীয় খণ্ড।।প-হ, অষ্টম মুদ্রণ : ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১.বাংলাদেশের যাত্রাদলের প্রতিষ্ঠাকাল-ভিত্তিক তালিকা

ক্রম	যাত্রাদল	প্রতিষ্ঠা	অধিকারী	জেলা
১.	স্বদেশী যাত্রাপালা	১৯০৫	মুকুন্দ দাস	বরিশাল
২.	নাগ-দত্ত-সিংহ-রায় কোম্পানি	১৯০৬	রজনীকান্ত নাগ, মহেন্দ্রনাথ সিংহ প্রমুখ	ঝালকাঠি
৩.	আদি ভোলানাথ অপেরা	১৯০৭	মহেন্দ্রকুমার সেন	শরিয়তপুর
৪.	নাগ-সিংহ কোম্পানি	১৯০৭	রজনীকান্ত নাগ, মহেন্দ্রনাথ সিংহ প্রমুখ	ঝালকাঠি
৫.	নাগ কোম্পানি	১৯০৮	রজনীকান্ত নাগ	ঝালকাঠি
৬.	সিংহ কোম্পানি	১৯০৮	মহেন্দ্র সিংহ	ঝালকাঠি
৭.	ঠাকুর কোম্পানি	১৯০৯	রজনীকান্ত চক্রবর্তী ও শশীভূষণ নট্ট	ঝালকাঠি
৮.	অক্ষয়বাবুর দল	১৯১০	অক্ষয়বাবু	ঢাকা
৯.	কেষ্টসাহার দল	১৯১০	কৃষ্ণচন্দ্র সাহা	নোয়াখালী
১০.	নীলমাধবের দল	১৯১০	নীলমাধব মুখোপাধ্যায়	যশোর
১১.	মাছরঙ বৈকুণ্ঠ নাট্য সমাজ	১৯১৪	বৈকণ্ঠনাথ নট্ট	ঝালকাঠি
১২.	লেডি কোম্পানি	১৯১৫	শ্রীমতি বোঁচা	ঝালকাঠি
১৩.	পাষাণময়ী অপেরা	১৯১৬	স্বর্ণকুমার রায়, রমণীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও রজনীকান্ত গুহ	বরিশাল
১৪.	বিল্বগ্রাম নট্টকোম্পানি	১৯১৮	কালীচরণ নট্ট	বরিশাল
১৫.	গৌরপ্রমাণিকের দল	১৯২০	গৌরচন্দ্র প্রামাণিক	নড়াইল
১৬.	নট্টকোম্পানি যাত্রা পার্টি	১৯২৪	বৈকুণ্ঠনাথ নট্ট	ঝালকাঠি
১৭.	রণজিৎ অপেরা	১৯২৮	কালিয়দমন গুহঠাকুরতা	বরিশাল
১৮.	মুসলিম যাত্রা পার্টি	১৯৩০	মোজাহার আলী সিকদার	পটুয়াখালী
১৯.	শঙ্কর অপেরা পার্টি	১৯৩১	নবদ্বীপচন্দ্র সাহা	ফরিদপুর
২০.	নবদ্বীপচন্দ্র সাহা যাত্রাপার্টি	১৯৩১	নবদ্বীপচন্দ্র সাহা	ফরিদপুর
২১.	জাতীয় আনন্দ প্রতিষ্ঠান	১৯৩৪	সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ফরিদপুর
২২.	অন্নপূর্ণা যাত্রাপার্টি	১৯৪৪	কার্তিকচন্দ্র সাহা	মানিকগঞ্জ
২৩.	জয়দূর্গা অপেরা	১৯৪৭	যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
২৪.	রায়কোম্পানি যাত্রাপার্টি	১৯৪৯	বিধুভূষণ রায়	গোপালগঞ্জ

Dhaka University Institutional Repository

২৫.	নাথ কোম্পানি	১৯৫০	গোপালকৃষ্ণ নাথ	ঝালকাঠি
২৬.	বাসন্তী মুক্তমঞ্চ নাট্যপ্রতিষ্ঠা	১৯৫৪	নারায়ণচন্দ্র দত্ত	সিরাজগঞ্জ
২৭.	ভোলানাথ অপেরা	১৯৫৫	যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
২৮.	খালপাড়ের দল	১৯৫৭	ছেরু মিয়া	মুন্সিগঞ্জ
২৯.	বাবুল অপেরা	১৯৫৮	আমিন শরীফ চৌধুরী	চট্টগ্রাম
৩০.	ভাগ্যলক্ষ্মী অপেরা	১৯৬০	গোপালকৃষ্ণ পাণ্ডে	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৩১.	রয়েল ভোলানাথ অপেরা	১৯৬২	গোপালকৃষ্ণ পাণ্ডে	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৩২.	রাজলক্ষ্মী অপেরা	১৯৬২	নওশের ফকির	খুলনা
৩৩.	বাবুল যাত্রাপার্টি	১৯৬৬	মোজাহার আলী শিকদার	পটুয়াখালী
৩৪.	নবরঞ্জন অপেরা	১৯৬৬	আবদুল হামিদ	ময়মনসিংহ
৩৫.	গীতশ্রী যাত্রা ইউনিট	১৯৬৭	গোপালচন্দ্র রুদ্র	চট্টগ্রাম
৩৬.	বুলবুল অপেরা	১৯৬৭	আবদুল খালেক ভুঁইয়া	ময়মনসিংহ
৩৭.	নিউ বাসন্তী অপেরা	১৯৬৮	স্বপনকুমার সাহা	ফরিদপুর
৩৮.	দীপালি অপেরা	১৯৬৯	ধীরেন্দ্রকুমার বাকচী	গোপালগঞ্জ
৩৯.	রঙমহল অপেরা	১৯৬৯	শেখ খলিলুর রহমান	নড়াইল
৪০.	জয়শ্রী অপেরা	১৯৭০	পরিমল হালদার	বাগেরহাট
৪১.	আদি দীপালি অপেরা	১৯৭২	ধীরেন্দ্রকুমার বাকচী	গোপালগঞ্জ
৪২.	নিউ গণেশ অপেরা	১৯৭২	গণেশচন্দ্র ঘোষ	মানিকগঞ্জ
৪৩.	কোহিনূর অপেরা	১৯৭২	লিপাই মিয়া	হবিগঞ্জ
৪৪.	সবুজ অপেরা	১৯৭২	নুরুল ইসলাম, পরে দেলোয়ার হোসেন বাচ্চু	ময়মনসিংহ
৪৫.	রূপশ্রী অপেরা	১৯৭২	খগেন লস্কর	নওগাঁ
৪৬.	জগন্নাথ অপেরা	১৯৭২	ডা. ব্রজেন্দ্রকুমার মণ্ডল	মানিকগঞ্জ
৪৭.	অম্বিকা যাত্রাপার্টি	১৯৭২	ভানু সাহা	মানিকগঞ্জ
৪৮.	বিশ্বজিৎ অপেরা	১৯৭২	রামপদ সাহা	সাতক্ষীরা
৪৯.	শিরিন যাত্রা ইউনিট	১৯৭২	ফজলুল করিম বিশ্বাস	খুলনা
৫০.	১ নং দীপালি অপেরা	১৯৭৩	বনশ্রী বাকচী	গোপালগঞ্জ
৫১.	জোনাকী অপেরা	১৯৭৩	নিরঞ্জন রায়	যশোর
৫২.	আদি মিতালী অপেরা	১৯৭৩	আজিজুল আলম চৌধুরী	রাজশাহী

Dhaka University Institutional Repository

৫৩.	বিজয়লক্ষ্মী অপেরা	১৯৭৪	করম আলী ভুঁইয়া	ঢাকা
৫৪.	হারুন অপেরা	১৯৭৪	হারুনুর রশিদ খান	হবিগঞ্জ
৫৫.	তরুণ যাত্রা পার্টি	১৯৭৪	সেলিম চৌধুরী	ফেনি
৫৬.	স্মরণিকা অপেরা	১৯৭৪	বদরুল চৌধুরী	কুমিল্লা
৫৭.	উত্তম অপেরা	১৯৭৪	অখিলচন্দ্র দাস	খুলনা
৫৮.	বিশ্বরূপ অপেরা	১৯৭৪	কালু মাস্টার	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৫৯.	তুষার অপেরা	১৯৭৪	তুষার দাশগুপ্তা, পরে শর্বরী দাশগুপ্তা	যশোর
৬০.	চারণিক নাট্যগোষ্ঠি	১৯৭৪	তাপস সরকার, পরে অমলেন্দু বিশ্বাস, পরে জোৎস্না বিশ্বাস	মানিকগঞ্জ
৬১.	বাণীশ্রী মুক্তমঞ্চ নাট্যপ্রতিষ্ঠান	১৯৭৪	নিরঞ্জনচন্দ্র কুণ্ডু	সিরাজগঞ্জ
৬২.	বঙ্গশ্রী অপেরা	১৯৭৪	নুর মো. হাওলাদার	বাগেরহাট
৬৩.	নব দীপালি অপেরা	১৯৭৪	ধীরেন্দ্রকুমার বাকচী	গোপালগঞ্জ
৬৪.	দীপ দীপালি অপেরা	১৯৭৪	ধীরেন্দ্রকুমার বাকচী	গোপালগঞ্জ
৬৫.	গীতাঞ্জলি অপেরা	১৯৭৪	আলাউদ্দিন আহমদ	কুষ্টিয়া
৬৬.	নবজাগরণ অপেরা	১৯৭৪	আবদুল জব্বার ভুঁইয়া	নারায়ণগঞ্জ
৬৭.	নবারুণ নাট্যসংস্থা	১৯৭৪	ললিতমোহন ঘোষ	চট্টগ্রাম
৬৮.	১নং বঙ্গশ্রী অপেরা	১৯৭৫	নুর মো. হাওলাদার ও আলাউদ্দিন আহমদ হারুমিয়া	বাগেরহাট
৬৯.	জ্যোৎস্না অপেরা	১৯৭৫	আফজাল হোসেন মোল্লা	বাগেরহাট
৭০.	বৈকালী অপেরা	১৯৭৫	প্রহ্লাদ বিশ্বাস (হিটলার)	যশোর
৭১.	তপোবন নাট্যসংস্থা	১৯৭৫	সুভাষচন্দ্র সরকার মণ্টু	বরিশাল
৭২.	আনন্দময়ী অপেরা পার্টি	১৯৭৬	ফণী গোস্বামী	মানিকগঞ্জ
৭৩.	বাসুদেব অপেরা পার্টি	১৯৭৬	সাধুচরণ পণ্ডিত ও যুধিষ্ঠির মণ্ডল	মানিকগঞ্জ
৭৪.	নিউ বলাকা অপেরা	১৯৭৬	আবদুস সালাম বাচ্চু	বগুড়া
৭৫.	অগ্রদূত নাট্যসংস্থা	১৯৭৬	এমএ চৌধুরী	চট্টগ্রাম
৭৬.	আজাদ অপেরা	১৯৭৬	গিয়াউদ্দিন আহমেদ	নারায়ণগঞ্জ
৭৭.	লিলি অপেরা	১৯৭৬	মোতাহার মিয়া	নোয়াখালী
৭৮.	নবচন্দন অপেরা	১৯৭৬	খোকন চৌধুরী	নারায়নগঞ্জ
৭৯.	কোহিনূর অপেরা	১৯৭৬	আফতাবউদ্দিন, পরে আয়শা আখতার	মানিকগঞ্জ

Dhaka University Institutional Repository

			(না. গঞ্জ)	
৮০.	উদয়ন নাট্যসংস্থা	১৯৭৬	প্রাণবল্লভ ঘোষ	চট্টগ্রাম
৮১.	বলাকা অপেরা	১৯৭৬	শেখ বোরহানউদ্দিন	মানিকগঞ্জ
৮২.	বঙ্গলক্ষ্মী অপেরা	১৯৭৬	পাণ্ডব আলী	কুমিল্লা
৮৩.	নববঙ্গশ্রী অপেরা	১৯৭৬	চুন্নু মিয়া	বাগেরহাট
৮৪.	বঙ্গদিপালী অপেরা	১৯৭৬	শচীন ঘোষ	মানিকগঞ্জ
৮৫.	আদি সবুজ অপেরা	১৯৭৬	প্রশান্তকুমার রায়	ময়মনসিংহ
৮৬.	আনন্দ অপেরা	১৯৭৭	নিখিলকুমার রায়	পাবনা
৮৭.	লক্ষ্মণ দাস অপেরা	১৯৭৭	বীরেন্দ্র দাস	বরিশাল
৮৮.	সাধনা অপেরা	১৯৭৭	আবদুল মালেক মোড়ল	খুলনা
৮৯.	নিশিবানী অপেরা	১৯৭৭	খোকন চৌধুরী	নারায়ণগঞ্জ
৯০.	মিতালী অপেরা	১৯৭৭	ডাবলু মিয়া	ময়মনসিংহ
৯১.	দি নবরঞ্জন অপেরা	১৯৭৭	শাহ আবদুল মন্নাফ	ময়মনসিংহ
৯২.	জনতা অপেরা	১৯৭৮	নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস	সিরাজগঞ্জ
৯৩.	শামীম অপেরা	১৯৭৮	আবু চেয়ারম্যান	রংপুর
৯৪.	আরতি অপেরা	১৯৭৮	আরতিরানী বিশ্বাস	খুলনা
৯৫.	প্রদীপ অপেরা	১৯৭৮	প্রদীপ বিশ্বাস	খুলনা
৯৬.	ভদ্রা অপেরা	১৯৭৮	আহমদ সরদার	খুলনা
৯৭.	প্রতিমা অপেরা	১৯৭৮	গণেশচন্দ্র কুণ্ডু	যশোর
৯৮.	আদি ঝর্ণা অপেরা	১৯৭৮	মহিউদ্দিন মনির	মাদারীপুর
৯৯.	তরুণ অপেরা	১৯৭৮	মতিউর রহমান	বরিশাল
১০০.	দি গীতাঞ্জলি অপেরা	১৯৭৮	ডা. তোফাজ্জল হোসেন	কুষ্টিয়া
১০১.	রূপালি যাত্রা পার্টি	১৯৭৮	শামসুদ্দিন হাওলাদার	কুমিল্লা
১০২.	নরনারায়ণ অপেরা	১৯৭৯	জগদানন্দ ঠাকুর	গোপালগঞ্জ
১০৩.	লায়ন অপেরা	১৯৭৯	লাল মিয়া	ময়মনসিংহ
১০৪.	চলন্তিকা নাট্যসংস্থা	১৯৭৯	অজিত সাহা	টাঙ্গাইল
১০৫.	রূপাঞ্জলি নাট্যসংস্থা	১৯৭৯	আনিস আহমদ	বরিশাল
১০৬.	নাসির অপেরা	১৯৭৯	আলী আহমদ	বরগুনা
১০৭.	আদি গীতাঞ্জলি অপেরা	১৯৭৯	শেখ আজিজুর রহমান ও আখতার	কুষ্টিয়া

Dhaka University Institutional Repository

			সিদ্দিকী	
১০৮.	মিলন যাত্রা ইউনিট	১৯৭৯	আবদুল মজিদ সরদার	খুলনা
১০৯.	রূপালী অপেরা	১৯৭৯	শাসমু মিয়া, পরে সানু আক্তার (না.গঞ্জ)	কুমিল্লা
১১০.	সুমি নাট্যসংস্থা-১	১৯৭৯	আনোয়ার আলী	নরসিংদী
১১১.	মিতালী অপেরা	১৯৭৯	আমিনুল হক সরকার	দিনাজপুর
১১২.	রয়েল বীণাপানি অপেরা	১৯৮০	আনিছুর রহমান	বগুড়া
১১৩.	দি সাধনা অপেরা	১৯৮০	আবদুল মালেক মোড়ল	খুলনা
১১৪.	মানিক অপেরা	১৯৮০	মানিক সেন	যশোর
১১৫.	বঙ্গবাণী অপেরা	১৯৮০	আবুল খায়ের মিয়া	গোপালগঞ্জ
১১৬.	সবিতা অপেরা	১৯৮২	আলফাজ মিয়া	সাতক্ষীরা
১১৭.	ভাগ্যলিপি অপেরা	১৯৮২	আবদুল হাই মাস্টার, পরে মমতাজ বেগম মায়া (ঢাকা)	নোয়াখালী
১১৮.	নবপ্রভাত অপেরা	১৯৮২	সুকুমার কর্মকার	মানিকগঞ্জ
১১৯.	অগ্রগামী যাত্রা ইউনিট	১৯৮২	এহসানুল মেম্বার	সাতক্ষীরা
১২০.	সুদর্শন অপেরা	১৯৮২	নির্মলকুমার সরদার	যশোর
১২১.	সোনার বাংলা অপেরা	১৯৮২	কলিপদ শীল	খুলনা
১২২.	স্বর্ণকলি অপেরা	১৯৮২	সন্তোষকুমার বিশ্বাস	গোপালগঞ্জ
১২৩.	দি তরুণ অপেরা	১৯৮৩	সুকুমার সরদার	যশোর
১২৪.	সত্যনারায়ণ অপেরা	১৯৮৩	নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল	মানিকগঞ্জ
১২৫.	সারথি যাত্রা ইউনিট	১৯৮৩	জগদীশচন্দ্র বর্মণ	যশোর
১২৬.	নিউ গীতশ্রী যাত্রা ইউনিট	১৯৮৩	মফিজুল আলম খোকা	যশোর
১২৭.	উজ্জ্বল নাট্যসংস্থা	১৯৮৪	নৃপেন বাবু	মাগুরা
১২৮.	অঞ্জলি অপেরা	১৯৮৪	শৈলেন রায়	গোপালগঞ্জ
১২৯.	আদি অগ্রগামী যাত্রাসমাজ	১৯৮৪	ননী চক্রবর্তী	ঢাকা
১৩০.	রাজনীলা নাট্যসংস্থা	১৯৮৪	খোন্দকার আতাউর রহমান	ফরিদপুর
১৩১.	জনতা যাত্রা ইউনিট	১৯৮৪	মো. নুরুল ইসলাম	রংপুর
১৩২.	কাকলী নাট্যসংস্থা	১৯৮৪	আবুল কালাম	মানিকগঞ্জ
১৩৩.	সোনালী অপেরা	১৯৮৪	মোহাম্মসদ আলী চৌধুরী	গাজীপুর
১৩৪.	চাঁদনী অপেরা	১৯৮৪	আবদুর রশীদ, পরে বীণা বেগম	কুমিল্লা

Dhaka University Institutional Repository

১৩৫.	আদি বলাকা অপেরা	১৯৮৪	খোন্দকার আলিমুজ্জামান	ফরিদপুর
১৩৬.	অগ্রগামী নাট্যসংস্থা	১৯৮৪	গৌরাঙ্গ বিশ্বাস, পরে তারাপদ কর্মকার	রাজবাড়ী
১৩৭.	আঞ্জু অপেরা	১৯৮৪	হামিদ মণ্ডল	জামালপুর
১৩৮.	আর্য অপেরা	১৯৮৪	মেহবুব ইসলাম, পরে মজিবুর রহমান	সাতক্ষীরা
১৩৯.	বাঁশরিয়া সৌখিন নাট্যদল	১৯৮৪	মো. জালালউদ্দিন	নরসিংদী
১৪০.	নিউ রাজদূত অপেরা	১৯৮৪	বজলুর রহমান	যশোর
১৪১.	সুন্দরবন নাট্যসংস্থা	১৯৮৫	ইউনুস সানা	সাতক্ষীরা
১৪২.	রূপশ্রী অপেরা	১৯৮৫	রতন মিয়া	কুমিল্লা
১৪৩.	মধুমিতা নাট্যসংস্থা	১৯৮৫	আবদুর রহমান প্রধান	মানিকগঞ্জ
১৪৪.	নবযুগ অপেরা	১৯৮৫	রাধাচরণ সাহারায়, পরে দীলু বণিক	নেত্রকোণা
১৪৫.	প্রগতি নাট্যসংস্থা	১৯৮৫	তমসের সিকদার	মানিকগঞ্জ
১৪৬.	সোনালী অপেরা	১৯৮৫	পরিতোষ ব্রহ্মচারী	খুলনা
১৪৭.	নবরূপা অপেরা	১৯৮৫	হায়দার আলী	মানিকগঞ্জ
১৪৮.	স্বপন অপেরা	১৯৮৫	স্বপন বাবু	ভোলা
১৪৯.	বেঙ্গল অপেরা	১৯৮৬	আবদুর রশীদ ফকির	ময়মনসিংহ
১৫০.	মহানগরী যাত্রা ইউনিট	১৯৮৬	কেএম হারুনুর রশিদ	মানিকগঞ্জ
১৫১.	নিউ জয়ন্তী অপেরা	১৯৮৬	সাকেলা বেগম, পরে এসএম ইকবাল রুমি	মানিকগঞ্জ
১৫২.	আদি প্রগতি নাট্যসংস্থা	১৯৮৬	আ. জলিল সিকদার (তারামিয়া)	মানিকগঞ্জ
১৫৩.	রত্নশ্রী অপেরা	১৯৮৬	এস আলম লাবু	মাদারীপুর
১৫৪.	নিউ ফাল্গুনী নাট্যসংস্থা	১৯৮৬	সুধীর বিশ্বাস	গোপালগঞ্জ
১৫৫.	চণ্ডী অপেরা	১৯৮৬	সাধনকুমার মুখার্জী গণেশ	যশোর
১৫৬.	চন্দ্রা অপেরা	১৯৮৬	অসীমকান্তি বল	গোপালগঞ্জ
১৫৭.	সুমি নাট্যসংস্থা-২	১৯৮৭	শামসু হক, পরে আয়শা আত্তার	নরসিংদী
১৫৮.	কপোতাক্ষ যাত্রা ইউনিট	১৯৮৭	নূর খাঁ চেয়ারম্যান	সাতক্ষীরা
১৫৯.	মহুয়া নাট্যসংস্থা	১৯৮৮	আদব আলী	নেত্রকোণা
১৬০.	নিউ প্রতিমা অপেরা	১৯৮৭	শিপ্রা সরকার উমা ও সুশীল সরকার	মানিকগঞ্জ
১৬১.	মণিহার যাত্রা ইউনিট	১৯৮৮	সাত্তার মিয়া	সাতক্ষীরা
১৬২.	মণিহার অপেরা	১৯৮৮	শহীদ মিয়া	নেত্রকোণা

Dhaka University Institutional Repository

১৬৩.	নিউ রূপশ্রী অপেরা	১৯৮৮	মোজাফ্ফর চৌধুরী	দিনাজপুর
১৬৪.	শাহী অপেরা	১৯৮৮	আবদুল মান্নান	নেত্রকোণা
১৬৫.	পলাশ অপেরা	১৯৮৮	বাদল খান	মানিকগঞ্জ
১৬৬.	দুর্বার অপেরা	১৯৮৮	আজগর আলী	নারায়ণগঞ্জ
১৬৭.	নিউ প্রভাস অপেরা	১৯৮৯	কার্তিকচন্দ্র দাশ	সাতক্ষীরা
১৬৮.	সততা নাট্যসংস্থা	১৯৮৯	গোবিন্দলাল সাহা	জামালপুর
১৬৯.	নাট্যমঞ্জুরী যাত্রা ইউনিট	১৯৮৯	মিনতি বসু ও সুকল্যাণ বসু	সাতক্ষীরা
১৭০.	বাসন্তী অপেরা	১৯৮৯	আশরাফ মিয়া সিদ্দিকী	নাটোর
১৭১.	বিউটি অপেরা	১৯৮৯	আনোয়ার হোসেন	নারায়ণগঞ্জ
১৭২.	রাজমহল অপেরা	১৯৮৯	গোষ্ঠবিহার মণ্ডল, পরে শেখ বেলালউদ্দিন বিলু	খুলনা
১৭৩.	শিল্পীতীর্থ নাট্যসংস্থা	১৯৮৯	সোহরাব তালুকদার	নাটোর
১৭৪.	বিশ্ববাণী যাত্রা ইউনিট	১৯৯০	মুজিবর রহমান সরদার	নাটোর
১৭৫.	জনান্তিক নাট্যগোষ্ঠি	১৯৯০	ননীগোপাল সরকার	নেত্রকোণা
১৭৬.	আকাঙ্ক্ষা নাট্যদল	১৯৯০	মো. আবদুল হালিম	ঢাকা
১৭৭.	রাজধানী যাত্রা ইউনিট	১৯৯০	মো. নজরুল ইসলাম	ঢাকা
১৭৮.	পারুল অপেরা	১৯৯০	শহিদুল ইসলাম	যশোর
১৭৯.	মধুছন্দা যাত্রা ইউনিট	১৯৯১	শাহনেওয়াজ ফিরোজ স্বপন	ফরিদপুর
১৮০.	দি সিজার্স যাত্রা ইউনিট	১৯৯১	শামসুল আলম	যশোর
১৮১.	সোহাগ অপেরা	১৯৯১	জাকির হোসেন সিকদার	ঢাকা
১৮২.	রামকৃষ্ণ যাত্রা ইউনিট	১৯৯১	কৃষ্ণারানী চক্রবর্তী	বাগেরহাট
১৮৩.	বিশ্বেশ্বরী নাট্যসংস্থা	১৯৯১	আলমগীর হোসেন	ঢাকা
১৮৪.	বিপ্লব নাট্যসংস্থা	১৯৯১	বিষ্ণুপদ রায়	মাগুরা
১৮৫.	রংধনু লোকনাট্য	১৯৯২	শেখ আমজাদ হোসেন	খুলনা
১৮৬.	কৃষ্ণবীণা অপেরা	১৯৯২	শামসু মিয়া	ঢাকা
১৮৭.	আদি বঙ্গশ্রী অপেরা	১৯৯২	পারভীন জামান	ফরিদপুর
১৮৮.	উত্তরণ নাট্য সংস্থা	১৯৯২	আবদুস সালাম	মাগুরা
১৮৯.	উত্তরণ যাত্রা ইউনিট	১৯৯২	আবদুল মান্নান	রংপুর
১৯০.	চন্দ্রা যাত্রা ইউনিট	১৯৯২	মানজারুল ইসলাম লাভলু	ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

১৯১.	তাজমহল যাত্রা ইউনিট	১৯৯২	আলাউদ্দিন দেওয়ান	ঢাকা
১৯২.	মণিহার অপেরা	১৯৯২	আবদুল মান্নান	সাতক্ষীরা
১৯৩.	মধুমতী নাট্যসংস্থা	১৯৯২	নাজমুল হোসেন ইকু	মাগুরা
১৯৪.	শিল্পী অপেরা	১৯৯২	নয়ন চৌধুরী	ঢাকা
১৯৫.	পদ্মা যাত্রা ইউনিট	১৯৯৩	প্রদীপকুমার সাহা	যশোর
১৯৬.	দেশ অপেরা	১৯৯৩	মিলনকান্তি দে	ঢাকা
১৯৭.	চৈতালী অপেরা	১৯৯৩	অতুলপ্রসাদ সরকার	মাগুরা
১৯৮.	লক্ষ্মীভাণ্ডার অপেরা	১৯৯৩	রনজিৎ সেন	চট্টগ্রাম
১৯৯.	আদমজী কিরণ নাট্যগোষ্ঠী	১৯৯৩	নূর মোহাম্মদ নূরু	নারায়ণগঞ্জ
২০০.	শিল্পী শোভা অপেরা	১৯৯৪	মো. নয়ন মিয়া	মুন্সিগঞ্জ
২০১.	কণিকা অপেরা	১৯৯৪	গোপালচন্দ্র পাল	নড়াইল
২০২.	রাজমণি অপেরা	১৯৯৫	সুভাষ চক্রবর্তী	ফরিদপুর
২০৩.	সৌখিন গীতিনাট্য	১৯৯৫	মো. শামীম হোসেন	গাজীপুর
২০৪.	তিনকন্যা অপেরা	১৯৯৫	বশির আহমেদ	যশোর
২০৫.	ঝুমুর টঙ্গী	১৯৯৫	নুরুল ইসলাম সবুজ	গাজীপুর
২০৬.	বন্ধন নাট্যসংস্থা	১৯৯৬	আবুল হাসেম	নেত্রকোণা
২০৭.	সূর্যমহল অপেরা	১৯৯৬	সেকেন্দার আলী	মানিকগঞ্জ
২০৮.	বিনোদন ঝুমুর যাত্রা	১৯৯৬	আরশাদ আলী	মুন্সীগঞ্জ
২০৯.	শাহীন অপেরা	১৯৯৬	আ. মতিন সরকার	কুমিল্লা
২১০.	নাগরী সৌখিন ঝুমুর শিল্পীগোষ্ঠী	১৯৯৭	সুনীল চার্জ রডরিক্স	গাজীপুর
২১১.	নিউ সবুজ অপেরা	১৯৯৭	এস আলম লাবু	মাদারীপুর
২১২.	তাজমহল অপেরা	১৯৯৭	নার্গিস আক্তার লিপি	শরিয়তপুর
২১৩.	কেয়া যাত্রা ইউনিট	১৯৯৮	মাসুম চৌধুরী	লক্ষ্মীপুর

Dhaka University Institutional Repository

২১৪.	আনন্দ অপেরা	১৯৯৮	বাবর চান বাবু, পরে মোশাররফ হোসেন নয়ন	যশোর
২১৫.	তরুণ অপেরা	১৯৯৮	মো. নূরুল ইসলাম	চাঁদপুর

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২.বাংলাদেশের নিবন্ধিত যাত্রাদলগুলোর সর্বশেষ তালিকা

ক্রমিক নং	যাত্রাদলের নাম	সত্ত্বাধিকারী
১	বৈকালী অপেরা	জনাব গোলাম মোর্শেদ
২	স্বপ্না অপেরা	জনাব মো. শাহাদাৎ হোসেন
৩	কেয়া যাত্রা ইউনিট	জনাব আবদুল মান্নান (মাসুম চৌধুরী)
৪	শতরূপা শিল্পীগোষ্ঠী	জনাব মো. আবদুস সাত্তার (বাবলু)
৫	লোকনাট্য গোষ্ঠী	জনাব তাপস সরকার
৬	দেশ অপেরা	জনাব মিলন কান্তি দে
৭	কৃষ্ণা অপেরা	জনাব কৃষ্ণ চক্রবর্তী
৮	নিউ শিল্প নাট্যসংস্থা	জনাব মাহাবুব আলম
৯	পিয়াস যাত্রা ইউনিট	জনাব ফাতেমা আক্তার রত্না
১০	আনন্দ অপেরা	জনাব রিজিয়া খাতুন
১১	ভোলানাথ যাত্রা সম্প্রদায়	জনাব মৌসুমী পারভীন তারা
১২	সুন্দরবন অপেরা	জনাব পারুল চৌধুরী
১৩	ব্রহ্মপুত্র যাত্রা ইউনিট	জনাব মোহাম্মদ আলী
১৪	নরসুন্দা অপেরা	জনাব মো. আনোয়ার হোসেন
১৫	বাংলার বাণী অপেরা	জনাব মো. নয়ন শেখ
১৬	চৈতালী অপেরা	জনাব স্বপন পান্ডে
১৭	দোয়েল অপেরা	জনাব মোর্শেদা বেগম
১৮	ডায়মন্ড যাত্রা ইউনিট	জনাব লাবলু উকিল
১৯	প্রতিমা অপেরা	জনাব আলমুন হুসাইন
২০	শীতলক্ষা যাত্রা ইউনিট	জনাব আহম্মদ আলী
২১	চৈতালী অপেরা	জনাব মো: কুতুবুল আলম শাহীন
২২	চম্পা অপেরা	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন ভূইয়া
২৩	লিমা যাত্রা ইউনিট	জনাব খোকন চৌধুরী
২৪	জাগরণী অপেরা	জনাব অনন্ত কুমার সরকার
২৫	আদি-রূপাঞ্জলী অপেরা	জনাব মো. আনছার আলী হাওলাদার
২৬	যমুনা নাট্য সংস্থা	জনাব সাধনা আক্তার শান্তা
২৭	দিশারী অপেরা	জনাব রমজান আলী মিয়া

Dhaka University Institutional Repository

২৮	জনি অপেরা	জনাব মো. কুতুব উদ্দিন
২৯	আশানূর অপেরা	জনাব আয়শা আখতার
৩০	বন্ধন নাট্য সংস্থা	জনাব আবুল হাশেম
৩১	নিউ রংধনু অপেরা	জনাব আঃ রব হাওলাদার
৩২	খোয়াই অপেরা	জনাব মো. আজগর আলী
৩৩	মধুছন্দা যাত্রা ইউনিট	জনাব মো. ফিরোজ শাহনেওয়াজ
৩৪	কল্পনা অপেরা	জনাব মো. লিটন ভূইয়া
৩৫	ববী যাত্রা ইউনিট	জনাব তারেকুল ইসলাম নাসির
৩৬	সেবা যাত্রা ইউনিট	জনাব মোল্লা জাহাঙ্গীর আলম
৩৭	মিতা অপেরা	জনাব মোছাঃ মিতা বেগম
৩৮	খুলনা যাত্রা ইউনিট	জনাব মো. রবিউল ইসলাম (রবি)
৩৯	সীমা অপেরা	জনাব মো. দুলাল মিয়া
৪০	দি চ্যালেঞ্জার অপেরা	জনাব আসকার আলী (ওয়াসীম)
৪১	চন্দ্রাবতী অপেরা	জনাব অফুর উদ্দিন পণ্ডিত
৪২	রাজলক্ষ্মী অপেরা	জনাব মো. ওমর ফারুক
৪৩	জোনাকী অপেরা	জনাব ফারুক সরকার সুজা
৪৪	লোকনাথ নাট্যসংস্থা	জনাব লিপি বেগম
৪৫	কর্ণফুলি যাত্রা ইউনিট	জনাব মো. আনোয়ার হোসেন
৪৬	মেঘনা অপেরা	জনাব দুলাল চন্দ্র সাহা
৪৭	সোনালী অপেরা	জনাব মো. পিন্টু সরদার
৪৮	স্বদেশ অপেরা	জনাব জলিল হোসেন (বাবুল)
৪৯	বনফুল অপেরা	জনাব মো. কবির হোসেন
৫০	নিউ কাজল অপেরা	জনাব আয়শা আক্তার কাজল
৫১	জয়যাত্রা	জনাব হাসান কবির শাহীন
৫২	নিউ সবুজ অপেরা	জনাব হাবিবুর রহমান
৫৩	আজাদ অপেরা	জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন
৫৪	মহানন্দা অপেরা	জনাব কামরুজ্জামান
৫৫	নিউ নবরঞ্জন অপেরা	জনাব গোরাঙ্গ চন্দ্র বিশ্বশর্মা
৫৬	মঞ্জুশ্রী অপেরা, খুলনা	জনাব অমর কান্তি রায়

Dhaka University Institutional Repository

৫৭	সুমাইয়া যাত্রা ইউনিট	জনাব ফাতেমা আক্তার (নদী)
৫৮	ফাল্গুনী যাত্রা ইউনিট	জনাব মোঃ সেকেন্দার আলী
৫৯	তিতাস নাট্য সংস্থা	জনাব সোহেল হায়দার জসিম
৬০	মধুমালা নাট্য সংস্থা	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (কবির)
৬১	স্বরূপ কথা	জনাব জাফরুল স্বপন
৬২	অগ্রগামী নাট্যসংস্থা	জনাব দুলাল চন্দ্র সাহা
৬৩	তাজমহল অপেরা	জনাব মো. শুক্কুর আলী ফিরোজ
৬৪	দিগ্বীজয়ী অপেরা	জনাব মো. শফিকুল ইসলাম (শফিক)
৬৫	পদ্মা অপেরা	জনাব মো. আলমগীর হোসেন হানিফ
৬৬	সোনালী যাত্রা ইউনিট	জনাব এস. এম হাফেজুল হক (মাসুম)
৬৭	রাজদূত অপেরা	জনাব সৌমেন রায়
৬৮	নিউ রাজমনি অপেরা	জনাব মো. রাশেদুল আলম
৬৯	শিউলী অপেরা	জনাব শিউলী বেগম
৭০	রাজবানি অপেরা	জনাব গঙ্গারানী মন্ডল
৭১	শারমিন অপেরা	জনাব মো. রফিকুল ইসলাম শেখ
৭২	নিউ দিপালী অপেরা	জনাব মো. এমদাদুল হক
৭৩	আমার দেশ যাত্রা ইউনিট	জনাব আলমগীর হোসেন আলম
৭৪	নিউ বাসন্তী শিল্পী গোষ্ঠী	জনাব মো. আশরাফ সিদ্দিকী
৭৫	আকাংখ্যা নাট্যগোষ্ঠী	জনাব শহীদুর রহমান এনা
৭৬	চারনিক নাট্য গোষ্ঠী	জনাব জ্যোৎস্না বিশ্বাস
৭৭	অঞ্জলী যাত্রা ইউনিট	জনাব মোস্তফা গাজী
৭৮	আরতি অপেরা	জনাব মোঃ আলী আজগর
৭৯	রূপসী বাংলা যাত্রা ইউনিট	জনাব এস এম ইদ্রিস আলী
৮০	সূর্যমহল অপেরা	জনাব বিথীকা মন্ডল
৮১	আদি রংমহল অপেরা	জনাব প্রদীপ কির্ত্তনীয়া
৮২	নেত্রকথন নাট্য সংঘ	জনাব মো. শফিকুল ইসলাম খান
৮৩	স্বণালী যাত্রা ইউনিট	জনাব বাবু কমলেশ সাহা
৮৪	ভাই ভাই যাত্রা অপেরা	জনাব মো. আশরাফ আলী খান
৮৫	চলো বাংলাদেশ অপেরা	জনাব মো. জয়নাল আবেদীন (জুয়েল)

Dhaka University Institutional Repository

৮৬	দি নিউ সাথী অপেরা	জনাব মো. মধু মিয়া
৮৭	পারুল অপেরা	জনাব খোকন সাহা
৮৮	স্বাধীন বাংলা নাট্য গোষ্ঠী	জনাব অঞ্জনা কুন্ডু
৮৯	সীমান্ত অপেরা	জনাব মো. আ: রাজ্জাক
৯০	সুরমা অপেরা	জনাব মো. ইলিয়াস হোসেন এনাম
৯১	ভি দানিয়েল মেরিচিত্রা অপেরা	জনাব ভিক্টর দানিয়েল
৯২	বনশ্রী অপেরা	জনাব ফোরকান উদ্দিন
৯৩	দি নিউ শাপলা অপেরা	জনাব মোঃ নূর হোসেন
৯৪	দি নিউ চামেলী অপেরা	জনাব মোঃ হারুণ অর রশীদ
৯৫	দি নিউ কিরণ অপেরা	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান রাজু
৯৬	নিউ ভাগ্যলিপি অপেরা	জনাব মোঃ ইসমাইল খান
৯৭	মহাশঙ্কর অপেরা	জনাব মুক্তেশ বিশ্বাস
৯৮	অরণ্য অপেরা	জনাব কল্যাণী বাগচী
৯৯	গ্রাম বাংলা নাট্য সংস্থা	জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন
১০০	সততা অপেরা	মো: আঃ রাজ্জাক দেওয়ান
১০১	জ্যোতি অপেরা	জনাব মোঃ ইদ্রিস রায়হান

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩.'যাত্রাশিল্প উন্নয়ন নীতিমালা-২০১২'

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ৩০, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ শ্রাবণ ১৪১৯/৭ আগস্ট ২০১২

নং সবিম/শাঃ৭/বিবিধ যোগাযোগ-০৮/০৮-৪৫৩—যাত্রাশিল্প উন্নয়ন নীতিমালা-২০১২ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হইল।

'যাত্রাশিল্প উন্নয়ন নীতিমালা-২০১২'

ভূমিকা ঃ

যাত্রা বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। একটি শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম হিসেবে যাত্রা আমাদের দেশে আবহমানকাল হইতে সামাজিক ও লোকশিক্ষা এবং নির্মল আনন্দদানের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছে, সেই সংগে দর্শকবৃন্দকে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতেছে। চিত্তবিনোদনের পাশাপাশি পুরান, ইতিহাস, লোকগাঁথা ও নীতি শিক্ষাদানের বিষয়টিও যাত্রার সংগে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে। ঐতিহ্যগতভাবে যাত্রা কেবল বাংলা ভাষা এবং আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংগই নয়, আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অন্যতম প্রধান যোগসূত্র।

আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশের স্বার্থে পরিবেশনা ও অভিনয়রীতিকে অপরিবর্তিত রাখিয়া একটি প্রগতিশীল, পরিশীলিত ও উন্নতমানের শিল্পমাধ্যম হিসেবে যাত্রাশিল্পকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে যাত্রাশিল্পের উন্নয়ন, অবক্ষয়রোধ, শিল্পচর্চার পরিবেশ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ এবং সমকালীন শিল্প সংস্কৃতির পরিমন্ডলে এই ধারাটিকে সম্পৃক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবিত হওয়ায় সরকার নিম্নবর্ণিতরূপে যাত্রাশিল্প উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করিলেন।

(১৩২৯৫১)

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

Dhaka University Institutional Repository

১। **শিরোনাম ঃ**

এই নীতিমালা 'যাত্রাশিল্প উন্নয়ন নীতিমালা-২০১২' নামে অভিহিত হইবে।

২। **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ**

নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এ নীতিমালা প্রণীত হইল ঃ

২.১ দেশব্যাপী যাত্রাচর্চার উন্নয়ন, বিকাশ ও প্রসার;

২.২ জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সংস্কৃতিচর্চার সুস্থ পরিবেশকে স্থিতিশীল রাখা;

২.৩ যাত্রাচর্চার ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ের উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান করা;

২.৪ সুস্থ ও সৎ যাত্রাচর্চার বহমান ধারাকে আরও সমৃদ্ধ এবং বেগবান করা;

২.৫ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় যাত্রাশিল্পকে লোক শিক্ষার বাহন হিসেবে এবং সুষ্ঠু শিল্পচর্চা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করিবার মাধ্যমে জনগণকে ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধ ও রুচিবান করিয়া তোলা;

২.৬ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শেকড় আশ্রয়ী সংস্কৃতির সহিত যুক্ত করিয়া তাহাদের মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা;

২.৭ বিভিন্ন যাত্রাদলের মধ্যে প্রতিযোগিতার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়িয়া তোলা;

২.৮ উপযুক্ত যাত্রাদল ও যাত্রাশিল্পী গড়িয়া তোলা;

২.৯ একটি সৃষ্টিশীল পেশাভিত্তিক কর্ম হিসেবে যাত্রাকে প্রতিষ্ঠিত করা ;

৩। **বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ ঃ**

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ও স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় এই নীতিমালা বাস্তবায়ন করিবে।

৪। **কমিটি গঠন ঃ (যাত্রা শিল্প উন্নয়ন কমিটি)।**

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, অর্থ মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন করে মোট ৬ (ছয়) জন প্রতিনিধিসহ যাত্রাশিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, যাত্রা গবেষক এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের সমন্বয়ে ১৫(পনের) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হইবে। মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ উপ-সচিব বা তদুর্ধ পদের কর্মকর্তা হইবেন। পদাধিকারবলে কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক। কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব উক্ত একাডেমীর মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত থাকিবে। যাত্রাশিল্পের উন্নয়নের জন্য এই কমিটি সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫। **অনুদান ঃ**

সরকারি অর্থ বরাদ্দের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে যাত্রাশিল্প উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রাদলকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হইতে সরকারী অনুদান এর ব্যবস্থা করা হইবে।

৬। **নিবন্ধন ঃ**

(১) যাত্রা দলগুলোকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে নিবন্ধিত হইতে হইবে। এই নিবন্ধন সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হইবে। নীতিমালা অনুমোদনের পর নিবন্ধন বিষয়ে সকল প্রকার কার্যাদি সম্পাদনের জন্য (ফরম তৈরী, ফি নির্ধারণ ও অন্যান্য বিষয়) কমিটি সিদ্ধান্ত নিবে।

(২) দলসমূহকে প্রতি ৩(তিন) বছর অন্তর নিবন্ধন নবায়ন করিতে হইবে।

(৩) সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া পর পর ৩ (তিন) বছর নিবন্ধিত মালিকপক্ষ যাত্রাদল গঠন কিংবা যাত্রাপালা/অনুষ্ঠান পরিবেশনে ব্যর্থ হইলে অথবা সুনির্দিষ্ট কোন লিখিত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট যাত্রাদলের নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে ঃ—

(ক) কোন যাত্রাদল অনুচ্ছেদ ৬ (৩) ধারায় অভিযুক্ত হইলে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী প্রথমে অভিযুক্ত যাত্রাদলের মালিকপক্ষকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবে। অভিযুক্ত মালিকপক্ষ নোটিশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে যথোপযুক্ত জবাব দিতে বাধ্য থাকিবে।

(খ) ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে অভিযুক্ত মালিকপক্ষ জবাব প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী সরাসরি উক্ত দলের নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে।

(গ) অভিযুক্ত মালিকপক্ষের জবাব সন্তোষজনক না হইলে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী উক্ত যাত্রাদলের নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে।

৭। **চুক্তি স্বাক্ষর ঃ**

যাত্রাদল মালিকপক্ষের সহিত আয়োজক কর্তৃপক্ষের (নায়েক পার্টি) যাত্রাপালা পরিবেশন সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বেই চুক্তি স্বাক্ষর করিবেন। চুক্তিভঙ্গের কারণে আয়োজক কর্তৃপক্ষ (নায়ক পার্টি) এবং যাত্রাদল মালিকপক্ষ উভয়ের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

যাত্রাদল মালিকপক্ষের সহিত যাত্রাশিল্পী কুশলীগণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করিবেন এবং মালিকপক্ষকে চুক্তির অনুলিপি যাত্রাশিল্পীদের প্রদান করিতে হইবে। চুক্তিভঙ্গের কারণে যাত্রাদল মালিকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮। **অনুমতি ঃ**

যে কোন স্থানে যাত্রা প্রদর্শনী করিতে হইলে পূর্বেই স্থানীয় জেলা প্রশাসন এর অনুমতি লইতে হইবে। অনুমতির জন্য আবেদন পাওয়ার ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসককে অনুমতির বিষয়টি নিষ্পত্তি করিতে হইবে। মৌসুমে অনুমতিজনিত প্রশাসনিক জটিলতায় যাত্রা পরিক্রমা যাহাতে বন্ধ না হয় সে বিষয়ে জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৯। **নিরাপত্তা ঃ**

অনুমোদিত স্থানে যাত্রা প্রদর্শনীর জন্য স্থানীয় প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবে। জেলায় প্রদর্শনী হইলে জেলা প্রশাসক এবং মেট্রোপলিটন এলাকায় প্রদর্শনী হইলে মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবেন।

১০। **সামাজিক শৃংখলা রক্ষা ঃ**

(১) যাত্রাপালার কাহিনী এবং পরিবেশিত নৃত্য কোনক্রমেই জাতীয় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থি হইবে না;

(২) যাত্রাদল মালিকপক্ষ ও আয়োজন কর্তৃপক্ষ (নায়েক পার্টি) কর্তৃক স্থানীয় জেলা প্রশাসককে নিশ্চিত করিতে হইবে যে, প্যান্ডেলের অভ্যন্তরে বা পার্শ্ববর্তী স্থানে কোন অসামাজিক/ অনৈতিক কার্যকলাপ চলিবে না;

(৩) যাত্রানুষ্ঠানের নামে কোথাও অশ্লীল নৃত্যগীত এবং কোন ধরণের অসামাজিক কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হইলে আয়োজক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। এইরূপ অভিযোগ পাওয়া গেলে বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় স্থানীয় জেলা প্রশাসক/ মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার এ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে যাত্রানুষ্ঠান যে কোন সময় বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন;

(৪) যাত্রানুষ্ঠানের নামে অবৈধ চাঁদা আদায়, দুর্বৃত্তায়ন ইত্যাদি পরিলক্ষিত হইলে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী সদস্যরা তাহা কঠোরহস্তে দমন করিবেন।

১১। **সাবলেট ঃ**

নিবন্ধিত দলের মালিকপক্ষ যাত্রা পরিবেশন করার জন্য দলের পক্ষে অন্য কোন দল/সংগঠন/ ব্যক্তিকে নিবন্ধন পত্র ও অনুমতি পত্র হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

১২। **কার্যকারিতা ঃ**

এই নীতিমালা সরকারি গেজেটে প্রকাশের দিন হইতে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সুরাইয়া বেগম এনডিসি
সচিব।

মোঃ আব্দুল বারিক (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

Dhaka University Institutional Repository